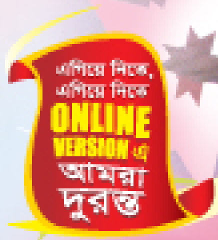




বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতায় শীর্ষে

আল ফাতাহ

ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ

আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ



ONLINE EXAM PREPARATION

www.alfatahbd.com



INTERNET BASED
Easy Network



HELPLINE CELL
Helpful for Teachers & Students

www.alfatahbd.com

উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস [তৃতীয় পত্র]



আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ

পূর্ণমান- ১০০

মানবণ্টন

ক. রচনামূলক প্রশ্ন :

৪টি প্রশ্ন থাকবে;

যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ২০ × ২ = ৪০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

৯টি প্রশ্ন থাকবে;

যে কোনো ৬টির উত্তর লিখতে হবে- ১০ ×৬ = ৬০

সর্বমোট = ১০০





সূচি

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

৩৫ .... এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন ●

ক. রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রথম অধ্যায়

আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি

৩৭ ١- ما معنى العقائد لغة وشرعا؟ ثم بين موضوعه وغرضه-
১। 'আকাইদ'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
او- عرف العقائد الاسلامية- ثم بين موضوعه وغرضه-
অথবা, 'আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ'-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

৪১ ٢- العقائد الاسلامية ما هي؟ اكتب تاريخ نشأة وتطور علم العقائد-
২। আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ কী? ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]
او- عرف العقائد الاسلامية لغة وشرعا- اكتب نشأتها وتطورها بالتفصيل-
অথবা, العقائد الاسلامية-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭]
او- عرف العقائد- ثم بين تاريخ تدوين علم العقائد مختصرا-
অথবা, আকাইদ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪৫ ٣- ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ تحدث عن موضوع العقيدة وغرضها وغايتها و نشأتها-
৩। আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আকিদা-এর বিষয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]

৫০ ٤- ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ اوضح اصول العقيدة الاسلامية واهميتها-
৪। আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]
او- ما معنى العقيدة؟ اكتب اصول العقيدة الاسلامية واهميتها مختصرا-
অথবা, عقيدة অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০০৯]
او- ما معنى العقائد؟ بين اصول العقيدة الاسلامية واهميتها مختصرا-
অথবা, 'আকাইদ' অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫৪ ٥- عرف العقيدة والايمان والاسلام- ثم بين اصول العقيدة الاسلامية مفصلا-
৫। আকিদা, ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯]

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৬২	اشرح مصدر العقيدة الاسلامية ـ ثم بين اهمية العقيدة الصحيحة مع ذكر اهم المؤلفات فى علم العقيدة ـ ৬। ইসলামী আকিদার উৎস ব্যাখ্যা কর। অতঃপর বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক আকিদা বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির নাম উল্লেখ কর।	٦ـ
৬৬	الايمان ما هو؟ هل هو يزيد وينقص؟ وما هو الاختلاف بين العلماء؟ بين مفصلا ـ ৭। ঈমান কী? এটা কি বৃদ্ধি এবং হ্রাস পায়? এ বিষয়ে আলেমগণের অভিমত কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।	٧ـ
৬৯	عرف التوحيد والايمان والاسلام ـ هل الايمان يزيد و ينقص؟ اكتب اختلاف العلماء فى هذه المسئلة ـ ৮। তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। ঈমান হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কি? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ। [ফা. প. ২০১০]	٨ـ
৭৪	هل الايمان والاسلام شيئان متغايران ام متحدان؟ فصل حق التفصيل ـ هل يجوز لاحد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ ৯। ঈমান ও ইসলাম কি একই জিনিস? নাকি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে? যথাযথ বিশ্লেষণ কর। কারো জন্য 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' একথা বলা বৈধ কিনা?	٩ـ
৭৬	ما هو الايمان؟ اذكر المناسبة بين الايمان والاسلام مفصلا ـ ১০। ঈমান কাকে বলে? ঈমান ও ইসলামের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তারিত বর্ণনা কর।	١٠ـ
৭৮	اكتب تاريخ نشأة علم العقائد ـ ثم اذكر الكتب المهمات لعلم العقائد مختصرا ـ ১১। আকাইদশাস্ত্র উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। অতঃপর আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির নাম উল্লেখ কর।	١١ـ
৮১	عرف العقيدة ونشأة مصطلح العقيدة وتطوره ـ ১২। عقيدة-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর عقيدة পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৮] او ـ عرف الايمان والاسلام والعقيدة لغة وشرعا ـ ثم بين نشأة مصطلح العقيدة وتطوره والمصطلحات الاخرى الدالة على معنى العقيدة ـ অথবা, ঈমান, ইসলাম ও আকিদার আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদা পরিভাষাটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষার ব্যাখ্যা কর।	١٢ـ
৮৭	ما معنى الايمان والاسلام لغة واصطلاحا؟ هل هما مترادفان ام لا؟ هل الايمان يزيد وينقص؟ ثم بين نشأة مصطلح "العقيدة" بالتفصيل ـ ১৩। ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দুটি কি সমার্থক শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর "আল আকিদা" পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৪]	١٣ـ
৯৩	عرف العقيدة والايمان والاسلام ـ ثم بين نشأة العقيدة وتطورها مفصلا وممثلا ـ ১৪। আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৫]	١٤ـ

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	عرف العقيدة والإيمان والاسلام. ثم بين الفرق بينها مع ذكر نشأة مصطلح العقيدة وتطورها. অথবা, عقيدة, ايمان ও اسلام-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ও عقيدة পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩]	او.
১০০	اكتب نبذة من حياة الإمام أبى حنيفة رحمه الله. ثم تحدث عن عقيدته فى ضوء كتابه "الفقه الأكبر". ১৫। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭]	১৫.
	اكتب نبذة من حياة الامام ابى حنيفة (رحـ). ثم اوضح عقيدته بضوء كتابه الفقه الاكبر بالتفصيل. অথবা, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।	او.
১০৪	اكتب نبذة من حياة الامام ابى جعفر الطحاوى (رحـ). ثم اذكر اصول عقيدة اهل السنة والجماعة. ১৬। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর।	١٦.
১০৭	اكتب نبذة من حياة الامام عمر النسفى (رحـ) مع بيان كتابه العقيدة بالتفصيل. ১৭। ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী তাঁর আকাইদ কিতাবের বর্ণনাসহ বিস্তারিত লেখ।	١٧.
১১০	اكتب نبذة من حياة الامام التفتازانى (رحـ) مع بيان كتابه العقائد النسفية بالايجاز. ১৮। ইমাম তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থ العقائد النسفية-এর বর্ণনা দাও।	١٨.
১১২	اكتب نبذة من حياة الامام عمر النسفى (رحـ). ثم اذكر عقيدته بضوء كتابه عقائد النسفى بالتفصيل. ১৯। ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আকাইদে নাসাফী'-এর আলোকে তাঁর আকিদা বিশ্লেষণ কর।	١٩.
১১৬	اكتب نبذة من حياة العلامة سعد الدين التفتازانى رحمه الله صاحب شرح العقائد النسفية. ২০। 'শরহুল আকিদা আন নাসাফিয়া' গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ উদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৮]	٢٠.
	اكتب نبذة من حياة الامام تفتازانى (رحـ) بالتفصيل. অথবা, ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ।	او.

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরকানুল ঈমান

১১৯ ٢١ـ تحدث عن اركان الايمان بالادلة النقلية والعقلية ـ
২১। নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

او ـ عرف اركان الايمان ـ وكم قسما لها؟ بين كل قسم مفصلا ـ
অথবা, اركان الايمان-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর।

او ـ اركان الايمان كم هى وما هى؟ تحدث عن هذه الاركان مفصلا ـ
অথবা, اركان الايمان কত প্রকার ও কী কী? এর রোকনগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

او ـ ماذا تعلم عن اركان الايمان؟ وكم هى وما هى؟ بين كل ركن بالوضاحة ـ
অথবা, اركان الايمان বলতে কী বোঝ? তা কত প্রকার ও কী কী? বিশদভাবে প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও।

১২৭ ٢٢ـ عرف التوحيد ـ ثم اذكر اقسامه مدللا ومفصلا ـ
২২। তাওহীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের প্রকারসমূহ দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪,'১৬]

او ـ ما معنى التوحيد لغة واصطلاحا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم مفصلا وممثلا ـ
অথবা, توحيد-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,'১১]

او ـ عرف التوحيد واقسامه ـ ثم اشرح القسم الذى انكر به المشركون ـ
অথবা, তাওহীদ ও তার প্রকারসমূহের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের সে প্রকারের ব্যাখ্যা দাও, যা মুশরিকরা অস্বীকার করে।

٢٣ـ ما المراد بالايمان برسالة محمد (صـ)؟ اشرح جوانب الايمان
১৩৩ برسالته (صـ) بالتفصيل ـ
২৩। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা কর।

٢٤ـ ما معنى النبوة والرسالة؟ ما الفرق بين النبى والرسول؟ تحدث عن مقتضيات الايمان بالرسالة مع اثبات ختم النبوة بمحمد
১৩৯ صلى الله عليه وسلم بالادلة والبراهين ـ
২৪। নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল এর মাঝে পার্থক্য কী? হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬]

٢٥ـ ما الإيمان بالرسالة؟ تحدث عن مقتضيات الايمان بالرسالة مع
১৫০ اثبات ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم مدللا ـ
২৫। রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৩]

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	ما معنى الايمان بالرسالة؟ تحدث عن مقتضيات الايمان بالرسالة مع اثبات ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم بالادلة والبراهين۔ অথবা, রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮]	او۔
১৫৮	اذكر ولادة النبى (صـ) واسمه ونسبه ومنزلته۔ ২৬। নবী করীম (স)-এর জন্ম, তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং তাঁর মর্যাদার বর্ণনা দাও।	٢٦۔
	متى واين ولد النبى (صـ)؟ بين مع ذكر اسمه وتعريف نسبه وشرفه بالتفصيل۔ অথবা, নবী করীম (স) কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দাও।	او۔
১৬৩	عرف نبينا محمدا (صـ)۔ ثم اشرح شرفه وفضله واهم معجزاته وختم النبوة به وفضل اصحابه واهل بيته فى ضوء القران والسنة۔ ২৭। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর মর্যাদা, প্রধান মুজিযাসমূহ, খতমে নবুয়ত এবং তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইতের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর।	٢٧۔
১৭০	تحدث عن عقيدة ختم النبوة مدعما بالادلة من القران والسنة مفصلا۔ ২৮। কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]	٢٨۔
	ماذا تعلم عن ختم النبوة؟ واذكر بالادلة مع اجابة المخالفين مفصلا۔ ثم اذكر نشأة المنكرين لختم النبوة وانتشارها مع ذكر اثارها فى بنغلاديش۔ অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? নবুয়ত অস্বীকারকারীদের জবাব দলীল সহকারে বিস্তারিত উল্লেখ কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর।	او۔
	عرف ختم النبوة۔ اثبت ختم نبوة لمحمد (صـ) بالقران والسنة ثم اذكر نشأة المنكرين لختم النبوة وانتشارها مع ذكر اثارها فى بنغلاديش۔ অথবা, খতমে নবুয়ত-এর সংজ্ঞা দাও। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুহাম্মাদ (স)-এর খতমে নবুয়ত সাব্যস্ত কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার ও ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর।	او۔
১৭৮	ما المعجزة؟ اذكر أهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم۔ ২৯। মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]	٢٩۔
	ما هى المعجزة؟ اذكر بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التى وقعت فى حياته الطيبة۔ অথবা, المعجزة কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৭,'১১, ১৫]	او۔
	ما هى المعجزة؟ ولمن تختص به المعجزة؟ ثم بين حقيقتها مفصلا۔ ثم اذكر بعض معجزة الرسول (صـ) التى وقعت فى حياته۔ অথবা, মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? অতঃপর মুজিযার হাকীকত বর্ণনা কর। অতঃপর রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় যেসব মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল, তার আংশিক উল্লেখ কর।	او۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
১৮৩	ما المعجزة والكرامة؟ تحدث عن عشر معجزات للنبى محمد صلى الله عليه وسلم۔ ৩০। মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]	٣٠۔
১৮৯	عرف الاسراء والمعراج ۔ ثم اثبت بالادلة ان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى اليقظة لا فى المنام۔ ৩১। 'ইসরা' ও 'মিরাজ' এর সংজ্ঞা দাও। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয়। [ফা. প. ২০১৮]	٣١۔
	عرف الاسراء والمعراج ۔ ثم اثبت بالادلة القاطعة ان المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى اليقظة بشخصه۔ অথবা, اسراء ও معراج-এর সংজ্ঞা দাও এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। [ফা. প. ২০১০]	او۔
	عرف الاسراء والمعراج ومتى وقع؟ ثم بين واقعة المعراج مختصرا۔ هل المعراج فى اليقظة ام فى المنام؟ অথবা, اسراء ও معراج-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কখন সংঘটিত হয়? অতঃপর মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় নাকি নিদ্রাবস্থায়?	او۔
	ما معنى المعراج؟ وما الفرق بين المعراج والاسراء؟ هل المعراج لرسول الله (صـ) كان فى اليقظة ام فى المنام؟ بين بالدلائل۔ অথবা, মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ এবং ইসরার মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল (স)-এর মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, না ঘুমন্ত অবস্থায়? দলীলসহ বর্ণনা কর।	او۔
১৯৬	بين عقائد اهل السنة والجماعة فى رؤية البارى تعالى وعصمة الانبياء عليهم السلام مع الرد على المخالفين۔ ৩২। আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন কর। [ফা. প. ২০১৩]	٣٢۔
২০৩	هل يمكن رؤية الله فى الدنيا والاخرة؟ ما رأى المعتزلة فى ذلك؟ اذكر رأيهم مع ادلتهم والرد عليهم ردا مقنعا۔ ৩৩। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কিনা? এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত কী? তাদের দলীল ও দলীলের সন্তোষজনক জবাব উল্লেখপূর্বক তাদের মতামত উল্লেখ কর।	٣٣۔
২০৭	اشرح وجوب طاعة النبى (صـ) واتباعه وخطورة مخالفته والتقدم عليه والرغبة عن سنته فى ضوء الايمان برسالة محمد (صـ)۔ ৩৪। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের আলোকে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা এবং তাঁর বিরোধিতা, অগ্রেগমন ও তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর।	٣٤۔
২১১	عرف الصحابة مع بيان فوائد القيود ۔ ثم بين فضل الصحابة بالتفصيل ۔ ثم اثبت ان الصحابة كلهم عدول۔ ৩৫। সাহাবীগণের সংজ্ঞা فوائد القيود-সহ বর্ণনা কর। অতঃপর সাহাবীগণের মর্যাদা বিস্তারিত বর্ণনা কর। অতঃপর প্রমাণ কর যে, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।	٣٥۔
২১৭	من هم الصحابة وبما يعرفون؟ وما حكم تنقيدهم؟ بين مع عقائد اهل السنة والجماعة بالتفصيل۔ ৩৬। সাহাবী কারা? কিভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যাবে? তাদের সমালোচনা করার বিধান কী? এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।	٣٦۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
২২০	اذكر اقوال العلماء حول عصمة الانبياء عليهم السلام بالدلائل۔ ৩৭। ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত প্রমাণসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১১] ما معنى النبى والرسول وما الفرق بينهما؟ بين مفهوم الايمان بالانبياء والرسول مع توضيح عصمة الانبياء۔ অথবা, নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? عصمة الانبياء-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখপূর্বক নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা কর। من هو الرسول؟ وما الفرق بين النبى والرسول؟ وما الحكمة فى ارسال الرسل؟ بين بالدليل۔ অথবা, رسول কাকে বলা হয়? نبى ও رسول-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর।	৩৭۔ او۔ او۔
২২৯	ما الرسالة؟ وما الحكمة فى ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أيد الله عز وجل رسوله بالمعجزات؟ ثم بين اهم معجزاته بالتفصيل۔ ৩৮। আররিসালাহ্ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার হেকমত কী? আল্লাহ কেন তাঁর রাসূল (স)-কে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তাঁর প্রধান মুজিযাসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪] ما هى الرسالة؟ وما هى الحكمة فى ارسال الرسل؟ ولماذا ايد الله تعالى الرسل بالمعجزات؟ অথবা, রিসালাত কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য কী? আল্লাহ কেন মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন?	৩৮۔ او۔
২৩৪	من هو الولى وما حقيقته؟ وما الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج؟ ثم اثبت ان الكرامة للاولياء حق بالادلة۔ ৩৯। অলী কে এবং তার হাকীকত কী? মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য কী? অতঃপর 'অলীগণের কারামত সত্য' বিষয়টি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর। عرف الولى لغة واصطلاحا ۔ وماذا تعلم عن حقيقته؟ ثم اثبت بادلة القران والسنة ان الكرامة للاولياء حق مع ترديد المخالفين۔ অথবা, অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে কী জান? অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করতঃ কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর 'অলীগণের কারামত সত্য'।	৩৯۔ او۔
২৩৮	ما معنى المعجزة والكرامة والاستدراج؟ وما الفرق بينهن؟ ثم اثبت ان كرامة الاولياء حق مع ترديد المخالفين۔ ৪০ অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডনপূর্বক প্রমাণ কর যে, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য।	٤٠۔
২৪৩	عرف المعجزة والكرامة والاستدراج ۔ ثم بين عقائد اهل السنة والجماعة فيهن مدللا بالتفصيل۔ ৪১। মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলো সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।	٤١۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
২৪৯	ما معنى الايمان بالكتب؟ اشرح مع بيان وجوه الايمان بالقران الكريم والكتب السماوية السابقة ـ ثم اذكر فوائد الايمان بالكتب ـ ৪২। الايمان بالكتب তথা কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের অর্থ কী? কুরআনে কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর। অতঃপর উল্লেখ কর কিতাবসমূহে বিশ্বাসের উপকারিতা কী?	٤٢ـ
২৫৪	اشرح وجوه الاعجاز فى القران ـ ৪৩। পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা কর। او ـ اذكر تحدى القران بالادلة الواضحة ـ অথবা, আল কুরআনের চ্যালেঞ্জকে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর।	٤٣ـ
২৫৮	ما معنى الملائكة؟ اشرح العقيدة الاسلامية فى الملائكة مع بيان ضلال عقيدة الكفار فيهم بضوء القران الكريم ـ ৪৪। ملائكة অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে ইসলামী আকিদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং ফেরেশতাগণের বিষয়ে কাফেরদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি কুরআনে কারীমের আলোকে আলোচনা কর।	٤٤ـ
২৬৪	هل البشر افضل من الملائكة ام الملائكة افضل من البشر؟ ৪৫। মানুষ কি ফেরেশতার চেয়ে উত্তম? নাকি ফেরেশতা মানুষের চেয়ে উত্তম? او ـ اثبت بالادلة ان البشر افضل من الملائكة ـ অথবা, প্রমাণ কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।	٤٥ـ
২৬৭	ما معنى الايمان بالاخرة؟ اشرح بالتفصيل مع شرح عقيدة عذاب القبر والقيامة والحشر والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار واشراط الساعة ـ ৪৬। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? কবরের আযাব, কেয়ামত, হাশর, হিসাব, মীযান, সিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদার ব্যাখ্যা কর।	٤٦ـ
২৭৪	ما معنى الايمان بالاخرة؟ اشرح بالتفصيل مع شرح عقيدة الصراط والحوض والجنة والنار واشراط الساعة ـ ৪৭। আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম, কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।	٤٧ـ
২৭৯	اثبت عذاب القبر وسؤال منكر ونكير بالادلة ـ ثم اذكر ادلة المخالفين فيه مع جواب ادلتهم ـ ৪৮। কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন ও উত্তর দলীলসহ প্রমাণ কর। অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও। [ফা. প. ২০১৪] او ـ اثبت سؤال منكر ونكير وعذاب القبر بالادلة القاطعة ـ ومن خالف فى هذه المسئلة؟ وماذا دلائلهم وما الجواب عنها؟ অথবা, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব এবং কবরের আযাব সাব্যস্ত হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। কারা এ মাসয়ালার বিরোধিতা করেছে? তাদের দলীল এবং প্রত্যুত্তর কী?	٤٨ـ
২৮২	اثبت سؤال منكر ونكير بالادلة القاطعة ـ ৪৯। মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ দলীলসহ প্রমাণ কর।	٤٩ـ

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
২৮৪	"الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" تحدث عن الايمان بالبعث بعد الموت وانكاره فى ضوء هذه العبارة مدللا ومفصلا۔ ৫০। "الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬,'১৮] او۔ عرف البعث لغة واصطلاحا ۔ ثم اثبت بأن البعث حق بالادلة النقلية والعقلية۔ واجب عن ادلة منكريه موضحا۔ অথবা, আল বায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের উত্তর দাও। [ফা. প. ২০১৪] او۔ ما معنى البعث؟ هل هو محال عقلا؟ وما الدليل على حقيته؟ وماذا يرد عليه؟ وما الجواب عنه؟ অথবা, بعث তথা পুনরুত্থান বলতে কী বোঝ? এটা কী যুক্তির মানদণ্ডে অসম্ভব? এর সত্যতার দলীল কী? এর ওপর কী কী আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং তার প্রত্যুত্তর কী?	৫০۔
২৮৭	اثبت بالادلة القاطعة ان الجنة والنار حق وانهما موجودتان الان۔ اجب عن ادلة المنكرين۔ ৫১। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং এতদুভয় বর্তমানে বিদ্যমান আছে। অতঃপর অস্বীকারকারীদের দলীলের জবাব দাও। او۔ اثبت وجود الجنة والنار بالادلة النقلية والعقلية مع ترديد اقوال المخالفين۔ অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি খণ্ডনপূর্বক নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সাব্যস্ত কর। او۔ هل الجنة والنار موجودتان الان ام لا؟ فصل المسئلة مع ذكر اختلاف العلماء مدللا۔ অথবা, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ মাসয়ালায় বিশেষজ্ঞদের মতভেদ দলীলসহ আলোচনা কর।	৫১۔
২৯০	اثبت بالدليل ان الوزن حق والكتاب حق والصراط حق ۔ و اجب عن المنكرين۔ ৫২। দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন সত্য, কিতাব সত্য এবং সিরাত সত্য। অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কর।	৫২۔
২৯৩	ما معنى الشفاعة لغة وشرعا؟ ولمن له حق الشفاعة؟ ثم بين انواع الشفاعة بالتفصيل۔ ৫৩। শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শাফায়াতের অধিকারী কারা? অতঃপর বিস্তারিতভাবে شفاعة-এর প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর।	৫৩۔
২৯৬	ما معنى الشفاعة؟ بين الشفاعة على ضوء القران والحديث ۔ هل هى ثابتة للرسل والصالحين فى اهل الكبائر؟ وما فيه الاختلاف؟ بين۔ ৫৪। শাফায়াত অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফায়াতের বর্ণনা দাও। কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূলগণের এবং সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কিনা? এতে কী মতভেদ আছে? বর্ণনা কর।	৫৪۔

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
او۔	ما معنى الشفاعة لغة وشرعا؟ ثم بين قول النبى (صـ) "شفاعتى لاهل الكبائر من امتى" مع ذكر اختلاف الائمة۔ অথবা, শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ইমামদের মতবিরোধসহ রাসূল (স)-এর বাণী– شفاعتى لاهل الكبائر من امتى-এর ব্যাখ্যা কর।	
۵۵۔	ما معنى القدر؟ وما المراد بالايمان بالقدر؟ اشرح العقيدة الاسلامية فى القدر مع بيان ضلال عقيدة الكفار فى ضوء القران۔ ثم بين اثر الايمان بالقدر فى حيوة الانسان۔ ৫৫। قدر অর্থ কী? قدر-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের আলোকে قدر সম্পর্কে ইসলামী আকিদা এবং ভ্রান্ত কুফরী আকিদা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর মানবজীবনে قدر-এর প্রতি ঈমানের প্রভাব বর্ণনা কর।	৩০১
او۔	ما هو القدر؟ وما المراد بالايمان بالقدر؟ وما هى الاشياء المتعلقة به؟ ثم بين اهمية الايمان بالقدر وفوائده۔ অথবা, قدر-এর অর্থ কী? قدر-এর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য কী? এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কী? অতঃপর قدر-এর প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা কর।	
۵٦۔	ما معنى الايمان بالقدر وما هى؟ ثم بين عقيدة الفرقة الضالة فى التقدير مع الاجابة من اهل الحق بضوء القران والحديث۔ ৫৬। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কী এবং এগুলো কী কী? তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর।	৩০৭
۵۷۔	عرف القدر لغة واصطلاحا۔ وما مراتبه؟۔ ثم اشرح الكلام "ان الله خالق لافعال العباد" مع ذكر اراء العلماء فى هذه المسئلة۔ ৫৭। قدر-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর স্তরগুলো কী কী? অতঃপর ব্যাখ্যা কর যে "আল্লাহই বান্দার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা" এবং এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত ব্যাখ্যা কর।	৩১০

তৃতীয় অধ্যায়
নাওয়াকিদুল ঈমান

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
۵۸۔	تحدث عن نواقض الايمان فى ضوء القران والسنة۔ ৫৮। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]	৩১৫
او۔	اكتب نواقض الايمان على ضوء القران والسنة۔ অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে লেখ। [ফা. প. ২০১২, '১৫]	
او۔	ما معنى نواقض الايمان وما موادها؟ وكم هى وما هى؟ بين باعتبار القران والسنة۔ অথবা, নাওয়াকিদুল ঈমানের অর্থ ও এর বিষয়বস্তু কী? তা কয়টি ও কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর।	
او۔	عرف نواقض الايمان۔ ثم بين اقسامه باعتبار القران والسنة مفصلا۔ অথবা, نواقض الايمان-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর প্রকারভেদগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।	

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৩২১	ما معنى النواقض؟ اشرح نواقض الايمان اى الكفر والشرك والنفاق بالتفصيل۔ ৫৯। نواقض অর্থ কী? ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।	٥٩۔
	عرف نواقض الايمان ۔ ثم اوضح نواقض الايمان يعنى الكفر والشرك والنفاق مفصلا۔ অথবা, نواقض الايمان-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বর্ণনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।	او۔
৩২৭	وازن حقيقة الشرك وطبيعته فى الامم السابقة ولهذه الأمة ۔ ثم بين مفاسد الشرك فى بنغلاديش مع بيان رأيك فى استئصاله۔ ৬০। অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর। বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এবং শিরকের মূলোৎপাটনে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।] [ফা. প. ২০১৩]	٦٠۔
৩৩২	ما هو الشرك؟ اذكر مفاسد الشرك فى بنغلاديش مع بيان رأيك فى استئصاله۔ ৬১। শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আলোচনাপূর্বক এর মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬]	٦١۔
৩৩৬	عرف الشرك لغة وشرعا ۔ وكم قسما له؟ بين بالتفصيل۔ ৬২। شرك-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৭]	٦٢۔
	ما معنى الشرك لغة وشرعا؟ بين اقسامه واسبابه وحكمه بالتفصيل۔ অথবা, শিরক-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শিরকের প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান বর্ণনা কর।	او۔
৩৪২	ما الفرق بين الكفر و الشرك؟ هل يكفر الرجل بارتكاب الكبائر؟ وهل يجوز ان يقال لاهل القبلة او المسلم كافرا؟ بين مع اختلاف العلماء فيه۔ ৬৩। কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কী? কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে কি? এবং কোনো মুসলিম অথবা কিবলার অনুসারীকে কাফের বলা যাবে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।	٦٣۔
৩৪৬	ما معنى الكفر؟ وكم قسما له؟ بين مفصلا ومدللا۔ ৬৪। কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯]	٦٤۔
	ما الكفر لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل۔ অথবা, 'কুফর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]	او۔
	ما معنى الكفر لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل۔ অথবা, كفر-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৯]	او۔
৩৪৯	ما معنى الكفر لغة وشرعا؟ وما هى اوصاف الكافر؟ ثم بين بعض مظاهر الكفر المروجة فى المجتمع۔ ৬৫। কুফরের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের বর্ণনা দাও।	٦٥۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৩৫২	عرف النفاق مع بيان اقسامه وحكمه مفصلا۔ ৬৬। নেফাক-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর শ্রেণিবিন্যাস ও হুকুম বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯] او- ما معنى النفاق لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل۔ وما الفرق بين النفاق الاعتقادى والعملى؟ অথবা, النفاق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। نفاق عملى ও نفاق اعتقادى-এর মধ্যে পার্থক্য কী? او- عرف النفاق۔ ثم بين اقسامه واسبابه وحكمه مع بيان الفرق بين الكافر والمنافق مفصلا۔ অথবা, نفاق-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান বর্ণনাসহ কাফের ও মুনাফিক-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।	٦٦
৩৫৮	اوصاف المنافقين ما هى؟ وما حكم المنافق الخالص؟ ثم بين اضرار النفاق فى الحياة الاجتماعية۔ ৬৭। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য কী? প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।	٦٧
৩৬২	عرف الشرك لغة وشرعا۔ نتيجة الشرك ما هى؟ ثم بين بعض الاشراك المذكورة فى القران الكريم مدللا ومفصلا۔ ৬৮। شرك-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। শিরকের পরিণতি কী? অতঃপর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু শিরকের বর্ণনা দলীলসহ বিস্তারিত উপস্থাপন কর।	٦٨
৩৬৭	اشرح بالتفصيل مظاهر الشرك والكفر والنفاق المنتشرة فى المجتمع۔ ৬৯। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাকের বিস্তারিত আলোচনা কর।	٦٩
৩৭০	ما معنى التكفير؟ بين مدى خطورة تكفير المؤمن فى ضوء القران والسنة۔ ثم وضح اصول اهل السنة والجماعة فى مسألة التكفير وعقائد الفرق الضالة فى ذلك۔ ৭০। تكفير অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাকফীরের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর আকিদা আলোচনা কর।	٧٠
৩৭৪	عرف البدعة فى ضوء القران والسنة النبوية المطهرة واثار الصحابة۔ ثم بين نشأة البدعة وتطورها۔ ৭১। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।	٧١
৩৭৯	ما معنى البدعة؟ وكم قسما لها وما هى؟ بين كل قسم بالتفصيل۔ ৭২। বিদয়াত অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর।	٧٢
৩৮৪	اكتب ما تعلم على نشأة البدعة وانتشارها۔ واذكر بعض البدعة التى اتسعت فى مجتمعنا بالتفصيل۔ ৭৩। বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ। আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু বিদয়াতের বিস্তারিত পরিচয় দাও।	٧٣

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক

او- اكتب تاريخ مصدر البدعة وانتشارها فى المجتمع- ثم اذكر بعض البدعة المروجة فى بلدنا-
অথবা, সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর। আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়
ইফতিরাক

٧٤- ما معنى الافتراق لغة واصطلاحا؟ وما خلفية الافتراق؟ هل الافتراق جائز فى الاسلام؟ بين بالادلة مفصلا- ৩৮৮
৭৪। افتراق-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট কী? ইসলামে কি ইফতিরাক জায়েয? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

٧٥- ما معنى الافتراق؟ وما الفرق بينه وبين الاختلاف؟ ثم اشرح اسباب الافتراق على ضوء القران والسنة- ৩৯২
৭৫। افتراق অর্থ কী? افتراق ও اختلاف-এর মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে افتراق-এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

٧٦- كيف ظهر الافتراق فى الامة الاسلامية؟ بين خلفية ذلك مع شرح المسائل الاساسية التى كانت مدار الافتراق- ৩৯৬
৭৬। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি হয় কিভাবে? এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর এবং যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে, সেগুলোর ব্যাখ্যা কর।

٧٧- اذكر الاسباب الرئيسية فى افتراق العقائد الاسلامية بين الائمة- ৪০০
৭৭। ইসলামী আকিদার প্রশ্নে ইমামগণের বিভাজনের প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]

او- بين سبب اختلاف العقيدة وخلفيتها مفصلا-
অথবা, আকিদা বিভক্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা কর।

او- كيف افترق فى اهل العقيدة؟ اكتب تاريخها موضحا-
অথবা, আকিদাপন্থিদের মধ্যে কিভাবে বিভাজন হয়েছিল? এর ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ কর।

٧٨- من أهل السنة والجماعة؟ بين عقائدهم بالتفصيل- ৪০৩
৭৮। 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

او- من هم اهل السنة والجماعة؟ بين عقائدهم بالتفصيل-
অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫]

او- من هم اهل السنة والجماعة؟ بين عقيدتهم بالتفصيل-
অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১২]

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	من هم اهل السنة والجماعة؟ اكتب نشأة اهل السنة والجماعة وتطورها مفصلا۔ অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,'১০]	او۔
৪০৮	اشرح جهود الائمة الاربعة فى شرح عقيدة اهل السنة والجماعة مع ذكر مؤلفاتهم واصولهم ومناهجهم۔ ৭৯। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান ব্যাখ্যা কর এবং তাঁদের গ্রন্থাবলি, মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।	۷۹۔
৪১২	من هم اهل السنة والجماعة؟ اذكر خصالهم واصول عقائدهم۔ ৮০। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাঁদের স্বভাব ও আকিদার মূলনীতি বিস্তারিত আলোচনা কর।	۸۰۔
৪১৬	عرف الفرق الضالة مع بيان اجمالى لخصائص عقائدهم۔ ৮১। বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনাসহ তাদের পরিচয় দাও।	۸۱۔
৪২১	عرف الخوارج مع بيان نشأتهم وتطورهم وعقائدهم بشيء من التفصيل۔ ৮২। খারেজিদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯]	۸۲۔
	من هم الخوارج؟ اذكر نشأتها وتطورها وافكارها واسماء فروقهم مع ذكر مؤسسهم؟ অথবা, খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠাতাদেরসহ তাদের দলগুলোর নাম উল্লেখ কর।	او۔
৪২৬	عرف الشيعة مع بيان تاريخ نشأتهم واصول عقائدهم۔ ৮৩। শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহ আলোকপাত কর। [ফা. প. ২০১৮]	۸۳۔
	عرف الفرقة "الشيعة"۔ ثم تحدث عن تاريخ نشأتهم وعقائدهم۔ অথবা, শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদা সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]	او۔
	عرف الشيعة۔ ثم اذكر تاريخ الشيعة واصولها بالتفصيل۔ অথবা, শিয়ার সংজ্ঞা দাও। শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মৌলিক বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]	او۔
	من هم الشيعة؟ اذكر اراء هذه الفرقة بالتفصيل۔ অথবা, শিয়া কারা? এ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা কর।	او۔
৪৩১	من هم الجبرية؟ اذكر نشأتهم وتطورهم ۔ ثم اكتب عقيدتهم الاصلية مع بيان طبقاتهم۔ ৮৪। জাবারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। তাদের মৌলিক আকিদা ও শ্রেণিবিন্যাস লিপিবদ্ধ কর।	۸٤۔
৪৩৪	من هم القدرية؟ اذكر نشأتهم وتطورهم و نظرياتهم بالتفصيل۔ ৮৫। কাদারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।	۸٥۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৪৩৭	عرف الجبرية والقدرية ـ بين سبب نشأتهما ـ وما خلافهم فى باب القدر وافعال العباد؟ اذكر بالتفصيل ـ ৮৬। জাবারিয়া এবং কাদারিয়ার পরিচয় দাও। তাদের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা কর। বান্দার কর্ম ও ভাগ্য বর্ণনায় তাদের মতবাদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।	٨٦ـ
৪৪০	من هم المرجئة؟ اذكر نشأتها وتطورها مع بيان نظرياتهم ـ ثم بين الفرق بينها وبين الخارجية ـ ৮৭। মুরজিয়া কারা? উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখপূর্বক তাদের মতবাদসমূহ আলোচনা কর। অতঃপর মুরজিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।	٨٧ـ
	عرف المرجئة مع بيان تاريخ نشأتهم وابرز فرقهم واصول عقائدهم ـ অথবা, উৎপত্তির ইতিহাসসহ মুরজিয়াদের পরিচয় দাও। তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্তি ও তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।	او ـ
৪৪৩	من هم فرقة المعتزلة؟ ومن هو مؤسسها؟ ولم سميت هذه الفرقة بالمعتزلة؟ اذكر افكارهم و عقائدهم ـ ৮৮। মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা বলা হয় কেন? এদের মতবাদ এবং আকিদাসমূহ আলোচনা কর।	٨٨ـ
৪৪৭	عرف المعتزلة ـ ثم بين نشأتهم واصول عقائدهم وسبب زوالهم ـ ৮৯। মুতাযিলাদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের উৎপত্তি, আকিদাগত মূলনীতি ও পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।	٨٩ـ
৪৫৩	من هم الاشعريون؟ اذكر تاريخ نشأتهم وتطورهم ونظرياتهم ـ ৯০। আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মতবাদগুলো আলোচনা কর।	٩٠ـ
	عرف الاشعرية مع بيان نشأتهم واصول عقائدهم ـ ثم بين الفرق بين العقائد المعتزلة والاشعرية ـ অথবা, আশয়ারীদের পরিচয় বর্ণনাপূর্বক তাদের উৎপত্তি ও আকিদাগত মূলনীতি পর্যালোচনা কর। অতঃপর মুতাযিলা ও আশয়ারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর।	او ـ
৪৫৮	عرف القاديانية مع بيان تعريف مؤسسها و تاريخ نشأتهم واصول عقائدهم ـ ৯১। উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানী ও এর প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় দাও এবং তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।	٩١ـ
৪৬১	ما هى عقائد اهل السنة والجماعة وعقائد الوهابية وعقائد الاحمدية؟ بين حق التفصيل ـ ৯২। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা কী? যথাযথভাবে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]	٩٢ـ
	عرف اهل السنة والجماعة والوهابية والاحمدية ـ ثم بين عقائدهم مفصلا ـ অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।	او ـ

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রথম অধ্যায়

আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি

৪৬৯ ١- ما معنى العقائد لغة وشرعا؟ بين -
১। عقائد-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর।

৪৭১ ٢- ما هو غرض علم العقائد وما موضوعه؟ بين بالايجاز-
২। আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪৭৩ ٣- بين تاريخ تدوين علم العقائد مختصرا-
৩। আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪৭৫ ٤- اكتب اصول العقيدة الاسلامية بالايجاز-
৪। ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১৬]

او- اكتب اصول العقيدة الصحيحة بالايجاز-
অথবা, সহীহ আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১৪]

او- ما هى الامور التى يجب على المسلم ان يعتقد بها؟ اكتب بادلة الكتاب والسنة-
অথবা, মুসলমানদের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১৩]

৪৭৬ ٥- اذكر اهمية العقيدة الاسلامية مختصرا-
৫। সংক্ষেপে ইসলামী আকিদার গুরুত্ব আলোচনা কর।

او- بين اهمية العقيدة الصحيحة بالايجاز-
অথবা, বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪৭৮ ٦- ما معنى الايمان والاسلام؟ وما الفرق بينهما؟ بين-
৬। ايمان ও اسلام-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. '০৭]

৪৮১ ٧- هل الايمان يزيد وينقص؟ وما رأيك؟ بين اختصارا-
৭। ঈমান কি হ্রাস বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫]

او- هل الايمان يزيد وينقص؟ وما الاختلاف فيه بين العلماء؟
অথবা, ঈমান কি হ্রাসবৃদ্ধি পায়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?

او- اثبت بالادلة ان الايمان لا يزيد ولا ينقص مع الرد على المخالفين-
অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে দলীল দ্বারা প্রমাণ কর, ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি পায় না।

৪৮২ ٨- ما معنى الايمان لغة واصطلاحا؟ هل الايمان يزيد وينقص؟
৮। ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়? [ফা. প. ২০১২]

او- ما معنى الايمان لغة واصطلاحا؟ هل الايمان يزيد وينقص ام لا؟ بين مفصلا-
অথবা, ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাকি? বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]

৪৮৫ ٩- ما الفرق بين الايمان والاسلام؟
৯। ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী?

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৪৮৬	هل الايمان والاسلام متحدان ام مختلفان؟ بين بالادلة۔ ১০। ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলিলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮]	۱۰۔
	هل الايمان والاسلام متغايران ام متحدان؟ هل يجوز لاحد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ অথবা, ঈমান ও ইসলাম কি ভিন্ন জিনিস না এক? কারো জন্য 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' বলা বৈধ কিনা?	او۔
৪৮৭	هل الايمان مركب ام بسيط؟ وما الاختلاف فيه بين العلماء؟ ১১। ঈমান যৌগিক নাকি মৌলিক বিষয়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?	۱۱۔
৪৮৮	اكتب تاريخ نشأة علم العقائد مختصرا۔ ১২। সংক্ষেপে আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর।	۱۲۔
৪৮৯	اكتب عشرة كتب تتعلق بالعقيدة الاسلامية مع ذكر مؤلفيها۔ ১৩। লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের নাম লেখ। [ফা. প. ২০১৯]	۱۳۔
	هات عشرة كتب التى الفت على العقائد مع ذكر اسماء مؤلفيها۔ অথবা, আকিদাবিষয়ক দশটি গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামসহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]	او۔
	اذكر الكتب المهمة لعلم العقائد۔ অথবা, আকিদাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ কর।	او۔
৪৯২	عرف الايمان والاسلام لغة وشرعا۔ ১৪। ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও।	۱٤۔
৪৯৪	ما هى مصطلحات العقيدة؟ بين المصطلحات الاخرى الدالة على معنى العقيدة۔ ১৫। আকিদার পরিভাষাসমূহ কী? আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষাগুলো বর্ণনা কর।	۱۵۔
৪৯৫	اكتب نبذة عن حياة الامام ابى حنيفة رحمه الله۔ ১৬। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৯]	۱٦۔
	اكتب ترجمة الامام ابى حنيفة رحمه الله بايجاز۔ অথবা, সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৬]	او۔
৪৯৮	اكتب نبذة من حياة الامام أبى جعفر الطحاوى رحمه الله۔ ১৭। ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৭]	۱۷۔
৪৯৯	اذكر اصول عقيدة اهل السنة والجماعة۔ ১৮। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর।	۱۸۔

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরকানুল ঈমান

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৫০১	اركان الايمان ما هى وكم هى؟ اكتب كلها بالتفصيل۔ ১৯। আরকানুল ঈমান কী ও তা কত প্রকার? প্রত্যেকটি বিস্তারিত লেখ। [ফা. প. ২০১০]	۱۹۔
	اركان الايمان كم هى وما هى؟ بين مفصلا۔ অথবা, اركان الايمان কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।	او۔
	ما معنى التوحيد؟ وكم قسما له؟ بين۔ ২০। তাওহীদ অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? বর্ণনা কর। [ফা. প. '০৭,'১৯]	۲۰۔
৫০৪	ما معنى التوحيد لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم۔ অথবা, توحيد-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রকারগুলো বর্ণনা কর।	او۔
৫০৬	ما هو المعراج؟ هل هو كان فى اليقظة ام فى المنام؟ بين مع الاختلاف۔ ২১। معراج কী? তা কি জাগ্রত অবস্থায় নাকি স্বপ্নযোগে হয়েছিল? মতপার্থক্যসহ আলোচনা কর। [ফা. প. '০৭,'০৯]	۲۱۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৫০৮	ما المراد بالايمان برسالة محمد (صـ) بين وجوه الايمان بها ۔ ২২। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তাঁর ওপর ঈমান গ্রহণের বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর।	٢٢۔
৫০৯	عرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ۔ ২৩। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও।	٢٣۔
৫১১	بين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايجاز ۔ ২৪। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।	٢٤۔
	بين بيانا شافيا فضل الرسول (صـ) وشرفه مع اهم معجزاته بالاختصار ۔ অথবা, রাসূল (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান সংক্ষেপে বর্ণনাপূর্বক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর।	او۔
৫১৪	اذكر اسماء الانبياء الذين ذكرت اسماءهم فى القران الكريم ۔ ২৫। যে সকল নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ কর।	٢٥۔
৫১৫	ابحث عن اهم معجزات النبى (صـ) وختم النبوة به ۔ ২৬। মহানবী (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ এবং তাঁর দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।	٢٦۔
৫১৭	اكتب ما تعلم بمكانة الصحابة ۔ ثم أثبت بالأدلة "ان الصحابة كلهم عدول" ۔ ২৭। সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লেখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, 'সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।' [ফা. প. ২০১৭]	٢٧۔
	عين مكانة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بضوء القران والسنة ۔ অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১৫]	او۔
৫২০	عين مكانة الصحابة واهل البيت رضوان الله عليهم اجمعين على ضوء الاحاديث النبوية ۔ ২৮। হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণের (রা) ও আহলে বাইতের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১৩]	٢٨۔
	عين مكانة الصحابة (رضـ) على ضوء الاحاديث النبوية ۔ অথবা, হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১১]	او۔
৫২২	تحدث عن ختم النبوة بأدلة من القران والسنة ۔ ২৯। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]	٢٩۔
৫২৪	اذكر نشأة المنكرين لختم النبوة وانتشارها مع ذكر اثارها فى بنغلاديش ۔ ৩০। বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৯]	٣٠۔
	ماذا تعلم عن ختم النبوة؟ اذكر نشأة المنكرين لختم النبوة وانتشارها مع ذكر اثارها فى بنغلاديش ۔ অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।	او۔
[illegible]	ما هى المعجزة؟ ولمن هذه خاصة؟ بين ۔ ৩১। মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? বর্ণনা কর।	٣١۔
	ما معنى المعجزة؟ ولمن تختص به؟ অথবা, মুজিযা অর্থ কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট?	او۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৫২৯	اذكر بعض معجزات الرسول (صـ) التى وقعت فى حياته۔ ৩২। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত কতিপয় মুজিযার বিবরণ দাও।	۳۲۔
৫৩০	متى اسرى النبى (صـ)؟ بين واقعة المعراج مختصرا۔ هل المعراج فى اليقظة ام فى المنام؟ ৩৩। মহানবী (স)-এর মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল? মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ কি সশরীরে সজাগ অবস্থায় নাকি স্বপ্নে হয়েছিল?	۳۳۔
৫৩৩	ما معنى المعراج؟ وما الفرق بين المعراج والاسراء؟ ৩৪। মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ ও ইসরার মাঝে পার্থক্য কী?	۳٤۔
৫৩৫	عرف الصحابة مع بيان فوائد القيود۔ ৩৫। সাহাবীগণের সংজ্ঞা فوائد قيود-সহ বর্ণনা কর।	۳۵۔
৫৩৬	اثبت بالادلة ان الصحابة كلهم عدول۔ ৩৬। দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ। [ফা. প. '০৯]	۳٦۔
৫৩৮	عرف الصحابة۔ ثم اثبت عدالتهم بضوء القران والسنة۔ وما حكم تنقيدهم؟ ৩৭। সাহাবীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের ন্যায়পরায়ণতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত কর। তাঁদের সমালোচনা করার বিধান কী?	۳۷۔
৫৪১	ما معنى النبى والرسول وما الفرق بينهما؟ ৩৮। নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী?	۳۸۔
৫৪৪	بين مفهوم الايمان بالانبياء والرسل مع بيان عصمة الانبياء۔ ৩৯। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিবরণসহ নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা কর।	۳۹۔
৫৪৬	ما المراد بعصمة الانبياء؟ بين فى ضوء القران والسنة۔ ৪০। ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে কী বোঝায়? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯] ما معنى عصمة الانبياء؟ وما عقيدة اهل السنة والجماعة فيها؟ بين۔ অথবা, 'ইসমাতুল আম্বিয়া' বলতে কী বুঝ? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮] ما المراد ب "عصمة الأنبياء"؟ بين فى ضوء القران والحديث۔ অথবা, 'ইসমাতুল আম্বিয়া' বলতে কী বুঝ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] ما معنى عصمة الأنبياء؟ وما هو رأيك؟ بين مؤجزا۔ অথবা, ইসমতে আম্বিয়া অর্থ কী? এ বিষয়ে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫] ما معنى العصمة؟ هل الانبياء معصومون عن الذنوب ام لا؟ فصل۔ অথবা, العصمة-এর অর্থ কী? আম্বিয়ায়ে কেরাম গুনাহ থেকে معصوم কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯]	٤٠۔ او۔ او۔ او۔ او۔
৫৫১	ما هو الرسول؟ ما هى الحكمة فى ارسال الرسل؟ ولماذا ايد الله تعالى الرسل بالمعجزات؟ ৪১। রাসূল কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য কী? আল্লাহ কেন মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন?	٤١۔
৫৫৪	ما هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو شرط لكمال الايمان؟ بين۔ ৪২। রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬]	٤٢۔

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

او- حب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هل هو شرط لتكميل الايمان؟ بين-

অথবা, রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য উপর্যুক্ত ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]

৫৫৫ ٤٢- ما الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج؟ اثبت ان الكرامة الاولياء حق-

৪৩। মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রমাণ কর যে, 'আওলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য'। [ফা. প. ২০১০]

৫৫৭ ٤٤- عرف المعجزة والكرامة والاستدراج-

৪৪। المعجزة ـ الكرامة ـ الاستدراج এবং-এর সংজ্ঞা দাও। [ফা. প. ২০০৭]

৫৬১ ٤٥- عرف المعجزة والكرامة والاستدراج- ثم بين الفرق بينهم بالايجاز-

৪৫। معجزة ـ كرامة ও استدراج-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

৫৬৪ ٤٦- ما الفرق بين الكرامة والاستدراج؟ وما حكمه؟ بين مفصلا-

৪৬। কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯]

او- ما الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج؟ وما حكمها؟ بين مفصلا-

অথবা, মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৫৬৬ ٤٧- عرف الولى لغة واصطلاحا- ثم اكتب ما تعرف عن حقيقة الاولياء وكراماتهم موضحا-

৪৭। الولى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত ও কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ। [ফা. প. ২০১৮]

او- عرف الولى لغة واصطلاحا- وماذا تعلم عن حقيقة الولى؟ بين موضحا-

অথবা, الولى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে কী জান? স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর। [ফা. প. '১৪,'১৬]

৫৬৮ ٤٨- بين اهمية الايمان بالكتب السماوية-

৪৮। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১১]

او- بين كيفية الايمان بالقران الكريم والكتب السماوية السابقة-

অথবা, কুরআনুল কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের স্বরূপ বর্ণনা কর।

৫৭০ ٤٩- بين ما تعلم عن التحريف الذى حصل فى التوراة والانجيل حسب ما بين الله فى القران-

৪৯। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে তুমি যা জান বর্ণনা কর।

৫৭৩ ٥٠- اذكر تحدى القران بالادلة الواضحة-

৫০। আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর।

৫৭৫ ٥١- ما معنى الملائكة؟ اشرح العقيدة الاسلامية فى الملائكة -

৫১। ملائكة অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে সংক্ষেপে ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ কর।

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

৫৭৯ تكلم عن الايمان بالملائكة ـ ثم اذكر صفاتهم بالادلة ـ ٥٢ـ

৫২। ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে দালিলিক প্রমাণ দাও। [ফা. প. ২০১২]

ما معنى الملائكة لغة واصطلاحا؟ اذكر مع بيان صفات الملائكة بالايجاز ـ او ـ

অথবা, ملائكة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সংক্ষেপে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৮]

৫৮১ صف الملائكة كما وصف المصنف العلام ـ ٥٣ـ

৫৩। প্রাজ্ঞ গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের বর্ণনা দাও।

৫৮৩ اثبت بالادلة ان البشر افضل من الملائكة ـ ٥٤ـ

৫৪। দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

৫৮৫ اكتب اشراط الساعة الكبرى بالايضاح ـ ٥٥ـ

৫৫। কেয়ামতের বড় আলামতগুলো বিশদভাবে লেখ। [ফা. প. ২০১৯]

الاشراط الكبرى للساعة ما هى؟ بين ـ او ـ

অথবা, কেয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কী কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,'০৯]

৫৮৬ ما الأشراط الصغرى للساعة؟ بين بايجاز ـ ٥٦ـ

৫৬। কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

الاشراط الصغرى للساعة ما هى؟ بين بالايجاز ـ او ـ

অথবা, কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,'১৩, '১৫]

৫৮৮ اين يسكن الروح بعد الممات؟ بين اراء العلماء فيه ـ ٥٧ـ

৫৭। মৃত্যুর পর রূহ কোথায় থাকে? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর।

ما معنى الايمان بالاخرة؟ اشرح عقيدة الصراط والحوض والجنة ٥٨ـ
৫৮৮ والنار واشراط الساعة ـ

৫৮। আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত ও জাহান্নাম, কেয়ামতের পূর্বাভাস বিষয়ক আকিদা ব্যাখ্যা কর।

৫৯২ بين اهمية الايمان بالاخرة ـ ثم اذكر اثاره فى المجتمع الانسانى ـ ٥٩ـ

৫৯। পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে এর প্রভাব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬]

تكلم عن الايمان بالاخرة ثم اذكر اثاره فى المجتمع الانسانى ـ او ـ

অথবা, আখেরাতের ওপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মানবসমাজে এর প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২]

৫৯৪ اثبت سؤال منكر ونكير بالادلة القاطعة ـ ٦٠ـ

৬০। মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।

৫৯৬ اثبت بالبراهين الباهرة ان البعث حق و اجب عن المنكرين ايجابا تاما ـ ٦١ـ

৬১। সুউজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত কর যে, পুনরুত্থান সত্য এবং এর অস্বীকারকারীদের তুমি পূর্ণ জবাব প্রদান কর।

هل المعاد الجسمانى موقوف على ثبوت اعادة المعدوم؟ بين ٦٢ـ
৫৯৮ بالادلة مع ترديد المخالفين ـ

৬২। শারীরিক পুনরুত্থান কি বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল? বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতঃ দলীল সহকারে বর্ণনা কর।

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৬০০	هل الجنة والنار موجودتان الان؟ اكتب اختلاف العلماء فى هذه المسئلة۔ ৬৩। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত ব্যক্ত কর। [ফা. প. ২০১২, '১৫]	٦٣۔
	هل الجنة وجهنم موجودتان فى الحال؟ اكتب اختلاف العلماء فى هذه المسئلة۔ অথবা, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কী? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ। [ফা. প. ২০১০]	او۔
	هل الجنة والنار موجودتان الان؟ اذكر المسئلة مع ذكر اختلاف العلماء ايجازا۔ অথবা, বেহেশত ও দোযখ এখন বিদ্যমান আছে কি? আলেমগণের মতপার্থক্য উল্লেখসহ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭]	او۔
৬০৩	اثبت حقيقة الوزن والكتاب والصراط والحوض بالادلة الواضحة۔ ৬৪। সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন, কিতাব, সিরাত এবং হাউযে কাউসার সত্য। [ফা. প. ২০১৪]	٦٤۔
	هل الحوض والكوثر سواء؟ بين الحوض الكوثر بالتفصيل۔ অথবা, হাউয ও কাউসার একই বস্তু কিনা? হাউযে কাউসার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।	او۔
৬০৭	هل الصراط حق ام لا؟ أوضح اختلاف العلماء فى هذه المسئلة۔ ৬৫। 'সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]	٦٥۔
	هل الصراط حق ام لا؟ حرر الخلاف بين العلماء فى هذه المسئلة۔ অথবা, সিরাত বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]	او۔
৬০৮	اكتب معنى الشفاعة واقسامها مفصلا۔ ৬৬। শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ। [ফা. প. ২০১৯]	٦٦۔
৬১০	تحدث عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ۔ هل هى ضرورية للنجاه ام لا؟ بين۔ ৬৭। উম্মতের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা কর। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]	٦٧۔
	حدث عن الشفاعة ۔ هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورية للنجاة ام لا؟ أثبت بالدلائل۔ অথবা, শাফায়াতের সংজ্ঞা দাও। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১১, '১৫]	او۔
	ما معنى الشفاعة؟ هل هى ثابتة للرسل والصالحين من اهل الكبائر؟ অথবা, শাফায়াত অর্থ কী? কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূল এবং সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কি? [ফা. প. ২০০৭,'০৯]	او۔
৬১৪	متى تقع واقعة الساعة؟ وما اشراط الساعة؟ بين بالايجاز۔ ৬৮। কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪]	٦٨۔
	ما القيامة ومتى تنعقدها؟ بين اشراطها بالدلائل۔ অথবা, কেয়ামত কী এবং কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রমাণসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]	او۔

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

٦٩- ما هو الايمان بالقدر؟ اثبت وجوب الايمان بالقدر بالادلة من
৬১৭ الكتاب والسنة-

৬৯। الإيمان بالقدر বলতে কী বোঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৬]

او- الإيمان بالقدر ما هو؟ أثبت وجوب الإيمان بالقدر بالأدلة من الكتاب والسنة-

অথবা, الإيمان بالقدر বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৩]

او- الايمان بالقدر ما هو؟ اثبت وجوب الايمان بالقدر بالادلة والبراهين-

অথবা, الايمان بالقدر কী? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০০৮]

٧٠- ما معنى القدر؟ وما المراد بالايمان بالقدر؟ اشرح العقيدة
৬১৯ الاسلامية فى القدر-

৭০। قدر অর্থ কী? قدر-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের আলোকে قدر সম্পর্কে ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ কর।

৬২১ ٧١- هات الدليل بالقران والحديث على ان القدر مكتوب-

৭১। "তাকদীর লিপিবদ্ধ"-এর ওপর কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন কর।

٧٢- هل للعباد افعال اختيارية ام لا؟ بين الخلاف بين المعتزلة
৬২৩ والاشعرية فى هذه المسئلة-

৭২। বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাযিলা ও আশয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর। [ফা. প. '১৩,'১৬]

৬২৫ ٧٣- ما حكمة الله فى جعل المفاضلة بين العباد فى الرزق؟

৭৩। বান্দাদের মাঝে রিজিকের তারতম্য রাখার পেছনে আল্লাহর কী রহস্য রয়েছে?

٧٤- بين عقيدة الفرقة الضالة فى التقدير مع الاجابة من اهل الحق
৬২৭ بضوء القران والحديث-

৭৪। তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর।

৬২৯ ٧٥- ما معنى القدر؟ اكتب اراء القدرية والجبرية فى هذه المسئلة-

৭৫। قدر অর্থ কী? এই বিষয়ে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যা সম্প্রদায়ের অভিমত লেখ। [ফা. প. ২০১০]

৬৩০ ٧٦- تحدث عن عذاب القبر فى ضوء القران والسنة-

৭৬। কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

او- ماذا تعرف عن عذاب القبر والبعث والحشر؟ بين-

অথবা, عذاب القبر والبعث والحشر সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

٧٧- ما الخلاف بين الخوارج والاشاعرة فى مسألة مرتكب الكبيرة؟
৬৩২ بين مفصلا-

৭৭। مرتكب الكبيرة বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬,'১৮]

পৃষ্ঠা | প্রশ্নাবলি | ক্রমিক

او۔ اكتب اقوال الخوارج والاشعرية فى مسئلة مرتكب الكبيرة مع الادلة۔
অথবা, مرتكب الكبيرة বিষয়ে খারেজী ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতামত দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]

৬৩৩ ٧٨۔ اكتب اقوال المعتزلة فى مسئلة مرتكب الكبيرة۔
৭৮। مرتكب الكبيرة বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০১৩]

তৃতীয় অধ্যায়
নাওয়াকিদুল ঈমান

৬৩৫ ٧٩۔ ما معنى نواقض الايمان؟ وكم هى وما هى؟
৭৯। নাওয়াকিদুল ঈমান বলতে কী বোঝ? তা কয়টি ও কী কী?

৬৩৭ ٨٠۔ عرف الشرك مع ذكر اقسامه مفصلا۔
৮০। শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]

او۔ الشرك ما هو؟ كم قسما له؟ ثم بين كل قسم بالاختصار۔
অথবা, শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

او۔ الشرك ما هو؟ وكم قسما له؟ بين حكم كل قسم بالتمثيل۔
অথবা, শিরক কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]

او۔ ما معنى الشرك لغة واصطلاحا؟ اذكر انواع الشرك مفصلا وممثلا۔
অথবা, شرك শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

৬৪০ ٨١۔ ما الشرك؟ اذكر انواع الشرك الاصغر فى ضوء الاحاديث النبوية۔
৮১। শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরকে আসগারের প্রকারসমূহের বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১৪]

٨٢۔ ما الفرق بين الشرك الاكبر و الشرك الاصغر؟ بين اقسام الشرك
৬৪৪ الاكبر مفصلا۔
৮২। শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য কী? শিরকে আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৬৪৫ ٨٣۔ ما الفرق بين الكفر والشرك؟ اوضح اوصاف الكافرين بالايجاز۔
৮৩। কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য কী? কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

٨٤۔ تحدث عن مظاهر الشرك فى العبادات التى ظهرت كثيرا فى
৬৪৭ المجتمع الاسلامى۔
৮৪। ইসলামী সমাজে বহুল প্রচলিত ইবাদতগত শিরকসমূহ আলোচনা কর।

৬৪৯ ٨٥۔ ما معنى الكفر لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل۔
৮৫। 'কুফর'এর-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০১৩]

٨٦۔ هل الشتم والكذب على الله والرسول صلى الله عليه وسلم من
৬৫১ الكبائر؟ اوضح بالايات القرانية والاحاديث النبوية۔
৮৬। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে গালি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা কি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	هل تقبل توبة الشاتم على الله ورسوله؟ ثم بين حد من سب النبى (صـ) وحد من كذب عليه۔ অথবা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালিদাতার তওবা কী কবুল হবে? অতঃপর যে ব্যক্তি নবী (স)-কে গালি দেয় ও তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করে তার শাস্তি বর্ণনা কর।	او۔
৬৫৫	عرف النفاق ثم اكتب اقسامه وحكمه بالاختصار۔ ৮৭। نفاق-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারসমূহ ও হুকুম সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১০,'১৪, '১৫]	٨٧۔
	عرف النفاق بالاختصار ثم اذكر علامات النفاق على ضوء القران والسنة۔ অথবা, নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতসমূহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২]	او۔
	عرف النفاق مع بيان اقسامه وحكمه۔ অথবা, نفاق-এর পরিচয় প্রদানপূর্বক এর প্রকারভেদ ও বিধান বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭]	او۔
৬৫৯	اذكر الأيات القرانية والاحاديث النبوية بالنسبة للنفاق والمنافقين۔ ৮৮। নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী হতে উদ্ধৃত কর। [ফা. প. ২০১৩]	٨٨۔
৬৬১	اوصاف المنافقين ما هى؟ ثم بين اضرار النفاق فى الحياة الاجتماعية۔ ৮৯। মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।	٨٩۔
	ما هى اوصاف المنافقين؟ وما حكم المنافق الخالص؟ ثم بين اضرار النفاق فى الحياة الاجتماعية۔ অথবা, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? প্রকৃত মুনাফিকের বিধান কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।	او۔
৬৬৫	ماذا تعرف عن النفاق الاعتقادى؟ ثم بين حكمه۔ ৯০। النفاق الاعتقادى বলতে কী বুঝ? এর বিধান বর্ণনা কর।	٩٠۔
৬৬৬	اشرح بالتفصيل مظاهر الشرك والكفر المنتشر فى المجتمع۔ ৯১। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের বর্ণনা দাও।	٩١۔
৬৬৯	ما معنى التكفير؟ بين مدى خطورة تكفير المؤمن فى ضوء القران والسنة۔ ৯২। تكفير অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর।	٩٢۔
৬৭১	عرف البدعة فى ضوء القران والسنة النبوية المطهرة واثار الصحابة۔ ৯৩। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় দাও।	٩٣۔
৬৭৩	بين نشأة البدعة وتطورها فى الاسلام۔ ৯৪। ইসলামে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।	٩٤۔
৬৭৫	ما معنى البدعة لغة وشرعا؟ بين اقسامها بالامثلة۔ ৯৫।'বিদয়াত' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বিদয়াত-এর প্রকারসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]	٩٥۔

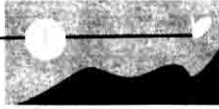
পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	بين معنى البدعة وأقسامها بالامثلة۔ অথবা, البدعة-এর অর্থ ও প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. '১১,'১৬]	او۔
	كم قسما للبدعة وما هى؟ اذكر البدعات المروجة فى بلدنا۔ অথবা, বিদয়াত কত প্রকার ও কী কী? আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতগুলোর বিবরণ দাও।	او۔
	كم قسما للبدعة وما هى؟ اكتب بالامثلة۔ অথবা, بدعة কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৭]	او۔

চতুর্থ অধ্যায়
ইফতিরাক

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৬৭৯	ما هى خلفية افتراق فى الامة المسلمة؟ كم فرقة فى الامة المسلمة؟ بين بالتفصيل۔ ৯৬। মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট কী? মুসলিমজাতির মধ্যে কতগুলো ফেরকা তথা সম্প্রদায় রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর।	٩٦۔
৬৮১	ما معنى الافتراق؟ وما الفرق بينه وبين الاختلاف؟ ৯৭। افتراق অর্থ কী? افتراق ও اختلاف-এর মধ্যকার পার্থক্য কী?	٩٧۔
৬৮৪	بين اسباب الافتراق فى ضوء القران والسنة۔ ৯৮। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকিদা বিভাজনের কারণসমূহ বর্ণনা কর।	٩٨۔
৬৮৬	كيف ظهر الافتراق فى الأمة الاسلامية؟ بين۔ ৯৯। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,'০৯,'১৫,'১৮]	٩٩۔
৬৮৭	بين المسائل الاساسية التى كانت مدار الافتراق۔ ১০০। যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে আকিদার বিভাজন ঘটে সেগুলোর বিবরণ দাও।	١٠٠۔
৬৯০	عرف اهل السنة والجماعة۔ ثم بين عقائد اهل السنة والجماعة۔ ১০১। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর।	١٠١۔
৬৯৩	اشرح جهود الأئمة الاربعة فى شرح عقيدة اهل السنة والجماعة۔ ১০২। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান ব্যাখ্যা কর।	١٠٢۔
৬৯৫	عرف اهل السنة والجماعة مع ذكر مزاياهم۔ ১০৩। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহসহ তাদের পরিচয় দাও। [ফা. প. ২০১৪]	١٠٣۔
	من هم اهل السنة والجماعة؟ اذكر خصالهم۔ অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব আলোচনা কর।	او۔
৬৯৮	من هم الخوارج؟ اذكر نشأتها وتطورها۔ ১০৪। খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।	١٠٤۔
৭০০	الخوارج من هم؟ اذكر أهم عقائدهم مختصرا۔ ১০৫। খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১১, '১৫]	١٠٥۔

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
	ما هو افكار الخوارج؟ بين. অথবা, খারেজীদের মতবাদ কী? বর্ণনা কর।	او-
৭০৪	عرف الفرقة الشيعة مع بيان تاريخ نشأتهم. ১০৬। শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনাসহ তাদের পরিচয় দাও।	١٠٦-
৭০৭	اصول عقائد الشيعة ما هى؟ بين. ১০৭। শিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? বর্ণনা কর।	١٠٧-
৭০৯	ما هى عقيدة اليهودى ابن صبا حول على (رضـ) وخلافته؟ ১০৮। হযরত আলী (রা) ও তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে ইহুদি ইবনে সাবার কী বিশ্বাস রয়েছে?	١٠٨-
৭১০	من هم الجبرية؟ اذكر نشأتهم وتطورهم. ১০৯। জাবরিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।	١٠٩-
৭১২	اكتب اصول عقيدة الجبرية وطبقات افكارهم واراء اهل السنة والجماعة عنهم. ১১০। জাবরিয়্যাদের আকিদার মূলনীতি ও তাদের মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস এবং তাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত লিপিবদ্ধ কর।	١١٠-
৭১৪	من هم القدرية؟ اذكر نشأتهم وتطورهم. ১১১। কাদারিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।	١١١-
৭১৫	عقائد القدرية ما هى؟ بين. ১১২। কাদারিয়্যাদের আকিদাসমূহ কী? বর্ণনা কর।	١١٢-
৭১৭	اكتب اقوال الجبرية والقدرية فى باب القدر وافعال العباد. ১১৩। বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যাদের অভিমতগুলো লিপিবদ্ধ কর।	١١٣-
৭১৮	من هم المرجئة؟ اذكر عن نشأتها وتطورها. ১১৪। মুরজিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।	١١٤-
৭২০	ما هى اصول عقائد المرجئة؟ ثم بين الفرق بين الخارجى والمرجئة. ১১৫। মুরজিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? অতঃপর খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।	١١٥-
৭২২	ما معنى المعتزلة لغة واصطلاحا؟ ومن مؤسسها؟ ولم سميت بها؟ وضح. ১১৬। معتزلة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাদেরকে معتزلة নামে নামকরণ করা হয়েছে কেন? আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮]	١١٦-
	من هم الفرقة المعتزلة؟ ومن هو مؤسسها؟ بين وجه تسمية هذه الفرقة بالمعتزلة. অথবা, মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।	او-

পৃষ্ঠা	প্রশ্নাবলি	ক্রমিক
৭২৫	من الفرقة المعتزلة؟ بين عقائدهم بالتفصيل۔ ১১৭। 'মুতাযিলা' সম্প্রদায় কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] او۔ ما هى اصول عقائد المعتزلة؟ بين۔ অথবা, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতিসমূহ কী? বর্ণনা কর।	۱۱۷۔
৭২৮	بين اسباب زوال المعتزلة بالايجاز۔ ১১৮। সংক্ষেপে মুতাযিলাদের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।	۱۱۸۔
৭৩০	من هم الاشعريون؟ اذكر تاريخ نشأتهم وتطورهم ونظرياتهم۔ ১১৯। আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মতবাদগুলো আলোচনা কর।	۱۱۹۔
৭৩৩	ما الفرق بين عقائد المعتزلة والاشعرية؟ اكتب بالوضاحة۔ ১২০। মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের আকিদার মাঝে পার্থক্য কী? সুস্পষ্ট করে বিস্তারিত লেখ। [ফা. প. ২০১০]	۱۲۰۔
৭৩৪	عرف الجهمية مع بيان تاريخ نشأتهم وعقائدهم۔ ১২১। জাহমিয়াদের পরিচয় তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদার বিবরণসহ প্রদান কর।	۱۲۱۔
৭৩৬	عرف الكرامية مع بيان تاريخ نشأتهم۔ ثم بين اصول عقائدهم۔ ১২২। উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাররামিয়াদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।	۱۲۲۔
৭৩৮	عرف القاديانية مع بيان تاريخ نشأتهم۔ ১২৩। উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানীদের পরিচয় দাও।	۱۲۳۔
৭৪১	اذكر اصول عقائد القاديانية مع بيان عقيدتهم۔ ১২৪। কাদিয়ানীদের আকিদার বিবরণসহ তাদের আকিদার মূলনীতিগুলো বর্ণনা কর।	۱۲٤۔
৭৪৩	اذكر اقوالا لغلام احمد القادياني فى كونه ظلا للنبى ونبيا مطلقا۔ ১২৫। ছায়া নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উক্তিসমূহ উল্লেখ কর।	۱۲٥۔
৭৪৫	ما القاديانية؟ بين عقيدتهم۔ ১২৬। কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১৭] او۔ ما هى القاديانية؟ بين عقيدتهم۔ অথবা, কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১২] او۔ من هو غلام احمد القادياني؟ اذكر بعض دعواه وعقائده الفاسدة۔ অথবা, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কে? তার কতিপয় ভ্রান্ত দাবি ও আকিদা উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৮,'১০]	۱۲٦۔
৭৪৭	تحدث عن بعض الفرق الضالة المتواجدة فى هذا العصر۔ ১২৭। বর্তমান সময়ের কতিপয় ভ্রান্ত দল সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]	۱۲۷۔
৭৫৩	● বোর্ড প্রশ্নাবলি	




উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস [তৃতীয় পত্র]

আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ

- আকিদা
- আরকানুল ঈমান
- নাওয়াকিদুল ঈমান
- ইফতিরাক



বিস্তারিত সিলেবাস

ক. আকিদা

■ আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ■ ঈমান, ইসলাম ও আকিদার সংজ্ঞা ■ আকিদা বিষয়ক অন্যান্য পরিভাষা ■ আকিদার উৎস ও গুরুত্ব ■ আকিদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি।

খ. আরকানুল ঈমান

■ আল্লাহর প্রতি ঈমান ■ তাওহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ■ রিসালাতের প্রতি ঈমান ■ মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয়, মর্যাদা, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা, তাঁর নবুয়তের সর্বজনীনতা, খাতমুন নুবুওয়াত, আনুগত্য, অনুকরণ, ভালোবাসা, আহলুল বাইত, সাহাবী ■ অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান ■ ইসমাতুল আম্বিয়া ■ মুজিযা, কারামত, ইসতিদরাজ ■ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : আল কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব ■ মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান ■ আখেরাতের প্রতি ঈমান ■ কবরের আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত, হাউয, শাফায়াত, আশরাতুস সায়া (কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ) ইত্যাদির প্রতি ঈমান ■ তাকদীরের প্রতি ঈমান।

গ. নাওয়াকিদুল ঈমান (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ)

■ শিরক, কুফর, নেফাক, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাক ■ কুফর বনাম তাকফীর ■ বিদয়াত : পরিচয় ও ক্রমবিকাশ, বিশ্বাসের বিদয়াত ও কর্মের বিদয়াত এবং সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদয়াত।

ঘ. ইফতিরাক (আকিদাগত বিভাজন)

■ কারণ ও প্রেক্ষাপট ■ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ■ আহলুস সুন্নাতের আকিদা ব্যাখ্যায় ইমামগণের অবদান ■ বিভ্রান্ত দল ও উপদলসমূহ এবং তাদের মতাদর্শ ও ইতিহাস।

এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন ২০২০

আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ

পৃষ্ঠা	প্রশ্নের বিবরণ	সম্ভাব্যতা
	ক. রচনামূলক প্রশ্নাবলি	
	[৪টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ২০ × ২ = ৪০]	
৪৫	١ـ ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ تحدث عن موضوع العقيدة وغرضها وغايتها و نشأتها ـ	***
৮৭	٢ـ ما معنى الايمان والاسلام لغة واصطلاحا؟ هل هما مترادفان ام لا؟ هل الايمان يزيد وينقص؟ ثم بين نشأة مصطلح "العقيدة" بالتفصيل ـ	**
৯৩	٣ـ عرف العقيدة والايمان والاسلام ـ ثم بين نشأة العقيدة وتطورها مفصلا وممثلا ـ	***
১০০	٤ـ اكتب نبذة من حياة الإمام أبى حنيفة رحمه الله ـ ثم تحدث عن عقيدته فى ضوء كتابه "الفقه الأكبر" ـ	**
১১৬	٥ـ اكتب نبذة من حياة العلامة سعد الدين التفتازانى رحمه الله صاحب شرح العقائد النسفية ـ	***
১২৭	٦ـ عرف التوحيد ـ ثم اذكر اقسامه مدللا ومفصلا ـ	***
১৭০	٧ـ تحدث عن عقيدة ختم النبوة مدعما بالادلة من القران والسنة مفصلا ـ	***
১৮৯	٨ـ عرف الاسراء والمعراج ـ ثم اثبت بالادلة ان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى اليقظة لا فى المنام ـ	***
২৮৪	٩ـ "الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" تحدث عن الايمان بالبعث بعد الموت وانكاره فى ضوء هذه العبارة مدللا ومفصلا ـ	**
৩১৫	١٠ـ تحدث عن نواقض الايمان فى ضوء القران والسنة ـ	***
৩৩২	١١ـ ما هو الشرك؟ اذكر مفاسد الشرك فى بنغلاديش مع بيان رأيك فى استئصاله ـ	***
৪০৩	١٢ـ من أهل السنة والجماعة؟ بين عقائدهم بالتفصيل ـ	**
৪২৬	١٣ـ عرف الشيعة مع بيان تاريخ نشأتهم واصول عقائدهم ـ	***

পৃষ্ঠা	প্রশ্নের বিবরণ	সম্ভাব্যতা

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

[৯টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ৬টির উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ৬ = ৬০]

৪৭৫	١- اكتب اصول العقيدة الاسلامية بالايجاز.	***
৪৮১	٢- هل الايمان يزيد وينقص؟ وما رأيك؟ بين اختصارا.	**
৪৮৬	٣- هل الايمان والاسلام متحدان ام مختلفان؟ بين بالادلة.	***
৫১৭	٤- اكتب ما تعلم بمكانة الصحابة. ثم أثبت بالأدلة "ان الصحابة كلهم عدول".	***
৫৬৬	٥- عرف الولى لغة واصطلاحا. ثم اكتب ما تعرف عن حقيقة الاولياء وكراماتهم موضحا.	***
৬১০	٦- تحدث عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. هل هى ضرورية للنجاه ام لا؟ بين.	***
৬১৭	٧- ما هو الايمان بالقدر؟ اثبت وجوب الايمان بالقدر بالادلة من الكتاب والسنة.	**
৬৩২	٨- ما الخلاف بين الخوارج والاشاعرة فى مسألة مرتكب الكبيرة؟ بين مفصلا.	***
৬৭৫	٩- ما معنى البدعة لغة وشرعا؟ بين اقسامها بالامثلة.	***
৬৮৬	١٠- كيف ظهر الافتراق فى الأمة الاسلامية؟ بين.	***
৭০০	١١- الخوارج من هم؟ اذكر أهم عقائدهم مختصرا.	**
৭২৫	١٢- من الفرقة المعتزلة؟ بين عقائدهم بالتفصيل.	***
৭৪৫	١٣- ما القاديانية؟ بين عقيدتهم.	***

ক. রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

[মানবণ্টন : ৪টি প্রশ্ন দেয়া থাকবে; যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে– ২০ × ২ = ৪০]

প্রথম অধ্যায়

আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি

■ السؤال (١) : ما معنى العقائد لغة وشرعا؟ ثم بين موضوعه وغرضه ـ

■ **প্রশ্ন : ১ 'আকাইদ'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।**

أو- عرف العقائد الاسلامية ـ ثم بين موضوعه وغرضه ـ

অথবা, 'আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ'-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আকাইদশাস্ত্র ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলি সংক্রান্ত ইলমই ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের মূলভিত্তি। ঈমানের প্রকৃতি, কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব বিষয় সম্পর্কে এ শাস্ত্র সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার এবং ভ্রান্ত আকিদার বিপদ থেকে মুসলিমদের ঈমানকে রক্ষা করে। তাই এ বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরি। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ عقائد-এর পরিচিতি :

معنى العقائد لغة :

عقائد-এর আভিধানিক অর্থ : عقائد শব্দটি عقيدة-এর বহুবচন। এটা عقد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عقيدة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. المورد অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।

২. কারো কারো মতে, عقيدة অর্থ– قضية مصدقة

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عقد البناء তথা الصق بعض حجارته ببعض بما يمسكها فاحكم الصاقها অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقَائِدِ شَرْعًا :

عَقَائِد-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ ـ

অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحِجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا ـ

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِىْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ ـ

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাতবিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهِ وَلَهُ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ ـ

অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدَى مُعْتَقِدِهِ অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ ـ

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয় যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَةٌ অর্থ–
مَا يَصْدُقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওয়ান (র) বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِيَ الَّتِيْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে– اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কাযী আযদুদ্দীন আবদুর রহমান اَلْمَوَافِق গ্রন্থে আকাইদশাস্ত্রের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আকাইদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আরো কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন–

১. **ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের বক্তব্য :** তারা বলেন–
مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ هُوَ ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتُهٗ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمَا حَقٌّ وَ اَزَلِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِهٖ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ تَعَلُّقًا قَرِيْبًا اَوْ بَعِيْدًا۔
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদের আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি এভাবে যে, ঐগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনন্ত। আর তার সাথে আকাইদে দীনিয়াকে সাব্যস্তকারী নিকটতম ও দূরবর্তী বিষয়গুলোও সম্পৃক্ত থাকবে।

২. **ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের বক্তব্য :** তারা বলেন– هُوَ ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ ذَاتِهٖ وَاَوْصَافِهِ الذَّاتِيَّةِ অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও তাঁর গুণাবলি আলোচনা করা হয়।

৩. **অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য :** তারা বলেন–
اَلْمَعْلُوْمُ مِنْ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهٖ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ تَعَلُّقًا قَرِيْبًا اَوْ بَعِيْدًا۔
অর্থাৎ, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে।

৪. **কাযী আরমুভী (র)-এর বক্তব্য :** তিনি বলেন–
ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ اَعْنِيْ عَنْ صِفَاتِهِ الثُّبُوْتِيَّةِ وَالسَّلْبِيَّةِ۔

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত গুণাবলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ইলমে আকাইদে মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণের আলোচনা করা হয়।

৫. **ইমাম গাযালী (র)-এর বক্তব্য :** তাঁর মতে– اَلْمَوْجُوْدُ عَلَى الْاِطْلَاقِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিত্বশীল বস্তুই হলো এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

৩ غَرْضُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য : আকাইদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা।

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশাস্ত্রের পাঁচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন :** ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য হলো– اَلتَّرَقِّىْ مِنْ حَضِيْرِ التَّقْلِيْدِ اِلٰى عُرْوَةِ الْاِيْقَانِ অর্থাৎ, অনুকরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া।

২. **বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন :** ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা।

৩. **বাতিলপন্থিদের মোকাবেলা :** বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা করা। তাঁর মতে–
حِفْظُ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ وَهِىَ عَقَائِدُهُ عَنْ تَزَلْزُلِهَا شُبَهِ الْمُبْطِلِيْنَ۔

৪. **নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন :** কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম বা আমল গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন তার বক্তব্য–
وَهُوَ حُجَّةُ النِّيَّةِ بِاِخْلَاصِهِمْ فِى الْاَعْمَالِ وَحُجَّةُ الْاِعْتِقَادِ بِقُوَّتِهِ فِى الْاَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاَفْعَالِ اَنَّ بِهَا يُرْجٰى قُبُوْلُ الْعَمَلِ۔

৫. **শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন :** তাঁর মতে– وَهُوَ اَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের ভিত্তিতে শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে।

বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য।

উপসংহার : যে কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পরিপালনের নাম আকিদা। ইসলামী আকিদা বা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতা বহির্ভূত হয়ে পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায়। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের যথাযথ পথনির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে আকাইদশাস্ত্রের।

■ اَلسُّؤَالُ (٢) : اَلْعَقَائِدُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَا هِيَ؟ اُكْتُبْ تَارِيْخَ نَشْأَةِ وَتَطَوُّرِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ۔

■ প্রশ্ন : ২ ॥ আল আকাইদ আল ইসলামিয়্যাহ কী? ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]

اَوْ عَرِّفِ الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةَ لُغَةً وَشَرْعًا ۔ اُكْتُبْ نَشْأَتَهَا وَتَطَوُّرَهَا بِالتَّفْصِيْلِ۔

অথবা, اَلْعَقَائِدُ الْإِسْلَامِيَّةُ-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭]

اَوْ۔ عَرِّفِ الْعَقَائِدَ۔ ثُمَّ بَيِّنْ تَارِيْخَ تَدْوِيْنِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ مُخْتَصَرًا۔

অথবা, আকাইদ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রশ্নাতীত একত্ববাদ, তাঁর গুণাবলি, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভেজাল আকিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভব হয়েছিল আকাইদশাস্ত্রের। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহে যারা ভ্রান্তি ছড়াতে চায়, তাদের গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত যুক্তির মোকাবেলায় তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঈমান আকিদা সংরক্ষণপূর্বক ইহ-পরকালীন সাফল্য অর্জনই এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ عَقَائِد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقَائِدِ لُغَةً :

عَقَائِد-এর আভিধানিক অর্থ : عَقَائِد শব্দটি عَقِيْدَة-এর বহুবচন। এটা عَقْد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِدُ অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।

২. কারো মতে, عَقِيْدَة অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقْدُ الْبِنَاءِ তথা اَلْصِقَ بَعْضَ حِجَارَتِهٖ بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَاَحْكَمَ اِلْصَاقُهَا অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقَائِدِ شَرْعًا :

عَقَائِد-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحِجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِيْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ۔

অর্থাৎ, এটা মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাতবিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهِ وَلَهُ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ۔

অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলদের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–

مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِىَ الَّتِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهُ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهُ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে–

اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

تَارِيْخُ تَدْوِيْنِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস : নিম্নে আকাইদশাস্ত্র সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হলো–

১. **খোলাফায়ে রাশেদার পরিসমাপ্তি :** খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিসমাপ্তির ফলশ্রুতিতে মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যথার্থভাবে খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্রে বর্তমান ছিলো না।

২. **রক্তক্ষয়ী সংঘাত :** হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষদিকে কতিপয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগের সূত্র ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে হক এবং কে বাতিলের পথে আছে। এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তী সময়ে কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ লাভে সাহায্য করে।

৩. **অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব :** উপরিউক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় ঐক্যে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও মতবিরোধের ফলে অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে থাকে। ইরাকের কুফা এ ফেরকাবাজদের একটি বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ বনু উমাইয়া এবং পরে আব্বাসীয়রা তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে। অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, এসবের মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা। যথা– শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাযিলা।

৪. **বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ :** উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সংস্পর্শে আসায় তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে। ফলে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে

বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটায়।

৫. **আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা :** আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। তাদের অবাধ শিক্ষানীতির ফলে ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইহুদি খ্রিস্টানসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী পণ্ডিত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর 'বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রিক, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

খলিফা মামুন ছিলেন গ্রিক দর্শন এবং যুক্তিবাদে প্রভাবান্বিত। তিনি মুতাযিলা ধর্ম দর্শনের সহযোগিতা শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা মুতাসিম এবং ওয়াসিক মুতাযিলা ধর্মমত গ্রহণ করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাদের প্রকাশ্য সহযোগিতায় মুতাযিলাগণ গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ, কুরআনসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে অবাঞ্ছিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে।

ⓒ نَشْأَةُ الْعَقَائِدِ وَتَطَوُّرُهَا :

আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : উপর্যুক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'ফিকহুল আকবার'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মতাদর্শের অনুসারীদেরকে "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত" বলা হয়। সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞানচর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা আহলুস সুন্নাত

ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়কশাস্ত্র আকাইদ বা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়।

উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম বাতিল ফেরকাসমূহের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আকাইদশাস্ত্রের সূচনা করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রটি পূর্ণতা লাভ করে।

■ **اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ تَحَدَّثْ عَنْ مَوْضُوْعِ الْعَقِيْدَةِ وَغَرَضِهَا وَغَايَتِهَا وَ نَشْأَتِهَا۔**

■ **প্রশ্ন : ৩ ॥ আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আকিদা-এর বিষয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আকিদা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলি সংক্রান্ত ইলমই ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের মূলভিত্তি। ঈমানের প্রকৃতি, কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব বিষয়ই আকিদার অন্তর্ভুক্ত। এটা সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার এবং ভ্রান্ত আকিদার বিপদ থেকে মুসলিমদের ঈমানকে রক্ষা করে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ عَقَائِد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقَائِدِ لُغَةً :

عَقَائِد-এর আভিধানিক অর্থ : عَقَائِد শব্দটি عَقِيْدَة-এর বহুবচন। এটা عَقْد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِدُ অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।

২. কারো কারো মতে, عَقِيْدَة অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقْدُ الْبِنَاءِ তথা اُلْصِقَ بَعْضُ حِجَارَتِهِ بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَاُحْكِمَ اِلْصَاقُهَا অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقَائِدِ شَرْعًا :

عَقَائِد-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ অর্থাৎ, আকাইদ এমন বিষয়, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهٖ عَلٰى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, আকিদা এমন জ্ঞান যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِىْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ۔

অর্থাৎ, তা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাতবিষয়ক জ্ঞান, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এটা মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী (র) বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ۔
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয় যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–
مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِيَ الَّتِيْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে– اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

৩ مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কাযী আযদুদ্দীন আবদুর রহমান اَلْمَوَافِق গ্রন্থে আকাইদশাস্ত্রের তিনটি আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আকাইদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আরো কিছু স্বতন্ত্র বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন–

১. **ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের বক্তব্য :** তারা বলেন–
مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ هُوَ ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتُهٗ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمَا حَقٌّ وَاَزَلِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِهٖ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ تَعَلُّقًا قَرِيْبًا اَوْ بَعِيْدًا۔
অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদের আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি এভাবে যে, ঐগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনন্ত। আর তার সাথে আকাইদে দীনিয়াকে সাব্যস্তকারী নিকটতম ও দূরবর্তী বিষয়গুলোও সম্পৃক্ত থাকবে।

২. **ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের বক্তব্য :** তারা বলেন–
هُوَ ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ ذَاتِهٖ وَاَوْصَافِهِ الذَّاتِيَّةِ۔
অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও তাঁর গুণাবলি আলোচনা করা হয়।

৩. **অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য :** তারা বলেন– اَلْمَعْلُوْمُ مِنْ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهٖ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ تَعَلُّقًا قَرِيْبًا اَوْ بَعِيْدًا অর্থাৎ, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে।

৪. **কাযী আরমুভী (র)-এর বক্তব্য :** তিনি বলেন–

ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اغراضه الذَاتِيَةِ اعنى عن صِفَاتِهِ الثُّبُوْتِيَةِ والسَلْبِيَةِ۔

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত গুণাবলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ইলমে আকাইদে মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণের আলোচনা করা হয়।

৫. **ইমাম গাযালী (র)-এর বক্তব্য :** তাঁর মতে– اَلْمَوْجُوْدُ عَلَى الْاِطْلَاقِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিত্বশীল বস্তুই হলো এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ᑐ غَرَضُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য : আকাইদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা।

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশাস্ত্রের পাঁচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন :** ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য হলো– اَلتَّرَقِّىْ مِنْ حَضِيْضِ التَّقْلِيْدِ اِلٰى عُرْوَةِ الْاِيْقَانِ অর্থাৎ, অনুকরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া।

২. **বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন :** ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা।

৩. **বাতিলপন্থিদের মোকাবেলা :** বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা করা। তাঁর মতে–

حِفْظُ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ وَهِيَ عَقَائِدُهُ عَنْ تَزَلْزُلِهَا بِشُبَهِ الْمُبْطِلِيْنَ۔

৪. **নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন :** কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম বা আমল গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন তার বক্তব্য–

وَهُوَ صِحَّةُ النِّيَّةِ بِاِخْلَاصِهِمْ فِى الْاَعْمَالِ وَصِحَّةِ الْاِعْتِقَادِ بِقُوَّتِهِ فِى الْاَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاَفْعَالِ اَنَّ بِهَا يُرْجٰى قُبُوْلُ الْعَمَلِ۔

৫. **শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন :** তাঁর মতে– وَهُوَ اَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের ভিত্তিতে শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে।

বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য।

تَارِيْخُ نَشْأَةِ الْعَقِيْدَةِ :

الْعَقِيْدَةُ-এর উৎপত্তির ইতিহাস : বিশ্বমানবতার মহান আদর্শ রাসূলে কারীম (স)-ই সর্বপ্রথম জাহালতের অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতির ভ্রান্ত আকিদার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে তাওহীদভিত্তিক বিশুদ্ধ আকিদার সূচনা করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আকিদা পরিভাষাটির প্রচলন ছিলো না। তখন আকিদা পরিভাষাটি ঈমান পরিভাষায় ব্যবহার হতো। পরবর্তীতে ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈমান এবং ব্যাপকার্থে আকিদা পরিভাষার প্রচলন হয়। রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পূর্বপর্যন্ত ইসলামের মধ্যে বিশ্বাসভিত্তিক আলাদা কোনো দল ও উপদল সৃষ্টি হয়নি। তাঁর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন সময় কিছু বাতিল ফেরকা তথা দল উপদলের সৃষ্টি হয়।

বাতিল ফেরকাসমূহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিমদের বিশ্বাসের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টির অপতৎপরতা চালায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা এ ব্যাপারে সফলও হয়। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'ফিকহুল আকবার'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকিদা বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই যার উপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক ইসলামী জ্ঞানচর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আকিদা বিষয়কশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়।

উপসংহার : ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা ও মতবাদে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল, মূলনীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বাতিল সম্প্রদায় তাদের অপতৎপরতা এখনো অব্যাহত রেখেছে। তাদের মোকাবেলায় ইসলামের সূর্যসৈনিক হকপন্থি আলেমগণও বিশুদ্ধ আকিদার ঝাণ্ডা ধারণ করে সদা সজাগ প্রহরির দায়িত্ব পালন করছেন।

■ السؤال (٤) : ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ اوضح أصول العقيدة الاسلامية واهميتها۔

■ **প্রশ্ন : ৪ আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১২]

او ـ ما معنى العقيدة؟ اكتب أصول العقيدة الاسلامية واهميتها مختصرا۔

অথবা, عقيدة অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০০৯]

او۔ ما معنى العقائد؟ بين أصول العقيدة الاسلامية واهميتها مختصرا۔

অথবা, 'আকাইদ' অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও এর গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون; বস্তুত অদৃশ্য আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা। নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে ইহ-পরকালীন মুক্তি অর্জনই প্রতিটি মুসলিমের পরম লক্ষ্য। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ عقائد-এর পরিচিতি :

معنى العقائد لغة :

عقائد-এর আভিধানিক অর্থ : عقائد শব্দটি عقيدة-এর বহুবচন। এটা عقد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عقيدة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. المورد অভিধানে এসেছে- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।
২. কারো মতে, عقيدة অর্থ- قضية مصدقة
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে- عقد البناء তথা الصق بعض حجارته ببعض بما يمسكها فأحكم الصاقها অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।
৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো- পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)
৫. ইংরেজিতে বলা হয়- Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

معنى العقائد اصطلاحا :

عقائد-এর পারিভাষিক অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- العقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهٖ عَلٰى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِيْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ۔

অর্থাৎ, এটা মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাতবিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَيْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ۔

অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِيْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَةٌ অর্থ–

مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِيَ الَّتِيْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–

اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيَقِيْمُ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়– আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

اُصُوْلُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ : ◌

ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ : ইসলামী আকিদার মূলনীতি মোটামুটি ছয়টি। যথা–

১. اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস।

২. اَلْاِيْمَانُ بِالْمَلٰئِكَةِ তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস।

৩. اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস।

৪. اَلْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস।

৫. اَلْاِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস।

৬. اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ তথা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস।

কুরআন ও হাদীসে এসব উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। যেমন–

١۔ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ۔

٢۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ۔

অর্থাৎ, ঈমান হলো ১. আল্লাহর ওপর, ২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, ৩. তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর, ৪. তাঁর রাসূলগণের ওপর, ৫. আখেরাতের ওপর এবং ৬. তাকদীরের ভালো বা মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই ইসলামী আকিদার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হিসেবে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তা হলো–

৭. اَلْاِيْمَانُ بِالْمُعْجِزَةِ তথা মুজিযাসমূহের ওপর বিশ্বাস।

৮. اَلْاِيْمَانُ بِالْمِعْرَاجِ তথা মিরাজের ওপর বিশ্বাস।

১ : اَهَمِّيَّةُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

ইসলামী আকিদার গুরুত্ব : ইসলামী আকিদার গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. **নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদত :** ইসলামী আকিদা প্রতিটি মুসলিমকে নিরঙ্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায়। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে ইরশাদ করেন–

١- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنِ-

٢- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

٣- وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ الخ-

২. **দৃঢ় ঈমান অর্জন :** ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন মুসলিমদেরকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে মানুষ পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا-

বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে ব্যক্তি যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৩. **মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড ঐক্য অর্জন :** নির্ভেজাল ইসলামী আকিদার ফলে মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর চিন্তার পারস্পরিক অবধারণগত বৈসাদৃশ্য (Cognitive dissonance) দ্বন্দ্ব, দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, বিতর্ক ও হানাহানি দূর হতে পারে। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট সম্মানীয় হয়ে ওঠতে পারে। রাসূল (স) এ বিষয়ে বলেন–

١- اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا-

٢- مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

৪. **পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ :** বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে কেয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান করে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ-

বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবিধ অজ্ঞাত, জ্ঞাত শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً-

৫. **একত্ববাদের যথার্থ শিক্ষা :** আকাইদশাস্ত্র একত্ববাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে সাহায্য করে। এর ফলে মানুষ মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে। মানুষ পরোক্ষ প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয়। আল কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

وَالٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔

উপসংহার : ইসলামের আকিদাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ বর্তমান মুসলিম উম্মাহ। বিশুদ্ধ আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আকিদার শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাস্তব জীবনে এর পতিপালন অতীব জরুরি। পৃথিবীতে শান্তি ও সাফল্য এবং পরকালের আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদার কোনো বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ۔

■ **السُّؤَالُ (٥) : عَرِّفِ الْعَقِيْدَةَ وَالْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ ـ ثُمَّ بَيِّنْ اُصُوْلَ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ مُفَصَّلًا۔**

■ **প্রশ্ন : ৫ ॥ আকিদা, ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর একত্ববাদ ইসলামের প্রথম কথা। আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ইসলামী আকিদার মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর আল্লাহ নির্দেশিত আরো কতিপয় বিষয় ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন– ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, আখেরাত, তাকদীর ইত্যাদি। মহান আল্লাহ এসব বিষয়কে আল কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে উপস্থাপন করেছেন।

⊃ عَقِيْدَةٌ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ لُغَةً :

عَقِيْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : عَقِيْدَةٌ শব্দটি عَقْد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عَقِيْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِدُ অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।
২. কারো মতে, عَقِيْدَةٌ অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقْدُ الْبِنَاءِ তথা اُلْصِقَ بَعْضُ حِجَارَتِهٖ بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَاُحْكِمَ اِلْصَاقُهَا অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।
৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ شَرْعًا :

عَقِيْدَة-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهٖ عَلٰى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِيْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ۔

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَيْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِيْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ۔

অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–

مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِىَ الَّتِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهُ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهُ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে–
اَلْعَقِيْدَةُ هِىَ الْخِصَالُ الَّتِىْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ۔
অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

➲ اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।
৭. ইংরেজিতে বলা হয়– Believe, Trust, Obey, Obedience, Security, Attest, certify ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهِ۔
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন– هُوَ تَصْدِيْقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

৫. ইমামত্রয়ের মতে– هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–

الْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ ـ

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–

الْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عَلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهٖ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا ـ

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

الْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ ـ

➲ اِسْلَام-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْلَامِ لُغَةً :

اِسْلَام-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْلَام শব্দটি سَلْمٌ শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে– اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৬. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। ৭. اَلْقَبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

১১. ইংরেজিতে বলা হয়– Surrender, Submit ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِسْلَامِ شَرْعًا :

اِسْلَام-এর শরয়ী অর্থ : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–

الْاِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ ـ

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– الْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

الْاِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) -

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে–

هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ) -

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقُبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ -

৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا -

اُصُوْلُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ :

ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ : ড. সালেহ ইবনে ফাওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আল ফাওয়ান তাঁর اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থে ইসলামী আকিদার ছয়টি মূলনীতির বিবরণ দিয়েছেন। ইসলামী চিন্তাবিদগণের কারো কারো বর্ণনায় ইসলামী আকিদার আরো দুটি বিষয় এর অঙ্গ বলে বিবৃত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

১. **اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস :** মহান আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিজিকদাতা ও প্রভু হিসেবে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামী আকিদার মুখ্য স্তম্ভ। মহান আল্লাহর একত্ববাদে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের দাবি। আল্লাহর সাথে বা তাঁর গুণাবলির ব্যাপারে কোনো শরীক করা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। মহান আল্লাহর একত্ববাদকে আকাইদশাস্ত্রবিদগণ মূলত তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা–

ক. **تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ তথা প্রভুত্বের ব্যাপারে একত্ববাদ :** সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র প্রভু, সৃষ্টিকারী, নিয়ন্ত্রণকারী ও মালিক হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস ও স্বীকার করে নেয়ার নাম تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ ; এ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

٢- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ -

খ. **تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ তথা উপাস্যের ব্যাপারে একত্ববাদ :** এমর্মে বিশ্বাস ও স্বীকার করা যে, আল্লাহ তায়ালাই ইবাদত বন্দেগির একমাত্র সত্তা। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

গ. **تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা নাম ও গুণাবলিতে একত্ববাদ :** মহান আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলি প্রকাশক অনেক নাম রয়েছে। এসব গুণ প্রকাশক নামের ব্যাপারেও মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর একত্ব ও تَوْحِيْد-এ অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামী আকিদার মূল উৎস।

২. الْإِيْمَانُ بِالْمَلٰئِكَةِ তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের চারটি দিক রয়েছে।

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. তাঁদের নামে বিশ্বাস, গ. তাঁদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস এবং ঘ. তাঁদের কর্মে বিশ্বাস।

'শরহে ফিকহুল আকবর' গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী (র) ফেরেশতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর সম্মানিত এক বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহ তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তারা জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মদেহের অধিকারী। তাদের রয়েছে নিজস্ব আকৃতি। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতাও আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। তারা পুরুষ বা মহিলা নন। তাদের কোনো সন্তানসন্ততি নেই। তারা অদৃশ্য এবং পানাহার ও নিদ্রামুক্ত। আল কুরআনে ফেরেশতাগণের বিভিন্ন গুণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١- وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ - يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

অর্থাৎ, আর ফেরেশতাগণ, তারা তো অহংকার বা বিদ্রোহ করে না। তারা তাদের মহান প্রভুকে ভয় করে চলে এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তা প্রতিপালন করে।

٢- عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ -

٣- يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ -

ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত। হাদীসে এসেছে, সাত আসমান ও যমীনের এক গজ বা এক কদম পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা ইবাদতে রত না আছেন। প্রধান ফেরেশতার সংখ্যা চার। যথা– ১. হযরত জিবরাঈল, ২. হযরত ইসরাফীল, ৩. হযরত মিকাঈল ও ৪. হযরত আযরাঈল (আ)।

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনা ফরয। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا -

৩. الْإِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস : আসমানী কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বস্তুত মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূলের মাধ্যমে যুগে যুগে তাঁর বাণী বা বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এসব বাণী বা এর লিখিত সংকলনই আসমানী কিতাব। মহান আল্লাহ বলেন–

١- فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

٢- يَا بَنِيْ اٰدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

٣- قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ-

٤- وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

'শরহে ওমদাতুল কারী' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। এ সকল কিতাবের মধ্যে সহীফা (صَحِيْفَةٌ) তথা ছোট আকারের কিতাব ১০০ খানা এবং বাকি চারখানা হলো প্রধান ও প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব। এগুলো হলো– ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইঞ্জিল এবং ৪. আল কুরআন।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা ইসলামী আকিদার মৌলিক অংশ। মহান আল্লাহ যথার্থ ঈমানদারগণের পরিচয় তুলে ধরে বলেন–

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ-

৪. اَلْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস : ইসলামী আকিদা তথা ঈমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো, রাসূল ও নবীগণের ওপর ঈমান। নবী রাসূলগণ মহান আল্লাহর বাণী দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা মানুষ, তবে মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহক ফেরেশতা কর্তৃক তাদের নিকট অহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল করেন। তাঁরা মানবজাতিকে আল্লাহর সে বাণী প্রচার করে হেদায়াতের পথে আহ্বান জানান। নবী রাসূলগণের ওপর ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন–

١- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ-

٢- وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ-

٣- رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ-

٤- هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

٥- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। মতান্তরে তাদের সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার বা আট হাজার বা দু'লক্ষাধিক বা ২ লাখ ২৪ হাজার।

ইমাম শাওকানীর মতে, নবী রাসূলদের সংখ্যা ৪ লাখ ২৪ হাজার।

৫. اَلْاِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস : ইসলামী আকিদার অন্যতম ভিত্তি হলো, আখেরাত তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ইসলামী জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো, ইহকালীন সাফল্যের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তি অর্জনে ব্রতী থাকা। মানুষের মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনের সূচনা হয়।

অতঃপর কেয়ামত সংঘটিত হবে। হাশর ময়দানে পাপপুণ্যের বিচারে মানুষ পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে। মানুষ সেখানে পরম সুখের স্থান জান্নাত কিংবা শাস্তিময় জাহান্নাম অর্জন করবে। পরকালের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। কেননা পরকাল অস্বীকারকারীগণ মুসলিম দাবি করতে পারে না। আল কুরআনে এসেছে–

١. فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ .

٢. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

মানুষের আখেরাত তথা পরকালীন জীবনের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন–

ক. কেয়ামত সংঘটন। এ পর্যায়ে কেয়ামতের ছোট ও বড় লক্ষণসমূহের প্রকাশ ঘটবে। অতঃপর হযরত ইসরাফীল (আ) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

খ. আখেরাতের সূচনা হবে। এ পর্যায়ে হাশর তথা মানবমণ্ডলী এক স্থানে একত্র হবে। তাদের পাপপুণ্যের বিচার হবে। পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রাপ্য হবে। এসব বিষয়ে আল কুরআনে বিভিন্ন আয়াত বিদ্যমান। যেমন–

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ .

৬. اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ **তথা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস :** ইসলামী আকিদার এ বিষয়টিও মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম। মহান আল্লাহ মানব ও জিনসহ অন্যান্য প্রাণীদেরকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সে যা করবে, যা আহার করবে, কিভাবে জীবনধারণ করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এমনকি মানুষের পারলৌকিক পরিণতিও এভাবে পূর্বে নির্ধারিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন– وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا অর্থাৎ, সে মহান সত্তা প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার একটি তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আরো বলেন– اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ;

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ الخ .

তাকদীর ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম। এটা ঈমানের অংশ এবং এতে বিশ্বাস না রাখা ঈমানের পরিপন্থি।

৭. اَلْاِيْمَانُ بِالْمُعْجِزَةِ **তথা মুজিযার ওপর বিশ্বাস :** মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী রাসূলগণকে এমন এক ক্ষমতা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা নিদর্শন উপস্থাপন করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এসব অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম বা নিদর্শনকে মুজিযা বলে।

شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ গ্রন্থকারের মতে, নবুয়ত অস্বীকার ও বিরোধিতাকারীদের মোকাবেলায় নবুয়তের দাবিদারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কোনো অস্বাভাবিক তথা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কাজকে মুজিযা বলে। তার প্রকাশ এমন পন্থায় হয়ে থাকে যে, বিরুদ্ধবাদীগণ অনুরূপ কার্য ঘটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি, রাসূল (স)-এর شَقُّ الْقَمَرِ (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ) এবং আল কুরআন মুজিযার অন্তর্গত। আল কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুজিযা হিসেবে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا۔

রাসূলগণের মুজিযার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর অস্বীকারকারী মুসলিম থাকতে পারে না।

৮. **اَلْاِيْمَانُ بِالْمِعْرَاجِ তথা মিরাজের ওপর বিশ্বাস :** মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় মহানবী (স) 'বুরাক'-এ আরোহণ করে মক্কা হতে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস অতঃপর সপ্তাকাশ ভ্রমণ, জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষকরণ; সর্বোপরি মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। হিজরতের এক বছর পূর্বে মতান্তরে ১৬, ১৭ বা ১৮ মাস পূর্বে সংঘটিত এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে মিরাজ বলে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মিরাজের বিবরণ এসেছে। এছাড়া হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١- سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الخ۔

٢- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۔

٣- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى۔

মিরাজ সশরীরে নাকি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, সে বিষয়ে দার্শনিকগণ মতভেদ করেছেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো, মিরাজ সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এরই ওপর ঈমান আনয়ন ইসলামী আকিদার অন্যতম মৌলিক উপাদান।

উপসংহার : ইসলামী আকিদার উৎসমূল হলো আল কুরআন ও হাদীসে বিবৃত বিষয়াবলি। এর মধ্যে উল্লিখিত আটটি বিষয় ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাসের মূলভিত্তি। এসব মূলভিত্তির ওপর ইসলামের সুবিশাল ইমারত নির্মিত হয়। ইসলামের এ মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ঈমান রাখা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٦) : اِشْرَحْ مَصْدَرَ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ ـ ثُمَّ بَيِّنْ اَهَمِّيَّةَ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ مَعَ ذِكْرِ اَهَمِّ الْمُؤَلَّفَاتِ فِىْ عِلْمِ الْعَقِيْدَةِ۔

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ ইসলামী আকিদার উৎস ব্যাখ্যা কর। অতঃপর বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব বর্ণনাপূর্বক আকিদা বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির নাম উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আকিদার মূল উৎস হলো অহী। অহীলব্ধ জ্ঞানের কষ্টিপাথরে ব্যক্তির আকিদা বা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়। আর সঠিক আকিদা অনুযায়ী জীবনযাপনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি অর্জিত হয়। সুতরাং আকিদার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

مَصْدَرُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ :

ইসলামী আকিদার মূল উৎস : অহী ইসলামী আকিদার মূল উৎস। এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ওপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দ অপছন্দের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা ও মত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ۔

অহীর বিপরীতে অহীর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা বা বিকৃত করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান সেগুলো হলো মানুষের মনগড়া যুক্তি, সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ।

এ প্রবণতাকে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ۔ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ۔

٢۔ وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ۔

অহী ব্যতীত আর যত উৎস রয়েছে, কোনোটাই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔

অর্থাৎ, তারা কেবল ধারণা ও কল্পনার অনুসরণ করে চলে। বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে না।

اَهَمِّيَّةُ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ :

বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব : ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল দীনি ইলমের মধ্যে বিশুদ্ধ আকিদা সংক্রান্ত ইলমের গুরুত্ব বেশি। বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনে যে সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য তা নিম্নরূপ–

১. **বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব :** সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয়। আর বিশুদ্ধতা তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। ভুল বিশ্বাস মানুষকে অস্থির করে তোলে।

আমাদের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত শিরকমুক্ত খাঁটি ঈমান। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ۔ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

২. **ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব :** এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়–

ক. মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে; কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।

খ. ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে বহু জাতি আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পর তা সংরক্ষণ করতে পারেনি; বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١- وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

٢- وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ-

٣- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

অতএব ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মতের বিভ্রান্তির কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব :** রাসূল (স)-এর আদর্শই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ। তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভ্রান্তির ফলে উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ-

এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করতেন, তা জানা মুমিনের অতীব প্রয়োজন।

৪. **নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদত :** বিশুদ্ধ আকিদা প্রতিটি মুমিনকে নিরঙ্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায়। মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

اَهَمُّ الْمُؤَلَّفَاتِ فِىْ عِلْمِ الْعَقِيْدَةِ :

আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি : ইসলামী আকিদার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দ্বন্দ্ব এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা বিস্তারের লক্ষ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী বহু মনীষী এ

শাস্ত্রে কলম ধরেছেন। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থিরাও আকাইদ নামে তাদের নিজস্ব মতবাদের পক্ষে গ্রন্থ রচনা করেছে। নিম্নে এ শাস্ত্রের ওপর লিখিত আহলুস হক ও বাতিলপন্থিদের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো–

আহলুস সুন্নাতের ওপর আকাইদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি :

১. আল ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফা (র), মৃত্যু ১৫০ হিজরী।
২. আস সুন্নাহ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), মৃত্যু ২৪১ হিজরী।
৩. আল ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র), মৃত্যু ২৪৩ হিজরী।
৪. আস সুন্নাহ, হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র), মৃত্যু ২৭৩ হিজরী।
৫. আস সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), মৃত্যু ২৯০ হিজরী।
৬. শারহুস সুন্নাহ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র), ৩১০ হিজরী।
৭. আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খাল্লাল (র), মৃত্যু ৩১১ হিজরী।
৮. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু জাফর তাহাবী (র), মৃত্যু ৩২১ হিজরী।
৯. আল ইবানাহ ওয়াল উসূলুদ দিয়ানা, আল আশয়ারী (র), মৃত্যু ৩২৪ হিজরী।
১০. আস সুন্নাহ, সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবারানী (র), মৃত্যু ৩৬০ হিজরী।
১১. আল ঈমান, ইবনে মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র), মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী।
১২. আল ইতিকাদ, ইমাম বায়হাকী (র), মৃত্যু ৪৫৮ হিজরী।
১৩. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামিদ গাযালী (র), মৃত্যু ৫০৫ হিজরী।
১৪. আল আকাইদ আন নাসাফিয়া, ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র), ৫৩৭ হিজরী।
১৫. শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়া, সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), ৭৯১ হিজরী।
১৬. 'শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়া, ইবনে আবিল ইযয হানাফী (র), মৃত্যু ৭৯২ হিজরী।
১৭. কিতাবুত তাওহীদ, আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রাজাব হাম্বল (র), মৃত্যু ৭৯৫ হিজরী।
১৮. শারহু ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলী কারী হানাফী (র), মৃত্যু ১০১৪ হিজরী।
১৯. আকাইদুন নাসাফী, আল্লামা তাফতাযানী (র)।
২০. আল আকিদা আওসাতিয়্যা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)।
২১. আল ইস্তিকামাত আলাল ঈমান, ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী।

বাতিলপন্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, মুরজিয়া, কাদরিয়া, শিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব সম্প্রদায় তাদের আকিদার পক্ষে বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং গ্রন্থাদি রচনা করে তাদের মতবাদ প্রচার করে। তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের মতবাদভিত্তিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. আল

কাফী, ২. মান লা ইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসতিবসার ফী মাখতুলিফা মিনাল আখবার, ৪. মাজালিস, ৫. উয়ূন, ৬. ইলাউশ শরায়ী, ৭. মাজমাউল বায়ান, ৮. জামিউল জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. শারায়েউল ইসলাম, ১১. নাহজুল মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. কাওয়াইদুল আকাইদ, ১৪. মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীযানুল হাক্ক, ২০. নাহজুল বালাগা প্রভৃতি।

উপসংহার : ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে হয়েছে। তন্মধ্যে কলম তথা লিখনির মাধ্যমেও এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পেতে সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাক্কিক সলফদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

■ السُّؤَالُ (٧) : اَلْاِيْمَانُ مَا هُوَ؟ هَلْ هُوَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ؟ وَمَا هُوَ الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا۔

■ প্রশ্ন : ৭ ॥ ঈমান কী? এটা কি বৃদ্ধি এবং হ্রাস পায়? এ বিষয়ে আলেমগণের অভিমত কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। মূলত ঈমানই হলো মুসলিমদের মূলধন। মুসলিম দাবিদার ব্যক্তির অন্তরে এর মর্যাদা উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ ايمان-এর পরিচিতি :

معنى الْاِيْمَانِ لغة :

ايمان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে افعال-এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. الاطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

معنى الْاِيْمَانِ اصْطِلَاحًا :

ايمان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে– اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ايمان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ তা বিশ্বাস করাকে ايمان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- هُوَ تَصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

৫. ইমামত্রয়ের মতে-

هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ۔

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهِ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِىِّ۔

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِىِّ بِهِ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا۔

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ۔

اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَمْ لَا :

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে عَقَائِدُ النَّسَفِىِّ প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু اِيْمَان হলো শুধু تَصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ সেহেতু عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা قَلْبِ হলো بَسِيْط জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনেও اِيْمَان এবং عَمَل-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন-

ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔

এখানে عَمَل-কে اِيْمَان-এর ওপর عَطْف করা হয়েছে। আর عَطْف উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে-

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। আর شَرْط ও مَشْرُوْط ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গ. মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ۔

ঘ. নবী করীম (স) وَفْد ثُقَيْف-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

زِيَادَتُهُ كُفْرٌ وَنُقْصَانُهُ شِرْكٌ ـ

ঙ. ঈমান قَلْب-এর মধ্যে থাকে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ ـ

যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে, তাও একক।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

২. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে– اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

দলীল : তাঁদের মতে, عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন–

ক. মহান আল্লাহ বলেন–

١ـ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا ـ

٢ـ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ

٣ـ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ـ

খ. রাসূল (স) বলেছেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ; এখানে عَمَل-কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই।

গ. রাসূল (স) আরো বলেছেন– اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

৩. **মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত :** মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে।

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়–

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং كَمَال তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান। এতে হ্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

খ. زِيَادَة ও نُقْصَان দ্বারা زِيَادَة نُوْر ও نُقْصَان نُوْر উদ্দেশ্য।

গ. زِيَادَة ও نُقْصَان দ্বারা ঈমানের قُوَّة ও ضُعْف উদ্দেশ্য; হ্রাসবৃদ্ধি নয়।

উপসংহার : ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। তবে عَمَل-এর মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

■ السُّؤَالُ (٨) : عَرِّفِ التَّوْحِيْدَ وَالْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ ـ هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ؟ اُكْتُبْ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৮ তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। ঈমান হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কি? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ।** [ফা. প. ২০১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। আর ঈমান ও তাওহীদ হলো ইসলামী আকিদার মূলভিত্তি। নির্দিষ্ট বিষয়াবলির ওপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণার প্রতি দৃঢ় ও অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তবে এ ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা, এ বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো।

১ تَوْحِيْد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى التَّوْحِيْدِ لُغَةً :

تَوْحِيْد-এর আভিধানিক অর্থ : تَوْحِيْد শব্দটি اِسْمِ مَصْدَر বাবে تَفْعِيْل এটি و ـ ح ـ د মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ– একত্ববাদ, কাউকে একক বলে স্বীকার করা। এটা শিরকের বিপরীত; তবে অভিধানবেত্তাগণ تَوْحِيْد শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো– جَعْلُ الشَّيْءِ وَاحِدًا অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা।
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– التَّوْحِيْدُ هُوَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক এমর্মে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ।
৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْحُكْمُ بِاَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ
৪. দর্শনশাস্ত্রে তাওহীদ হলো– اَلْقَوْلُ بِاَنَّهُ وَاحِدٌ অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা।
৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– نَفْىُ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ
৬. কেউ কেউ বলেন– اِفْرَادُ الْقَدِيْمِ عَنِ الْمُحْدَثِ
৭. কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া, একত্ববাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।
৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Unique, Singular, Unmatched, Incomparable ইত্যাদি। তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

مَعْنَى التَّوْحِيْدِ اِصْطِلَاحًا :

تَوْحِيْد-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন–

نَفْىُ الْكُفْوِ وَالْمِثْلِ عَنْ ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ وَاَفْعَالِهٖ وَنَفْىُ الشَّرِيْكِ فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَعِبَادَتِهٖ عَزَّ وَجَلَّ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রভুত্ব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়।

২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন–

هُوَ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَاِفْرَادُهٗ بِمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالْاُلُوْهِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর একক হওয়া, যা তাঁর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও বিশেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই তাওহীদ।

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, আহলুল হাকীকতদের মতে–

تَجْرِيْدُ الذَّاتِ الْاِلٰهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا يَتَصَوَّرُ الْاَفْهَامُ وَيَتَخَيَّلُ فِى الْاَوْهَامِ وَالْاَذْهَانِ۔

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত–

ক. مَعْرِفَةُ اللّٰهِ بِالرُّبُوْبِيَّةِ তথা আল্লাহর প্রভুত্ব অনুধাবন করা।

খ. الْاِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ তথা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

গ. نَفْىُ الْاَنْدَادِ عَنْ جُمْلَةٍ তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা।

৫. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমান বলেন–

عِلْمُ الْعَبْدِ وَاعْتِرَافُهٗ وَاعْتِقَادُهٗ وَاِيْمَانُهٗ بِتَفَرُّدِ الرَّبِّ بِكُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ وَاعْتِقَادُهٗ اَنَّهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ كَمَالِهٖ۔ وَاَنَّهٗ ذُو الْاُلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُوْدِيَّةِ عَلٰى خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

৬. কারো কারো মতে– وَحَّدَ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَعْنِىْ اَقَرَّ وَاٰمَنَ بِاَنَّهٗ وَاحِدٌ

অর্থাৎ, মহান ও পবিত্র আল্লাহকে সে এক বলে স্বীকৃতি দিল, কেননা তিনি এক ও একক। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁর যাবতীয় বিধান বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ।

⊃ اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : الْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি الْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা الْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. التَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. الْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,

৩. الْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. الْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,

৫. الْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. الْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

معنى الايمان اصطلاحا :

ايمان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে−

الايمان هو التصديق بما جاء به النبى (صـ) من عند الله تعالى والاقرار به۔

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ايمان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন− الايمان هو تصديق النبى (صـ) بجميع ما جاء به অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ايمان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন− هو تصديق بما جاء به الرسول من عند الله والاقرار به جميعا অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন− الايمان هو تصديق بالقلب وحده

৫. ইমামত্রয়ের মতে−

هو تصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان۔

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন−

الايمان هو تصديق النبى (صـ) بما جاء به باعتماد على النبى۔

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন−

الأيمان هو التصديق بما علم مجىء النبى به اجمالا وتفصيلا۔

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন−

الايمان هو العمل بالمأمورات والاجتناب عن جميع المنهيات۔

➲ اسلام-এর পরিচিতি :

معنى الاسلام لغة :

اسلام-এর আভিধানিক অর্থ : اسلام শব্দটি سلام শব্দমূল থেকে বাবে افعال-এর মাসদার। মূল শব্দ سلم; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে−

১. التسليم তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে− قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين

২. الانقياد তথা মেনে নেয়া।

৩. الاطاعة তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে− اسلم تسلم

৪. الاخلاص তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. الاذعان তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৬. الخضوع তথা বশ্যতা স্বীকার করা।

৭. القبول তথা গ্রহণ করা। ৮. الدخول فى السلم তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. الدخول فى دين الاسلام তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. الدين الذى جاء به محمد (ص) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– ان الدين عند الله الاسلام

معنى الاسلام اصطلاحا :

اسلام-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–

الاسلام هو التصديق والاقرار بالله تعالى كما هو واقع باسمائه وصفاته وشرائعه.

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– الإسلام هو التسليم والانقياد لاوامر الله ورسوله অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

الإسلام هو تصديق سيدنا محمد (ص) فى جميع ما جاء به من عند الله تعالى.

৪. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

الاسلام هو الانقياد لما اخبر به رسول الله (ص).

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে–

هو اظهار الخضوع والقبول لما اتى به محمد (ص).

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

هو الانقياد لله تعالى بقبول ما جاء به رسول الله والتلفظ بكلمتى الشهادة والاتيان بالواجبات والامتناع عن المنكرات.

৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন–

هو الانقياد الظاهرى والتلفظ بالشهادتين والاقرار بما يترتب عليهما.

الايمان يزيد وينقص ام لا :

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে عقائد النسفى প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন– الايمان لا يزيد ولا ينقص অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু اِيْمَان হলো শুধু تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ সেহেতু عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা قَلْب হলো بَسِيْط জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনেও اِيْمَان এবং عَمَل-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন–

ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔

এখানে عَمَل-কে اِيْمَان-এর ওপর عَطْف করা হয়েছে। আর عَطْف উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে–

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। আর شَرْط ও مَشْرُوْط ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গ. মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ۔

ঘ. নবী করীম (স) وَفْد ثَقِيْف-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

زِيَادَتُهُ كُفْرٌ وَنُقْصَانُهُ شِرْكٌ ۔

ঙ. ঈমান قَلْب-এর মধ্যে থাকে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ۔

যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে, তাও একক।
সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

২. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে– اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

দলীল : তাঁদের মতে, عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন–

ক. মহান আল্লাহ বলেন–

١۔ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا۔

٢۔ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۔ ٣۔ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى۔

খ. রাসূল (স) বলেছেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ; এখানে عَمَل-কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই।

গ. রাসূল (স) আরো বলেছেন– اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

৩. **মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত :** মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে।

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়–

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং كمال তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান। এতে হ্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

খ. زِيَادَة ও نُقْصَان দ্বারা زِيَادَة نُوْر ও نُقْصَان نُوْر উদ্দেশ্য।

গ. زِيَادَة ও نُقْصَان দ্বারা ঈমানের قُوَّة ও ضُعْف উদ্দেশ্য; হ্রাসবৃদ্ধি নয়।

উপসংহার : ঈমান হলো ইসলামের প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। মনের বিশ্বাস হলো ঈমান, যার হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটলেও عمل-এ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে; যা ইসলাম থেকে দূরে এবং ঈমানকেও দুর্বল করে দেয়।

■ اَلسُّؤَالُ (٩) : هَلِ الْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ اَمْ مُتَّحِدَانِ؟ فَصِّلْ حَقَّ التَّفْصِيْلِ ـ هَلْ يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ؟

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ ঈমান ও ইসলাম কি একই জিনিস? নাকি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে? যথাযথ বিশ্লেষণ কর। কারো জন্য 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' একথা বলা বৈধ কিনা?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। কেননা আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান এবং সে অনুপাতে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। মূলত এতদুভয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ مُتَغَايِرَانِ اَمْ مُتَّحِدَانِ :

اِيْمَان ও اِسْلَام এক জিনিস না দু'জিনিস : ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস না দু'জিনিস, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম বুখারী ও নাসাফী (র)-এর মতে– اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَّحِدَانِ অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। সুতরাং তাদের মতে, প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন। তারা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন–

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মুমিন ও মুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাক্কিকীনের মতে– اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, তবে একটি অপরটির পরিপূরক।
তাঁরা দলীল হিসেবে বলেন–
قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ـ

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ঈমান ও ইসলামের মধ্যে عَامٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ-এর সম্পর্ক রয়েছে একথা বলার পর বলেন, ঈমান হচ্ছে عَامٌ আর ইসলাম হচ্ছে خَاصٌ ; যেমন– فَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ

৪. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে– اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ-এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে– শরীর ও আত্মার সম্পর্ক।

৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন– اِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا অর্থাৎ اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্নরূপে আসলে একই অর্থে ব্যবহার হয়।

৬. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–
هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ ـ فَالْاِيْمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ

৭. কতিপয় আলেমের মতে, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হলো عَامٌ خَاصٌ مِنْ وَجْهٍ অর্থাৎ, একজন মুমিন ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিমও হতে পারে, আবার একজন মুসলিম ক্ষেত্র বিশেষে মুমিনও হতে পারে।

➲ حُكْمُ اَنْ يَقُوْلَ "اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ" :

"ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন" একথা বলার বিধান : কোনো ব্যক্তির অন্তরে সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যদি সে বলে, আমি নিঃসন্দেহে মুমিন, তবে একথা বলা তার পক্ষে যথার্থ হবে; কিন্তু সে যদি বলে, ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন, তবে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা–

ক. ঈমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে এরূপ বললে ঈমান গ্রহণ কখনো শুদ্ধ হয় না।

খ. এতে ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না।

গ. ঈমান প্রকাশের জন্য দৃঢ়তার প্রয়োজন। اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বললে ব্যক্তিগতভাবে বক্তার দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করা হয় না।
তাই اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া অনুচিত।

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে। ঈমান মুসলিমদের মৌলিক জিনিস। সুতরাং একজন মুমিন ব্যক্তিকে اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ না বলে বরং দৃঢ়চিত্তে ঈমানের স্বীকৃতি দিতে হবে।

■ السُّؤَالُ (١٠) : مَا هُوَ الْإِيْمَانُ؟ اُذْكُرِ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ مُفَصَّلًا.

■ **প্রশ্ন : ১০ ॥ ঈমান কাকে বলে? ঈমান ও ইসলামের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। আর ঈমানের বাহ্যিক রূপ হলো ইসলাম। মূলত এতদুভয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। নিম্নে ঈমানের সংজ্ঞা এবং ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হলো।

ايمان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْإِيْمَانِ لُغَةً :

ايمان-এর আভিধানিক অর্থ : الْإِيْمَانُ শব্দটি বাবে افعال-এর মাসদার। এটি الْأَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা الْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,
৩. اَلْإِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

مَعْنَى الْإِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

ايمان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে–

الْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْإِقْرَارُ بِهِ.

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ايمان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ايمان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন– هُوَ تَصْدِيْقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْإِقْرَارُ بِهٖ جَمِيْعًا অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. **ইমাম আবু হানীফা (র)** বলেন– اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَحْدَهٗ

৫. **ইমামত্রয়ের** মতে–

هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ.

৬. **আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)** বলেন–

اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ.

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهٖ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا۔

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ۔

اَلْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ :

ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক : اِسْلَام ও اِيْمَان শব্দগতভাবে ভিন্ন হলেও ভাব ও উদ্দেশ্য একই। এতদুভয়ের মাঝে তুলনামূলক সম্পর্ক নিম্নরূপ–

১. ইমাম বুখারী (র) বলেন– اِيْمَان ও اِسْلَام এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন।

দলীল : মহান আল্লাহর বাণী–
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (الذاريات ۔ ٣٥)

এ আয়াতে مُؤْمِن-কে مُسْلِم বলা হয়েছে। অন্যত্র এসেছে–
يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ۔
এ আয়াতেও مُؤْمِن-কে مُسْلِم বলা হয়েছে।

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ও আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, اِيْمَان হচ্ছে خَاصّ আর اِسْلَام হচ্ছে عَامّ; অতএব فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ;

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, اِيْمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে সম্পর্ক مِسْكِيْن ও فَقِيْر শব্দদ্বয়ের মতো। সুতরাং اِذَا اجْتَمَعَا اِفْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا অর্থাৎ উভয় শব্দ একত্রে আসলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাবে আর ভিন্ন ভিন্ন আসলে একই অর্থ বোঝাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ۔

৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–
اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ فَالْاِيْمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ۔

৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ কতিপয় মুহাক্কিক আলেমের মতে–
اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ۔
অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।

দলীল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ۔

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে। আর মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে পরিণত করাকে ইসলাম বলে।

■ السُّؤَالُ (١١) : اُكْتُبْ تَارِيْخَ نَشْأَةِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ ـ ثُمَّ اذْكُرِ الْكُتُبَ الْمُهِمَّاتِ لِعِلْمِ الْعَقَائِدِ مُخْتَصَرًا ـ

■ প্রশ্ন : ১১ আকাইদশাস্ত্র উৎপত্তির ইতিহাস লেখ। অতঃপর আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির নাম উল্লেখ কর।

উত্তর।। **উপস্থাপনা :** ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে নির্ভেজাল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বাসগত সমস্যা হলে পরকালীন মুক্তি ও নাজাত দুরূহ হয়ে ওঠতে পারে। এমনকি ঈমানও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে নির্ভেজাল বিশ্বাস ও তদনুযায়ী ইসলামের আমলের ব্যাখ্যা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিকভাবে। আর এ গবেষণার ফসল হলো আকাইদশাস্ত্র। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ تَارِيْخُ نَشْأَةِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস : বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'ফিকহুল আকবার'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই, যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মতাদর্শের অনুসারীদেরকে "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত" বলা হয়। সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক শাস্ত্র আকাইদ বা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়।

⊃ اَلْكُتُبُ الْمُهِمَّاتُ لِعِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি : ইসলামী আকিদার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। এসব বিষয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ক. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিতাবসমূহ :** বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাবলম্বীর আকিদা সম্পর্কিত অমূলক মতবাদ প্রচারের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফা (র) কলম ধারণ করেন। তিনি اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে আকিদা বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি ১০টি বিষয়ে ইসলামের আকিদা উপস্থাপনের পাশাপাশি ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। রচনার তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী আকিদা গ্রন্থ হলো 'ওয়াসিয়াতু আবী হানীফা (র)'। গ্রন্থটিতে ২৭ দফা সংবলিত আকিদা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় 'ফিকহে আকবর' নামে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ আকাইদ গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থে প্রধানত আল্লাহর স্বরূপ বা যাত ও তাঁর চিরন্তন গুণরাজি সম্বন্ধে মুতাযিলাদের মতবাদের জবাব প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এ পর্যায়ে 'ওয়াসিয়াতু আবি হানীফা' নামক আরেকটি গ্রন্থ রচিত হয়।

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। আকাইদের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের ত্রয়ী মতবাদ (Triad) তথা ওয়াজিব, মুমকিন বা জায়েয এবং মুসতাহিল (অসম্ভব) তর্ক এ তিনটি শ্রেণি বিভাগ ব্যবহার করা হয়। এ সময় মূলসত্তা (جَوْهَر তথা Essence) এবং আকস্মিক সংযোজনী عَرْض (Accident) এ সকল দার্শনিক পরিভাষাও ব্যবহার হয়। এর ফলে দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারীদের সমক্ষে দার্শনিক আঙ্গিকে আকাইদের উপস্থাপন সুবিধাজনক হয়। আকাইদের এ পর্যায়ে ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ৪১৮ হি.), ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.), আল গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.), আল ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.), ইবনে সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.) প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকদের লেখনীতে। এ পর্যায়ে রচিত হয় আবু হাফস ওমর আন নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭ হি.) عَقَائِدُ النَّسَفِيْ; ইমাম শাফেয়ী (র)-এর প্রতি আরোপিত তৃতীয় ফিকহে আকবার আস সানূসীর (মৃ. ৮৯৫ হি.) উম্মুল বারাহীন, আল ঈজীর (মৃ. ৭৫৬ হি.) মাওয়াকিফ ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাবলি।

আকাইদশাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক অনবদ্য গ্রন্থকার ইমাম আবুল হাসান আলী আল আশয়ারী (র) (মৃ. ৩২৪ হি.)। ইবনে ফুরাকের মতে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় ৩০০ খানা। তাঁর বিখ্যাত আকাইদ গ্রন্থ মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন তিন খণ্ডবিশিষ্ট বিশদ আকাইদ গ্রন্থ। এছাড়াও আল ইবানা আন লিউসুদ দিয়ানা, রিসালা ফী ইসতিহসানিল খাওফি ফিল কালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো−

১. আল ফিকহুল আকবার− ইমাম আবু হানীফা (র), ১৫০ হিজরী।
২. আস সুন্নাহ− ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ২৪১ হিজরী।
৩. আল ঈমান− মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র), মৃত্যু ২৪৩ হিজরী।
৪. আস সুন্নাহ− হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র), ২৭৩ হিজরী।
৫. আস সুন্নাহ− আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ২৯০ হিজরী।
৬. সারীহুস সুন্নাহ− আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র), ৩১০ হিজরী।
৭. আস সুন্নাহ− আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খাল্লাল (র), ৩১১ হিজরী।

৮. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ– আবু জাফর তাহাবী (র), ৩২১ হিজরী।
৯. আল ইবানাহ ওয়াল-উসূলুদ দিয়ানা– আল-আশয়ারী (র), ৩২৪ হিজরী।
১০. আস সুন্নাহ– সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবারানী (র), ৩৬০ হিজরী।
১১. আল ঈমান– ইবনে মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র), ৩৯৫ হিজরী।
১২. আল ইতিকাদ– ইমাম বায়হাকী (র), ৪৫৮ হিজরী।
১৩. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ– আবু হামেদ গাযালী (র), ৫০৫ হিজরী।
১৪. আল আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ– ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র), ৫৩৭ হিজরী।
১৫. শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ– সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), ৯৭১ হিজরী।
১৬. শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়্যাহ– ইবনে আবিল ইযয হানাফী (র), ৭৯২ হিজরী।
১৭. কিতাবুত তাওহীদ– আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রাজাব হাম্বলী (র), ৭৯৫ হিজরী।
১৮. শারহু ফিকহিল আকবার– মোল্লা আলী কারী হানাফী (র), ১০১৪ হিজরী।
১৯. আকাইদুন নাসাফী– আল্লামা তাফতাযানী (র)।
২০. আল-আকিদা আওসাতিয়্যা– ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)।
২১. আল ইস্তিকামাত আলাল ঈমান– ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী।

খ. বাতিলপন্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, মুরজিয়া, কাদারিয়া, শিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব সম্প্রদায় তাদের আকিদার পক্ষে বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং গ্রন্থাদি রচনা করে তাদের মতবাদ প্রচার করে। তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের মতবাদভিত্তিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. আল কাফী, ২. মান লাইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসতিবসার ফী মাখতুলিফা মিনাল আখবার, ৪. মাজালিস, ৫. উয়ূন, ৬. ইলাউশ শরয়ী, ৭. মাজমাউল বায়ান, ৮. জামিউল জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. শারায়েউল ইসলাম, ১১. নাহজুল মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. কাওয়াইদুল আকাইদ, ১৪. মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীযানুল হাক্ক, ২০. নাহজুল বালাগা প্রভৃতি।

উপসংহার : ইসলামে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সর্বমোট সংখ্যা ৭৩টি। كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ; মুসলিমদের বিশ্বাস তথা আকিদাগত এ বিভক্তির ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের শক্তি খর্ব ও দুর্বল হতে থাকে। এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। আর এ কারণেই মহান আল্লাহর আহ্বান وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا-কে উপেক্ষা করে সুন্নী, শিয়া, কুর্দী, দ্রুজ, আহলুস হাদীস, হানাফী ইত্যাদি ব্যানারে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মত্ত।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢) : عَرِّفِ الْعَقِيْدَةَ وَنَشْأَةَ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرَهُ.

■ প্রশ্ন : ১২ عَقِيْدَة-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর عَقِيْدَة পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৮]

أَوْ عَرِّفِ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَقِيْدَةَ لُغَةً وَشَرْعًا. ثُمَّ بَيِّنْ نَشْأَةَ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرَهُ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْأُخْرَى الدَّالَّةَ عَلَى مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ.

অথবা, ঈমান, ইসলাম ও আকিদার আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদা পরিভাষাটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : একত্ববাদী জীবনবিধান ইসলামে ঈমান, আকিদা ও ইসলাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়। এ শব্দত্রয় আভিধানিকভাবে ভিন্ন হলেও পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক। ঈমান ব্যতীত যেমন ইসলাম হয় না, তেমনি ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। এক বিচারে এ শব্দত্রয় পরস্পর পরিপূরক। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهِ.

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

هُوَ تَصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

৫. ইমামত্রয়ের মতে– هُوَ تَصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (ص) بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ۔

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهٖ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا۔

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ۔

اِسْلَام-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْلَامِ لُغَةً :

اِسْلَام-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْلَام শব্দটি سَلْم শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে– اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৬. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা।

৭. اَلْقُبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ (ص) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

مَعْنَى الْاِسْلَامِ شَرْعًا :

اِسْلَام-এর শরয়ী অর্থ : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ۔

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ۔

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–
اَلْإِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِيْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–
اَلْإِسْلَامُ هُوَ الْإِنْقِيَادُ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ)۔

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে–
هُوَ إِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلِ لِمَا أَتٰى بِهِ مُحَمَّدٌ (صـ)۔

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–
هُوَ الْإِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ وَالْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ۔

৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন–
هُوَ الْإِنْقِيَادُ الظَّاهِرِيُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارُ بِمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا۔

⊃ عَقِيْدَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ لُغَةً :

عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ : عَقِيْدَة শব্দটি عَقْد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِدُ অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।

২. কারো মতে, عَقِيْدَة অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقْدُ الْبِنَاءِ তথা اَلصَقَ بَعْضَ حِجَارَتِهِ بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَأَحْكَمَ اِلْصَاقَهَا অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ شَرْعًا :

عَقِيْدَة-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–
اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْإِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ۔
অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–
هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلٰى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِإِيْرَادِ الْحِجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–
هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمُ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِىْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ-

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ-
অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ اَلْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ-

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–
مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ-

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–
اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِىَ الَّتِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ-

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে–
اَلْعَقِيْدَةُ هِىَ الْخِصَالُ الَّتِىْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

নَشْأَةُ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرُهُ :

আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক (مَعْقُوْلَات) ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (فِقْه) বা জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (مَنْقُوْلَات) জ্ঞানকে عِلْم (ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব তথা ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলিকে স্বতন্ত্রভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ, ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ অধিক শ্রেয়। এখানে اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ দ্বারা ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে اَلْكَلَامُ পরিচিতি লাভ করে। কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু 'কালাম' শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে ধীরে اِعْتِقَاد বা عَقِيْدَة বা عَقَائِد নামে বিবেচিত হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তাঁর 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 'ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা।

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা যায় বিষয়টিতে। আকাইদশাস্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ খ্রি.), ইবনে হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী (মৃ. ৯৫০ খ্রি.), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদের হাতে। আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন নাসাফী (মৃ. ১১৪২ খ্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে। ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় ফিকহুল আকবার গ্রন্থটিও একই আদলের। আকাইদে নাসাফী ও আস সানূসী (মৃ. ১৪৯০ খ্রি.) রচিত 'উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

اَلْمُصْطَلَحَاتُ الْاُخْرٰى الدَّالَّةُ عَلٰى مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ ৩ :

আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষা : রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের যুগে ইসলামী বিশ্বাস বোঝাতে 'ঈমান' ছাড়া অন্য কোনো পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে এ বিষয়ে অন্যান্য পরিভাষার উৎপত্তি হয়। ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে পরিভাষাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. **اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ (আল ফিকহুল আকবার)** : ইমাম আবু হানীফা (র) আকিদা বিষয়ক তাঁর এ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল ফিকহুল আকবার'। ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সম্ভবত 'আকিদা' বোঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।

২. **عِلْمُ التَّوْحِيْدِ (ইলমুত তাওহীদ)** : ইমাম আবু হানীফা (র) 'ইলমুল আকিদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আকিদার মূলভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র) ইলমুল আকিদা বোঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

৩. **اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ)** : তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্মবিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ বোঝাতে 'আস সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলিম। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলেম 'আস সুন্নাহ' নামে 'আকিদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

৪. **اَلشَّرِيْعَةُ (আশশারীয়াহ)** : শরীয়ত বা শরীয়াহ অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান বা পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়াহ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি অর্থ 'ধর্মবিশ্বাস' বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতি। তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম 'আশশারীয়াহ' নামে আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

৫. **اُصُوْلُ الدِّيْنِ বা اُصُوْلُ الدِّيَانَةِ** : উসূলুদ্দীন (اُصُوْلُ الدِّيْنِ) বা উসূলুদ্দিয়ানাহ (اُصُوْلُ الدِّيَانَةِ) অর্থ- দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলেম 'ঈমান' বা আকিদা বোঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

৬. عِلْمُ الْكَلَامِ **(ইলমুল কালাম)** : ইসলামী আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' (عِلْمُ الْكَلَامِ) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক আলোচনা বোঝানো হয়।

'আল কালাম' (اَلْكَلَامُ) শব্দের অর্থ– কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (Word, Speech, Conversation, Debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, كَلَامُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর কালাম থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপসংহার : আকিদা বা আকাইদ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাস বা ঈমান বিষয়ক শাস্ত্র। কালামশাস্ত্র নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও শাস্ত্রটি মূলত ইসলামের আকিদা বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল, নিষ্কলুষ ঈমান এবং আমলের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের জন্য আকাইদশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

السُّؤَالُ (١٣) : مَا مَعْنَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ هَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ اَمْ لَا؟ هَلِ الْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ؟ ثُمَّ بَيِّنْ نَشْأَةَ مُصْطَلَحِ "الْعَقِيْدَةِ" بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ **প্রশ্ন : ১৩ ॥ ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দুটি কি সমার্থক শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর "আল আকিদা" পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা কর।**

[ফা. প. ২০১৪]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুসলিম জীবনে ঈমান ও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ। আভিধানিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক। ঈমান ব্যতীত যেমন ইসলাম হয় না তেমনি ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। এক বিচারে এ শব্দদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১ اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা সত্যায়ন করা।
২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া।
৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা।
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া।
৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

مَعْنَى الْإِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

اَلْإِيْمَانُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে– اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْإِقْرَارُ بِهِ অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَانٌ বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (ص) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَانٌ বলা হয়।

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–
اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (ص) بِمَا جَاءَ بِهِ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ.

৪. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–
اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهِ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا.

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–
اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ.

ↄ اِسْلَام-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْإِسْلَامِ لُغَةً :

اِسْلَام-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْلَام শব্দটি سَلْم শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– وَاِذْ قَالَ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে– اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা।

৬. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৭. اَلْقُبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (ص) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

مَعْنَى الْإِسْلَامِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْلَام-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–
اَلْإِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْإِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ ـ
অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لاوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–
اَلْإِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–
اَلْإِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ـ

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে–
هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ) ـ

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–
هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ ـ

৭. فَيْضُ الْبَارِىْ গ্রন্থকার বলেন–
هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا ـ

هَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ اَمْ لَا ؟ :

اِيْمَان ও اِسْلَام সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক শব্দ : اِيْمَان ও اِسْلَام শব্দগতভাবে ভিন্ন হলেও ভাব ও উদ্দেশ্য একই। এ শব্দ দুটি সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম বুখারী (র) বলেন– اِيْمَان ও اِسْلَام সমার্থক তথা এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন।

দলীল : মহান আল্লাহর বাণী–
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (الذاريات ـ ٣٥)

এ আয়াতে مُؤْمِن-কে مُسْلِم বলা হয়েছে। অন্যত্র এসেছে–
يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ـ

এ আয়াতেও مُؤْمِن-কে مُسْلِم বলা হয়েছে।

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ও আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, ইসলাম ও ইমান সমার্থক নয়; বরং বিপরীতার্থক। কেননা اِيْمَان হচ্ছে خَاصّ আর اِسْلَام হচ্ছে عَامّ; অতএব فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ;

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, শব্দ দুটি অবস্থাভেদে কখনো সমার্থক আবার কখনো বিপরীতার্থক হয়ে থাকে। اِيْمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে সম্পর্ক فَقِيْر ও مِسْكِيْن শব্দদ্বয়ের মতো। সুতরাং اِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا অর্থাৎ, উভয় শব্দ একত্রে আসলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাবে আর ভিন্ন ভিন্ন আসলে একই অর্থ বোঝাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ۔

৪. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–

اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ فَالْاِيْمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ۔

৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ কতিপয় মুহাক্কিক আলেমের মতে– الْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।

দলীল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا۔

⊃ هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَمْ لَا :

ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা–

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে الْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ প্রণেতা আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, যেহেতু اِيْمَان হলো শুধু تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ; সেহেতু ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা قَلْب হলো بَسِيْط জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করবে না। পবিত্র কুরআনেও اِيْمَان এবং عَمَل-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন–

১. কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔

এখানে عَمَل-কে اِيْمَان-এর ওপর عَطْف করা হয়েছে। আর عَطْف-এর মধ্যে مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف দুটি ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে।

২. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে–

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

অত্র আয়াতেও عَمَل বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে شَرْط করা হয়েছে। আর شَرْط এবং مَشْرُوْط ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৩. মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

৪. নবী করীম (স) وَفْد ثَقِيْف-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন–

زِيَادَتُهٗ كُفْرٌ وَنُقْصَانُهٗ شِرْكٌ ـ

সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

খ. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

দলীল : ইমামত্রয়ের দলীল নিম্নরূপ–

১. তাঁদের মতে, عَمَل بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

١ـ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا ـ

٢ـ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ ٣ـ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ـ

২. রাসূল (স) বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

এখানে عَمَل-কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই।

আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

গ. মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে।

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়, উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং كَمَال তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান হলো যা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এতে হ্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ঘ. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি হয়, তবে ঘাটতি হয় না।

نَشْأَةُ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرُهٗ :

আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক (مَعْقُوْلَات) ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (فِقْه) বা

জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (مَنْقُوْلَات) জ্ঞানকে عِلْم (ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব তথা ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলিকে স্বতন্ত্রভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ, ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ অধিক শ্রেয়। এখানে اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ দ্বারা ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে اَلْكَلَام পরিচিতি লাভ করে। কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু 'কালাম' শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে ধীরে اِعْتِقَاد বা عَقِيْدَة বা عَقَائِد নামে বিবেচিত হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তাঁর 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 'ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা।

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা যায় বিষয়টিতে। আকাইদশাস্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ খ্রি.), ইবনে হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী (মৃ. ৯৫০ খ্রি.), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদের হাতে। আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন নাসাফী (মৃ. ১১৪২ খ্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে। ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় ফিকহুল আকবার গ্রন্থটিও একই আদলের। আকাইদে নাসাফী ও আস সানূসী (মৃ. ১৪৯০ খ্রি.) রচিত 'উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে। বান্দার ঈমানের মাঝে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তবে ইমাম শাফেয়ী মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

■ اَلسُّؤَال (١٤) : عَرِّفِ الْعَقِيْدَةَ وَالْإِيْمَانَ وَالْاِسْلَام - ثُمَّ بَيِّنْ نَشْأَةَ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرَهَا مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا -

■ **প্রশ্ন : ১৪ আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৫]

اَوْ عَرِّفِ الْعَقِيْدَةَ وَالْإِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ - ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَهَا مَعَ ذِكْرِ نَشْأَةِ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرِهَا -

অথবা, عقيدة, ايمان ও اسلام-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ও عقيدة পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আকিদা, ঈমান ও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়। এ তিনটি বিষয় গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হলেও ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেকাংশে সমার্থক। একজন পরিপূর্ণ মুমিনের ক্ষেত্রে কোনো একটিকেও হালকাভবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। ঈমানকে বাদ দিয়ে যেমন ইসলামকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে একজন পরিপূর্ণ মুমিন ও মুসলিম হওয়া যায় না। এ তিনটি পরিভাষার মাঝে অর্থগত দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। তাছাড়া আকিদা পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের রয়েছে সুউজ্জ্বল ইতিহাস। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

১ عَقِيْدَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ لُغَةً :

عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ : عَقِيْدَة শব্দটি عَقْد শব্দমূল থেকে গৃহীত। عَقِيْدَة-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِد অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ।
২. কারো মতে, عقيدة অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقَدَ الْبِنَاءَ তথা اَلْصِقَ بَعْضَ حِجَارَتِه بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَاَحْكِمِ الْصَاقُهَا অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মযবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।
৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)
৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Article of faith, Bind, tie, Confidence, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ شَرْعًا :

عَقِيْدَة-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْعَقَائِدُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওয়ুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِإِيْرَادِ الْحِجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا.

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِيْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ.

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন– الْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهِ وَلَهُ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَيْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

الْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِيْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدَى مُعْتَقِدِهِ.

অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِي الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللهِ وَبَعْثَةِ الرَّسُوْلِ.

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. الْاِرْشَادُ اِلَى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–

مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهِ.

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِيَ الَّتِيْ بَعَثَ اللهُ بِهَا رُسُلَهُ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهُ وَاَوْجَبَهَا عَلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ.

১১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে–

الْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

⊃ اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْإِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْإِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْأَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা, ২. اَلْإِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা,

৩. اَلْإِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা,

৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৬. اَلْإِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

৭. ইংরেজিতে বলা হয়– Believe, Trust, Obey, Obedience, Security, Attest, certify ইত্যাদি।

مَعْنَى الْإِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে–

اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْإِقْرَارُ بِهِ.

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন– هُوَ تَصْدِيْقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

৫. ইমামত্রয়ের মতে– هُوَ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهِ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ.

৭. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهِ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا.

৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

الْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمل بِالْمَأْمُوْرَات وَالْاِجْتِنَاب عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ۔

⊃ اسلام-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْلَام لُغَةً :

اسلام-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْلَام শব্দটি سَلْم শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে– اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৬. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। ৭. اَلْقُبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

১১. ইংরেজিতে বলা হয়– Surrender, Submit ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِسْلَامِ شَرْعًا :

اسلام-এর শরয়ী অর্থ : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–

اَلْاِسْلَام هُوَ التَّصْدِيْق وَالْاِقْرَار بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَشَرَائِعِهِ۔

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْم وَالْاِنْقِيَاد لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

اَلْاِسْلَام هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

اَلْاِسْلَام هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ)۔

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে–

هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقُبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهِ مُحَمَّدٌ (صـ)۔

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

هُوَ الْانْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتِى الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ ـ

৭. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন–

هو الْانْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا ـ

الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَقِيْدَةِ وَالْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ :

عَقِيْدَة ـ اِيمَان **ও** اِسْلَام**-এর মধ্যকার পার্থক্য :** عَقِيْدَة ـ ايمان ও اسْلام-এর মাঝে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. عَقِيْدَة শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। মূলশব্দ عَقْد; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ, বিশ্বাসমালা, বাঁধা, সম্পন্ন করা, চুক্তি করা, Article of faith. Bind, tie. Confidence. Ideology ইত্যাদি। আর اِيْمَان শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। মূলশব্দ أَمْن; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা, সত্যায়ন করা, Believe. Trust. Obey. Obedience. Security. Attest. certify ইত্যাদি। পক্ষান্তরে اِسْلَام শব্দটিও বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। মূলশব্দ سِلْم; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা, Surrender. Submit ইত্যাদি।

২. عَقِيْدَة হলো সকল বিশ্বাসের সমুষ্টিগত রূপ। আর اِيْمَان হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপনীয় আনুগত্য। পক্ষান্তরে اِسْلَام হলো আকিদা ও ঈমানের আলোকে বাহ্যিক আনুগত্য।

৩. عَقِيْدَة হলো মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিশ্বাসের নাম যা সে অন্তরে লালন করে। আর اِيْمَان হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। পক্ষান্তরে اِسْلَام হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য।

৪. عَقِيْدَة ও اِيْمَان হলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসগত বিষয়। আর اِسْلَام হলো আমলগত বিষয়।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় عَقِيْدَة হলো–

اَلْعَقِيْدَةُ هِىَ الْخِصَالُ الَّتِىْ اَخَذَ النَّاسُ وَيَقِيْمُ عَلَيْهِ ـ

আর اِيْمَان হলো–

هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهِ ـ

পক্ষান্তরে اسْلام হলো– هُوَ اَدَاءُ الطَّاعَةِ مِنَ التَّصْدِيْقِ الْاِقْرَارِ

অথবা هُوَ الدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى

গ. অন্যান্য পার্থক্য :

১. عَقِيْدَة ও اِيْمَان-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে اِسْلَام-এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ـ

২. কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে اِسْلَام আর গোপনে আনুগত্যের নাম হচ্ছে اِيْمَان ও عَقِيْدَة;

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- عَقِيْدَه ও اِيمَان হচ্ছে আম আর اِسْلَام হচ্ছে খাস। এজন্য বলা হয়-

كُلَّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَلٰكِنْ لَيْسَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ۔

৪. কেউ কেউ বলেন- عَقِيْدَة ও اِيمَان শব্দ দুটি অনেকটা একই বিষয়। আর عَقِيْدَة - اِيمَان ও اِسْلَام শব্দ তিনটি এক জায়গায় ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে; কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। কায়দা হচ্ছে- اِذَا اجْتَمَعُوْا اِفْتَرَقُوْا وَاِذَا افْتَرَقُوْا اِجْتَمَعُوْا

৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- عَقِيْدَة - اِيمَان ও اِسْلَام শব্দ তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়।

৬. عَقِيْدَة-কে বাদ দিয়ে اِيمَان এবং اِيمَان-কে বাদ দিয়ে اِسْلَام-কে কল্পনা করা যায় না।

৭. বিশুদ্ধ আকিদা পোষণকারী ও ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। আর ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম।

৮. عَقِيْدَة ও اِيمَان প্রায় একই বিষয়; কিন্তু عَقِيْدَة - اِيمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দৃষ্টিকোণ হতে এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তাই ইমাম বুখারী (র) বলেন- اِيمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো এক ও অভিন্ন।

৯. মুহাক্কিকীনের মতে, প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন। তাঁদের দলীল হলো মহান আল্লাহর এ বাণী-

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

সুতরাং عَقِيْدَة - اِيمَان ও اِسْلَام এ তিনটি শব্দ গঠন ও পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ হতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মৌলিক দিক ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় শব্দ তিনটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন বলা যায়। তবে عَقِيْدَة ও اِيمَان হলো বান্দার বিশ্বাসগত বিষয় আর اِسْلَام হলো বান্দার সে বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন।

⊃ نَشْأَةُ مُصْطَلَحِ الْعَقِيْدَةِ وَتَطَوُّرِه :

আকিদা পরিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইসলামের বিশ্বাসগত মৌলিক বিষয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে আকিদা বা আকাইদশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক (مَعْقُوْلَات) ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবহারিক বিধানসমূহের সমষ্টিকে ফিকহ (فِقْه) বা জ্ঞান বলা হতো এবং কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক (مَنْقُوْلَات) জ্ঞানকে عِلْم (ইলম) বলা হতো। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব তথা ইসলামের মৌলিক আকিদাগত

বিষয়াবলিকে স্বতন্ত্রভাবে বৃহত্তর ফিকহ বা اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মাতুরিদী প্রণীত اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ গ্রন্থে ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়াবলির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ اَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ, ব্যবহারিক ফিকহ হতে দীনি ফিকহ্ অধিক শ্রেয়। এখানে اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ দ্বারা ইসলামের মৌলিক আকিদা বোঝানো হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বাসগত বিষয়াবলির শাস্ত্রীয় নাম হিসেবে اَلْكَلَام পরিচিতি লাভ করে। কারণ এসব বিষয়ে চিন্তাগত যুক্তিতর্কের ব্যাপকতা লাভ করে; কিন্তু 'কালাম' শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হওয়ায় বিষয়টি ধীরে ধীরে اِعْتِقَاد বা عَقِيْدَة বা عَقَائِد নামে বিবেচিত হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি তাঁর 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে দশটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর প্রতিটি বিষয় মূলত খারেজী, কাদারিয়া, শিয়া, জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার প্রতিবাদ এবং ইসলামের সঠিক আকিদার পক্ষে আলোচনামূলক। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আরেকটি গ্রন্থ 'ওয়াসিয়াতু আবু হানীফা'-ও মূলত বিশুদ্ধ আকিদা বিষয়ক। এ বিষয়ে দ্বিতীয় 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি আকিদা বিষয়ক সুশৃঙ্খল একটি রচনা।

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এ সময় এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিকের রীতির প্রতিফলন দেখা যায় বিষয়টিতে। আকাইদশাস্ত্রের এ ক্রমবিকাশ ঘটে আল বাগদাদী (মৃ. ১০২৭ খ্রি.), ইবনে হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) আল গাযালী (মৃ. ১১১১ খ্রি.), আল ফারাবী (মৃ. ৯৫০ খ্রি.), ইবনে সীনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি.) প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববিদের হাতে। আকাইদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আকারের শ্রেণিবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন আবু হাফস ওমর আন নাসাফী (মৃ. ১১৪২ খ্রি.) প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে। ইমাম শাফেয়ী (র) রচিত তৃতীয় ফিকহুল আকবার গ্রন্থটিও একই আদলের। আকাইদে নাসাফী ও আস সানূসী (মৃ. ১৪৯০ খ্রি.) রচিত 'উম্মুল বারাহীন' আকিদা বিষয়ক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

উপসংহার : আকিদা, ঈমান ও ইসলাম মুমিন জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনা করা যায় না। আর ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয় সংক্রান্ত বিশ্বাসের সমুষ্টিগত রূপই হচ্ছে আকিদা। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে কোনো ব্যক্তি নিজেকে একজন পরিপূর্ণ মুমিন দাবি করতে পারে না। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মুমিন হতে হয়। আর ব্যক্তি তার ঈমান ও আকিদার আলোকে আমলী জিন্দেগী তৈরির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। সুতরাং ইসলামী আকিদা, ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনপূর্বক নিজেকে একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হিসেবে তৈরি করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য।

■ اَلسُّؤَالُ (١٥) : اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْإِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ. ثُمَّ تَحَدَّثْ عَنْ عَقِيْدَتِهٖ فِىْ ضَوْءِ كِتَابِهٖ "اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ".

■ **প্রশ্ন : ১৫ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৭]

أَوْ اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) . ثُمَّ اَوْضِحْ عَقِيْدَتَهُ بِضَوْءِ كِتَابِهِ الْفِقْهُ الْاَكْبَرُ بِالتَّفْصِيْلِ.

অথবা, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আকাইদ ও ফিকহশাস্ত্রে যাঁরা মুসলিম ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানীফা নামটি তাঁদের সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন আকাইদ ও ফিকহ জগতের প্রদীপ্ত সূর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্নে যাঁর জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, মুসলিম উম্মাহর আশীর্বাদ ও ইমামগণের নেতা আবু হানীফা (র) তাঁর কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য আকাইদ ও ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর রচিত ফিকহুল আকবার গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা আলোচিত হলো।

১ : نُبْذَةٌ مِنْ سِيْرَةِ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ)

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ–

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান, উপাধি ইমামুল আযম, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত সালমান ফারেসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন।

২. **জন্ম :** ইমাম আবু হানীফা (র) হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **শৈশবকাল :** শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁর মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

৪. **প্রাথমিক জীবন :** বাল্যকালে ইমাম আবু হানীফা (র) প্রখর ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে দোয়া গ্রহণের জন্য নিয়ে গেলে হযরত আলী (রা) তাঁর জন্য দোয়া করেন। হয়তোবা সে দোয়ার বরকতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত ইমামের মর্যাদা লাভ করেছেন।

৫. **শিক্ষাজীবন :** ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি বিদ্যা শিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি আলেমদের সাথে ওঠাবসা কর। এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং জ্ঞানসিন্ধুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন।

৬. **জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা :** ইমাম আবু হানীফা ফিকহশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত,

ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাম্মাদ (র)-এর নিকট সুদীর্ঘ ১৮ বছর হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন।

৭. **ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী :** ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। আবু হাকাম কবীর তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলেছেন। তিনি যেসব মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক।

৮. **তাঁর শিষ্যবৃন্দ :** তাঁর থেকে যারা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (র), খ. ওকী ইবনুল জাররাহ (র),
গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন (র), ঘ. কাজী আবু ইউসুফ (র),
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী (র), চ. ইমাম যুফার (র),
ছ. হাম্মাদ ইবনে আবি হানীফা (র), জ. আবু আসেম (র) প্রমুখ।

৯. **সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ :** ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত আনাস (রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তার থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত আনাস (রা) তাঁর ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাঁর জন্য দোয়াও করেন। ইমাম আযম তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইবনে খাল্লিকান (র) বলেছেন, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি। এ চারজন সাহাবী হলেন–

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা)
খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা)
গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা)
ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)।

১০. **ব্যবসায় বাণিজ্য :** পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে কালে তাঁর সমপর্যায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

১১. **শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন :** ১২০ হিজরীতে উস্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের অপূর্ণ কাজ তাঁকেই সমাপ্ত করতে হবে। আর তাই শিক্ষাদানকে তিনি কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান।

১২. **ফিকহ সংকলন :** ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্পে তাঁর প্রধান চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে مَجْلِس تَدْوِيْنِ الْفِقْه তথা ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। তাঁরা সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনায় ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত كُتُب حَنَفِيَة নামে একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করেন।

১৩. **বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ :** উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাঁকে কুফার প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাঁকে কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করে।

■ প্রশ্ন : ১৫ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭১৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ اَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ اَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تُؤَدِّيَانِ زَكٰوتَهٗ ـ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ـ قَالَتَا لَا قَالَ فَاَدِّيَا زَكٰوتَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

اَلْاَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ

١ـ مَا مَعْنَى الزَّكٰوةِ؟ وَمَتٰى فُرِضَتِ الزَّكٰوةُ؟

٢ـ مَا هُوَ نِصَابُ الزَّكٰوةِ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟

٣ـ هَلْ تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِى الْحُلِىِّ الْمُسْتَعْمَلَةِ؟

٤ـ فَصِّلْ اِسْنَادَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ـ

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

হাদীসের অনুবাদ

- **সংকলন তথ্য :** আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের كِتَابُ الزَّكٰوةِ-এর অন্তর্গত بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ থেকে সংগৃহীত।
- **হাদীস প্রসঙ্গ :** আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) নারীদের অলঙ্কারের যাকাত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
- **হাদীসের অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা) তাঁর পিতা শোয়াইব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি শোয়াইবের দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা দু'জন রমণী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করে। সে সময় তাদের উভয়ের হাতে কাঁকন ছিল। রাসূল (স) তা দেখে বললেন, তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর কি? তারা উত্তর দিল, না। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে, কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে দুটি আগুনের কাঁকন পরিয়ে দেন? তারা জবাবে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এগুলোর যাকাত আদায় কর। (তিরমিযী)
- **সমাপনী :** পার্থিব জীবনের সামান্য সম্পদ পরকালে বিপদের কারণ হবে। এজন্য মহিলাদের গহনার যাকাত থেকে শুরু করে সকল প্রকার যাকাত আদায় করা প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

◀◀ اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الزَّكٰوةِ؟ وَمَتٰى فُرِضَتِ الزَّكٰوةُ؟

▶▶ প্রশ্ন : ১। যাকাত অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়?

উত্তর।। زَكٰوة-এর আভিধানিক অর্থ : زَكٰوة শব্দটি زَكْوٌ বা زَكِىٌّ থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. اَلنَّمَاءُ তথা বৃদ্ধি পাওয়া (To marese)। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ اِذَا نَمَا

২. اَلطَّهَارَةُ তথা পবিত্রতা লাভ করা (Purity)। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

৩. اَلْبَرَكَةُ তথা প্রাচুর্য বা সমৃদ্ধি। যেমন বলা হয়– زَكَتِ الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا

৪. اَلْمَدْحُ তথা প্রশংসা (Praise)। যেমন বলা হয়– زَكّٰى نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَهَا

৫. اَلصَّلَاحُ তথা সংশোধিত হওয়া। ৬. اَلزِّيَادَةُ তথা অতিরিক্ত।
৭. صَفْوَةُ الشَّيْءِ তথা বস্তুর উত্তম অংশ। ৮. পরিচ্ছন্নতা।

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতার সম্পদ যেমন বৃদ্ধি ও পবিত্র হয় তেমনি আত্মারও পরিশুদ্ধতা অর্জন হয়। এ কারণেই যাকাতকে যাকাত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– ١. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا
٢. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

زَكٰوة-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِمُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রব্যক্তিকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هِيَ حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهِ يُوْجِبُ الشَّرْعُ بَذْلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوْطٍ خَاصَّةٍ.

অর্থাৎ, যাকাত হলো সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে।

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هِيَ اِيْتَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ مِنْ بَعْدِ حَوْلَانِ حَوْلٍ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ.

অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্রকে প্রদান করার নাম যাকাত।

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে–

اَلزَّكٰوةُ اِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَى الْفُقَرَاءِ.

৫. ইবনুল আরাবী (র) বলেন–

اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوْبَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْحَقِّ وَالْعَفْوِ.

৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন– اَلزَّكٰوةُ حَقٌّ يَجِبُ فِى الْمَالِ

৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী (র) বলেন–

اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا اللّٰهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.

৮. লুবাবুন নুকুল প্রণেতা বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ.

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **ইবনে খোযায়মার অভিমত :** ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়।

দলীল : তাঁর দলীল হচ্ছে, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট এ কথা বলা– يَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ আর এটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। অতএব যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে।

২. **জমহুরের অভিমত :** জমহুর আলেমগণের মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ.

যাকাতের বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতে কারীমা মহানবী (স)-এর হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

খ. হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكٰوةُ ـ

সুতরাং সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন আদায় করা হয় সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরয হয়েছে।

৩. **নবুবীর অভিমত :** ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (র) বলেন, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়।

৪. **ইবনুল আসীরের অভিমত :** ইতিহাসবেত্তা ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়।

৫. **আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত :** আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–

نَزَلَتْ فَرْضِيَّتُهَا فِيْ مَكَّةَ اِجْمَالًا ثُمَّ فِى الْمَدِيْنَةِ تَفْصِيْلًا ـ

৬. **তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকারের অভিমত :** তারীখুল ইসলাম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যাকাত প্রথম হিজরীতে ফরয হয়।

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা যায়–

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বে মদিনায় যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং এখানে সাওম, সালাত ও সদকা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুণ্য কাজরূপে বিবেচিত ছিল।

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا هُوَ نِصَابُ الزَّكٰوةِ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟

প্রশ্ন : ২। স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের নেসাব কী?

উত্তর।। স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : স্বর্ণের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার নেসাব হলো ২০ মিসকাল বা ৭.৫ তোলা তথা ৮৭.৪৫ গ্রাম। এ পরিমাণ স্বর্ণ যদি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় পূর্ণ এক বছর সংরক্ষিত থাকে তাহলে তাকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী– خُذْ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ نِصْفَ مِثْقَالٍ

তবে ২০ মিসকালের অধিক হলে কিভাবে যাকাত দিতে হবে, সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. **শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ২০ মিসকাল হতে এক মিসকাল বেশি হলেও এর ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

দলীল : তাঁদের দলীল হলো–

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ ـ

এখানে مَا زَادَ-কে عَامٌ রাখা হয়েছে, যা কমবেশি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

২. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, বিশ মিসকালের পর অতিরিক্ত তিন দীনার ক্ষমাযোগ্য। তবে চার দীনার বৃদ্ধি পেলে প্রতি চার দীনারে এক দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে।

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী– ١ـ وَمَا زَادَ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

٢ـ فَاِذَا بَلَغَتْ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ ـ

তবে এখানে স্পষ্ট যে, তিন দিরহাম পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে যাকাত দিতে হবে না।

রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো ২০০ দিরহাম। বাংলাদেশের হিসাবে ৫২.৫ তোলা তথা ৬১২.২৫ গ্রাম। এ পরিমাণ রৌপ্য কারো কাছে পূর্ণ এক বছর গচ্ছিত থাকলে তার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।
২০০ দিরহাম হলে ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে।
তবে ২০০ দিরহামের বেশি হলে যাকাত কিভাবে দিতে হবে, সে ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. **শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র) ও সাহেবাইনের মতে, ২০০ দিরহাম হতে এক দিরহাম বৃদ্ধি পেলেই ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। তাঁদের দলীল হলো–

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ۔

২. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ২০০ দিরহাম হতে ২৩৯ পর্যন্ত বর্ধিত ৩৯ দিরহাম ক্ষমার যোগ্য। ২৪০ দিরহাম হলে ৬ দিরহাম যাকাত দিতে হবে।

দলীল : তাঁর দলীল হচ্ছে–

١۔ فَاِذَا بَلَغَتْ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ۔

٢۔ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ۔

٣۔ فَاِذَا كَانَتْ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ۔

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٣) : هَلْ تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِى الْحُلِىِّ الْمُسْتَعْمَلَةِ؟

▶▶ **প্রশ্ন : ৩। ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হয় কিনা?**

উত্তর।। ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাতের বিধান : মহিলাদের ব্যবহার্য গহনা ও অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা, সাওরী, আওযায়ী ও ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর মতে, ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হবে।

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ۔

খ. রাসূল (স)-এর বাণী–

١۔ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ فِى الْحُلِىِّ اَتُؤَدِّيْنَ زَكٰوتَهُنَّ فَقَالَتْ لَا قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ۔

٢۔ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) لِاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ وَخَالَتِهَا اَمَا تَخَافَانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ اَسْوِرَةً مِنَ النَّارِ اَدِّيَا زَكٰوتَهَا۔

٣۔ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ۔

গ. **কেয়াসী দলীল :** কেয়াসের চাহিদাও হলো মহিলাদের অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব হওয়া। কারণ এ অলঙ্কার পুরুষের নিকট থাকলেও তার যাকাত ওয়াজিব হতো। যেমন দিরহাম দীনার যার নিকট থাকে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব মহিলাদের অলঙ্কারে তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

২. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, ব্যবহার্য অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব নয়।

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী– عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكٰوةٌ

৩. **রাযীর অভিমত :** ইমাম রাযী (র) বলেন, অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الخ

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন–

১. কুরআনের বিপরীতে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২. সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে آثار-এর মূল্যায়ন নেই।

৩. ইমামগণের পেশকৃত হাদীসগুলো مَوْقُوْف এবং হানাফীগণের হাদীসগুলো مَرْفُوْع হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। অতএব মারফূ হাদীসের মোকাবেলায় মাওকুফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আহনাফের অভিমতই গ্রহণীয়।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٤) : فَصِّلْ اِسْنَادَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ـ

▶▶ **প্রশ্ন : ৪। আমর ইবনে শোয়াইবের সনদ** عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ**-এর বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর ।। عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ **-এর বিশ্লেষণ :** عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ এ সনদটি مُنْقَطِعُ السَّنَدِ; এজন্য এ সনদে সহীহাইনের মধ্যে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ–

আমরের পিতা হচ্ছেন শোয়াইব, দাদা হচ্ছেন আবদুল্লাহ আর প্রপিতা হচ্ছেন মুহাম্মদ। এখন جَدِّهٖ-এর যমীরের مَرْجِعْ নিয়ে জটিলতা রয়েছে। যেমন–

১. جَدِّهٖ-এর যমীরের مَرْجِعْ যদি اَبٌ হয়, তাহলে جَدُّ اَبٍ বা মুহাম্মদ উদ্দেশ্য হবে। তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
এমতাবস্থায় হাদীসটি মুরসাল হবে। কেননা মুহাম্মদ হচ্ছেন একজন তাবেয়ী।

২. আবার جَدِّهٖ-এর যমীরের مَرْجِع যদি شُعَيْب হয়, তাহলে جَدُّ شُعَيْبٍ দ্বারা আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য হবে। তাহলে মূল সনদ হবে এরূপ–
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

এমতাবস্থায়ও হাদীসটি مُرْسَل হবে। কারণ আমর তার দাদা আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ পাননি।

■ **প্রশ্ন : ১৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।** [মূল কিতাব হাদীস নং ১৭২১]

عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ ـ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ)

اَلْاَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ

١ـ مَا مَعْنَى الْعَرَايَا لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكْمِ بَيْعِ الْعَرَايَا؟ بَيِّنْ بِالْوَضَاحَةِ ـ

٢ـ هَلْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهٖ؟ بَيِّنْ مَعَ الدَّلِيْلِ ـ

٣ـ بَيِّنْ اٰرَاءَ الْاَئِمَّةِ فِيْ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ وَالْخَضْرَوَاتِ بِالدَّلَائِلِ ـ

٤ـ بَيِّنْ حُكْمَ زَكٰوةِ الْبُقُوْلِ وَالْفَوَاكِهِ ـ

٥ـ حَقِّقْ كَلِمَةَ الْاَوْسُقِ ـ ثُمَّ بَيِّنْ مِقْدَارَ الْوَسَقِ ـ

٦ـ اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ سِيْرَةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ (رض) ـ

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

হাদীসের অনুবাদ

- **সংকলন তথ্য :** আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের كِتَابُ الزَّكٰوةِ-এর অন্তর্গত بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ থেকে সংগৃহীত।
- **হাদীস প্রসঙ্গ :** আলোচ্য হাদীসে যমীনে উৎপাদিত ফসল, ফল, শাকসবজি, ভ্রমণের কাজে ব্যবহৃত উট, গরু, ভেড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় নিয়োজিত দাসদাসীর যাকাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- **হাদীসের অনুবাদ :** হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, শাকসবজিতে যাকাত নেই ও দানকৃত খেজুর গাছের খেজুরে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওসাকের কম শস্যে যাকাত নেই। খেতখামার আর ভ্রমণের কাজের উট গরুতে যাকাত নেই এবং ব্যবহারের প্রয়োজনে পালিত ব্যবসায় বহির্ভূত ঘোড়া, খচ্চর ও গৃহসেবায় নিয়োজিত ক্রীতদাসদাসীতে যাকাত নেই। ইমাম সকর (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে শেষোক্ত তিন প্রকারকে اَلْجَبْهَةُ শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। (দারে কুতনী)
- **সমাপনী :** যাকাত দরিদ্রদের প্রাপ্যাধিকার। সুতরাং যেসব খাতে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব, সেসব খাতে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যাকাত প্রদান করা অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

◀◀ اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الْعَرَايَا لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِىْ حُكْمِ بَيْعِ الْعَرَايَا؟ بَيِّنْ بِالْوَضَاحَةِ.

▶▶ **প্রশ্ন : ১। عَرَايَا-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? عَرَايَا-এর বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতপার্থক্য কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।**

উত্তর।। عَرَايَا-এর আভিধানিক অর্থ : عَرَايَا শব্দটি عَرِيَّةٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. উলঙ্গ করা। যেমন বলা হয়– عَرَى يَعْرِىْ اِذَا قَلَعَ ثَوْبَهُ

২. দানকৃত খেজুর। ৩. বৃক্ষ থেকে আহরিত খেজুর। ৪. উপঢৌকন ইত্যাদি।

عَرَايَا-এর শরয়ী সংজ্ঞা : عَرَايَا-এর শরয়ী সংজ্ঞার ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে– اَلْعَرِيَّةُ اِسْمُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلٰى عَادَةِ الْعَرَبِ

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিত্তশালী লোকেরা গরিবদেরকে দু'একটি খেজুর দান করত। সে দরিদ্র ব্যক্তি বারবার বাগানে আসা যাওয়া করত। তখন দাতা বলত, তুমি বাগানে না এসে এ পরিমাণ ফল আমার ঘর হতে নিয়ে যাও। এটাই بَيْعُ الْعَرَايَا নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো بَيْع নয়।

৩. মুকরিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ بَيْعٌ اَنْ يَخُوْصَ الثَّمَرَةُ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلَةِ ثُمَّ تُعْطِيَهُ قَدْرَهَا مِنْ ثَمَرِ الْقَدِيْمِ.

অর্থাৎ, গাছে ফল রেখে অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ কেনাবেচা করা। অতঃপর ঘরে জমা করা ফল থেকে সে পরিমাণ ফল প্রদান করাকে بَيْعُ الْعَرَايَا বলা হয়।

عَرَايَا-এর বিধান : عَرَايَا-এর বিধান সম্পর্কে আলেমগণের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, بَيْعُ الْعَرَايَا জায়েয নয়। তবে দানগ্রহীতা দরিদ্র হলেও তার প্রয়োজন হলে নগদ ভিত্তিতে জায়েয।

২. **শাফেয়ীর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, খেজুরের পরিমাণ ৫ ওসাক হলে بَيْعُ الْعَرَايَا জায়েয। এর বেশি হলে জায়েয হবে না।

৩. **হেদায়া প্রণেতার অভিমত :** হেদায়া গ্রন্থকারের মতে, এটা জায়েয। কারণ দীন হলো কারো কল্যাণ কামনা করা।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٢) : هَلْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِىْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهِ؟ بَيِّنْ مَعَ الدَّلِيْلِ.

▶▶ প্রশ্ন : ২। যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক কিংবা বেশি হোক উভয়ের ওপর 'ওশর' ওয়াজিব হবে কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর।। যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত তথা ওশর সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা– ১. কাঁচামাল না হওয়া, ২. পাঁচ ওসাক পরিমাণ হওয়া, ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া। এ তিন শর্তের ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধওশর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ফসল যদি অস্থায়ী, পাঁচ ওসাকের কম এবং কাঁচামাল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী–

١. لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ لَيْسَ فِىْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ.

٤. لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

২. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র), মুজাহিদ, ইবরাহীম নখয়ী, যুফার (র) প্রমুখের মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ.

٢. وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ.

খ. রাসূল (স)-এর বাণী– ১. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত–

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَتْ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যমীনে উৎপাদিত শস্য কম হোক বা বেশি হোক যাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র)-এর দলীলের জবাবে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন–

১. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের পারপন্থী। কেননা আয়াতে কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা)-এর হাদীস মাশহুর। সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়।
২. ইবনে ওমরের হাদীসের দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে।
৩. তাঁদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা যমীনে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
৪. প্রথম যুগে পাঁচ ওসাকের হুকুম ছিল। পরবর্তীতে আয়াত ও হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।
৫. সর্বোপরি যাকাতের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো অসহায়, দুঃস্থদের অন্নের সংস্থান করা। তাই পাঁচ ওসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়।

সুতরাং বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে।

◀◀ اَلسُّوَالُ (٣) : بَيِّنْ اٰرَاءَ الْاَئِمَّةِ فِىْ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ وَالْخَضْرَوَاتِ بِالدَّلَائِلِ.

▶▶ প্রশ্ন : ৩। উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমতগুলো দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর।। উৎপাদিত ফসল ও ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান : যমীনে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে শরীয়তের পরিভাষায় ওশর বলে। তবে যমীনে উৎপাদিত ফল এবং শাকসবজির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কাঁচামাল না হলে এবং ন্যূনতম ৫ ওসাক পরিমাণ তথা ২৬ মণ ১০ সের না হলে ওশর তথা উৎপাদিত ফসল ও ফলের যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে ফসল কাঁচামাল হলে এবং তা সারা বছর ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত ফসল কমপক্ষে ৫ ওসাক হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

শাফেয়ী ও সাহেবাইনের দলীল : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ, পাঁচ ওসাকের কমে কোনো যাকাত নেই। তাঁদের মতে, ফসল ৫ ওসাকের কম হলে এবং অস্থায়ী হলে (যেমন শাকসবজি) তাতে ওশর ওয়াজিব হবে না। কারণ মহানবী (স)-এর বাণী– لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ অর্থাৎ, শাকসবজিতে কোনো যাকাত নেই।

২. **ইউসুফের ভিন্ন অভিমত :** ইমাম আবু ইউসুফ (র) অন্যত্র বলেন, যে সকল বস্তু ওজন করা যায় না, যেমন তুলা, জাফরান ইত্যাদির মূল্য ৫ ওসাক পরিমাণ হলে ওশর ওয়াজিব হবে।
৩. **মুহাম্মদের অভিমত :** ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যত্র বলেন, ওশরী যমীনে মধু পাওয়া গেলে তা কম হোক বা বেশি হোক তারও ওশর দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ১০ মশক হলে মধুর ওশর দিতে হবে। তবে খিরাজী জমি তথা যে যমীনের খাজনা দেয়া হয় সে জমির উৎপাদিত ফসলে যাকাত তথা ওশর হয় না।
৪. **আবু হানীফা ও কতিপয়ের অভিমত :** ইমাম আবু হানীফা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ (র)-এর মতে, যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ওশর আদায় করতে হবে। বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত হলে ওশর দশ ভাগের এক ভাগ এবং সেচের দ্বারা উৎপাদিত হলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। তবে বাঁশ, কাঠ, ঘাস, তৃণলতার ওপর ওশর প্রযোজ্য হবে না। কারণ এগুলো ফসল নয়।

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-
٢- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ الاية-

খ. মহানবী (স)-এর বাণী–

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ (عـ) قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أو كَانَ عَثَرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سَقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

◂◂ اَلسُّوَالُ (٤) : بَيِّنْ حُكْمَ زَكٰوةِ الْبُقُوْلِ وَالْفَوَاكِهِ-

▸▸ প্রশ্ন : ৪। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর।। ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান : ফলমূল ও তরিতরকারির যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. **সাহেবাইনের অভিমত** : সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ফলমূল, তরিতরকারি, বাদাম, আখরোট ইত্যাদির ওপর কোনো যাকাত প্রদান করতে হবে না।

দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী– لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ

আর উপরিউক্ত সবগুলো শাকসবজির অন্তর্ভুক্ত।

২. **আবু হানীফার অভিমত** : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফলমূল, তরিতরকারি ইত্যাদির ওপরও যাকাত হিসেবে ওশর ওয়াজিব হবে।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-
٢- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ-

খ. রাসূল (স)-এর বাণী–

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো প্রমাণ করে যমীনে উৎপাদিত সকল ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তা ফলমূল, তরিতরকারি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, আয়াতে কোনো ফসল নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তর : সাহেবাইনের দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা– ১. আয়াতের মোকাবেলায় হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আয়াত দ্বারা হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

◂◂ اَلسُّوَالُ (٥) : حَقِّقِ كَلِمَةَ الْاَوْسُقِ- ثُمَّ بَيِّنْ مِقْدَارَ الْوَسْقِ-

▸▸ প্রশ্ন : ৫। اَوْسُق শব্দের তাহকীক কর। অতঃপর وَسُق-এর পরিমাণ বর্ণনা কর।

উত্তর।। اَوْسُق শব্দের তাহকীক : اَلْاَوْسُقُ শব্দটি اَلْوَسُقُ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. ضَمُّ الشَّئِ إِلَى الشَّئِ অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো।

২. اَلْحَمْلُ তথা বহন করা।

৩. مَكِيْلَةٌ مَعْلُوْمَةٌ তথা নির্দিষ্ট বাটখারা।

وَسَق-এর পরিমাণ : ৬০ সা পরিমাণ সমান এক ওসাক। প্রতি সা-এর মধ্যে ৪ মুদ থাকে। বর্তমানে বাজারে প্রতি সা সাড়ে তিন সেরের সমতুল্য। এ হিসেবে প্রতি ওসাকে ৫ মণ ১০ সের হয়।

◀◀ السؤال (٦) : اكتب نبذة من سيرة سيدنا علي (رض).

▶▶ **প্রশ্ন : ৬। হযরত আলী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।**

উত্তর।। হযরত আলী (রা)-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর প্রিয় জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন

১. **জন্ম ও পরিচয় :** তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, আবু তুরাব, পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ। তাঁর উপাধি ছিল হায়দার, আসাদুল্লাহ, মুরতাযা। তিনি ছিলেন হাশেমী বংশোদ্ভূত এবং রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তলাভের দশ বছর পূর্বে তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** বালকদের মধ্যে আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম গ্রহণকালীন তাঁর বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় ১৫/১৬/৮/১০ বছর এসেছে। অধিকাংশের মতে তিনি ৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. **মহানবী (স)-এর সাথে সম্পর্ক :** রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। হিজরী দ্বিতীয় সনে রাসূল (স)-এর নয়নের মণি কলিজার টুকরা ফাতেমা (রা)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

৪. **হিজরত :** রাসূল (স) মদিনায় হিজরতকালে আলী (রা)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন। মক্কার লোকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে তিন দিন পর তিনি মদিনায় হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর এ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ ঘোষণা করেন–
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً.

৫. **জেহাদে অংশগ্রহণ :** রাসূল (স)-এর যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। খায়বার যুদ্ধে ইহুদিদের বড় বড় দুর্গগুলো তাঁর হাতেই পতন হয়। তাবুক যুদ্ধে তিনি রাসূল (স)-এর নির্দেশ পালনার্থে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ ব্যাপারে রাসূল (স) তাঁকে বলেন–
اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى.

৬. **খেলাফতলাভ :** হযরত ওসমান (রা)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী ৩৫ সালে খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন। প্রায় ৬ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেন।

৭. **জ্ঞান গরীমা :** তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক। তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (স) বলেন– اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ, আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী হলো সে শহরের প্রবেশদ্বার।

৮. **হাদীসশাস্ত্রে অবদান :** হাদীসশাস্ত্রে হযরত আলী (রা)-এর অবদান অপরিসীম। অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা আল্লামা আইনী (র)-এর মতে ৫৮৬টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সম্মিলিতভাবে ২০টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৯টি ও মুসলিম (র) ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯. **শাহাদাত :** ৪০ হিজরী সনের ১৮ রমযান শুক্রবার ফজর নামাযে যাওয়ার পথে খারেজী ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলযিমের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে তিন দিন পর ২১ রমযান সোমবার শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা) তাঁর জানাযা পড়ান। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

১০. **দাফন :** কুফার জামে মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। কারো মতে, নাজাফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৩ : بيان كتابه شرح العقائد النسفية

তাঁর রচিত শরহে আকাইদ আন নাসাফিয়্যার বর্ণনা : আল্লামা তাফতাযানী রচিত শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যা গ্রন্থটি কালামশাস্ত্রে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এর বহু ব্যাখ্যাও রচিত হয়েছে। যেমন–

১. আন নিবরাস শরহে শারহিল আকাইদ।
২. হাশিয়ায়ে শরহে আকাইদ।
৩. তুহফাতুল ফাওয়ায়িদ লি শারহিল আকাইদ।
৪. তালীকুল ফারাইদ আলা শারহিল আকাইদ।
৫. আল ফারাইদ ফি হল্লে শারহিল আকাইদ।

শরহে আকাইদ রচনার কারণ : আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন, ইসলামী শরীয়ত এবং এর আহকাম সংক্রান্ত ইলম, ইসলামী আকাইদের মূল উৎস হলো ইলমুত তাওহীদ ও ইলমুস সিফাত, যা ইলমে কালাম নামেও খ্যাত।

আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) রচিত اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ নামক গ্রন্থটি এ কালামশাস্ত্রের ওপরই লিখিত, আমি এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যসমূহ, সূক্ষ্ম আলোচ্য বিষয়াদি ও জটিল আলোচনাদির ব্যাখ্যা সংবলিত এক গ্রন্থ রচনা করি, যাতে পাঠক সহজেই এ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উপসংহার : আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা তাঁর কর্মবহুল এ সংগ্রামী জীবনের সন্ধান পাই। তিনি সর্বদা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, লেখনী ও জ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইলমে দীনের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এ মহাসাধকের জীবনী এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

■ **السُّؤَالُ (١٩) : اُكْتُبْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْإِمَامِ عُمَرَ النَّسَفِيِّ (رحـ) - ثُمَّ اذْكُرْ عَقِيْدَتَهُ بِضَوْءِ كِتَابِهِ عَقَائِدِ النَّسَفِيِّ بِالتَّفْصِيْلِ -**

■ **প্রশ্ন : ১৯ ॥ ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আকাইদে নাসাফী'-এর আলোকে তাঁর আকিদা বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইমাম ওমর আন নাসাফী ছিলেন একজন খ্যাতিমান পুরুষ। তিনি একাধারে একজন ফকীহ, আকাইদ শাস্ত্রবিশারদ এবং ইলমে তাফসীর ও ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ছিলেন আলেমগণের ইখতিলাফ ও মতভেদ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং সুচারুভাবে তা বিশ্লেষণপূর্বক গ্রন্থে উপস্থাপনকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও একনিষ্ঠ সমর্থক। নিম্নে তাঁর জীবনী উল্লেখপূর্বক আকাইদে নাসাফীর আলোকে তাঁর আকিদা উপস্থাপন করা হলো।

৩ : حَيَاةُ الْإِمَامِ عُمَرَ النَّسَفِيِّ

ইমাম ওমর আন নাসাফীর জীবনী : তাঁর মূল নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস এবং উপাধি মুফতিউস সাকালাইন ও নাজমুদ্দীন। পিতার নাম আহমাদ । পিতামহ ইসমাঈল। প্রপিতামহ মুহাম্মাদ ইবনে লোকমান আন নাসাফী। তাঁর বংশানুক্রম হলো– আবু হাফস নাজমুদ্দীন ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে লোকমান, মুফতিউস সাকালাইন আন নাসাফী।

১. **জন্ম :** ইমাম আবু হাফস ওমর আন নাসাফী দজলা ফুরাত নদীর পার্শ্ববর্তী মেসোপটেমিয়ার নাসাফ শহরে ৪৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

২. **শিক্ষাজীবন :** এ মহামনীষী স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে জ্ঞানার্জন করে স্বীয় জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করেন। তাঁর ফিকহ বিষয়ক উস্তাদ ছিলেন সদরুল ইসলাম আবুল ইয়াসার মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে মুসা বাযদুবী (র)। তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা অসংখ্য। যাদের তালিকা তিনি تِعْدَادُ الشُّيُوْخِ لِعُمَرَ নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

৩. **ইলমুল ফিকহে তাঁর সনদ :** ইমাম নাসাফীর ইলমুল ফিকহের সনদ ইমাম আবু ইউসুফ (র) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। যেমন– তাঁর ফিকহশাস্ত্রের উস্তাদ সদরুল ইসলাম আবুল ইয়াসার মুহাম্মাদ বাযদুভী, তাঁর উস্তাদ আবু ইয়াকুব ইউসুফ ছাইয়ারী, তাঁর উস্তাদ আবু ইসহাক হাকীম নওকদী, তাঁর উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনে হামায়া, তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু ইউসুফ (র)।

৪. **শিষ্যবৃন্দ :** এ মহান ব্যক্তিত্ব থেকে যাঁরা ইলমে দীন অর্জন করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন–

১. তাঁর পুত্র আবু লাইস নাসাফী।
২. আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল আযীয বলখী।
৩. হেদায়া গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর মারগীনানী।
৪. আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল জলীল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে হায়দার সমরকন্দী।
৫. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাওফিকুদ্দীন খতীবে খাওয়ারিযম।
৬. আহমাদ ইবনে মুসা আল কাসাতী।
৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন আল কাসানী প্রমুখ। কথিত আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ই তাঁর শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য তাঁকে 'মুফতি উস সাকালাইন' বলা হতো।

৫. **তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি :** ফিকহ, তাফসীর, আকাইদ ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি। নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো–

১. اَلتَّفْسِيْرُ فِىْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ
২. اَلْمَنْظُوْمَةُ
৩. نَظْمُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ
৪. قِنْدُ فِىْ عُلَمَاءِ سَمَرْقَنْدَ
৫. كِتَابُ الْمَوَاقِيْتِ
৬. اَلْاَشْعَارُ بِالْمُخْتَارِ مِنَ الْاَشْعَارِ
৮. كِتَابُ الشُّرُوْطِ
৯. طَلَبَةُ الطَّلَبَةِ
১০. تَارِيْخُ بُخَارَا
১১. اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ
১২. عَجَالَةُ الصَّبِيِّ بِصِفَةِ الْمَغْرِبِيِّ
১৩. اَلْفَتَاوَى النَّسَفِيَّةُ

৭. مَشَارِعُ الشَّرَائِعِ ১৪. كِتَابُ النَّجَاحِ فِىْ شَرْحِ كِتَابِ اَخْبَارِ الصِّحَاحِ

৬. **কবিতা চর্চা :** শায়খুল ইসলাম আল্লামা যারনূজী تَعْلِيْمُ الْمُتَعَلِّمِ গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলোকে ইমাম নাসাফীর দিকে সম্পর্কিত করেছেন–

كُنْ لِلْاَوَامِرِ وَالنَّوَاهِىْ حَافِظًا * وَعَلَى الصَّلٰوةِ مُوَاظِبًا وَمُحَافِظًا ـ

وَاطْلُبْ عُلُوْمَ الشَّرْعِ وَاجْتَهِدْ وَاسْتَعِنْ * بِالطَّيِّبَاتِ تَصِرْ فَقِيْهًا حَافِظًا ـ

وَاسْئَلْ اِلٰهَكَ حِفْظَكَ رَاغِبًا * وَفَضْلَهُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا ـ

اَطِيْعُوْا وَجِدُّوْا وَلَا تَكْسِلُوْا * وَاَنْتُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ـ

وَلَا تَهْجَعُوْا فَخِيَارُ الْوَرٰى * قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ـ

ইমাম ওমর আন নাসাফী (র)-এর পুত্র আবুল লাইস আহমাদ বলেছেন–

اَنْشَدَنِىْ وَالِدِىْ لِنَفْسِهِ ـ

يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ اَتَرْضٰى بِاَنْ * تَسْعَدَ قَوْمٌ وَلَكَ الشَّقْوَةُ ـ

كَفَاكَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَا يَكُنْ * غَيْرَكَ اَوْفٰى مِنْكَ بِالْخَطْرَةِ ـ

৭. **একটি ঘটনা :** আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বর্ণনা করেন, একদা ইমাম ওমর আন নাসাফী (র) আল্লামা যামাখশারীর সাথে দেখা করার জন্য পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। যখন ওমর আন নাসাফী যামাখশারীর ঘরের দরজায় আঘাত করলেন, যামাখশারী (র) বললেন, কে? ইমাম নাসাফী বললেন– عُمَرُ; তখন যামাখশারী বললেন– اِنْصَرِفْ অর্থাৎ, চলে যাও। নাসাফী (র) বললেন– عُمَرُ لَا يَنْصَرِفُ অর্থাৎ, ওমর মুনসারিফ হয় না। যামাখশারী উত্তরে বললেন– اِذَا نُكِّرَ صُرِّفَ অর্থাৎ, যখন নাকেরা হয়, তখন মুনসারিফ হয়।

৮. **ইন্তেকাল :** এ মহামনীষী ৭৭ বছর বয়সে ৫৩৭ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসের কোনো এক বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, মুনকার নাকীরের প্রশ্নোত্তর ব্যাপারটি কিভাবে সমাপ্ত হয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমার আত্মা পুনরায় ফেরত দিলেন, তখন মুনকার নাকীর এসে প্রশ্ন করতে লাগল। আমি বললাম, উত্তর কী গদ্যে দিব না পদ্যে? ফেরেশতারা বলল, পদ্যে দিন। অতঃপর আমি বললাম–

وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ مُصْطَفَاهُ * رَبِّىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ سِوَاهُ

وَدِيْنِى الْاِسْلَامُ وَفِعْلِىْ ذَمِيْمٌ * اَسْئَلُ اللّٰهَ عَفْوَهُ وَعَطَاهُ ـ

অর্থাৎ, আমার নবী মুহাম্মাদ (স), যিনি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমার ধর্ম ইসলাম। আর আমার কর্ম নিন্দনীয়, আল্লাহ তায়ালার নিকট তার ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করছি।

عَقِيْدَةُ النَّسَفِيِّ بِضَوْءِ كِتَابِهِ :

স্বীয় গ্রন্থের আলোকে নাসাফীর আকিদা : ইমাম নাসাফী (র) হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সুতরাং হানাফী মাযহাব এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাই তাঁর আকিদা।

তাঁর রচিত আকাইদে নাসাফী গ্রন্থ পর্যালোচনা : আল্লামা আবু হাফস নাজমুদ্দীন ওমর আন নাসাফী (র) বিরচিত اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ গ্রন্থটি একটি তুলনাহীন গ্রন্থ। আকাইদ তথা কালামশাস্ত্রে এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে ইলমে কালামের বিষয়াদি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, এ ধরনের গ্রন্থ ইলমে কালামে খুবই বিরল।

এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই বিভিন্ন মনীষী এর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম তুলে ধরা হলো–

১. شَرْحُ الْعَقَائِدِ : শামসুদ্দীন আবু সানা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইস্পাহানী (র), মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী।

২. اَلْقَلَائِدُ عَلَى الْعَقَائِدِ : শেখ জামালউদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমাদ (র), মৃত্যু ৭৭০ হিজরী।

৩. اَلْقَوْلُ الْوَافِيْ لِشَرْحِ عَقَائِدِ النَّسَفِيْ : শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে যাইনুদ্দীন (র), মৃত্যু ৭৭০ হিজরী।

৪. اَلدُّرَّةُ : শায়খ ইবনে আযম (র), মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী।

৫. حَلُّ الْمَعَاقِدِ فِيْ شَرْحِ الْعَقَائِدِ : শায়খ মালাযাদা হারদী খাইরযিয়ানী (র), মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী।

৬. شَرْحُ الْعَقَائِدِ : আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র), মৃত্যু ৭৯২ হিজরী।

৭. اَلْفَوَائِدُ الْقَادِرِيَّةُ فِيْ شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ : আবদুল কাদের ইবনে আবু নসর মুহাম্মাদ ইদরীস ইবনে মুহাম্মাদ (র)।

উপসংহার : ইমাম আবু হাফস ওমর আন নাসাফী (র) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, হাফেয, ফিকহবিশারদ, উসূলবিশারদ, সাহিত্যিক, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ, এবং কালামশাস্ত্রবিশারদ। প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

■ السُّؤَالُ (٢٠) : اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْعَلَّامَةِ سَعْدِ الدِّيْنِ التَّفْتَازَانِيْ رَحِمَهُ اللّٰهُ صَاحِبِ شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ.

■ প্রশ্ন : ২০ ॥ 'শরহুল আকিদা আননাসাফিয়া' গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা.প. ২০১৮]

اَوْ. اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْإِمَامِ تَفْتَازَانِيْ (رحـ) بِالتَّفْصِيْلِ.

অথবা, ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লেখ।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইমাম সাদউদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর তাফতাযানী (র) একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশাস্ত্রবিদ ছিলেন। একজন ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভের পাশাপাশি আকাইদশাস্ত্রেও তিনি সবিশেষ খ্যাত।

حَيَاةُ الْإِمَامِ التَّفْتَازَانِيْ (رحـ) :

ইমাম তাফতাযানী (র)-এর জীবনী :

১. **নাম ও বংশ পরিচিতি :** 'শরহে আকাইদ' গ্রন্থকারের নাম মাসউদ, উপাধি সাদউদ্দীন। তবে তিনি তাফতাযানী নামেই অধিক পরিচিত। পিতার নাম ওমর, উপাধি কাযী ফখরুদ্দীন। দাদার নাম আবদুল্লাহ, উপাধি বুরহানুদ্দীন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী اَلدُّرَّ الْكَامِنَةُ এবং اَبْنَاءُ الْغمر নামক গ্রন্থে তার নাম মাহমুদ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মোল্লা আলী কারী তাঁর নাম ওমর এবং পিতার নাম মাসউদ বলে বর্ণনা করেছেন।

২. **জন্ম :** আল্লামা তাফতাযানী (র) খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর তাফতাযানে ৭২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানের দিকে নেসবত করে তাঁকে তাফতাযানী বলা হয়।

৩. **শৈশবের একটি ঘটনা :** আল্লামা তাফতাযানী (র) শৈশব অবস্থায় স্বল্প মেধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষক আল্লামা আযদুদ্দীনের পাঠশালায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল ছাত্র; কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী ছিলেন।

একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে বলছেন, হে সাদউদ্দীন! চলো চিত্তবিনোদন করে আসি। তিনি বললেন, আমাকে চিত্তবিনোদনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমি অনেক প্রচেষ্টার পরও পাঠ উদ্ধার করতে পারি না। কিরূপে চিত্তবিনোদন করব? অপরিচিত লোকটি একথা শুনে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় আসল। এভাবে তিনবার আসা যাওয়ার পর লোকটি বলল, মহানবী (স) আপনাকে স্মরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং খালি পায়ে চললেন। শহরের বাইরের এক জায়গায় কিছু বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষের নিকট তিনি মহানবী (স)-কে দেখতে পান। তাকে দেখে মহানবী (স) মুচকি হাসি হেসে বললেন, আমি তোমাকে বার বার ডাকছি, আর তুমি আসছ না! তাফতাযানী আরজ করলেন, হুযুর! আমার জানা ছিলো না যে, আপনি আমাকে স্মরণ করছেন। তারপর তাফতাযানী মহানবী

(স)-এর পবিত্র খেদমতে তাঁর মেধার দুর্বলতার কথা পেশ করলেন। মহানবী (স) বললেন, তোমার মুখ খোল। তাফতাযানী মুখ খুললেন। অতঃপর প্রিয়নবী (স) স্বীয় মুখের পবিত্র লালা তাঁর মুখে রাখলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, চলে যাও। জাগ্রত হয়ে যখন আযদুদ্দীনের পাঠশালায় উপস্থিত হন, তখন তিনি পাঠের ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যা অন্যান্য ছাত্র নিরর্থক মনে করল; কিন্তু বিজ্ঞ উস্তাদ তা বুঝতে পেরে বললেন– يَا سَعْدُ! اِنَّكَ الْيَوْمَ غَيْرُكَ فِيْمَا مَضَى অর্থাৎ, হে সাদ! তুমি আজ ঐ ব্যক্তি নও, যা এর পূর্বে ছিলে।

৪. **জ্ঞানার্জন :** তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী, আল্লামা আযদুদ্দীন (র) অন্যতম। যৌবনকালেই তিনি বড় বড় বিজ্ঞ আলেমগণের সমমর্যাদার আসনে সমাসীন হন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি গ্রন্থাদি রচনার কাজ শুরু করেন। আল্লামা কাযবী (র) বর্ণনা করেন, তাঁর মতো দক্ষ আলেম আমার চোখদ্বয় অন্য কাউকে দেখেনি।

৫. **শিক্ষকতা :** শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র) শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জ্ঞান প্রতিভার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ তাঁর নিকট আসতে থাকে। তিনি তাদের মাঝে নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানের আলো বিতরণ করতে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন–

ক. শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (র)।
খ. আবদুল ওয়াসেহ ইবনে খাযর (র)।
গ. আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন হাযদার ইবনে আহমাদ (র)।
ঘ. জালালুদ্দীন ইউসুফ (র)।
ঙ. মাওলানা ফযলুল্লাহ (র)।
চ. সুলতান ফিরোজ শাহ (র) প্রমুখ।

৬. **রচিত গ্রন্থাবলি :** তিনি ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে মানতিক, ইলমে ফিকহ, ইলমে উসূলিল ফিকহ, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে আকাইদ, ইলমে মায়ানী ও ইলমে কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো–

ক. মুখতাসারুল মায়ানী।
খ. সাদিয়া শরহে শামসিয়া। এটা মানতিকশাস্ত্রে লিখিত।
গ. ইরশাদ। এটা নাহুশাস্ত্রে লিখিত।
ঘ. সিরাজুল আরওয়াহ। এটা সরফশাস্ত্রে লিখিত।
ঙ. হাশিয়া কাশশাফ। এটা তাফসীরশাস্ত্রে লিখিত।
চ. শরহে আকাইদ। এটি আকাইদশাস্ত্রে লিখিত।

ছ. তালবীহ ওয়া তানকীহ। এটা উসূলে ফিকহশাস্ত্রে লিখিত।

৭. **তাফতাযানীর কবিতা :** আল্লামা তাফতাযানী (র) কবি না হলেও তাঁর রচিত কিছু কবিতা পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন–

اِذَا خَاضَ فِىْ بَحْرِ التَّفَكُّرِ خَاطِرِىْ ـ عَلٰى دُرَّةٍ مِنْ مُفَصَّلَاتِ الْمَطَالِبِ ـ

حَقَرْتُ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِىْ نَيْلِ مَا هُوَ دُرٌّ ـ وَنِلْتَ مِنِّىْ بِالْكُتُبِ لَا بِالْكِتَابِ ـ

তিনি আরো বলেছেন–

طَوَيْتُ بِاِحْرَازِ الْعُلُوْمِ وَكَسْبِهَا ـ رِوَاءُ شَبَابِىْ وَالْجُنُوْنُ فُنُوْنٌ ـ

فَلَمَّا تَخَلَّصْتُ الْعُلُوْمَ وَنِلْتُهَا ـ تَبَيَّنَ لِىْ اَنَّ الْفُنُوْنَ جُنُوْنٌ ـ

৮. **আলেমগণের দৃষ্টিতে তাফতাযানী (র) :** সাইয়েদ আহমাদ তাহাবী (র) বলেন– اِنْتَهَتْ اِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَنَفِيَّةِ فِىْ زَمَانِهٖ অর্থাৎ, তাঁর যামানায় হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব সমাপ্তি লাভ করেছে। অনেক আলেম মন্তব্য করেন যে, প্রাচ্যের দেশসমূহ তাঁর মাধ্যমেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

আল্লামা কাযবী (র) বলেছেন–

كَانَ مِنْ مَحَاسِنِ الزَّمَانِ لَمْ تَرَ الْعُيُوْنُ مِثْلَهٗ فِى الْاَعْلَامِ وَالْاَعْيَانِ ـ

আল্লামা তাফতাযানী একাধারে সুবক্তা, নাহুবিদ, সরফবিদ, উসূলশাস্ত্রবিদ, ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও তর্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন।

৯. **মাযহাব :** আল্লামা তাফতাযানী (র) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (র), মোল্লা আলী কারী (র) এবং সাইয়েদ আহমাদ তাহাবী (র) বলেন, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র), আল্লামা কাযবী (র) এবং মোল্লা হাসান (র) বলেন, তিনি শাফেয়ী মতাবলম্বী ছিলেন।

১০. **ইন্তেকাল :** মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর; তবে তাঁর ইন্তেকালের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, তিনি ৭৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কেউ বলেন, ৭৯২ হিজরীতে। কেউ বলেছেন, ৭৯৭ হিজরীতে। আল্লামা মীর সাহেব (র) তাঁর মৃত্যুর সন সম্পর্কে বলেছেন–

عقل را پرسیدم از تاریخ سال رحلتش * گفت تاریخش یکے کم "طیب الله ثراه"
۷۹۲

উপসংহার : আল্লামা তাফতাযানী (র)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত কর্মবহুল। তিনি সর্বদা লেখনী ও জ্ঞান সাধনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ এ মহৎ কাজে অতিবাহিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরকানুল ঈমান

■ اَلسُّؤَالُ (٢١) : تَحَدَّثْ عَنْ اَرْكَانِ الْاِيْمَانِ بِالْاَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ۔

■ **প্রশ্ন : ২১ ॥ নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান সম্পর্কে আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১২]

اَوْ۔ عَرِّفْ اَرْكَانَ الْاِيْمَانِ۔ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مُفَصَّلاً۔

অথবা, اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর।

اَوْ۔ اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ كَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟ تَحَدَّثْ عَنْ هٰذِهِ الْاَرْكَانِ مُفَصَّلاً۔

অথবা, اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ কত প্রকার ও কী কী? এর রোকনগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

اَوْ۔ مَاذَا تَعْلَمُ عَنْ اَرْكَانِ الْاِيْمَانِ؟ وَكَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟ بَيِّنْ كُلَّ رُكْنٍ بِالْوَضَاحَةِ۔

অথবা, اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ বলতে কী বোঝ? তা কত প্রকার ও কী কী? বিশদভাবে প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ইসলামের মূলভিত্তিসমূহের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। প্রতিটি মানুষকে মুমিন হিসেবে গণ্য হতে হলে যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোকেই ইসলামের পরিভাষায় আরকানুল ঈমান বলা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ مَعْرِفَةُ اَرْكَانِ الْاِيْمَانِ :

اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর পরিচিতি : সংজ্ঞাগত দিক থেকে اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ক. حَدِّ اِضَافِىٌّ তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা। খ. حَدِّ لَقَبِىٌّ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা।

ক. حَدِّ اِضَافِىٌّ তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা : مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف-এর সংজ্ঞা পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে حَدِّ اِضَافِىٌّ বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ একটি যৌগিক শব্দ। আর এ কারণেই اَرْكَان ও اَلْاِيْمَانُ-এর সংজ্ঞা পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

اَرْكَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَرْكَان শব্দটি رُكْن শব্দের বহুবচন। অভিধানে رُكْن শব্দটি اَلْبِنَاءُ তথা ভিত্তি, স্তম্ভ, খুঁটি, কোণ, মূল অংশ, শক্তি, যার ওপর নির্ভর করা হয়, Foundation ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

اَرْكَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. اَصْلُ الشَّىْءِ তথা কোনো কিছুর মূল বোঝায়।

২. مَا يَقُوْمُ عَلَيْهِ الشَّىْءُ অর্থাৎ, যার ওপর কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন বলা হয়– رُكْنُ الشَّىْءِ دَاخِلُ الشَّىْءِ অর্থাৎ, কোনো কিছুর رُكْن হলো তার ভিতরের অংশ তথা মৌলিক বিষয়।

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اِيْمَان শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার; যা أ ـ م ـ ن মূলধাতু হতে উৎকলিত। যেমন বলা হয়– صَارَ الشَّخْصُ ذَا أَمْنٍ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْوُثُوْقُ তথা আনুগত্য করা, ২. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৩. اَلْاِنْقِيَادُ তথা নির্ভর করা, ৪. اَلْاِذْعَانُ তথা আস্থা স্থাপন করা, ৫. اَلتَّصْدِيْقُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৬. নিরাপত্তা প্রদান করা, ৭. বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীগণ اِيْمَان-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, তার সবকিছুর সত্যতা স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–
تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاِعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ (صـ).

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন– اَلتَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ (صـ) بِهٖ اِجْمَالًا اَوْ تَفْصِيْلًا. অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতভাবে যা আনীত বিধান হিসেবে জানা গিয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ.

৫. জমহুর ওলামার মতে–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (صـ) مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ.

তাই اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর অর্থ হলো, ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূলনীতিসমূহ তথা ঈমানের রোকনসমূহ; যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. حَدّ لَقَبِيّ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা : مُضَافُ اِلَيْهِ ও مُضَاف-এর সংজ্ঞা সম্মিলিতভাবে প্রদান করাকে حَدّ لَقَبِيّ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা বলে। মূলত

اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর একক সংজ্ঞাই حَدِّ لَقَبِيّ-এর অন্তর্গত। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা মুসা আল আসওয়াদ (র) বলেন– هِيَ الْعُمُوْدُ الَّتِيْ تَجْرِي عَلَيْهَا اُمُوْرُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ হলো ঐসব খুঁটি বা স্তম্ভ, যার ওপর ভিত্তি করে ঈমানের কার্যাবলি আবর্তিত হয়।

২. কতিপয় আলেম বলেন– اَلْقَضَايَا الَّتِيْ تَبْتَنِيْ عَلَيْهَا عَقِيْدَةُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ, আরকানুল ঈমান এমন কিছু বিষয়, যার ওপর মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

اَقْسَامُ اَرْكَانِ الْاِيْمَانِ :

আরকানুল ঈমানের প্রকারভেদ : আরকানুল ঈমান তথা ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ ছয়টি। যথা–

১. اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন।

২. اَلْاِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ তথা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান।

৩. اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান।

৪. اَلْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ তথা রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

৫. اَلْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তথা পুনরুত্থান, কেয়ামত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান।

৬. اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ তথা তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের প্রতি ঈমান। ঈমানের আরকান তথা মূলনীতিসমূহের বর্ণনা পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١۔ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۔ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۔

٢۔ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ ۔

খ. হাদীসের ভাষ্য : ঈমান সম্পর্কে নবী করীম (স)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন–

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ ۔

গ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

أَصْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يَصِحُّ الْاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ اَنْ يَقُوْلَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ۔

এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

১. اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ **তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান :** আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো–

ক. তিনিই একমাত্র ইলাহ তথা আইনদাতা। তাঁর আইন ছাড়া আর কারো আইন চলবে না।

খ. তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

গ. তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি নিজে সৃষ্ট নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আবার তাঁর জন্মও কারো থেকে হয়নি।

ঘ. তিনি আরশের উপর সমাসীন। ইলমের দিক থেকে তিনি বান্দার নিকটে আছেন।

ঙ. ইবাদত পাওয়ার তিনিই একমাত্র যোগ্য।

দলীল :

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ- (اَعْرَاف ٥٤)

٢- اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ- (اَلْاَنْعَامُ ٥٧)

٣- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ- (اٰلُ عِمْرَان ٢)

٤- لَا شَرِيْكَ لَهٗ- (اِنْعَام ١٦٤)

٥- لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ- (صَفّ ١)

٦- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- (فَاتِحَة ٤)

٧- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

খ. রাসূল (স)-এর বাণী–

١- مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

٢- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

ঈমান আনয়নের মাধ্যম : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে। যথা– ১. اَلْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ তথা মৌখিক স্বীকৃতি। ২. اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ তথা অন্তরের বিশ্বাস। ৩. اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ তথা রোকনসমূহ কর্মে বাস্তবায়ন।

ঈমানের পূর্ণতার মাধ্যম : তিনটি পর্যায় ব্যতীত ঈমানে পূর্ণতা আসে না। সেগুলো হলো–

১. اَلتَّوْحِيْدُ بِالرُّبُوْبِيَّةِ তথা প্রভুত্বের একত্বে বিশ্বাস।

২. اَلتَّوْحِيْدُ بِالْاُلُوْهِيَّةِ তথা ইবাদতের একত্বে বিশ্বাস।

৩. اَلتَّوْحِيْدُ بِاَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا তথা আল্লাহর নাম ও তাঁর সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যের একত্বে বিশ্বাস।

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাসের অর্থ হলো, আল্লাহ একক ও অতুলনীয়। প্রতিপালনে, কর্মে ও ইবাদতে তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পুরস্কার : আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র কুরআনে مُحْسِن ـ مُسْلِم ـ مُؤْمِن ইত্যাদি আখ্যা প্রদানপূর্বক তাদের পুরস্কার সম্পর্কে ঘোষণা করে বলা হয়েছে–

١ـ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ـ

٢ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ـ

রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

বেঈমানের পরিণতি : অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, কুরআনে তাদেরকে كَافِر তথা অস্বীকারকারী এবং مُنَافِق ঘোষণা করে বলা হয়েছে–

١ـ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

٢ـ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

২. **اَلْاِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ তথা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান :** اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটি مَلَك-এর বহুবচন, যা مَلْك শব্দমূল থেকে গৃহীত। কখনো এর বহুবচনে مَلَك আসে। যেমন কুরআনে এসেছে– وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

مَلَك শব্দের আভিধানিক অর্থ– পত্র, দূত, বাণী। আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (angel)।

ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক : ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. তাঁদের নামে বিশ্বাস, গ. তাঁদের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস ও ঘ. তাঁদের কর্মে বিশ্বাস। এগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ–

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ এবং আল্লাহর পরিজনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানপূর্বক কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করা ও বিশ্বাস করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلْمَلَائِكَةُ جِسْمٌ نُوْرَانِىٌّ مُتَشَكِّلٌ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ اَصْلُهُ اَلْاَلُوْكَةُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ ـ

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ জ্যোতির্ময় সত্তা। তাঁরা বিভিন্ন আকৃতিতে পরিবর্তিত হন, তাঁরা মহান আল্লাহর অবাধ্য হন না; আল্লাহ যে নির্দেশ করেন তা তাঁরা পালন করেন। مَلَائِكَة-এর মূল হলো اَلْاَلُوْكَةُ; অর্থ– বার্তা।

খ. ফেরেশতাগণের নামে বিশ্বাস : কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত সকল ফেরেশতার নাম ও সংখ্যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন– ১. হযরত জিবরাঈল, ২. মিকাঈল, ৩. ইসরাফীল, ৪. মালাকুল মওত, ৫. আল হাফাযাহ, ৬. কিরামান কাতিবীন, ৭. মুনকার নাকীর, ৮. হামালাতুল আরশ, ৯. আয যাবানিয়াহ ইত্যাদি।

তাঁদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে মালেক ইবনে সাসা (রা) বলেন, মহানবী (স) মিরাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন–

رُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا مِنْهُ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, আমার সামনে বায়তুল মামুর উত্থিত হলো। অতঃপর আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর। প্রতিদিন এর মাঝে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। এমনকি যারা একবার বেরিয়ে যায়, তারা আর কখনই ফিরে আসে না।

গ. **আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস :** ফেরেশতাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং তার পরিবর্তন ও ধরন ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ.

ঘ. **তাঁদের কর্ম ও দায়িত্বে বিশ্বাস :** ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিয়োজিত। তা ছাড়া অহী পৌঁছানো, কর্মবণ্টন, মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষের কল্যাণে উৎসাহ প্রদান, মুমিনের জন্য দোয়া করা, কর্ম লিপিবদ্ধ করা, মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ, আরশ বহন ইত্যাদি দায়িত্ব ও কর্মে বিশ্বাস করা। এমর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١. لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

٢. عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ.

٣. يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ.

৩. **اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান :** اَلْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ তথা আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুমিনের ওপর ফরয। উল্লেখ্য, আসমানী কিতাব সর্বমোট ১০৪ খানা। এর মধ্যে ১০০ খানা সহীফা তথা ছোট কিতাব। আর প্রধান ৪ খানা কিতাব তথা তাওরাত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর দাউদ (আ)-এর ওপর, ইঞ্জিল ঈসা (আ)-এর ওপর এবং আল কুরআন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলদের নিকট অহীর মাধ্যমে এসব কিতাব প্রেরণ করেছেন। সন্দেহাতীতভাবে এ গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ প্রদানপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١. قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ...... وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

٢۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ۔

٣۔ كِتٰبٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔

٤۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ۔

٥۔ طٰهٰ۔ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى۔

৪. **اَلْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ তথা রাসূলগণের প্রতি ঈমান :** ঈমানের অন্যতম রোকন হলো, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দানের জন্য অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানুষকে মনোনীত করে তাঁর বাণী প্রদান করেন। তাঁরা সবাই মহৎ চরিত্রের অধিকারী সৎ ও আদর্শ মানুষ ছিলেন। যাঁদের নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে এবং যাঁদের নাম পবিত্র কুরআনে নেই তাঁদেরকে নির্দিষ্টভাবে নবী রাসূল বলে বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা করা এবং ভালোবাসা আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করা ও অনুকরণ করা এবং তাঁর শরীয়ত মতো জীবন পরিচালনা করা ঈমানের অন্যতম মূলভিত্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔

٢۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔

٣۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ۔

٤۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ۔

নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন–

ক. আল্লাহর অপার করুণা, খ. নবী রাসূলগণের সকলেই সহীফা বা কিতাবপ্রাপ্ত হননি, গ. নবী রাসূলগণের সংখ্যা অগণিত, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে মাত্র পঁচিশ জনের নাম, ঘ. সকলেই আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন, ঙ. সকলের দাওয়াত এক, চ. সকলেই আল্লাহর মনোনীত, নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ, ছ. সকলেই মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন, জ. মর্যাদাগত কিছু পার্থক্য ছিল এবং ঝ. মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাস এবং তাঁর শরীয়তের অনুকরণ ও অনুসরণ ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

৫. **اَلْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ তথা পুনরুত্থান, কেয়ামত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান :** আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো মৃত্যুর পর কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা,

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন। মহান আল্লাহ اَلْيَوْمُ الْاٰخِرُ তথা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে গুরুত্বারোপ করে ইরশাদ করেন−

١ـ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

٢ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ ـ

٣ـ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ

আলোচ্য আয়াতে اَلْيَوْمُ الْاٰخِرُ অর্থ হলো শেষ দিবস। যে দিবসের পর আর কোনো দিবস থাকে না, তাকে اَلْيَوْمُ الْاٰخِرُ বলা হয়। সেখানে পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হবে এবং মানবজীবনের কর্মকোলাহল সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না।

সেদিন গোটা মানবজাতি আল্লাহর নির্দেশে একত্র হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে উত্থিত হবে। কেউ কেউ يَوْمُ الْبَعْثِ-কে ঈমানের ভিন্ন রোকন তথা সপ্তম রোকন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৬. **اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ তথা তাকদীরের প্রতি ঈমান :** তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। তাকদীর অর্থ- নির্ধারণ, ভাগ্য। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, একেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। এ বিশ্বের ভালো মন্দ, আনন্দ উল্লাস ও দুঃখ কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না এবং এসব কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার শামিল। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন−

١ـ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ـ

٢ـ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ـ

٣ـ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

٤ـ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

٥ـ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ ـ

উপসংহার : উল্লিখিত রোকন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য আবশ্যক। কারণ এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনা করা যায় না।

■ اَلسُّؤَال (٢٢) : عَرِّفِ التَّوْحِيْدَ - ثُمَّ اذْكُرْ اَقْسَامَهُ مُدَلَّلًا وَمُفَصَّلًا -

■ **প্রশ্ন : ২২ ॥ তাওহীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের প্রকারসমূহ দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৪,'১৬]

اَوْ - مَا مَعْنَى التَّوْحِيْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا -

অথবা, تَوْحِيْد-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮,'১১]

اَوْ - عَرِّفِ التَّوْحِيْدَ وَاَقْسَامَهُ - ثُمَّ اشْرَحِ الْقِسْمَ الَّذِىْ اَنْكَرَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ -

অথবা, তাওহীদ ও তার প্রকারসমূহের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের সে প্রকারের ব্যাখ্যা দাও, যা মুশরিকরা অস্বীকার করে।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাওহীদ হলো ইসলামী আকীদার মূলভিত্তি। ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল আধার হিসেবে বিবেচিত। এর মূলবক্তব্য হলো, আল্লাহ তায়ালাকে সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস হিসেবে মেনে নেয়া, তার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা।

⊃ تَوْحِيْد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى التَّوْحِيْدِ لُغَةً :

تَوْحِيْد-এর আভিধানিক অর্থ : تَوْحِيْد শব্দটি اِسْم مَصْدَر বাবে تَفْعِيْل এটি و - ح - د মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ– একত্ববাদ, কাউকে একক বলে স্বীকার করা। এটা শিরকের বিপরীত; তবে অভিধানবেত্তাগণ تَوْحِيْد শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো– جَعْلُ الشَّيْءِ وَاحِدًا অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা।
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلتَّوْحِيْدُ هُوَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক এমর্মে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ।
৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْحُكْمُ بِاَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ
৪. দর্শনশাস্ত্রে তাওহীদ হলো– اَلْقَوْلُ بِاِلٰهٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা।
৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– نَفْىُ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ
৬. কেউ কেউ বলেন– اِفْرَادُ الْقَدِيْمِ عَنِ الْمُحْدَثِ
৭. কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া, একত্ববাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Unique, Singular, Unmatched, Incomparable ইত্যাদি।
তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- اَللّٰهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

مَعْنَى التَّوْحِيْدِ اِصْطِلَاحًا :

তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা : তাওহীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন,
نَفْيُ الْكُفْوِ وَالْمِثْلِ عَنْ ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ وَاَفْعَالِهٖ وَنَفْيُ الشَّرِيْكِ فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَعِبَادَتِهٖ عَزَّ وَجَلَّ-
অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রভুত্ব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়।

২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন–
هُوَ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَاِفْرَادُهٗ بِمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالْاُلُوْهِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ-
অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর একক হওয়া যা তাঁর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও বিশেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ, তা-ই তাওহীদ।

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) নামায বলেন, আহলুল হাকীকতদের মতে–
تَجْرِيْدُ الذَّاتِ الْاِلٰهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا يَتَصَوَّرُ الْاَفْهَامُ وَيَتَخَيَّلُ فِى الْاَوْهَامِ وَالْاَذْهَانِ-

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত–
ক. مَعْرِفَةُ اللّٰهِ بِالرُّبُوْبِيَّةِ তথা আল্লাহর প্রভুত্ব অনুধাবন করা।
খ. وَالْاِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ তথা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।
গ. وَنَفْيُ الْاَنْدَادِ عَنْ جُمْلَةٍ তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা।

৫. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমান বলেন–
عِلْمُ الْعَبْدِ وَاعْتِرَافُهٗ وَاعْتِقَادُهٗ وَاِيْمَانُهٗ بِتَفَرُّدِ الرَّبِّ بِكُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ وَاعْتِقَادُهٗ اَنَّهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ كَمَالِهٖ- وَاَنَّهٗ ذُو الْاُلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُوْدِيَّةِ عَلٰى خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

৬. কারো কারো মতে– وَحَّدَ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَعْنِىْ اَقَرَّ وَاٰمَنَ بِاَنَّهٗ وَاحِدٌ
অর্থাৎ, মহান ও পবিত্র আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করল তথা তাঁকে এক বলে বিশ্বাসের সাথে স্বীকৃতি দিল।

মোটকথা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁর যাবতীয় বিধান বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ।

اقسام التوحيد :

তাওহীদের প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের একাধিক স্তর রয়েছে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় 'শারহুল আকীদাহ আত তাহাবী' গ্রন্থে তাওহীদকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. تَوْحِيْدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْاِثْبَاتِ তথা জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ।

২. تَوْحِيْدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ তথা কর্মপর্যায়ের তাওহীদ।

ইবনে আবুল ইযয হানাফী (র) অন্যত্র প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞানপর্যায়ের তাওহীদকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন। যথা- ১. تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত), ২. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ (তাওহীদুর রুবুবিয়াত) ও ৩. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ (তাওহীদুল উলুহিয়্যাত)। এ ব্যাপারে তিনি বলেন-

فَالتَّوْحِيْدُ اَوَّلُ الْاَمْرِ وَاٰخِرُهٗ. اَعْنِىْ تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ - فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ انواعٍ : اَحَدُهَا اَلْكَلَامُ فِى الصِّفَاتِ. وَالثَّانِىْ تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ، وَبَيَانُ اَنَّ اللّٰهَ وَحْدَهٗ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَالثَّالِثُ : تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ. وَهُوَ اِسْتِحْقَاقُهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ.

পরবর্তীতে হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞানপর্যায়ের তাওহীদকে তৃতীয় পর্যায়ে এবং কর্মপর্যায়ের তাওহীদকে চতুর্থ পর্যায়ের তাওহীদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাওহীদের স্তরকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা-

১. আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা।
৩. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা।
৪. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র মাবুদ তথা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা।

এতে প্রতীয়মান হয়, তাওহীদ চার স্তরে বিভক্ত হলেও মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দু'প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তা হলো, এর প্রথম পর্যায়ের একাধিক পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর উপস্থাপনার ভিত্তিতে আমরা তাওহীদের প্রকারভেদ উপস্থাপন করব। যেমন-

১. **জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ :** জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্যায়ের তাওহীদ تَوْحِيْدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْاِثْبَاتِ নামে খ্যাত হলেও কখনো কখনো এ পর্যায়ের তাওহীদকে

تَوْحِيْدُ الْعِلْمِيِّ الْخَبَرِيِّ তথা জ্ঞান ও সংবাদের একত্ববাদমূলক তাওহীদও বলা হয়। এ তাওহীদের দুটি মূল বিষয় রয়েছে। যথা–

ক. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব।

খ. تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা নাম ও গুণাবলির একত্ব।

ক. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব : تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস করার অর্থ হলো–

هُوَ الْاِفْرَادُ وَالْاِعْتِقَادُ مِنَ الْمُكَلَّفِ بِاللّٰهِ خَالِقُ الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ وَالْاِنْسَانِ وَاَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكٌ وَرَازِقٌ ... وَاَنَّهُ الْمُقَدِّرُ لِكُلِّ اُمُوْرٍ۔

অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিজিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার আধার।

এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

১۔ اِنَّهُ مُحْيِ الْمَوْتِ بَعْدَ مَا اَحْيٰ اسْتَحَقَّ هٰذَا الْاِسْمَ قَبْلَ اَحْيَائِهِمْ۔

٢۔ كَذٰلِكَ اسْتَحَقَّ اِسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ اِنْشَائِهِمْ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টির পূর্বেও স্রষ্টা নামের দাবিদার।

দলীল : পবিত্র কুরআনে সৃষ্টজীবকে প্রতিপালনের ব্যাপারে বেশকিছু আয়াত রয়েছে। যেমন–

١۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

٢۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۔

٣۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ۔

٤۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا۔

٥۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔

٦۔ وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ۔

অধিকাংশ কাফের এ পর্যায়ের তাওহীদ তথা সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবন, মৃত্যু, বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করত; কিন্তু এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা ঈমানদার হতে পারেনি।

দলীল :

١۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .... فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهَ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۔

٢۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ قُلِ اللّٰهُ۔

٣۔ قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

٤۔ وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ۔

খ. تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তাওহীদ : تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা নাম ও গুণাবলির একত্ব : تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা নাম ও গুণাবলির একত্ববাদের অর্থ হলো দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এবং সকল অপূর্ণতার ত্রুটি থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত সকল নাম ও বিশেষণের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা। সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকা এবং আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের গুণ বা বিশেষণের মতো নয়, এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহর নামসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

ক. اَلْاِسْمُ الذَّاتِيُّ তথা সত্তাগত নাম। যেমন– اَللّٰهُ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ .... الخ

খ. اَلْاِسْمُ الصِّفَاتِيُّ তথা আল্লাহ তায়ালার অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١. وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهِ.

٢. قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

٣. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

٤. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন–

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

বিভিন্ন দলের বিভ্রান্তি : تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্বের বিষয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে। তারা এ বিষয়ে একমাত্র অহীর ওপর নির্ভর না করে মানবীয় দর্শন, যুক্তি, পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) তাঁর اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ গ্রন্থে এ সকল বিভ্রান্তি খণ্ডন করেন।

২. **কর্মপর্যায়ের তাওহীদ :** আরবিতে একে تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ তথা ইবাদত বা উপাসনার একত্ব কিংবা تَوْحِيْدُ الْاِرَادَةِ الطَّلَبِيُّ তথা ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব বলা হয়।

ক. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ : সকল প্রকার ইবাদতমূলক কর্ম যেমন– প্রার্থনা, সেজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

দলীল : মহান আল্লাহ বলেন–

١. هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

٢. وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

٣. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا.

٤۔ يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ۔

খ. ইবাদতে তাওহীদই সকল নবী রাসূলের দাওয়াত : সকল নবী রাসূল তাঁদের উম্মতকে একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

٢۔ وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ۔

সকল নবীকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىَ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ۔

উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য : তাওহীদের এ দুটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির ওপর ঈমান আনয়ন করে মুসলিম হওয়া যায় না। যেমন–

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

اَلتَّوْحِيْدُ الَّذِىْ اَنْكَرَهُ الْمُشْرِكُوْنَ :

মুশরিকরা যে তাওহীদ অস্বীকার করে : এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফেরদের কিছু আপত্তি ছিল। আর তা হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি অদৃশ্য বিষয়। মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা অনুভব করতে পারলেও যুক্তি তথা বুদ্ধি দিয়ে তাঁর সত্তা ও গুণাবলির খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন মন্তব্যও করেছেন। যেমন–

১. বিভিন্ন যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ থাকতে পারে না।
২. কেউ বলেছেন, তাঁর অমুক গুণ থাকতে পারে, তবে অমুক গুণ থাকতে পারে না বা অমুক নামে তাঁকে ডাকা যায় না।
৩. মক্কার কাফেররা মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাঁকে 'রাহমান' তথা করুণাময় বলে বিশ্বাস করতে এবং ডাকতে অস্বীকার করত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا۔

উপসংহার : মহান আল্লাহর একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই তাওহীদ। তাওহীদ ছাড়া সকল ইবাদতই নিরর্থক। সকল নবী রাসূল এ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীরও একই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মানুষকে আল্লাহর ইবাদত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ ([redacted] مَا الْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ (ص)؟ اِشْرَحْ جَوَانِبَ الْاِيْمَانِ بِرِسَالَتِهٖ (ص) بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ প্রশ্ন : ২৩ ॥ মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তাঁর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ۔

মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের অবতারণা।

⊃ اَلْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ (ص) :

মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের মর্মার্থ : ইসলামের প্রথম রোকন হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। মুমিনকে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে– شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁরই বান্দা ও রাসূল।

মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা কিছু বলেছেন, সবকিছুকে সন্দেহাতীত সত্য বলে মনে করা ও সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা। اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ-এর গ্রন্থকার ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী বলেন–

يُؤْمِنُ الْمُكَلَّفُ اَنَّ اٰخِرَ الْاَنْبِيَاءِ وَخَاتَمَ الرِّسَالَاتِ هُوَ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ (ص) حَيْثُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ خَاتَمَ بِهٖ سِلْسِلَةَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ۔

অর্থাৎ, মুকাল্লাফ এমর্মে বিশ্বাস করবে যে, সর্বশেষ নবী এবং রিসালাতের সমাপ্তি হচ্ছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), যার দ্বারা আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়েছেন।

⊃ تَشْرِيْحُ جَوَانِبِ الْاِيْمَانِ بِرِسَالَتِهٖ (ص) :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতে ঈমানের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা : কোনো মানুষকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ বিশ্বাসের আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত : একজন মুমিন সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক। কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ

٢. يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ـ

২. **নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা :** মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না।

দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

٢. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

٣. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طُهُوْرًا وَّمَسْجِدًا وَّاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ ـ

অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। যথা– ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, ৩. আমার জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, ৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩. **নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না– এ কথার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন–

اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ ـ

অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। ..... অতঃপর তিনি বললেন– اَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ لِيْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ ... وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ـ

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে। .... এবং আমি 'আকিব' তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. **তাঁর দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণতা :** মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন। কোনো কিছুই তিনি গোপন করেননি।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ـ

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পৌছালেন না।

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ এক বাক্যে বললেন, হ্যাঁ।

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

৫. **তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। উম্মতের দায়িত্ব হলো শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ।

দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে–

١- فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا ـ

٢- مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

٣- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

৬. **তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য :** মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই তাঁর আনুগত্যের শামিল। পৃথিবীর সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে তাঁর আনুগত্যকেই ঈমানের আলামত বলা হয়েছে।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

٣- وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

٤- وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

٥- فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

৭. **তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ :** নবী করীম (স) যা কিছু পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার সাথে সাথে তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা। তাঁর সুন্নাত তথা জীবনাদর্শই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

٢- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

৮. **তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই অগ্রাহ্য :** কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল : ক. যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

٢- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

٣- مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন–

٤- اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ-

৯. **তাঁর মর্যাদা ও সম্মান :** মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে। এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব ও তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوْكَ -

٢- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ-

٣- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

٤- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا-

٥- وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا-

রাসূল (স) বলেন–

١- اَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ وَلَا فَخْرَ-

٢- وَاَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ-

খ. আবু হোরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন–

وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ-

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন– اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِىْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

১০. **তাঁর ভালোবাসা :** রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা। এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালোবাসবেন।

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ-

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔

১১. তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইত : রিসালাতে ঈমানের দিকগুলো থেকে আরেকটি হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালোবাসা তাঁরই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাথি তথা সাহাবীরা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর, আর নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ ۔ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

১২. ইমাম আযমের বক্তব্য : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিষয়ক আকিদায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

مُحَمَّدٌ نَبِيُّهٗ وَعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَفِيُّهٗ وَنَقِيُّهٗ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ تَعَالٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ ۔ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর মনোনীত ও বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেননি। আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى وَاَنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ وَكُلُّ دَعْوَةِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهٗ فَغَيٌّ وَهَوًى وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرٰى بِالْحَقِّ وَالْهُدٰى وَبِالنُّوْرِ وَالضِّيَاءِ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তাঁর নির্বাচিত নবী ও তাঁর সন্তোষভাজন রাসূল। আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের মুত্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে গণ্য হবে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য হেদায়াত, নূর ও আলো সহকারে।

উপসংহার : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করাই প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব। কারণ তাঁর রিসালাতের নূরে আলোকিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٤) : مَا مَعْنَى النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ؟ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُوْلِ؟ تَحَدَّثْ عَنْ مُقْتَضِيَاتِ الْإِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ مَعَ اِثْبَاتِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِيْنِ۔

■ **প্রশ্ন : ২৪ ॥ নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল-এর মাঝে পার্থক্য কী? হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৬]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছেন নানাপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির। তাই মহান আল্লাহ এই প্রতিকূলতা দূর করতে তাঁদের দিয়েছেন বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা। নবী রাসূলগণের এ অলৌকিক ক্ষমতাই মুজিযা। নিম্নে এতদসম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ نُبُوَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى النُّبُوَّةِ لُغَةً :

نُبُوَّة-এর আভিধানিক অর্থ : نُبُوَّة শব্দটি মূলত نُبُوْءَة ছিল। وَاو-এর পরের هَمْزَة-কে وَاو দ্বারা পরিবর্তন করে وَاو-কে وَاو-এর মধ্যে اِدْغَام করায় نُبُوَّة হয়েছে। শব্দটি نَبَأٌ ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اِخْبَارٌ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ তথা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া,

২. নবীর কাজ, ৩. নবুয়ত,

৪. ইংরেজিতে বলা হয়– Activities of prophet ইত্যাদি।

مَعْنَى النُّبُوَّةِ اِصْطِلَاحًا :

نُبُوَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : نُبُوَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন–

১. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন– سِفَارَةٌ بَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ ذَوِى الْعُقُوْلِ لِاِزَاحَةِ عِلَلِهَا অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ও যাবিল উকুল তথা মানুষ এবং জিনের মাঝে বিদ্যমান অস্পষ্ট বিষয়ের অস্পষ্টতা দূর করার উদ্দেশ্যে দূতের কাজকে نُبُوَّة বলা হয়।

২. اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِىُّ গ্রন্থকার বলেন– اَلْاِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ حَزْرًا وَتَخْمِيْنًا অর্থাৎ, কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনুমানের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাকে نُبُوَّة বলা হয়।

৩. اَلْمُنْجِدُ গ্রন্থকার বলেন– اَلْاِخْبَارُ عَنِ الْغَيْبِ وَالْمُسْتَقْبَلِ بِالْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ দেয়াকে نُبُوَّة বলা হয়।

৪. কোনো কোনো ভাষাশাস্ত্রবিদ বলেন- اَلْاِخْبَارُ عَنِ اللّٰهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ تَعَالٰى
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ও তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়াকে نُبُوَّة বলা হয়।

رِسَالَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الرِّسَالَةِ لُغَةً :

رِسَالَة-এর আভিধানিক অর্থ : رِسَالَة শব্দটি فِعَالَة-এর ওযনে اِسْم جَامِد; বহুবচনে رَسَائِل; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلْبَعْثُ তথা প্রেরণ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-
هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ۔

২. দূত পাঠানো। যেমন বলা হয়- اَرْسَلَنِىْ اِسْتَادُ اِلَيْكَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ

৩. পয়গাম তথা বিশেষ বার্তা। যেমন মহান আল্লাহর মহান বাণী-
رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ۔

৪. اَلْخَطُّ তথা চিঠি।

৫. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ-এর গ্রন্থকার বলেন- اَلرِّسَالَةُ مَا يُرْسَلُ

৬. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন- كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلٰى قَلِيْلٍ مِنَ الْمَسَائِلِ

৭. قَوَاعِدُ الْفِقْهِ-এর গ্রন্থকার মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন-
اَلرِّسَالَةُ هِىَ الصَّحِيْفَةُ يَكُوْنُ فِيْهَا الْحُكْمُ۔

৮. رَائِدُ الطُّلَّابِ গ্রন্থকার বলেন- اَلصَّحِيْفَةُ الَّتِىْ يَكْتُبُ فِيْهَا الْكَلَامُ

৯. ইংরেজিতে বলা হয়- Letter, Message, Consignment, Communication, Shipment ইত্যাদি।

مَعْنَى الرِّسَالَةِ اِصْطِلَاحًا :

رِسَالَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন-
هِىَ سَفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَتِهٖ۔
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাকে رِسَالَة বলা হয়।

২. اَلْمُنْجِدُ অভিধান প্রণেতার মতে- هِىَ دَعْوَةُ الرَّسُوْلِ لِلنَّاسِ اِلٰى مَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ রাসূলদের নিকট যা প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি মানুষকে **আহ্বান** করার নামই রিসালাত।

৩. **আল্লামা ইমাম** তাহাবী (র) বলেন-
اَلرِّسَالَةُ هِىَ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ الصَّالِحِيْنَ نَبِيًّا ثُمَّ نَبَّأَهٗ بِخَبَرِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَمَرَهٗ اَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهٗ۔
অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দা থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার **পর তাঁকে আসমানী** সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌঁছানোর পর যে নির্দেশ দেন, তার নাম রিসালাত।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ প্রণেতা বলেন–

هُوَ مَا اُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ عَنِ اللّٰهِ وَدَعْوَتِهِ النَّاسَ اِلٰى مَا اَوْحَى اللّٰهُ۔

৫. ইমাম রাগেব (র) বলেন– اَلرِّسَالَةُ هِيَ اَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ الرَّسُوْلَ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهٖ وَيُبَلِّغُهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এমন শরীয়ত সহকারে কোনো দূত প্রেরণ, যা তিনি পালন করেন এবং প্রচার করে থাকেন।

ƆC اَلْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَ الرَّسُوْلِ :

নবী ও রাসূলের মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

ক. আভিধানিক পার্থক্য : نَبِيٌّ শব্দটি نَبَأٌ থেকে صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ-এর সীগাহ; বহুবচনে اَنْبِيَاءُ ও نَبِيُّوْنَ ; যার অর্থ- সংবাদবাহক, দূত, আবির্ভূত হওয়া ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে– عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ; আর رَسُوْل শব্দটি اِسْمُ جَامِدٍ একবচন, বহুবচনে رُسُلٌ যার অর্থ– দূত, বার্তাবাহক। অর্থের দিক ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় نَبِيٌّ বলা হয়– مَنْ يَكُوْنُ مُخْبِرًا عَنِ اللّٰهِ بِاَحْكَامِهٖ اَوْ سَفِيْرًا بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ عِبَادِهٖ অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন তাঁকে নবী বলে। সুতরাং নবী হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত; صَاحِبُ الشَّرِيْعَةِ হওয়া শর্ত নয়। আর رَسُوْل বলা হয়– هُوَ مَنْ اُوْحِيَ اِلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ وَبِتَنْزِيْلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল।

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে عَامٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন বলা হয়– كُلُّ رَسُوْلٍ نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُوْلاً

ঘ. আলেমগণের মতভেদ : এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী।

২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلرَّسُوْلُ مَنْ اُمِرَ بِالتَّبْلِيْغِ وَالنَّبِيُّ مَنْ اُوْحِيَ اِلَيْهِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالتَّبْلِيْغِ اَمْ لاَ۔

অর্থাৎ, যাঁকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল। আর যাঁর নিকট অহী প্রেরণ করা হয়েছে তিনি নবী, তাঁকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক।

৪. কাযী আয়ায (র) বলেন– اِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ

৫. ইবনুল হুমামসহ কতিপয় বলেছেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ۔

৩ مُقْتَضَيَاتُ الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ بِمُحَمَّدٍ (صـ) :

মহানবী (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ : কোনো মানুষকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ বিশ্বাসের আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. **তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত :** একজন মুমিন সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক। কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

٢. يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ۔

২. **নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা :** মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না।

দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

٢. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا۔

٣. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ۔

অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। যথা– ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে,

৩. আমার জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, ৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩. **নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না– এ কথার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন–

اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। ..... অতঃপর তিনি বললেন– اَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ لِيْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ ... وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে। .... এবং আমি 'আকিব' তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. **তাঁর দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণতা :** মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন। কোনো কিছুই তিনি গোপন করেননি।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পৌছালেন না।

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ সমস্বরে এক বাক্যে বললেন, হ্যাঁ।

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নর আয়াত নাযিল করেন–
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

৫. **তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। উম্মতের দায়িত্ব হলো শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ।

দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে–

١۔ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا۔

٢۔ مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔

٣۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

৬. **তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য :** মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই তাঁর আনুগত্যের শামিল। পৃথিবীর সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে তাঁর আনুগত্যকেই ঈমানের আলামত বলা হয়েছে।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

٢۔ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

٣۔ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا۔

٤۔ وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا۔

٥۔ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔

৭. **তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ :** নবী করীম (স) যা কিছু পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করার সাথে সাথে তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো, জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা। তাঁর সুন্নাত তথা জীবনাদর্শই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

٢- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

৮. **তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই অগ্রাহ্য :** কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল : ক. যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

٢- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا۔

খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

٣- مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔

নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন–

٤- اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ۔

৯. **তাঁর মর্যাদা ও সম্মান :** মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে। এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব ও তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوْكَ۔

٢- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ۔

٣- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

٤- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُنِيْرًا۔

٥- وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔

রাসূল (স) বলেন–

١- اَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ وَلَا فَخْرَ۔

٢- وَاَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔

খ. আবু হোরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন–
وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ۔

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন– اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِىْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

১০. **তাঁর ভালোবাসা :** রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা। এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে সকল মানুষের ঊর্ধ্বে ভালোবাসবেন।

দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

খ. অবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔

১১. **তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইত :** রিসালাতে ঈমানের দিকগুলো থেকে আরেকটি হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালোবাসা তাঁরই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাথি তথা সাহাবীরা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর। আর নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ ۔ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

১২. **ইমাম আযমের বক্তব্য :** মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিষয়ক আকিদায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

مُحَمَّدٌ نَبِيُّهٗ وَعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَفِيُّهٗ وَنَقِيُّهٗ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ تَعَالٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ ۔ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর মনোনীত ও বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেননি। আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

وَاِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى وَاِنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ وَكُلُّ دَعْوَةِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهٗ فَغَىٌّ وَهَوًى وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرٰى بِالْحَقِّ وَالْهُدٰى وَبِالنُّوْرِ وَالضِّيَاءِ۔

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তাঁর নির্বাচিত নবী ও তাঁর সন্তোষভাজন রাসূল। আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের মুত্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে গণ্য হবে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য, হেদায়াত, নূর ও আলো সহকারে।

৩ إِثْبَاتُ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِمُحَمَّدٍ (صـ) بِالدَّلَائِلِ :

মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি দলীলসহ সাব্যস্তকরণ : মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির দলীলগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো–

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : পবিত্র কুরআনে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।

খ. মহানবী (স)-এর বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে একটি হলো– وَخُتِمَ بِىَ النُّبُوَّةُ অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–
كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ۔
অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তাঁরা সংখ্যায় অনেক হবেন।

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন– اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারুনের মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–
اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلَا نَبِيَّ۔
অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পর কোনো রাসূল এবং নবী নেই।

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–
مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔
অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল ও অবাক হতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন–
اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفَّارَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔
অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি حَاشِر তথা একত্রকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি عَاقِب তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

গ. যৌক্তিক দলীল : বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (স)-কে শেষনবী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন–

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষকে জানাবেন। যেমন সূরা সফফে ঈসা (আ)-এর বক্তব্য–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে বলা হয়নি যে, তাঁর পরে মানবজাতির মধ্যে কোনো নবী রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন।

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাঁদের শিক্ষা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। এজন্য তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

١ـ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

٢ـ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

٣ـ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে যে, তিনিই শেষনবী, তাঁরপর আর কোনো নবী নেই। এমনকি তারপর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী।

কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং ঐক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষনবী। একইরূপে ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী-বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম উম্মাহর, এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তাঁর পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবে না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٥) : مَا الْإِيْمَانُ بِالرِّسَالَةِ؟ تَحَدَّثْ عَنْ مُقْتَضَيَاتِ الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ مَعَ إِثْبَاتِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَلَّلًا۔

■ প্রশ্ন : ২৫ রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৩]

اَوْ مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ؟ تَحَدَّثْ عَنْ مُقْتَضَيَاتِ الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ مَعَ اِثْبَاتِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِيْنِ۔

অথবা, রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক। আমরা সকল নবীর মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী। আর মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদা ও নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা মুমিন ও মুসলিম হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্যই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা।

⊃ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ :

اِيْمَانٌ بِالرِّسَالَةِ-এর অর্থ : اِيْمَانٌ بِالرِّسَالَةِ-এর অর্থ হলো- আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ মহানবী (স) ও তাঁর আনীত বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক। আমরা সকল নবীর মর্যাদা ও নবুয়তে বিশ্বাসী।

⊃ مُقْتَضَيَاتُ الْاِيْمَانِ بِالرِّسَالَةِ بِمُحَمَّدٍ (صـ) :

মহানবী (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ : কোনো মানুষকে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে "মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ বিশ্বাসের আলোকে বেশকিছু বিষয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

১. **তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত :** একজন মুমিন সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল আর মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক। কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

١۔ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

٢- يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه-

২. **নবুয়ত ও রিসালাতের সর্বজনীনতা :** মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, মুহাম্মাদ (স) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষ কখনো সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা পেতে পারে না।

দলীল : ক. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا-

٢- قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا-

٣- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِى الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّوْنَ-

অর্থাৎ, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের ওপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। যথা– ১. আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, ২. আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, ৩. আমার জন্য গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, ৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রতার উপকরণ ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, ৫. আমাকে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৬. আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

৩. **নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না– এ কথার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন–

اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلاَّ اَنَّه لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ-

অর্থাৎ, তোমার আমার সম্পর্ক মুসা (আ)-এর সাথে হারুন (আ)-এর সম্পর্কের অনুরূপ; তবে ব্যতিক্রম এতটুকুই, আমার পরে কোনো নবী নেই।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেছেন; কিন্তু ভবনের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। .....

অতঃপর তিনি বললেন- اَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ, আমিই হলাম সেই ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন-

اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ ... وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ -

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম আছে। .... এবং আমি 'আকিব' তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. **তাঁর দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণতা :** মুহাম্মাদ (স) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন। কোনো কিছুই তিনি গোপন করেননি।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ -

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা অবতরণ করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পৌছালেন না।

রাসূল (স) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি আল্লাহর বাণীসমূহ প্রচার করেছি? সাহাবীগণ সমস্বরে এক বাক্যে বললেন, হ্যাঁ।

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا -

৫. **তাঁর শিক্ষার নির্ভুলতা :** মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন, সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। উম্মতের দায়িত্ব হলো শিক্ষাটি তিনি দিয়েছেন কিনা, তা যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং সন্দেহ পোষণ না করা। এমনকি কেউ এসব বিষয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে সে গোমরাহির অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই হলো মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার মর্মার্থ।

দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে-

١- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا -

٢- مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

٣- فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

৬. **তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য :** মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশাবলিকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই তাঁর আনুগত্যের শামিল। পৃথিবীর

সকল মানুষের কথা ও মতের উর্ধ্বে মহানবী (স)-এর কথাকে স্থান দেয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য শর্ত। পবিত্র কুরআনে তাঁর আনুগত্যকেই ঈমানের আলামত বলা হয়েছে।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

٣. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

٤. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

٥. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

৭. **তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণই মুক্তির পথ :** নবী করীম (স) যা কিছু পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করার সাথে সাথে তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো, জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা। তাঁর সুন্নাত তথা জীবনাদর্শই মুসলমানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

٢. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

৮. **তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম সবকিছুই অগ্রাহ্য :** কেউ যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ও সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। অন্যথা তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল : ক. যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

٢. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

খ. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

٣. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

নবী করীম (স) অন্যত্র ইরশাদ করেন–

٤. اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

৯. **তাঁর মর্যাদা ও সম্মান :** মুহাম্মাদ (স) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলগণের নেতা এবং সর্বযুগের ও সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে যথাযথভাবে সম্মান করতে হবে। এমনকি তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব ও তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা।

দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوْكَ -

٢- وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ -

٣- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

٤- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا -

٥- وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا -

রাসূল (স) বলেন–

١- اَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ وَلَا فَخْرَ -

٢- وَاَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ -

খ. আবু হোরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন–

وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ -

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন– اَنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِىْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

১০. **তাঁর ভালোবাসা :** রিসালাতে ঈমানের দিকগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো মুহাম্মাদ (স)-এর ভালোবাসা। এ ঘোষণাকারী অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালোবাসবেন।

দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

খ. অবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

১১. **তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইত :** রিসালাতে ঈমানের দিকগুলো থেকে আরেকটি হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর পরিবার ও বংশধরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালোবাসা তাঁরই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

দলীল ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ -

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাথি তথা সাহাবীরা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর। আর নিজেদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ। তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের ললাটে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

খ. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ ـ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ـ

১২. **ইমাম আযমের বক্তব্য :** মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিষয়ক আকিদায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

مُحَمَّدٌ نَبِيُّهُ وَعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَنَقِيُّهُ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ تَعَالٰى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ ـ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর নবী, তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর মনোনীত ও বাছাইকৃত। তিনি কখনো মূর্তির ইবাদত করেননি এবং কখনই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেননি। আর তিনি কখনই সগীরা ও কবীরা কিংবা কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হননি।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

وَاِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى وَاِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَكُلُّ دَعْوَةِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَىٌّ وَهَوٰى وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ اِلٰى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرٰى بِالْحَقِّ وَالْهُدٰى وَبِالنُّوْرِ وَالضِّيَاءِ ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, তাঁর নির্বাচিত নবী ও তাঁর সন্তোষভাজন রাসূল। আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) সর্বশেষ নবী, সর্বকালের মুত্তাকীগণের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং রাব্বুল আলামীনের একান্ত প্রিয়জন। তাঁর পরবর্তীকালে নবুয়তের সকল দাবি ভ্রান্ত ও প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে গণ্য হবে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র জিন ও মানবের প্রতি সত্য, হেদায়াত, নূর ও আলো সহকারে।

৩ اِثْبَاتُ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِمُحَمَّدٍ (ص) بِالدَّلَائِلِ :

মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি দলীলসহ সাব্যস্তকরণ : মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির দলীলগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো–

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : পবিত্র কুরআনে খতমে নবুয়তের পক্ষে বহুবিধ দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ۔

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে, আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।

খ. মহানবী (স)-এর বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে একটি হলো– وَخُتِمَ بِىَ النُّبُوَّةُ অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ۔

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তাঁরা সংখ্যায় অনেক হবেন।

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন– اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلَا نَبِىَّ۔

অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমার পর কোনো রাসূল এবং নবী নেই।

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ

لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ وَفِى رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔

অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল ও অবাক হতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন–

اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفَّارَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ۔

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ এবং আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি حاشر তথা একত্রকারী। আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামতের দিন মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি عَاقِبْ তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

গ. **যৌক্তিক দলীল :** বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (স)-কে শেষনবী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন–

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষকে জানাবেন। যেমন সূরা সফফে ঈসা (আ)-এর বক্তব্য–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ۔

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসে বলা হয়নি যে, তাঁর পরে মানবজাতির মধ্যে কোনো নবী রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন।

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাঁদের শিক্ষা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। এজন্য তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

١. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

٢. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .

٣. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا .

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে যে, তিনিই শেষনবী, তাঁরপর আর কোনো নবী নেই। এমনকি তারপর যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী।

কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং ঐক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষনবী। একইরূপে ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী-বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম উম্মাহর। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তাঁর পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবে না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٦) : اُذْكُرْ وِلَادَةَ النَّبِيِّ (ص) وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَمَنْزِلَتَهُ .

■ প্রশ্ন : ২৬ ॥ নবী করীম (স)-এর জন্ম, তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং তাঁর মর্যাদার বর্ণনা দাও।

او. مَتٰى وَاَيْنَ وُلِدَ النَّبِيُّ (ص)؟ بَيِّنْ مَعَ ذِكْرِ اسْمِهِ وَتَعْرِيْفِ نَسَبِهِ وَشَرَفِهِ بِالتَّفْصِيْلِ .

অথবা, নবী করীম (স) কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুসলিম মিল্লাতের জনক হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট এভাবে দোয়া করেছিলেন– رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন। তাতে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ছিল গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ ও কল্যাণকর। আলোচ্য প্রশ্নে রাসূল (স)-এর জন্ম, বংশপরিচয় ও তাঁর মর্যাদা উপস্থাপন করা হলো।

১ وِلَادَةُ النَّبِيِّ (ص) :

নবী করীম (স)-এর জন্ম : নবী করীম (স)-এর জন্মের সময়কাল ও তারিখ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. সময়কাল : পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) عَامُ الْفِيْلِ তথা হস্তিবছরে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ যে বছর বাদশাহ আবরাহা হাতি নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরী আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল।

খ. **জন্মবার :** সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।

গ. **জন্ম তারিখ :** হাদীসে নববী থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিলো না। এ কারণেই পরবর্তী যুগে আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি অভিমত রয়েছে।

তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হলো–

১. কারো কারো মতে, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা অবান্তর।
২. মাস হিসেবে মহররম, রবিউল আউয়াল, সফর, রবিউস সানী, রজব ও রমযান মাস উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. আল্লামা কোস্তলানী (র)-এর মতে, রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে রাসূল (স)-এর জন্ম হয়। এ মতটি অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এ মতটি দু'জন সাহাবী ইবনে আব্বাস ও যোবায়ের ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
৪. ইবনে শায়বা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মহানবী (স) রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।
৫. জমহুর মুহাদ্দিস ও মুতায়াররিখীন তথা ইতিহাসবেত্তাদের মতে– عَامُ الْفِيْلِ তথা হস্তিবছরেই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৪০/৫০ দিন পর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম হয়। তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) সুবহে সাদেকের সময় সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন।

৩ اَلْاِسْمُ الْمُبَارَكُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মোবারক নাম : রাসূলুল্লাহ (স) অনেক নাম ও বিভিন্ন উপাধির অধিকারী ছিলেন। যেমন–

ক. প্রসিদ্ধ মতে, তাঁর মূল নাম হলো দুটি। যথা–

১. মুহাম্মাদ। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

২. আহমাদ । এ নামটিও পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ۔

খ. সহীহ বুখারীতে রাসূল (স)-এর মোট পাঁচটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ১. مُحَمَّدٌ তথা প্রশংসিত, ২. اَحْمَدُ তথা অধিক প্রশংসিত, ৩. اَلْمَاحِىْ তথা উচ্ছেদকারী, ৪. اَلْحَاشِرُ তথা একত্রকারী, ৫. اَلْعَاقِبُ তথা সর্বশেষ। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفَّارَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ۔

গ. কোনো কোনো আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতা স্বপ্নের আলোকে তাঁর নাম রাখেন আহমাদ (اَحْمَدُ) এবং তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ (مُحَمَّدْ);

পবিত্র কুরআনে مُحَمَّدْ ও اَحْمَدُ ছাড়াও আরো কিছু উপনাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– يٰس - حٰمٓ - طٰهٰ - اَلْمُدَّثِّرْ - اَلْمُزَّمِّلُ

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) আল আমীন (اَلْاَمِيْنُ), আসসাদেক (اَلصَّادِقُ) ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন।

১ (صـ) مَعْرِفَةُ اَنْسَابِ النَّبِيِّ :

নবী করীম (স)-এর বংশপরিচয় : রাসূল (স)-এর বংশপরিচয় নিম্নরূপ–

১. **বংশ :** মহানবী (স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ, তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। যারা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।

২. **বংশপরিচয় :** রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. প্রথম অংশের নির্ভুলতার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা এবং বংশধারা বিশেষজ্ঞরা একমত। এ অংশ ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান আদনান পর্যন্ত।

খ. দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এ অংশ আদনান থেকে ওপরে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

গ. তৃতীয় অংশের মধ্যে নিশ্চিত ভুল রয়েছে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে আদম (আ) পর্যন্ত পৌছেছে।

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, যারা আদনানের ওপরে বংশ তালিকা বর্ণনা করে, তারা মিথ্যা বলে।

৩. **রাসূলুল্লাহ-এর বংশপরম্পরা :** সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত বিশুদ্ধভাবে আদনান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ–

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ اِلْيَاسَ بْنِ مُضَرِ بْنِ مَعَادِ بْنِ عَدْنَانَ-

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (শায়বা) ইবনে হাশেম (আমর) ইবনে আবদে মানাফ (মুগীরা) ইবনে কুসাই (যায়দ) ইবনে কেলাব ইবনে মুররা, ইবনে কাব ইবনে লুয়াই, ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নযর (কায়স) ইবনে কেনানা ইবনে খোযায়মা ইবনে মুদরেকা (আমের) ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান।

এর সমর্থনে সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স) বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং কেনানার বংশধরদের মধ্য থেকে কুরাইশকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আর কুরাইশদের থেকে বনি হাশেমকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

৪. **কুরাইশ বংশের মর্যাদা :** মহান আল্লাহ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে কুরাইশ বংশে প্রেরণ করেছেন। কারণ কুরাইশ বংশ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মনোনীত আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ। কুরাইশ বংশের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত। মক্কাবাসীরা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। এ হাশেম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ বংশের অন্য বিশেষ মর্যাদা হলো নেতৃত্ব প্রদান।

৫. **নেতৃত্ব :** তৎকালীন আরবের শাসক নির্বাচিত করা হতো কুরাইশ বংশ থেকে। কারণ কুরাইশদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের সকল যোগ্যতা ও গুণাবলি বিদ্যমান ছিল। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ অর্থাৎ, কুরাইশরা গোটা মানবজাতির নেতা।

অন্যত্র রাসূল (স) ইরশাদ করেন- اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ অর্থাৎ, ইমামত তথা নেতৃত্ব কেবল কুরাইশদের থেকে হবে।

৩ (صـ) مَنْزِلَةُ النَّبِىِّ :

মহানবীর মর্যাদা : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির পথপ্রদর্শক, নবী রাসূলদের নেতা। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাঁকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর মর্যাদা দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা-

১. **পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদা :** পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে তাঁর প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

١۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ۔

٢۔ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

٣۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

তাঁকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ... الاية ـ

তাঁর বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

তাঁর সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه ... الاية ـ

২. **হাদীসে নববীর আলোকে তাঁর মর্যাদা :** হাদীসে নববীতেও তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন– ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

١ـ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ـ

٢ـ اَنَا اَكْرَمُ وَلَدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ وَلاَ فَخْرَ ـ

খ. আবু উমামা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَنِىْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ ـ

৩. **তাঁর মর্যাদার বিষয়ে অহীর অনুসরণ :** নবী রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালঙ্ঘন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ـ

উপসংহার : নবী করীম (স)-এর আগমন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ কুরাইশ বংশে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো তাঁর জীবনচরিত যথাযথভাবে জানা এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে তাঁর প্রকৃত উম্মত হিসেবে নিজেকে তৈরি করা।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٧) : عَرِّفْ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا (صـ) - ثُمَّ اشْرَحْ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ وَاهَمَّ مُعْجِزَاتِهِ وَخَتْمُ النُّبُوَّةِ بِهِ وَفَضْلَ اصْحَابِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ

■ প্রশ্ন : ২৭ ॥ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর মর্যাদা, প্রধান মুজিযাসমূহ, খতমে নবুয়ত এবং তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইতের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও নবী রাসূলগণের নেতা এবং রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যাঁর আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। নিম্নে তাঁর পরিচয়, মর্যাদা, মুজিযা, খতমে নবুয়ত এবং তাঁর সাহাবী ও আহলে বাইতগণের মর্যাদা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো।

১. مَعْرِفَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (صـ) :

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত ও সঠিক পথের দিশারি। মানবজাতির পক্ষে তাঁর যথাযথ পরিচয় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবীগণের সর্দার এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। নিম্নে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো—

১. **জন্মস্থান ও বংশপরিচয় :** আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীতে মা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম ছিলেন কুরাইশ বংশের; যারা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর।

   কুরাইশদের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আবদুল্লাহ কুরাইশ বংশের অপর শাখা বনি যুহরার নেতা ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরার কন্যা আমেনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

২. **জন্ম :** আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (স) عَامُ الْفِيْلِ তথা হস্তির বছর জন্মগ্রহণ করেন।

   হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের নিকট থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; তবে ঐতিহাসিকদের মতে, হস্তির বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল। সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত প্রকাশ করেছেন।

৩. **শৈশব ও কৈশোর :** জন্মের পর তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ । আর তাঁর দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। জন্মের কিছুদিন পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদুইন গোত্র বনি সাদের হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব নামক

এক মহিলা একাধারে পাঁচ বছরের জন্য শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন।

এরপর মক্কায় তাঁর মাতার নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বছর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন। তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। দুই বছর পর ৮ বছর বয়সে দাদাকে হারিয়ে পরবর্তীতে প্রায় ১৭ বছর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন।

এ সময়ে তিনি মাঝে মাঝে স্বীয় চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের ছাগল, ভেড়া চরাতেন। তবে সাধারণ যুবকদের মতো গল্পগুজব, মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিছু সাহসী যুবককে সঙ্গে নিয়ে অন্যায়ের মূলোৎপাটনের জন্য 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. **বিবাহ ও নবুয়তপূর্ব জীবন :** ২৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স) মক্কার সম্ভাব্য ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা)-কে বিবাহ করেন। খাদীজার বয়স তখন ৪০ বছর।

বিবাহের পর খাদীজা (রা) তাঁর সকল সম্পদ রাসূল (স)-এর জন্য উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। এ সময় তিনি তাঁর সমাজসেবা, সততা, চিত্তাকর্ষক অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সবাই তাঁকে আল আমীন ও আস সাদিক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্ততা মেনে নিত।

৫. **নবুয়ত লাভ :** ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (আগস্ট মাসে) ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল আমীন (আ) অহী নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাঁকে কুরআনের সূরা ইকরার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষাদান করেন।

৬. **মক্কী জীবন :** নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। এ সময় মক্কার কিছু সৎ ও নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে চতুর্থ বছর থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী প্রায় ১০ বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন। এ সময় মূলত তিনি তাওহীদুল ইবাদতের দাওয়াত প্রচার করতেন। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি তখনো প্রবর্তিত হয়নি।

নবুয়তের দশম বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজা (রা) কিছু দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বছরটি ছিল খুবই বেদনাদায়ক। এমতাবস্থায় কাফেরদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

৭. **মদিনায় হিজরত ও মাদানী জীবন :** আল্লাহর নির্দেশে কুরাইশদের হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে নবুয়তের চতুর্দশ বছরে রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন।

তিনি মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন।

মক্কার কাফেররা তাঁর সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার মুসলিমদের ধ্বংসের নিমিত্ত বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে আল্লাহ মুসলিমদের যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তী ৮ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরী সালের রমযান মাসে রাসূল (স) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এ বছর রাসূলুল্লাহ (স) লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

৮. **ওফাত :** হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ১১ হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কত তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিকগণের মতে, রাসূল (স) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১০/১২/১৩/১৪ দিন অসুস্থ থাকার পর ১২/১৩ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন।

১২ রবিউল আউয়াল দিবসের প্রথম দিকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকাবস্থায় মিসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! সুমহান সঙ্গীর সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন। এরপর তিনি ওফাত লাভ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

⊃ فَضْلُ الرَّسُوْلِ (صــ) وَشَرَفُهُ :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও নবী রাসূলদের নেতা। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাঁকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর মর্যাদা দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা–

১. **পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদা :** পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে তাঁর প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ـ

٢- وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ ٣- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ـ

তাঁকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ... ـ

তাঁর বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدًا إنَّ ذٰلكم كانَ عِندَ اللهِ عَظيمًا ـ

অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لا تَجعلوا دُعاء الرَّسُوْل بينكُم كدعاءِ بعضكُم بعضا ـ

তাঁর সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تُقدِّمُوْا بين يدى الله ورسوله ... الاية ـ

২. **হাদীসে নববীর আলোকে তাঁর মর্যাদা :** হাদীসে নববীতেও তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন– ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

١ـ انا سَيِّدُ وُلدِ ادم يوم القيامة ولا فخر ـ

٢ـ انا اَكْرَمُ وُلدِ ادم على ربّى ولا فخر ـ

খ. আবু উমামা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

انَّ اللّٰه فضَّلنى على الانبياء ـ

৩. **তাঁর মর্যাদার বিষয়ে অহীর অনুসরণ :** নবী রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালঙ্ঘন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لا تُطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم فانّما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ـ

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاهْلَ الْكِتٰبِ لا تَغْلُوا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ـ

০ اهم معجزات الرسول (ص) :

রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক মুজিযা দান করেছেন। নিম্নে তাঁর প্রধান মুজিযাসমূহ উপস্থাপন করা হলো–

১. **পবিত্র কুরআন :** অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদেরকে এর অনুকরণে ছোট্ট একটি সূরা তৈরি করতে আহ্বান করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অন্যত্র আল্লাহ কাফেরদের উক্তিকে এভাবে তুলে ধরেন এবং তারা তাতে অক্ষম হয়।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّه اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ـ

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি।

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা :** পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিযার মধ্যে দুটি মুজিযা গুরুত্বপূর্ণ। যথা–

ক. ইসরা তথা মিরাজ : মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর জন্য এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ সম্ভব।

খ. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্র হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية۔

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে। তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তা ছাড়া তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। বাকশক্তিহীন কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

بَيَانُ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِهٖ ﷺ :

খতমে নবুয়্যতের বর্ণনা : ইসলামী আকিদা হলো মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আর কোনো অহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল আসবে না। কুরআন ও অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বার বার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দলীল : ১. যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ۔

২. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে নবীগণের ওপর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠটি হলো আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।

৩. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন–

وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِىٌّ۔

৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلَا نَبِىَّ۔

৩ : فَضْلُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ (صـ)

নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা : রাসূল (স)-এর সম্মান ও ভালোবাসার অংশ হলো, তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। বিশেষভাবে তাঁর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা। তাঁদের মর্যাদাসম্মান এবং তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ও হাদীস তুলে ধরা হলো–

১. **আকাশের ধ্রুবতারা :** মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারার ন্যায়। তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ। যেমন মহানবী (স) বলেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔

২. **আল্লাহর সন্তোষ অর্জন :** আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ওপর স্বীয় সন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করতঃ ইরশাদ করেন–

١۔ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

٢۔ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

৩. **মহানবী (স)-এর অতি প্রিয় :** সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। মহানবী (স)-এর ভালোবাসা যে হৃদয়ে রয়েছে, সে হৃদয় সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। তাঁদের ওপর আক্রমণের তীর নবী করীম (স)-এর কলিজায় বিদ্ধ হবে। যেমন নবী করীম (স) বলেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِى فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ۔

৪. **জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত :** মহান আল্লাহ রাসূল (স)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু সাহাবীকে ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারাহ তথা দশজন খুবই প্রসিদ্ধ। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ (صـ) قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ اَبِى وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ ابْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ۔

৫. **উম্মতের আমানত :** মহানবী (স) স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের আমানত এবং তাঁদেরকে রেখে গেছেন সমগ্র উম্মতের আমানতস্বরূপ। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী– اَصْحَابِى اَمَانَةٌ لِأُمَّتِىْ

৬. **ঈমানের দৃঢ়তা :** মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা ছিল পাহাড়ের চেয়েও মযবুত ও অবিচল। হযরত কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

اَلْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ۔

৭. **আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য :** সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔

৮. **মহানবী (স)-এর অনুসরণ :** সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তাঁরা সর্বদা মহানবী (স)-এর নির্দেশ পালনের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রস্তুত থাকতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

এরই নমুনাস্বরূপ বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সাদ ইবনে ওবাদা (রা) বলেন– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَ الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا অর্থাৎ, ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদেরকে মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা (বিনা প্রতিবাদে) সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

৯. **হাদীসের আমানতদার :** সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এজন্যই তাঁরা মহানবী (স)-এর হাদীসের পূর্ণ আমানতদার ছিলেন। এ ব্যাপারে মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

١۔ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

٢۔ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ۔

٣۔ مَنْ يَقُلْ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ۔

১০. **আল্লাহ কর্তৃক সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত :** সাহাবীগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। আর এমর্মে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল (স) সত্যায়ন করেন। যেমন ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব হলো, সকল সাহাবীর জন্য দোয়া করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা।

খ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ۔

১১. **সাহাবীদের যুগ উত্তম যুগ :** সবচেয়ে উত্তম ও শান্তির যুগ হলো রাসূল (স)-এর যুগ। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী পরবর্তী উত্তম যুগ হলো সাহাবীদের যুগ। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করেছিলেন। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষ্য– خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেমই এভাবে

বলেছেন যে– اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ অতএব কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ধারণা করা বা সমালোচনা করা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ অমান্য করা এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে ঘৃণা করার সমতুল্য।

৩. فَضْلُ اَهْلِ بَيْتِهِ :

আহলে বাইতের মর্যাদা : আহলে বাইত তথা মহানবী (স)-এর পরিবার পরিজনের মর্যাদা সাহাবীগণের মর্যাদা থেকে কোনো অংশে কম নয়। কারণ তাঁরাও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণও উম্মতের জন্য মাতাস্বরূপ। মহানবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁকে ভালোবাসা ও সাহায্য করার ক্ষেত্রে اَهْلُ بَيْتٍ তথা তাঁর বংশ ও পরিবার পরিজনগণ অগ্রণী ছিলেন। তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর আত্মীয়গণকে ভালোবাসার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন– قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ;

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মুজিযা। আর তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٨) : تَحَدَّثْ عَنْ عَقِيْدَةِ خَتْمِ النُّبُوَّةِ مُدَعَّمًا بِالْاَدِلَّةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ مُفَصَّلًا۔

■ প্রশ্ন : ২৮ ॥ কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]

اَوْ مَاذَا تَعْلَمُ عَنْ خَتْمِ النُّبُوَّةِ؟ وَاذْكُرْ بِالْاَدِلَّةِ مَعَ اِجَابَةِ الْمُخَالِفِيْنَ مُفَصَّلًا ۔ ثُمَّ اذْكُرْ نَشْأَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارَهَا مَعَ ذِكْرِ اٰثَارِهَا فِىْ بَنْغَلَادِيْش۔

অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? নবুয়ত অস্বীকারকারীদের জবাব দলীল সহকারে বিস্তারিত উল্লেখ কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর।

اَوْ۔ عَرِّفْ خَتْمَ النُّبُوَّةِ۔ اَثْبِتْ خَتْمَ نُبُوَّةِ لِمُحَمَّدٍ (صـ) بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔ ثُمَّ اذْكُرْ نَشْأَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارَهَا مَعَ ذِكْرِ اٰثَارِهَا فِىْ بَنْغَلَادِيْش۔

অথবা, খতমে নবুয়ত-এর সংজ্ঞা দাও। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুহাম্মাদ (স)-এর খতমে নবুয়ত সাব্যস্ত কর। অতঃপর খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার ও ক্রমবিকাশ বর্ণনাসহ বাংলাদেশে এর প্রভাব উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের প্রধান অংশ। তাঁর পরে আর অহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাঁর পরে কেউ নবুয়তের দাবি করলে সে নিজেও কাফের আর যারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করবে তারাও মুরতাদ ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩. خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى خَتْمِ النُّبُوَّةِ لُغَةً :

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর আভিধানিক অর্থ : خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. বিখ্যাত আরবি অভিধান لِسَانُ الْعَرَبِ-এ বলা হয়েছে– خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ অর্থাৎ, জাতির শেষ ব্যক্তিই হচ্ছে খাতামুল কাওম।

২. আল্লামা জাওহারী বলেন, কোনো বস্তুর খাতেম তার শেষকে বোঝায়। আর মুহাম্মাদ (স) নবীগণের সর্বশেষ।

৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, খাতামুন নাবিয়্যীন নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছে।

৪. আল্লামা ইবনুল ফারিস বলেন, خَتْم অর্থ– বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা। নবী করীম (স) হলেন– خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ; সেহেতু তিনিই তাঁদের শেষে এসেছেন।

৫. এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন লিখেছেন, খাতম তথা খাতামুন নাবিয়্যীনের অর্থ The last of the prophets তথা নবী রাসূলগণের শেষ।

৬. বুখারী শরীফে এসেছে, রাসূল (স)-এর অন্যতম নাম খাতিম। এর অর্থ হলো– যার আগমনে তথা যার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে।

৭. ইমাম কুরতুবী (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেন। যথা–

ক. অধিকাংশ আলেমই خَاتِم-এর تَاء বর্ণে যেরযোগে পাঠ করেছেন। যার অর্থ হলো– তিনি তাদেরকে সমাপ্ত করেছেন।

খ. কারী আসেম تَاء বর্ণে যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। এর অর্থ হলো– নবীগণকে তাঁর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে।

৮. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দীন ফিরোজাবাদী, ইমাম জুবাইদী প্রমুখ خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তি।

مَعْنَى خَتْمِ النُّبُوَّةِ اِصْطِلَاحًا :

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 'খতমুন নবুয়ত'-এর মর্ম হলো ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আর কোনো ব্যক্তির কোনো ইসমাত তথা অভ্রান্ততা এবং কাদাসাত তথা পবিত্রতা ও বিশেষ পদমর্যাদা নেই একথা স্বীকার করা।

২. اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ গ্রন্থকার ড. মুয্যাম্মিল আলী (র) বলেন–

خَتْمُ النُّبُوَّةِ هُوَ اَنْ يُؤْمِنَ عَلٰى اَنَّ اٰخِرَ الْاَنْبِيَاءِ وَخَاتَمَ الرِّسَالَاتِ هُوَ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ (صـ) حَيْثُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ خَتَمَ بِهٖ سِلْسِلَةَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ـ وَكُلُّ مَنِ ادَّعٰى بِالنُّبُوَّةِ بَعْدَهٗ فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ الدَّجَّالِيْنَ وَالْكَذَّابِيْنَ ـ

অর্থাৎ, خَتْمُ النُّبُوَّةِ হলো হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে এভাবে বিশ্বাস করা যে, নবুয়ত ও রিসালাতের দ্বার তাঁর দ্বারা বন্ধ হয়েছে। আর যারা তার পর নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী।

মোদ্দাকথা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি টেনেছেন, তাই ইসলামের পরিভাষায় خَتْمُ النُّبُوَّةِ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

الْأَدِلَّةُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ :

খতমে নবুয়তের পক্ষে কুরআন হাদীসের দলীল : خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন–

ক. কুরআনের বাণী :

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।

খ. হাদীসের বাণী : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো– وَخُتِمَ بِىَ النُّبُوَّةُ অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَه نَبِىٌّ وَاِنَّه لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ-

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন।

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন– اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّه لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلَا نَبِىَّ-

অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আমার পর আর কোনো রাসূল এবং নবী নেই।

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ-

অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হয়ে বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন–

اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِى الْكُفَّارَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَه نَبِىٌّ-

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আমি আহমাদ এবং আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি حَاشِر তথা একত্রকারী, আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামত দিবসে মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি عَاقِب তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

গ. دَلِيْل عَقْلِى **তথা যৌক্তিক দলীল :** বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যদি কোনো ঘোষণা নাও থাকত, তাহলেও কয়েকটি কারণে আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে শেষনবী হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। যেমন–

১. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরে অন্য নবী বা রাসূল আগমন করবেন। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী মানুষদেরকে জানাবেন। যেমন সূরা সফ-এ ঈসা (আ)-এর বক্তব্য– وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ;

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসের কোথাও বলা হয়নি যে, তাঁর পরে মানবজাতির মধ্যে কোনো নবী রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন।

২. পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং তাঁদের শিক্ষা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। এজন্য তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দীনের পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন এবং দাওয়াত ছিল নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি অহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দিত; কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। কাজেই এরপর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

١ـ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

٢ـ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

٣ـ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

٤ـ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ

٥ـ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

এভাবে পবিত্র কুরআন ও সকল হাদীসের কিতাবে অসংখ্যবার হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত সম্পর্কে সত্যায়নপূর্বক বলা হয়েছে, তিনিই শেষনবী, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। এমনকি তাঁর পরে যারাই নবুয়তের দাবি করবে, তারা দাজ্জাল ও চরম মিথ্যাবাদী।

কুরআন হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং ঐক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে, রাসূল (স)-এর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষনবী। একইরূপে ইজমা রয়েছে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, অলী, বুযুর্গ ও গোটা মুসলিম উম্মার। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

⊃ دَعَاوِى مُنْكِرِى خَتْمِ النُّبُوَّةِ :

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দাবিসমূহ : কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যারা মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, তারা কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছে। যেমন–

১. وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ অত্র আয়াতের ব্যাপারে তারা বলে, এতে নবীদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ-এর অর্থ হলো– নবীদের শ্রেষ্ঠ। এ আয়াত দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি উদ্দেশ্য নয়।

২. তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো, অন্য নবীর কাছ থেকে আল্লাহ যেরূপ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, নবী মুহাম্মাদ (স)-এর থেকেও একইরূপে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। আর তা হলো, পরবর্তীতে আগত নবীর ওপর ঈমান আনয়নপূর্বক তাঁকে সাহায্য করা। তাদের দলীল হলো– وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ; অতএব বোঝা গেল, নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়নি।

৩. اَلْخَاتَمُ অর্থ হলো– اَلْمَهْرُ অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) মানুষের মনে মোহরাঙ্কিত করেছেন। আর মোহর অঙ্কনকারী শুধু তিনি একাই।

৪. আয়াতে اَلنَّبِيّٖنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তসহ আগমনকারী নবী। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা اَلْاَنْبِيَاءُ ذُو الشَّرِيْعَةِ বন্ধ হয়েছে; কিন্তু সাধারণ নবীদের আগমন বন্ধ হয়নি।

৫. اَلْخَاتَمُ অর্থ– اَلْاَفْضَلُ তথা শ্রেষ্ঠ। হযরত মুহাম্মাদ (স) শ্রেষ্ঠ নবী; কিন্তু শেষনবী নন।

⊃ اَلرَّدُّ عَلٰى دَعَاوِىْ مُنْكِرِىْ خَتْمِ النُّبُوَّةِ :

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর অস্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন : خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারকারীরা পবিত্র কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়ে দলীল পেশ করেছে। তাদের দলীলগুলোর প্রত্যুত্তর নিম্নরূপ–

১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রথম দাবি অযৌক্তিক। কারণ সকল অভিধানবেত্তার ঐকমত্যে خَتْم শব্দটিতে সর্বশেষ, সমাপ্তি ও চূড়ান্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ তারা শ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করেছে, যা ইজমা বিরোধী। সুতরাং তা অগ্রহণযোগ্য।

২. তাদের দ্বিতীয় দাবি পূর্ববর্তী নবী এবং মুহাম্মাদ (স)-এর একই প্রতিশ্রুতি। এ দাবি خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর সাথে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। কারণ সকল নবী থেকে দাওয়াত, তাবলীগ ও বিধানাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল।

৩. কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণের সামনে তাদের একটি দলীলেরও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না; বরং এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার দলীল। অতএব خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বারাই হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তি। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না। তথাপি যারা নবী হওয়ার দাবি করবে তারা দাজ্জাল, চরম মিথ্যাবাদী, মুরতাদ ও কাফের বৈ আর কিছুই নয়। যারা এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে বিশ্বাস করবে, তারাও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারকারী হিসেবে কাদিয়ান নামক স্থানের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

⊃ نَشْأَةُ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارُهَا :

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) وَانَّهُ سَيَكُوْنَ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلاَثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ -

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া। বাস্তবে তাই ঘটেছে। কারণ তাঁর ওফাতের পরপরই হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের সময় ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসায়লামাতুল কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা ও সাজাহ প্রমুখ।

এরাই خَتْمُ النُّبُوَّةِ-কে অস্বীকারপূর্বক নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে। সাথে সাথে বিভিন্ন ভূখণ্ডে আরো কিছু ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং কঠোর হস্তে উক্ত ভণ্ডনবীদেরকে দমন করেন। এরপরও সময়ের আবর্তে বিভিন্ন ভূখণ্ডে خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারকারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে এদের মধ্যে অন্যতম হলো কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ । তিনি মির্জা গোলাম মোর্তজা ইবনে মির্জা আতা মোহাম্মদ। সে পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। মির্জা গোলাম আহমাদ ছিল মির্জা গোলাম মোর্তজার কনিষ্ঠ সন্তান। এই পরিবারটি ছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ও চাটুকার। মির্জা গোলাম মোর্তজা ইংরেজ সরকারের একজন বিশেষ অনুরাগভাজন ও অনুগত কৃতজ্ঞ জমিদার ছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের সেবায় আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে দেশ প্রেমিক আজাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পারিবারিক তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েকবার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি আরম্ভ করে।

এ লোকটিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারপূর্বক নিজেকে নবী বলে দাবি করে। বর্তমানে এর বেশকিছু অনুসারীও রয়েছে, এদেরকে ভারতীয় মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করার ফলে এ বিভ্রান্ত ও মুরতাদ দলটি কিছুটা প্রসারিত হয়।

বিভিন্ন দেশে এদের তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন অমুসলিম দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের কেন্দ্রীয় অফিস ইসরাঈলে অবস্থিত। তবে মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা ও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরানসহ অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রই এদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

৩. أَثَارُهَا فِىْ بَنْغَلَادِيْش :

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রভাব : বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশীয় স্বাধীনতার পূর্বে স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের মনমস্তিষ্ক থেকে জেহাদের স্পৃহা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা লক্ষ্য করল যে, প্রথমে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাস নষ্ট করতে হবে। এলক্ষ্যে ১৮ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিমদের মধ্য থেকেই একজন ভণ্ডনবী ও একজন ভণ্ড পীর মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ভণ্ডনবীর জন্য মির্জা গোলাম মোর্তজার পুত্র গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে মনোনয়ন করে এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজরা তাদের পক্ষে গণসমর্থন ও মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে শিকার করে নেয়। মির্জা গোলাম আহমাদ ক্রমান্বয়ে তিনধাপে নবী হওয়ার দাবি করে। প্রথমে ১৮৮০ সনে সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন দীনে মুবাল্লিগ তথা ধর্মপ্রচারক বলে ঘোষণা করে। ১০ বছর পর্যন্ত ধর্মপ্রচারকের নামে কাজ করতে থাকে। এরপর ১৮৯১ সনে মুবাল্লিগ পদ ত্যাগ করে সে নিজেকে মুজাদ্দিদ এবং প্রতিশ্রুত মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে এবং কাজ করতে থাকে। ১০ বছর পর ১৯০১ সনে আরো একটু এগিয়ে সে নবুয়তের দাবি করে। প্রথমে সে বুরুজী নবী, অতঃপর জিল্লী নবী, এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী ও শেষ নবী হওয়ার দাবি করে। এরপর থেকে তারা বাংলাদেশে তাদের ধর্মমত প্রচার ও প্রসার করতে থাকে। দেশের বিভিন্ন শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে কেন্দ্র কায়েম করে নানাধরনের পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। ঢাকার বখশিবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। তারা মুসলিমদের মুরতাদ বানানোর জন্য পাঁচটি পৃথক সংগঠনের নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেগুলো হলো–

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ, ২. মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়া, ৩. মজলিসে আতফালুল আহমদিয়া, ৪. লাজনা এমাইল্লা ও ৫. নাসেরাত। ঢাকাতে তাদের ৬টি কেন্দ্র এবং সারাদেশে তাদের ১২৩টির বেশি কেন্দ্র এ ধর্মমত প্রচার করছে।

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের অবস্থান : পথভ্রষ্ট এ দলটি নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার বখশিবাজারে এদের কেন্দ্রীয় অফিস রয়েছে। এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা বিভিন্ন স্থানে বামপন্থি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট চাপ অব্যাহত রেখেছে। প্রবল বিরোধিতার কারণে তাদের মিশন সফল হচ্ছে না এবং কখনো হবে না ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তাঁর পর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবে না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٩) : مَا الْمُعْجِزَةُ؟ اُذْكُرْ أَهَمَّ مُعْجِزَاتِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

■ প্রশ্ন : ২৯ ॥ মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

اَوْ۔ مَا هِيَ الْمُعْجِزَةُ؟ اُذْكُرْ بَعْضَ مُعْجِزَاتِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ وَقَعَتْ فِيْ حَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ۔

অথবা, اَلْمُعْجِزَةُ কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৭, '১১, '১৫]

اَوْ۔ مَا هِيَ الْمُعْجِزَةُ؟ وَلِمَنْ تَخْتَصُّ بِهِ الْمُعْجِزَةُ؟ ثُمَّ بَيِّنْ حَقِيْقَتَهَا مُفَصَّلًا۔ ثُمَّ اُذْكُرْ بَعْضَ مُعْجِزَةِ الرَّسُوْلِ (صـ) الَّتِيْ وَقَعَتْ فِيْ حَيَاتِهِ۔

অথবা, মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? অতঃপর মুজিযার হাকীকত বর্ণনা কর। অতঃপর রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় যেসব মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল, তার আংশিক উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত তথা নিদর্শন বা চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

⊃ مُعْجِزَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি اِعْجَاز থেকে গৃহীত। এটা বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ। যা ع۔ ج۔ ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থে এসেছে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِهِ۔

৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Miracle, Wonder ইত্যাদি।

মূলত মুজিযা শব্দটি اٰيَة তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ أَيْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُعْجِزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভূত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত।

২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوَى لِنُبُوَّتِهِ۔

অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. عِلْمُ الْكَلَامِ-এর পরিভাষায়–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ظَهَرَ مِنَ النَّبِىِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ۔

অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থপ্রণেতার মতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ النَّبِىِّ (صـ) تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা।

৫. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে– اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَأَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلٰى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنُبُوَّتِهِ অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে।

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। যেমন– ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা, ৫. নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি।

لِمَنْ تَخْتَصُّ بِهِ الْمُعْجِزَةُ :

মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট : মুজিযা কাদের জন্য নির্দিষ্ট, এ ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন– اَلْمُعْجِزَةُ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ অর্থাৎ, মুজিযা নবী রাসূলদের থেকে প্রকাশিত হয়, অন্য কারো থেকে নয়।

এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির একমত যে, মুজিযা নবী রাসূলগণের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা এগুলো তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। তাদের ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অসাধারণ ঘটনা তথা নিদর্শনকে মুজিযা বলা যায় না; বরং কারামত, ইসতিদরাজ ইত্যাদি বলা হয়। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন– وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ;

৩ حَقِيْقَةُ الْمُعْجِزَةِ :

মুজিযার তাৎপর্য : মুজিযার হাকীকত তথা তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও যুক্তিযুক্ত। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বাতিলের অযৌক্তিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ মুজিযার হাকীকতসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. **মুজিযা আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ :** আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ এবং আল্লাহর নির্দেশেই মুজিযা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যা বিভ্রান্ত মানুষের অন্ধকারের পর্দা দূর করে দিয়ে সত্যপথের দিশা দান করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ۔

২. **ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব :** এক শ্রেণির মানুষ বিশ্বাস করত, পৃথিবী প্রকৃতির নিয়মে চলছে। মুজিযা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব দিয়েছে। প্রকৃতি মহান আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিতে অলৌকিকত্ব বা ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

٢۔ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتٰبٌ۔

৩. **আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পালন :** কাফেররা নবীগণকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বললে তাঁরা বলতেন– وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ তথা মুজিযা উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়।

৪. **নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রমাণ :** নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মুজিযার মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করেন, এতে মানুষের ঈমান মযবুত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَائَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔

অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শপথপূর্বক বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন দেখানো হয়, তাহলে তারা ঈমান আনয়ন করবে।

٢۔ فَاْتُوْا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ۔

অর্থাৎ, তোমরা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আস।

৫. **দাওয়াতী কাজের সহায়তা :** নবী রাসূলগণ আল্লাহপ্রদত্ত দীনের দাওয়াতী কাজ করতে গেলে কঠিন প্রতিকূলতার স্বীকার হন। আল্লাহ তায়ালা তখন مُعْجِزَة-এর মাধ্যমে তাদের দাওয়াতী কাজে সাহায্য করেন। এমনকি তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করে সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ۔

৬. **বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা :** নবীগণকে শত্রুদের চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করতে আল্লাহ মুজিযা প্রদান করেন। তাঁরা এ মুজিযার মাধ্যমে কাফেরদের মোকাবেলা করেছেন। যেমন মুসা (আ) ফিরাউনের যাদুর ওপর মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوْسٰى فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى۔

৭. **আবেদন পূরণ করা :** অমুসলিমরা কোনো বিষয়ের প্রমাণ চাইলে কিংবা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার আবেদন করলে আল্লাহ নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মুজিযা

প্রদর্শনের মাধ্যমে কাফের মুশরিকদের আবেদন পূরণ করেন। যেমন আল কুরআনে এসেছে–

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔

এমনকি এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করে একটি সূরা অবতীর্ণ করেন, যাতে তারা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং ঈমানদার হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

قُل رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيْهِمْ اِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَّلاَ تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا۔

৮. **ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ করা :** সকল যুগের মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণকে মুজিযা প্রদান করেছিলেন। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ۔

৯. **ভণ্ডনবী থেকে হেফাযত করা :** নবীগণকে মুজিযার মাধ্যমে ভুয়া নবুয়তী এবং ভণ্ডনবীর দাবি থেকে হেফাযত করা হয়েছে।

১০. **নবীগণের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ :** মুজিযা নবীগণের বিশেষ ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ। সাধারণ ও অবিশ্বাসী মানুষের যা সাধ্যের বাইরে, নবীগণের জন্য তা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধকে ভালো করা এবং নূহ (আ)-এর নৌকা ইত্যাদি।

بَعْضُ مُعْجِزَاتِ الرَّسُوْلِ (ص) :

রাসূল (স)-এর কতিপয় মুজিযা : রাসূল (স)-কে আল্লাহ অনেক আয়াত তথা মুজিযা দান করেছেন, যা ছিল সর্বজনীন, চিরন্তন এবং অন্যান্য নবী রাসূলের মুজিযা থেকে ব্যতিক্রম। এসব তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিলো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ۔

নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত কয়েকটি মুজিযা উল্লেখ করা হলো–

১. **আল কুরআন :** যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন। আর তা হলো, মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى۔ (طٰهٰ۔ ١٣٣)

অর্থাৎ, তারা বলে, সে (মুহাম্মাদ) তার রবের নিকট থেকে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? (সূরা ত্বহা : আয়াত-১৩৩)

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা অবগত হচ্ছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **ইসরা ও মিরাজ :** অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রধান মুজিযা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত। যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى۔

বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত ও জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন; তবে অধিকাংশের মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছে।

৩. **চন্দ্র খণ্ডিতকরণ :** মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية۔

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া, যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে, তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, হিজরতের পথে উম্মে মা'বাদ-এর ছাগল থেকে অস্বাভাবিক দুগ্ধ দোহন, খন্দকের পরিখা খননকালে পাথর থেকে এমন রশ্মি বের হওয়া যা রোম ও পারস্য পর্যন্ত আলোকিত করে দিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে, বাকশক্তিহীন কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চিরন্তন ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٠) : مَا الْمُعْجِزَةُ وَالْكَرَامَةُ؟ تَحَدَّثْ عَنْ عَشْرِ مُعْجِزَاتٍ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

■ প্রশ্ন : ৩০ ॥ মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ নবী ও রাসূলদের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা কারামত নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১ مُعْجِزَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি اِعْجَازٌ থেকে গৃহীত। এটা বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل এর-وَاحِد مُؤَنَّث এর সীগাহ। যা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থে এসেছে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِهِ۔

৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Miracle, Wonder ইত্যাদি।

মূলত মুজিযা শব্দটি اٰيَةٌ তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ أَيْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُعْجِزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভূত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত।

২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوَى لِنُبُوَّتِهٖ۔

অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. عِلْمُ الْكَلَام-এর পরিভাষায়- هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ظَهَرَ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থপ্রণেতার মতে-

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ النَّبِيِّ (صـ) تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা।

৫. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে- اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَأَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلٰى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنُبُوَّتِهٖ অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে।

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ.

ↄ كَرَامَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَرَامَةِ لُغَةً :

كَرَامَة-এর আভিধানিক অর্থ : كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, যা ك - ر - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা। আর ইংরেজিতে বলা হয়- Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি।

مَعْنَى الْكَرَامَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَلْكَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলে।

২. عِلْمُ الْكَلَام-এর দৃষ্টিতে কারামত বলা হয়- هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرُ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই কারামত; তবে শর্ত হলো ঐ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না।

৩. গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِىْ بِهٖ شَخْصٌ رَائِدُ الطُّلَّابِ

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে।

দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা–

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন– كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য।

ঠ عَشْرُ مُعْجِزَاتٍ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صـ) :

নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা : নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা অনেক মুজিযা দান করেছেন। নবী করীম (স)-এর মুজিযাগুলো সর্বজনীন, চিরন্তন এবং অন্যান্য নবী রাসূলের মুজিযা থেকে ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা এ সকল মুজিযা প্রকাশ করে মহানবী (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ মুজিযাসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিলো না। এগুলো ছিল মহানবীর প্রতি আল্লাহর একান্ত করুণা ও সম্মাননা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ـ

অর্থাৎ, তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে ভূগর্ভে কোনো সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং এদের কাছে কোনো নিদর্শন আনার চেষ্টা কর।

নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত দশটি মুজিযা উল্লেখ করা হলো–

১. **আল কুরআন :** যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন। আর তা হলো, মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ـ (طٰهٰ ـ ١٣٣)

অর্থাৎ, তারা বলে, সে (মুহাম্মাদ) তার রবের নিকট থেকে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? (সূরা ত্বহা : আয়াত-১৩৩)

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা অবগত হচ্ছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **ইসরা ও মিরাজ :** অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রধান মুজিযা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত। যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (ص) مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى۔

বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত ও জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন; তবে অধিকাংশের মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছে।

৩. **চন্দ্র খণ্ডিতকরণ :** মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية۔

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

৪. **তাবুক যুদ্ধে পানির ব্যবস্থা করা :** তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর নিকট থাকা পানি শেষ হয়ে গেলে তাঁরা মারাত্মকভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থার রাসূলুল্লাহ (স) মহান আল্লাহর করুণায় অলৌকিকভাবে পানির ব্যবস্থা করেন। এ পানি দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং অযুসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করেন।

৫. **বালু নিক্ষেপে শত্রুকে অন্ধ করে দেওয়া :** হিজরতের রাতে মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার ঘরের চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেলে। এমতাবস্থায় রাসূল (স) মহান আল্লাহর নির্দেশে এক মুঠো বালু নিক্ষেপ করলে ওৎপেতে থাকা শত্রুদের চোখে গিয়ে লাগে এবং তারা অন্ধ হয়ে যায়। আর রাসূল (স) নিরাপদে মদিনায় হিজরত করে চলে যান।

অনুরূপ ঘটনা বদর যুদ্ধের সময়েও ঘটেছিল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ, আর তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।

৬. **খেজুরের একটি গুচ্ছ হাতে চলে আসা :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন এক বেদুঈন তথা মরুচারী মহানবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, কিভাবে বুঝবো যে, আপনি প্রকৃত নবী? মহানবী (স) বললেন, এ খেজুর গাছটির ঐ খেজুর গুচ্ছকে যদি এখানে ডেকে নিয়ে আসি, তবে কি তুমি বিশ্বাস করবে ও সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল! অতঃপর রাসূল (স) আল্লাহর অনুমতিতে ঝুলন্ত খেজুর গুচ্ছকে কাছে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ খেজুরের একটি গুচ্ছ তাঁর হাতে চলে আসে। খেজুর গুচ্ছকে কিছুক্ষণ হাতে ধারণ করার পর রাসূল (স) পুনরায় বললেন, ফিরে যাও। সাথে সাথে খেজুর গুচ্ছটি খেজুর গাছে পূর্বের স্থানে চলে গেল। মহানবী (স)-এর এ মুজিয়া দেখে ঐ আরব্য বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।

৭. **কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়া :** হযরত বারা ইবনে আজিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমরা চৌদ্দশত লোক উপস্থিত ছিলাম। আমরা হুদায়বিয়ার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সেখানে খুব সামান্য পানির সন্ধান পেলাম। রাসূল (স) তখন কূপের নিকটে এসে কিছু পানি চাইলেন এবং এই পানি দ্বারা তিনি কুলি করে কূপে ফেললেন (অতঃপর কূপটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল)। এরপর আমরা কূপ থেকে পানি তুলে আমাদের সকলের তৃষ্ণা মিটালাম এবং আমাদের বাহনের পশুগুলোও তাদের তৃষ্ণা মিটালো।

৮. **সাহাবীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করা :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-এর দুই সাহাবী এক অন্ধকার রাতে তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তারা বললেন, তারা যখন তাদের গন্তব্যে যাচ্ছিলেন, তখন তাদের সামনে সামনে একটি আলো তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এটি ছিল রাসূল (স)-এর একটি অন্যতম মুজিযা।

৯. **গাছের কেঁদে উঠা ও তা বন্ধ হওয়া :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) প্রথম দিকে একটি গাছের সাথে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করা হলো, তখন তিনি গাছটি ছেড়ে মিম্বার থেকে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন। এতে গাছটি শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলে রাসূল (স) গাছটির কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে গাছটিকে শান্ত করেন তথা কান্না বন্দ করান।

১০. **এক পেয়ালা দুধ অনেকের পান করা :** একবার আবু হুরায়রা (রা) ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকলো। রাসূল (স) তাকে দেখে তার অবস্থা বুঝতে পেরে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রাসূল (স) বাড়িতে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় সামান্য কিছু দুধ দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? বাড়ির লোকজন উত্তর দিল, অমুক আপনাকে হাদিয়া দিয়েছে। রাসূল (স) আবু হোরায়রা (রা)-কে ডেকে বললেন, আহলে সুফফার সকলকে ডেকে আন। আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি মনে মনে বললাম, এতটুকু দুধ দ্বারা আহলে সুফফার কী হবে? আমিই এ দুধ পানের বেশি হকদার। আমি তা পান করলে শরীরে শক্তি পেতাম। অতঃপর যখন আহলে সুফফার লোকদেরকে ডাকা হলো এবং তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে তাদেরকে দুধ পান করানোর আদেশ দিলেন। আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব; কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। রাসূল (স) বললেন, এটি তাদেরকে দাও। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক এক করে সকলে তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। এভাবে আমি পেয়ালা নিয়ে সর্বশেষ রাসূল (স)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি দুধের পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, এখন আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! তিনি বললেন, বসে পড় এবং পান কর। আমি বসে পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, পান কর। আমি পান করলাম। তিনি এ কথা বলতে থাকলেন। অতঃপর আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে বাকি দুধ পান করলেন।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, হিজরতের পথে উম্মে মা'বাদ-এর ছাগল থেকে অস্বাভাবিক দুগ্ধ দোহন, খন্দকের পরিখা খননকালে পাথর থেকে এমন রশ্মি বের হওয়া যা রোম ও পারস্য পর্যন্ত আলোকিত করে দিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে, বাকশক্তিহীন কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা প্রমাণে অন্যতম মাধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়তি জীবনে অসংখ্য মুজিযা ঘটেছে। যা তার সর্বশেষ নবী ও রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

■اَلسُّؤَالُ (٣١) : عَرِّفِ الْإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ ـ ثُمَّ اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ اَنَّ مِعْرَاجَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الْيَقْظَةِ لَا فِى الْمَنَامِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৩১ ॥ 'ইসরা' ও 'মিরাজ' এর সংজ্ঞা দাও। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয়।** [ফা. প. ২০১৮]

او ـ عَرِّفِ الْإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ ثُمَّ اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ اَنَّ الْمِعْرَاجَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ ـ

অথবা, اِسْرَاء ও مِعْرَاج-এর সংজ্ঞা দাও এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। [ফা. প. ২০১০]

او ـ عَرِّفِ الْإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ وَمَتٰى وَقَعَ؟ ثُمَّ بَيِّنْ وَاقِعَةَ الْمِعْرَاجِ مُخْتَصَرًا ـ هَلِ الْمِعْرَاجُ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ؟

অথবা, اِسْرَاء ও مِعْرَاج-এর সংজ্ঞা দাও এবং তা কখন সংঘটিত হয়? অতঃপর মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় নাকি নিদ্রাবস্থায়?

او ـ مَا مَعْنَى الْمِعْرَاجِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاءِ؟ هَلِ الْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) كَانَ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ؟ بَيِّنْ بِالدَّلَائِلِ ـ

অথবা, মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ এবং ইসরার মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল (স)-এর মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, না ঘুমন্ত অবস্থায়? দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : হাজার বছর পর হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য। এটা ছিল তাঁর জীবনে সংঘটিত অন্যতম প্রধান মুজিযা। যা স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন।

⊃ اِسْرَاء-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْرَاءِ لُغَةً :

اِسْرَاء-এর আভিধানিক অর্থ : : اَلْإِسْرَاءُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার, যা س ـ ر ـ ى থেকে গৃহীত। এর অর্থ- سَيْرُ اللَّيْلِ তথা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। আর রাতের ভ্রমণকেই আরবি ভাষায় اِسْرَاء বলা হয়।

مَعْنَى الْاِسْرَاءِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْرَاء-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী পরিভাষায় ইসরা হলো–

وَالْاِسْرَاءُ سَيْرُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ـ

অর্থাৎ, ইসরা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর اَلْمَسْجِدُ الْحَرَام থেকে اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى পর্যন্ত ভ্রমণ।

২. কারো ভাষায়– اَلسَّفَرُ فِى اللَّيْلِ مِنْ مَكَّةَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

৩. ঐতিহাসিকগণ ও মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর অলৌকিক ঐতিহাসিক নৈশভ্রমণকেই إِسْـرَاء বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. ইসরা সম্পর্কে আল্লাহ সূরা বনি ইসরাঈলে ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الاية ـ

☾ مِعْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ لُغَةً :

مِعْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : مِعْرَاجٌ শব্দটি عُرُوْجٌ মাসদার থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ– ঊর্ধ্বগমন, উপরে ওঠা ইত্যাদি। এটি اِسْم اٰلَة-এর وَاحِد كُبْرٰى-এর সীগাহ। সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে। যথা–

১. ঊর্ধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. ঊর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা যানবাহন।

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ اِصْطِلاَحًا :

مِعْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়–

اَلْمِعْرَاجُ هُوَ عُرُوْجُ الرَّسُوْلِ اِلَى السَّمَاءِ حَيْثُمَا شَاءَ اللّٰهُ جَلَّ جَلاَلُهٗ ـ

অর্থাৎ, মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সান্নিধ্যে রাসূল (স)-এর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ صُعُوْدُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ اِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ فِى الْيَقْظَةِ ـ

৩. মিরাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ قَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) عُرِجَ بِشَخْصِهٖ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ حَيْثُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَاَكْرَمَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ بِمَا شَاءَ وَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ـ

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়। অতঃপর ঊর্ধ্বজগতের যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল, তা প্রদান করেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে।

☾ وَقْتُ وُقُوْعِ اُسْرِىَ النَّبِىُّ (صـ) :

মহানবী (স)-এর মিরাজ সংঘটনের সময়কাল : মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা তাবারী (র) বলেন, যে বছর নবী করীম (স)-কে নবুয়ত দান করা হয়, সে বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়।

২. নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নবুবী ও কুরতুবী (র) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. নবুয়তের দশম বছরে ২৭ রজব সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা মনসুরপুরী (র) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

৪. হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে, নবুয়তের দ্বাদশ বছর রমযান মাসে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে মহররম মাসে সংঘটিত হয়েছে।

৬. কারো মতে, রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে।

এভাবে ২০টিরও অধিক মত রয়েছে। নির্দিষ্ট একটি মতকে প্রাধান্য দেয়ার মতো কোনো একটি দলীল পাওয়া যায় না; তবে অধিকাংশ আলেম দশম বছর ২৮ রজব বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

⊃ وَاقِعَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مُخْتَصَرًا :

ইসরা ও মিরাজ-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন−

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে : ১. মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের অলৌকিক নিদর্শন إِسْرَاء ও مِعْرَاج সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাঈলে বলেন−

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মসজিদুল আকসা তথা জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত। যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময় তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। আর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২. অন্যত্র তিনি বলেন−

اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۔ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۔

অর্থাৎ, তিনি (মুহাম্মাদ স.) যা দেখেছেন, তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে (হযরত জিবরাঈল আ. কে) আরেকবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিলেন।

খ. হাদীসের আলোকে : মিরাজের ঘটনা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বিশজনের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ (স)-এর إِسْرَاء তথা মিরাজ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা নিম্নরূপ−

১. রাসূল (স) মক্কার মসজিদে হারাম থেকে বোরাকযোগে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছেন। এখানে নবী রাসূলগণের সাথে সালাত আদায় করেন।

২. বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর সহযোগিতায় বায়তুল মামুরে পৌছেন। এ পর্যায়ে নবী রাসূলগণের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং সাত আসমান অতিক্রম করেন।

৩. সেখান থেকে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছেন। এখানে তিনি আল্লাহর মহানিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট থেকে সালাতসহ অনেক উপহার অর্জন করেন। যেমন মুসলিম শরীফে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ : اَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ فَسَارَ بِىْ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا .... فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَقَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى اِسْتَحْيَيْتُ۔

ঘটনা প্রকাশ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, ভোরবেলায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রাতে পর্যবেক্ষণকৃত বড় বড় নিদর্শনের সংবাদ দেন। তখন তারা তাঁকে আরো কঠোরভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। তাঁরা বলে– اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ অর্থাৎ, এটা তো এক অদ্ভুত কাহিনী। এরপর তারা বর্ণনা জানতে চাইলে মহানবী (স) বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেন। পরে তাঁর বর্ণিত সবকথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়; কিন্তু তাঁরা কুফরী করতঃ তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এমনকি কাফেরদের মতো কতিপয় দুর্বল ঈমানদারও এ অসম্ভব ঘটনাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمِعْرَاجِ وَالْاِسْرَاءِ :

মিরাজ ও ইসরার মধ্যে পার্থক্য : মিরাজ ও ইসরার পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. আভিধানিক পার্থক্য : مِعْرَاجٌ শব্দটি مِفْعَالٌ-এর ওযনে اِسْم اٰلَة-এর وَاحِد ; নাসারা/ضَرَبَ বাবে মাসদার اَلْعُرُوْجُ; ع - ر - ج হলো مَادَّة। كُبْرٰى-এর সীগাহ। অর্থ– সিঁড়ি, ধাপ, উপরে উঠার যন্ত্রবিশেষ ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে–

ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اِلَى السَّمَاءِ۔

আর اِسْرَاءٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। মাদ্দাহ س - ر - ى ; জিনসে نَاقِص يَائِىْ ; অর্থ– রাতে ভ্রমণ করা। আল কুরআনে এসেছে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الخ۔

২. পারিভাষিক পার্থক্য :

১. مِعْرَاج-এর সংজ্ঞায় শরহে আকাইদ আন নাসাফী প্রণেতা বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ۔

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন– مَا اُعْرِجَ الرَّسُوْلُ (صـ) فِىْ لَيْلَةِ الْاِسْرَاءِ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন–

إِنَّمَا سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ لِصُعُوْدِ النَّبِيِّ (صـ) فِيْهَا إِلَى السَّمَاءِ۔

৪. কারো কারো মতে–

هُوَ إِسْرَاءُ النَّبِيِّ (صـ) مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ الْعُرُوْجُ إِلَى السَّمَاءِ۔

পক্ষান্তরে إِسْرَاء হলো–

اَلْإِسْرَاءُ سَفَرُ النَّبِيِّ (صـ) لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى بِبَرَكَةٍ خَاصَّةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِأَنْ يَّحْصُلَ عِلْمَ عَيْنِ الْيَقِيْنِ بِرُؤْيَةِ اٰيٰتِ اللّٰهِ۔

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا۔

৩. **স্থানগত পার্থক্য :** মিরাজের সূচনা হলো, মসজিদে আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আকাশ, অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আরশে আযীম পর্যন্ত। পক্ষান্তরে إِسْرَاء-এর সূচনা হলো, রাসূল (স)-এর হুজরা থেকে বায়তুল্লাহ অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।

সুতরাং মিরাজ হলো, উর্ধ্বজগতের সফর আর إِسْرَاء হলো, ভূপৃষ্ঠের সফর।

৪. **কার্যগত পার্থক্য :** مِعْرَاج-এ রাসূল (স) ঈমানের বিষয় যেমন– মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি বায়তুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহাসহ আল্লাহর অপার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিরাজি অবলোকন করেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালার মহান দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পক্ষান্তরে إِسْرَاء-তে রাসূল (স) মসজিদে আকসায় সকল নবী রাসূলের ইমাম হয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন এবং তাঁদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

৫. **আকিদাগত পার্থক্য :** إِسْرَاء কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আর مِعْرَاج সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এতদুভয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

هَلِ الْمِعْرَاجُ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ ؟

মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় না নিদ্রাবস্থায় : রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে নাকি নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ (صـ) وَعُرِضَ بِشَخْصِهٖ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلَى حَيْثُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى۔

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। নবীকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উর্ধ্বলোকে গমন করিয়েছেন।

একইভাবে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْعُلٰى حَقٌّ۔

অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর সশরীরে আকাশপানে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজ সংঘটিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেছেন ততটুকু উর্ধ্বলোকে গমন হওয়াটা সত্য।

দলীল : মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

ক. নকলী দলীলসমূহ : তারা স্বীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীল উপস্থাপন করেছেন।

১. মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

٢۔ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরিউক্ত দুটি আয়াতে বান্দা বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীতে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবি (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী– اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ অংশটি দ্বারা সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ عَبْد হলো, দেহ ও রূহ-এর সমষ্টি।

২. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١۔ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۔

٢۔ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۔

৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– ١۔ فَرَكِبْتُ فَسَارَ بِىْ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ

٢۔ رَكِبْتُ الْبُرَاقَ وَاَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ۔

এ দ্বারাও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল।

খ. আকলী দলীল : মিরাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা হকপন্থিদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো, কাফেররা স্বপ্নকে বিশ্বাস করত এবং বাস্তব জানত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এবং কিছু নওমুসলিম মিরাজ অস্বীকার করে এবং অসম্ভব বলে দাবি করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ হওয়ার কথা বলেছিলেন।

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল। তাঁদের দলীল–

ক. আল্লাহর বাণী- وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

খ. মুয়াবিয়া (রা) বলেন- كَانَتْ رُؤْيَا صَالِحَةً

গ. আয়েশা (রা) বলেন- مَا فَقَدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ (صــ) لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে হয়েছে।

তাঁদের দলীলের জবাব : ক. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে رُؤْيَا দ্বারা رُؤْيَا بِالْعَيْنِ তথা চাক্ষুষ দর্শন উদ্দেশ্য।

খ. মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসের উত্তর হলো এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ১০ বছর পূর্বে মিরাজ হয়েছিল।

গ. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো, তাঁর দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল।

৩. **দার্শনিকদের অভিমত :** দার্শনিকরা মিরাজকে কাল্পনিক ব্যাপার ও মিথ্যা বলেছেন। তাঁদের মতে, সশরীরে কোনো মানুষের পক্ষে উর্ধ্বগমন সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের যুক্তি : দার্শনিকগণ নিজেদের মতের সমর্থনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যথা-

১. আকাশে আরোহণের জন্য যে দ্রুতযানের প্রয়োজন ছিল সে যুগে এরূপ কোনো যানবাহন ছিলো না। অতএব মিরাজ আকাশপানে হওয়া অসম্ভব।

২. ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া ও পুনরায় জোড়া লাগা আবশ্যক। অথচ এটা অসম্ভব।

দার্শনিকদের দলীলের জবাব :

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে তাঁদের যুক্তির জবাবে বলা হয়, সে যুগে দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন ছিলো না; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত বোরাক ছিল বিদ্যুতের চেয়েও অধিক গতিসম্পন্ন।

২. দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা যায়, আকাশ ফেটে যাওয়া আবার মিলিত হওয়া সম্ভব।

দলীল :

١- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-

٢- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

উপসংহার : اَلْاِسْرَاء তথা মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অনন্য মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলগণের যুগে ঘটেনি। আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ مَنْ رَدَّهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ অর্থাৎ, মিরাজের সংবাদ সত্য; যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত। ইসরা ও মিরাজ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٢) : بَيِّنْ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ رُؤْيَةِ الْبَارِىْ تَعَالٰى وَعِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعَ الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ ـ

■ **প্রশ্ন : ৩২ আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন কর।** [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদী হিসেবে খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্মদর্শনের উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। খারেজী, শিয়া, মুতাযিলা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকিদা তথা বিশ্বাস। নিম্নে প্রশ্নালোকে আল্লাহ তায়ালার দীদার ও ইসমাতুল আম্বিয়া সম্পর্কে তাদের আকিদাসমূহ তুলে ধরা হলো।

⊃ رُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى :

আল্লাহ তায়ালার দীদার তথা দর্শন : মহান আল্লাহর দীদার তথা দর্শনের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে, পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে। জান্নাতবাসীগণ তাঁকে হাশরের ময়দান এবং জান্নাত উভয় স্থানেই দেখতে পাবেন। কাফের ও মুশরিকরা শুধু হাশরের ময়দানে ভয়ভীতির মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা স্বীয় রবের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীদার তথা দর্শন সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ করেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ـ

অর্থাৎ, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন- لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ অর্থাৎ, যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য উত্তম বস্তু তথা জান্নাত এবং অতিরিক্ত আরো কিছু রয়েছে। (সূরা ইউনুস : আয়াত- ২৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'অতিরিক্ত আরো কিছু' বলতে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে তাকানোকে বোঝানো হয়েছে। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, "যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে, ওহে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা সবাই বলবে, সে প্রতিশ্রুতি কী? তিনি কি আমাদের ওজনের পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আগুন

থেকে কি নাজাত দেননি? ঠিক এমন সময় আল্লাহ পর্দা উন্মোচন করবেন, তখন তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ সময় তারা মনে করবে, তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় অপর কোনো বস্তু তিনি তাদের দেননি, এটিই হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত সে 'যিয়াদা' তথা 'অতিরিক্ত বস্তু'। জান্নাতিগণ এ সময় আল্লাহকে দেখতে পেলেও জাহান্নামিরা তখন আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ, কস্মিনকালেও নয়, সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন হতে প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকবে। (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত- ১৫)

ইমাম শাফেয়ী (র)-সহ অন্যান্য ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন।

জান্নাতবাসীদের আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন-

إِنَّكُمْ سترون رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا. لا تَضَامُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ-

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে চক্ষু দিয়েই এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে কোনো অসুবিধা অনুভব করো না। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জাহান্নামিদের হাশরের ময়দানে আল্লাহকে দেখার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, "যেদিন আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করার কথা সেদিন তোমাদের একজন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না, কোনো অনুবাদকও অনুবাদ করার জন্য থাকবে না। তখন তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট এমন রাসূল প্রেরণ করিনি, যিনি তোমাকে দীনের কথা শোনাতেন? তখন সে বলবে হ্যাঁ, আপনি পাঠিয়েছেন"। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেদিন আল্লাহর সাথে প্রত্যেকের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা এসে উপস্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৯৫)

উপরিউক্ত হাদীস এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সময়ে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তবে কাফেরদের এ দেখাটি হবে ভয়ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে।

⊃ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ فِىْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى :

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত : আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে দেখার ব্যাপারে সাহাবীগণ থেকে প্রায় ত্রিশটির মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহকে দেখা যাওয়া সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেকটা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছা সত্ত্বেও তা মুতাযিলা, জাহমিয়া, খারেজী ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট গোপন রয়েছে। তাই তারা তা অস্বীকার করে বলেছে, আল্লাহকে হাশরের মাঠে এবং জান্নাতে কোথাও দেখা সম্ভবপর নয়। তারা তাদের দাবির সপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে- رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِى অর্থাৎ, মুসা (আ) বলেন, প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ বলেন, তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ১৪৩)

এ আয়াত দ্বারা দলীল দিয়ে তারা বলেন, এখানে لَنْ অব্যয়টি স্থায়ী নিষেধের অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তা পরকালেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হওয়ার বিষয় প্রমাণ করে। তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকে– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ, আল্লাহকে কোনো চক্ষু দেখতে পারে না, অথচ তিনি সকল চক্ষুকে দেখতে পারেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ১০৩)

اَلرَّدُّ عَلٰى رَأْىِ الْمُعْتَزِلَةِ :

তাদের যুক্তি খণ্ডন : এ আয়াত দুটিকে মুতাযিলারা তাদের মতের পক্ষের দলীল মনে করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে তাদের বিপক্ষ মতেরই দলীল রয়েছে। প্রথম আয়াতটি দ্বারা বিপক্ষ মতের দলীল কয়েকভাবে পেশ করা যায়। যেমন–

১. হযরত মুসা (আ) কর্তৃক আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে মুসার মতো জলীলুল কদর রাসূলের কাছে তা গোপন থাকতো না এবং তিনি তা চাইতেনও না।

২. আল্লাহকে দেখা যদি একেবারেই অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ)-এর আবেদনকে ঠিক সেভাবেই প্রত্যাখ্যান করতেন যেভাবে নূহ (আ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর ছেলের নাজাতের ব্যাপারে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সূরা হুদ : আয়াত- ৪৯)

৩. মুসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে মহান আল্লাহ সরাসরি এ কথা বলেননি যে, আমাকে দেখা যায় না বা আমাকে দেখা বৈধ নয় বা আমি দেখার যোগ্য নই; বরং আল্লাহ বলেন– لَنْ تَرَانِىْ অর্থাৎ, আমাকে কস্মিনকালেও তুমি দেখতে পাবে না। এতে প্রমাণিত হয়, মানবীয় দুর্বলতার কারণে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পারবে না বলেই মহান আল্লাহ মুসা (আ)-কে এ কথা বলেছেন। আল্লাহকে যে একেবারেই দেখা অসম্ভব, সেজন্য তিনি এ কথা বলেননি।

৪. মানবীয় দুর্বলতাই যে এর পথে মূল অন্তরায়, তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ মুসা (আ)-কে বললেন, পাহাড়ের দিকে তাকাও। তা এত শক্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর তাজাল্লির সামনে যদি নিজ অবস্থায় থাকতে না পারে, তাহলে তুমি পাহাড়ের তুলনায় অতীব দুর্বল মানুষ হয়ে আমাকে কিভাবে দেখতে পাবে?

৫. পাহাড়ের মতো নির্জীব পদার্থের সামনে আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ করা যদি বৈধ হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অলীদের সামনে জান্নাতে তাঁর প্রকাশ হওয়া কেন অবৈধ হবে?

৬. لَنْ অব্যয়টি সবসময় নিষেধের অর্থ প্রকাশ করে বলে তারা যে দাবি করেছেন, দুটি কারণে তা সঠিক নয়–

ক. যদি তা সে রকম হতো, তাহলে সে নিষেধকে কোনো বস্তু অর্জিত হওয়া বা নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখার সাথে এর নিষেধকে সীমাবদ্ধ করা যেতো না; অথচ তা কুরআনে সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ-

অর্থাৎ, পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহ আমাকে কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কস্মিনকালেও আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। (সূরা ইউসুফ : আয়াত- ৮০)

এ আয়াতের মধ্যে لَنْ অব্যয়টি পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহর নির্দেশ অর্জনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, لَنْ অব্যয়টি কোনো পূর্বলক্ষণ ব্যতীত সবসময় চিরস্থায়ী নিষেধজ্ঞাপক অর্থ প্রকাশ করে না।

খ. মহান আল্লাহকে দেখা যদি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার হতো, তাহলে আল্লাহ মুসা (আ)-কে বলতেন, আমাকে দেখা যায় না; কিন্তু তা না বলে যখন বলেছেন, "আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না", এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে দেখা একটি সম্ভবপর ব্যাপার, তবে তা এ পার্থিব জগতে সম্ভব না হলেও পরকালে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আর সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দর্শনকে জান্নাতে মুমিনদের জন্য প্রমাণ করে বলেন- تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ অর্থাৎ, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সাদর সম্ভাষণ হবে সালাম। (সূরা আহযাব : আয়াত- ৪৪)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জান্নাতে মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে, আর সাক্ষাৎ হলে দেখাও হবে। কেননা দেখাবিহীন সাক্ষাৎ বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়া এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ এ আয়াতটি প্রশংসামূলকভাবে বলেছেন। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রমাণিত কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রশংসা করা হয়ে থাকে। যে বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত নয়, তার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই, সেজন্য তা দিয়ে কোনো প্রশংসা করা যায় না। আল্লাহ যখন এ আয়াতটি প্রশংসার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, তিনি এর দ্বারা এটাই বলতে চেয়েছেন যে, তিনি এমন যে, তাঁকে দেখা গেলেও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাঁকে কেউ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবে না।তাছাড়া এ আয়াত দ্বারা তাদের দলীল পেশ করা সঠিক হয়নি এজন্য যে,

আভিধানিক দিক থেকে إِدْرَاك শব্দটি رُؤْيَة তথা দেখার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয় না; বরং তা কেবল احَاطَة তথা বেষ্টন করার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়। সে অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয় চক্ষু তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না, যদিও তাকে দেখতে পারে। এটা এজন্য বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এ কথাটি প্রশংসামূলক অর্থে বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহর প্রশংসা সাধারণত প্রমাণিত গুণাবলি দ্বারা হয়ে থাকে; অপ্রমাণিত ধরনের গুণাবলি দ্বারা নয়। কেননা তা আল্লাহর গুণের পূর্ণতার অর্থ বহন করে না, সেজন্য তা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাও করা যায় না। কাজেই উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- তাঁকে দেখা যাবে; তবে তাঁকে কেউ বেষ্টন করতে পারবে না। তাঁকে দেখেও কারো পক্ষে তাঁকে বেষ্টন করতে না পারার মধ্যেই তার পূর্ণতা নিহিত। সম্পূর্ণ না দেখার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই।

৩ عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ :

নবী (আ)-গণের নিষ্পাপ হওয়া : عِصْمَة শব্দটি ع - ص - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংরক্ষণ করা, নিষ্পাপ, নিষেধ করা, হেফাযত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি। এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ; আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাঁরা আল্লাহর দীনের অনুসারী ছিলেন

এবং সকল উম্মতকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং নিষ্পাপ ছিলেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

اَلْاَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ. وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيْئَاتٌ.

অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্খলন ও ভুলত্রুটি তাঁদের ঘটেছে।

এখানে ইমাম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন– ১. নবীগণের ওপর ঈমান। ২. সকল নবী আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ এবং সকল নবী রাসূলই আল্লাহর প্রিয়বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়নপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

এতে বোঝা যায়, কেবল বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ

আর নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ মানবজাতিকে নবী রাসূলগণের اِتِّبَاع তথা অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

١. كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ.

٢. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

৩ : اِخْتِلَافٌ فِىْ عِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ مَعَ الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ

ইসমাতুল আম্বিয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য ও বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত খণ্ডন : মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী রাসূলগণ নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে শিরক, কুফর ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র। এ ঐকমত্য ইজমা পর্যায়ের। তবে তাঁদের থেকে সগীরা ও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্য বাতিলপন্থির মাঝে মতভেদ লক্ষণীয়।

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** তাঁদের মতে, সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তবে যেসব সগীরা গুনাহ তাঁদের ব্যক্তিত্ববিধ্বংসী, সেগুলো থেকেও তাঁরা নিষ্পাপ।

দলীল : এ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশসমূহ নিম্নরূপ–

١. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

٢. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

٣. وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ.

২. **ফিকহুল আকবার গ্রন্থকারের অভিমত :** ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র।

দলীল : তাঁদের দলীল নিম্নরূপ–

١. وَالْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ يَعْنِىْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا.

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) সকলেই নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র।

উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে– وَلَمْ يَرْتَكِبِ النَّبِىُّ (صـ) صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ يَعْنِىْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোনো ধরনের পাপ করেননি।

৩. **মোল্লা আলী কারীর অভিমত :** আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তাঁর মেরকাত ফী শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন–

عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا .

অর্থাৎ, নবুয়তের পূর্বে বা পরে নবীগণ সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র।

৪. **ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত :** ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, নবীগণ থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি এটাকেই সঠিক মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন–

فَلَمْ يَمْكُنْ صُدُوْرُهُ (صُدُوْرُ الذَّنْبِ) مِنْهُ وَلَوْ صَغِيْرَةً قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَلَى الصَّوَابِ .

অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়; চাই তা সগীরা গুনাহ হোক না কেন।

৫. **মুফতি শফীর অভিমত :** মায়ারেফুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ শফী (র) লিখেছেন, চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৬. **মুতাযিলাদের অভিমত :** নবুয়তপূর্ব জীবনে নবী রাসূলগণ থেকে কোনো রকম কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাবে না। তবে সগীরা গুনাহ থেকে তাঁরা মুক্ত নন।

দলীল : তাদের দলীল প্রসঙ্গে ইমাম নাসাফী (র) বর্ণনা করেন–

لِاَنَّهَا تُوْجِبُ النَّفْرَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ اِتِّبَاعِهِمْ فَتَفُوْتَ مَصْلَحَةُ الْبِعْثَةِ . وَالْحَقُّ مَنْعُ مَا يَجِبُ النَّفْرَة كَعَهْرِ الْاُمَّهَاتِ وَالْفُجُوْرِ وَالصَّغَائِرِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخِسَّةِ .

অর্থাৎ, নবী রাসূলদের থেকে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেলে তাঁদের ব্যাপারে জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাঁদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে। ফলে তাঁদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাহত হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা তাঁদের জন্য আবশ্যক।

৭. **শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত :** শিয়া দার্শনিকদের মতে–

اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الْمَعَاصِىْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا عَلٰى سَبِيْلِ الْعَمَدِ وَالنِّسْيَانِ وَعَنْ كُلِّ رَذِيْلَةٍ وَمَنْقَصَةٍ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْخِسَّةِ وَالضَّعَةِ .

অর্থাৎ, নবী রাসূলগণ সকল প্রকার কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হবেন; অপরাধ থেকে মুক্ত, নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে; চাই তা ইচ্ছাকৃত

হোক অথবা ভুলক্রমে হোক। এছাড়াও সকল ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং ব্যক্তিত্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকেও তাঁরা পবিত্র হবেন।

৮. **হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত :** এসব বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় উপদলগুলোর মত হলো– اِنَّهٗ يَمْكُنُ صُدُوْرُ الْكَبَائِرِ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ عَمَدًا وَسَهْوًا অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে কবীরা গুনাহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

দলীল : ১. মহানবী (স) একবার সালাতে সূরা আন নজম পাঠ করতে গিয়ে পাঠ করে ফেললেন–

اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ـ تِلْكَ الْغَرَانِيْقَ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجٰى ـ

এ আয়াতে অনিচ্ছাকৃত হলেও মহানবী (স) কবীরা গুনাহ করে ফেলেন। কারণ দেবদেবী থেকে শাফায়াত প্রার্থনাকে তিনি স্বীকার করেন।

২. বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা কথা বলেন এবং এগুলো তিনি স্বীকারও করেন। অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা গুনাহের মূল– اَلْكِذْبُ اُمُّ الذُّنُوْبِ

৩. আল কুরআনে এসেছে, হযরত মুসা (আ) এক কিবতীকে চড় মেরে হত্যা করেছেন। অথচ কুরআনের বাণী হলো– وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ, মানুষ হত্যা মহাপাপ। অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন।

দলীলের জবাব :

১. সূরা নজমের ঐ সৃষ্ট আয়াতটি মূলত শয়তান আবৃত্তি করেছিল এবং রাসূলের স্বরকে নকল করে অবিকল মহানবীর মতো আবৃত্তি করে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

২. ইবরাহীম (আ) মূলত কোনো মিথ্যাই বলেননি; বরং এগুলো ছিল ইলমে বালাগাতের تَوْرِيَة তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. মুসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যা ছিল নবুয়তপূর্ব ঘটনা। আর নবুয়তের পূর্বে কবীরা গুনাহ ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত হত্যা।

কাজেই তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিমূলক; তা মেনে নেয়া যায় না।

উপসংহার : মুতাযিলা মতবাদ হচ্ছে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাতিল মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে চরম গোঁড়ামির পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। অপর পক্ষে হক্কানী ধর্মদর্শনের উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় তারা সর্বোতভাবে মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٣) : هَلْ يُمْكِنُ رُؤْيَةُ اللهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ؟ مَا رَأْىُ الْمُعْتَزِلَةِ فِىْ ذٰلِكَ؟ اُذْكُرْ رَأْيَهُمْ مَعَ اَدِلَّتِهِمْ وَالرَّدَّ عَلَيْهِمْ رَدًّا مُقْنِعًا ـ

■ প্রশ্ন : ৩৩ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব কিনা? এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত কী? তাদের দলীল ও দলীলের সন্তোষজনক জবাব উল্লেখপূর্বক তাদের মতামত উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর দীদার লাভই মুমিনের চরম ও পরম পাওয়া; তবে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য দুনিয়াতে সম্ভব না হলেও জান্নাতে অবশ্যই নসীব হবে। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা। তবে মুতাযিলারা এর বিরোধিতা করেছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ رُؤْيَةُ اللّٰهِ فِى الدُّنْيَا مُمْكِنٌ اَمْ لَا :

পৃথিবীতে মহান আল্লাহকে দেখা যাবে কিনা : মুসলিম উম্মাহর সকল মনীষীই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দুনিয়ায় থাকাবস্থায় কেউই স্বচক্ষে মহান আল্লাহকে দেখতে পায়নি এবং পাবেও না।

⊃ بَيَانُ رُؤْيَةِ اللّٰهِ فِى الْاٰخِرَةِ :

পরকালে আল্লাহকে দেখার বর্ণনা : এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে, পরকালে আল্লাহকে দেখা যাবে। জান্নাতবাসীগণ তাঁকে হাশরের ময়দান এবং জান্নাত উভয় স্থানেই দেখতে পাবেন। কাফের ও মুশরিকরা শুধু হাশরের ময়দানে ভয়ভীতির মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পাবে।
আয়াতে এসেছে– لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ অর্থাৎ, যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য উত্তম বস্তু তথা জান্নাত এবং অতিরিক্ত আরো কিছু রয়েছে।
(সূরা ইউনুস : আয়াত- ২৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'অতিরিক্ত আরো কিছু' বলতে আল্লাহর মুখমণ্ডলের দিকে তাকানোকে বোঝানো হয়েছে। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, "যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে, ওহে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা সবাই বলবে, সে প্রতিশ্রুতি কী? তিনি কি আমাদের ওজনের পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেননি, আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আগুন থেকে কি নাজাত দেননি? ঠিক এমন সময় আল্লাহ পর্দা উন্মোচন করবেন, তখন তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ সময় তারা মনে করবে, তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় অপর কোনো বস্তু তিনি তাদের দেননি, এটিই হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত সে 'যিয়াদা' তথা 'অতিরিক্ত বস্তু'। জান্নাতিগণ এ সময় আল্লাহকে দেখতে পেলেও জাহান্নামিরা তখন আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন– كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ, কস্মিনকালেও নয়, সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন হতে প্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকবে। (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত- ১৫)

ইমাম শাফেয়ী (র)-সহ অন্যান্য ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের জান্নাতে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন।

জান্নাতবাসীদের আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন–

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا. لَا تَضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ-

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে চক্ষু দিয়েই এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে কোনো অসুবিধা অনুভব করো না। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জাহান্নামিদের হাশরের ময়দানে আল্লাহকে দেখার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন, "যেদিন আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করার কথা সেদিন তোমাদের একজন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না, কোনো অনুবাদকও অনুবাদ করার জন্য থাকবে না। তখন তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট এমন রাসূল প্রেরণ করিনি, যিনি তোমাকে দীনের কথা শোনাতেন? তখন সে বলবে হ্যাঁ, আপনি পাঠিয়েছেন"। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেদিন আল্লাহর সাথে প্রত্যেকের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবে। এ ধরনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন– وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা এসে উপস্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম : আয়াত- ৯৫)

উপরিউক্ত হাদীস এবং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সময়ে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তবে কাফেরদের এ দেখাটি হবে ভয়ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে।

مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ فِىْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى :

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত : আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে দেখার ব্যাপারে সাহাবীগণ থেকে প্রায় ত্রিশটির মতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহকে দেখা যাওয়া সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেকটা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছা সত্ত্বেও তা মুতাযিলা, জাহমিয়া, খারেজী ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট গোপন রয়েছে। তাই তারা তা অস্বীকার করে বলেছে, আল্লাহকে হাশরের মাঠে এবং জান্নাতে কোথাও দেখা সম্ভবপর নয়। তারা তাদের দাবির সপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে– رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرَانِىْ অর্থাৎ, মুসা (আ) বলেন, প্রভু! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ বলেন, তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ১৪৩)

এ আয়াত দ্বারা দলীল দিয়ে তারা বলেন, এখানে لَنْ অব্যয়টি স্থায়ী নিষেধের অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তা পরকালেও আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হওয়ার বিষয় প্রমাণ করে। তারা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকে– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ, আল্লাহকে কোনো চক্ষু দেখতে পারে না; অথচ তিনি সকল চক্ষুকে দেখতে পারেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ১০৩)

اَلرَّدُّ عَلٰى رَأْىِ الْمُعْتَزِلَةِ ১ :

তাদের যুক্তি খণ্ডন : এ আয়াত দুটিকে মুতাযিলারা তাদের মতের পক্ষের দলীল মনে করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে তাদের বিপক্ষ মতেরই দলীল রয়েছে। প্রথম আয়াতটি দ্বারা বিপক্ষ মতের দলীল কয়েকভাবে পেশ করা যায়। যেমন–

১. হযরত মুসা (আ) কর্তৃক আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহকে দেখা সম্ভব। তা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে মুসার মতো জলীলুল কদর রাসূলের কাছে তা গোপন থাকতো না এবং তিনি তা চাইতেনও না।

২. আল্লাহকে দেখা যদি একেবারেই অসম্ভব হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ)-এর আবেদনকে ঠিক সেভাবেই প্রত্যাখ্যান করতেন। যেমন নূহ (আ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর ছেলের নাজাতের ব্যাপারে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সূরা হুদ : আয়াত- ৪৯)

৩. মুসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে মহান আল্লাহ সরাসরি এ কথা বলেননি যে, আমাকে দেখা যায় না বা আমাকে দেখা বৈধ নয় বা আমি দেখার যোগ্য নই; বরং আল্লাহ বলেন– لَنْ تَرَانِىْ অর্থাৎ, আমাকে কস্মিনকালেও তুমি দেখতে পাবে না। এতে প্রমাণিত হয়, মানবীয় দুর্বলতার কারণে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পারবে না বলেই মহান আল্লাহ মুসা (আ)-কে এ কথা বলেছেন। আল্লাহকে যে একেবারেই দেখা অসম্ভব, সেজন্য তিনি এ কথা বলেননি।

৪. মানবীয় দুর্বলতাই যে এর পথে মূল অন্তরায়, তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ মুসা (আ)-কে বললেন, পাহাড়ের দিকে তাকাও, তা যদি এত শক্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর তাজাল্লির সামনে নিজ অবস্থায় থাকতে না পারে, তাহলে তুমি পাহাড়ের তুলনায় অতীব দুর্বল মানুষ হয়ে আমাকে কিভাবে দেখতে পাবে?

৫. পাহাড়ের মতো নির্জীব পদার্থের সামনে আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ করা যদি বৈধ হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অলীদের সামনে জান্নাতে তাঁর প্রকাশ হওয়া কেন অবৈধ হবে?

৬. لَنْ অব্যয়টি সবসময় নিষেধের অর্থ প্রকাশ করে বলে তারা যে দাবি করেছেন, দুটি কারণে তা সঠিক নয়–

ক. যদি তা সে রকম হতো, তাহলে সে নিষেধকে কোনো বস্তু অর্জিত হওয়া বা নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখার সাথে এর নিষেধকে সীমাবদ্ধ করা যেতো না; অথচ তা কুরআনে সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ -

অর্থাৎ, পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহ আমাকে কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কস্মিনকালেও আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। (সূরা ইউসুফ : আয়াত- ৮০)

এ আয়াতের মধ্যে لَنْ অব্যয়টি পিতার অনুমতি অথবা আল্লাহর নির্দেশ অর্জনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, لَنْ অব্যয়টি কোনো পূর্বলক্ষণ ব্যতীত সবসময় চিরস্থায়ী নিষেধজ্ঞাপক অর্থ প্রকাশ করে না।

খ. মহান আল্লাহকে দেখা যদি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার হতো, তাহলে আল্লাহ মুসা (আ)-কে বলতেন, আমাকে দেখা যায় না; কিন্তু তা না বলে যখন বলেছেন, "আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না", এতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহকে দেখা একটি সম্ভবপর ব্যাপার, তবে তা এ পার্থিব জগতে সম্ভব না হলেও পরকালে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আর সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দর্শনকে জান্নাতে মুমিনদের জন্য প্রমাণ করে বলেন– تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ অর্থাৎ, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের সাদর সম্ভাষণ হবে সালাম। (সূরা আহযাব : আয়াত- ৪৪)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, জান্নাতে মুমিনদের সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে, আর সাক্ষাৎ হলে দেখাও হবে। কেননা দেখাবিহীন সাক্ষাৎ বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা আল্লাহর দর্শন সম্ভব হওয়া এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ এ আয়াতটি প্রশংসামূলকভাবে বলেছেন। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রমাণিত কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রশংসা করা হয়ে থাকে। যে বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত নয়, তার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই, সেজন্য তা দিয়ে কোনো প্রশংসা করা যায় না। আল্লাহ যখন এ আয়াতটি প্রশংসার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তাতে প্রমাণিত হয়, তিনি এর দ্বারা এটাই বলতে চেয়েছেন যে, তিনি এমন যে, তাঁকে দেখা গেলেও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় তাঁকে কেউ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবে না।

তাছাড়া এ আয়াত দ্বারা তাদের দলীল পেশ করা সঠিক হয়নি এজন্য যে, আভিধানিক দিক থেকে إِدْرَاك শব্দটি رُؤْيَة তথা দেখার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয় না; বরং তা কেবল إِحَاطَة তথা বেষ্টন করার অর্থ প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়। সে অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয় চক্ষু তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না, যদিও তাকে দেখতে পারে। এটা এজন্য বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এ কথাটি প্রশংসামূলক অর্থে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহর প্রশংসা সাধারণত প্রমাণিত গুণাবলি দ্বারা হয়ে থাকে; অপ্রমাণিত ধরনের গুণাবলি দ্বারা নয়। কেননা তা আল্লাহর গুণের পূর্ণতার অর্থ বহন করে না, সেজন্য তা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাও করা যায় না। কাজেই উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তাঁকে দেখা যাবে, তবে তাঁকে কেউ বেষ্টন করতে পারবে না। তাঁকে দেখেও কারো পক্ষে তাঁকে বেষ্টন করতে না পারার মধ্যেই তার পূর্ণতা নিহিত। সম্পূর্ণ না দেখার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, দিব্যচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা যাবে না; কিন্তু পরকালে জান্নাতে মুমিনগণ অবশ্যই আল্লাহর দেখা পাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٤) : اشْرَحْ وُجُوْبَ طَاعَةِ النَّبِيِّ (صـ) وَاتِّبَاعَهُ وَخُطُوْرَةَ مُخَالَفَتِهِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَالرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّتِهِ فِىْ ضَوْءِ الْاِيْمَانِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ (صـ) ـ

■ **প্রশ্ন : ৩৪ ॥ মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের আলোকে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা এবং তাঁর বিরোধিতা, অগ্রেগমন ও তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাওহীদের দ্বিতীয় শর্ত হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ কথাটি বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো, ইত্তিবায়ে রাসূল তথা রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের অপরিহার্যতা এবং বিরোধিতা, অগ্রেগমন ও তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উপস্থাপন করা হলো।

وُجُوْبُ طَاعَةِ النَّبِىِّ وَاتِّبَاعِهِ ❍ :

মহানবী (স)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা :

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে অপরিহার্যতা : কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে রাসূল (স)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্যের কোনো সুযোগ নেই। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণই হলো মুক্তি, সফলতা এবং হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদানপূর্বক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন–

১. **তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই ঈমানের আলামত :** এ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

২. **রাসূলের আদর্শই মুমিনের একমাত্র আদর্শ :** রাসূল (স)-এর আদর্শকে ঈমানদারের আদর্শ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

৩. **তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্যের শামিল :** রাসূল (স)-এর আনুগত্যই হলো আল্লাহর আনুগত্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ـ

৪. **তাঁর অনুসরণই মুক্তির পথ :** রাসূল (স)-এর অনুসরণকে মুক্তির পথ হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١ـ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

٢ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

٣. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا.

٤. مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

৫. **তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য আল্লাহর ভালোবাসার কারণ :** মহানবী (স)-এর আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

٢. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

৬. **অনুসরণ ও আনুগত্যের বিশেষ নির্দেশ :** আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

খ. **হাদীসের আলোকে নবীর আনুগত্যের অপরিহার্যতা :** কুরআনের ন্যায় অসংখ্য হাদীসেও রাসূল (স)-এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাতের পরিপূর্ণ এবং হুবহু অনুসরণই মুক্তির পথ, প্রতিদান, বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. **ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অল্প কর্মে বেশি প্রতিদান :** রাসূল (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করলে অল্প কর্মে বেশি প্রতিদান পাওয়া যায়। এমর্মে হাদীসে এসেছে–

عَمَلٌ قَلِيْلٌ فِىْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ فِىْ بِدْعَةٍ.

অন্যত্র রাসূল (স) আরো বলেন–

١. مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيْدٍ.

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন–

اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِمَا فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

২. **রাসূল (স)-কে ভালোবাসা ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত :** প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি রাসূল (স)-কে তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি সমস্ত মানুষ এমনকি তার জীবন থেকেও অধিক ভালোবাসবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

خُطُوْرَةُ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ :

নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

কুরআনের আলোকে নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূল (স)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য না করা আমল ধ্বংসের কারণ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ.

অনুরূপভাবে রাসূল (স)-এর কর্মের সামান্যতম ব্যতিক্রম বা তাঁর চেয়ে বেশি কিছু করাও ধ্বংসের কারণ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ -

সকল দ্বিধা, যুক্তি, তর্ক তথা ন্যূনতম বিরোধিতার ঊর্ধ্বে থেকে রাসূল (স)-এর সকল শিক্ষা ও বিধিনিষেধ এককথায় তাঁর সার্বিক জীবনাদর্শের অনুসরণ করাই মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। আর আনুগত্য ও অনুসরণ বর্জন করা কঠিন শাস্তির কারণ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُو اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

٢. وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَائَتْ مَصِيْرًا -

অন্য আয়াতে মুমিনদেরকে এরূপ শাস্তি ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয়, রাসূল (স)-এর কর্ম, শিক্ষা ও আদর্শের ব্যতিক্রম বা তাঁর পথের ব্যতিক্রম চলা কিংবা তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ।

হাদীসের আলোকে নবীর বিরোধিতার ভয়াবহতা : রাসূল (স) অনেক হাদীসে তাঁর আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁর আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ কোনো কর্মই কবুল করবেন না। তাঁর কর্মের বাইরে নব উদ্ভাবিত কর্ম বিভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন–

১. হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

অর্থাৎ, যদি কেউ এমন কর্ম করে যা আমাদের কর্ম নয়; তবে তার কর্ম (আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ -

৩. নিম্নোক্ত হাদীসে এসেছে, তাঁর আনুগত্য অস্বীকারকারী কিংবা বর্জনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন–

كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى. قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى -

৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ বিদয়াতিদের তওবার দরজা বন্ধ করেছেন। যেমন–

اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ -

৫. আলী (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন– وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا

اَلتَّقَدُّمُ عَلَى النَّبِىِّ وَالرَّغْبَةُ عَنْ سُنَّتِهٖ مَتْرُوْكٌ ❍ :

অগ্রেগমন ও তাঁর আদর্শের ব্যতিক্রম অগ্রহণযোগ্য : মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এজন্য হাদীস শরীফে অতিরিক্ত কর্ম বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন–

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন–

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ (صـ) يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا .... قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَ ..... لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ۔

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণের নিকট গিয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। তখন তাদের একজন বললেন, আমি সর্বদা সারারাত জেগে সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন, আমি সর্বদা রোযা রাখব এবং কখনো রোযা ভঙ্গ করবো না। আরেকজন বলল, আমি আজীবন নারী সঙ্গ পরিত্যাগ করব এবং কখনো বিবাহ করবো না। অতঃপর রাসূল (স) এলেন এবং এদের কথা জানতে পেরে বললেন ..... আমি মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখি আবার তা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় সালাত আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করি, স্ত্রীদের সময় দেই। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল, সে আমার দলভুক্ত নয়।

২. প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যখন ওসমান ইবনে মাযউন (রা) দাম্পত্য জীবন পরিত্যাগের চিন্তা করেন, তখন রাসূল (স) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন– يَا عُثْمَانُ اِنِّىْ لَمْ اُوْمَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ অর্থাৎ, হে ওসমান! আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেয়া হয়নি; তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ?

এভাবে অগণিত হাদীসের নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল (স)-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোনো রকম সংযোজন বিয়োজন, ইচ্ছা অনিচ্ছা, যুক্তি তর্কের কোনো সুযোগ নেই; বরং অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা, আনুগত্য, কর্ম, তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা সকল বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের কারণ। তাঁর সাহাবীগণের মতো হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণই প্রকৃত অনুসরণ। কারণ তিনিই হলেন আদর্শ মানুষ, শিক্ষক ও একমাত্র পরিপূর্ণ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

٢۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ۔

উপসংহার : সর্বোপরি বলা যায়, রাসূল (স)-এর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা হবে শর্তহীন ও সীমাহীনভাবে, অবনতমস্তকে এবং চূড়ান্তভাবে। যা ইসলামী বিশ্বাস তথা ঈমানের পূর্বশর্ত।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٥) : عَرِّفِ الصَّحَابَةَ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُوْدِ ـ ثُمَّ بَيِّنْ فَضْلَ الصَّحَابَةِ بِالتَّفْصِيْلِ ـ ثُمَّ اَثْبِتْ اِنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ ـ

■ প্রশ্ন : ৩৫ ॥ সাহাবীগণের সংজ্ঞা فَوَائِدُ الْقُيُوْد-সহ বর্ণনা কর। অতঃপর সাহাবীগণের মর্যাদা বিস্তারিত বর্ণনা কর। অতঃপর প্রমাণ কর যে, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাঁদের মাধ্যমেই দিগ্‌দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে। এমনকি তাঁদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তাঁরা ছিলেন عُدُوْل তথা উম্মতের আমানতদার এবং অনুকরণীয় আদর্শ।

১ الصَّحَابَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الصَّحَابَةِ لُغَةً :

الصَّحَابَة-এর আভিধানিক অর্থ : صَحَابَة শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَصْحَاب; এ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে صَحَابَة শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَحَابِى ব্যবহার হয়।

مَعْنَى الصَّحَابَةِ اِصْطِلَاحًا :

الصَّحَابَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন তাঁরাই সাহাবী।

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন–

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ (صـ) اَوْ رَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ

অর্থাৎ, যাঁরা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাই সাহাবী।

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন–

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ اَوْ رَاٰهُ وَلَوْ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهٖ ـ

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

كُلُّ مَنْ صَحِبَهٗ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً اَوْ رَاٰهُ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهٖ ـ

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে–

اَلصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ ـ

অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩ فَوَائِدُ الْقُيُوْد :

ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) সাহাবীর সংজ্ঞায় বলেন- اَلصَّحَابِى مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ (صد) مُؤْمِنًا بِه وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ এ সংজ্ঞার মাধ্যমে সাহাবীগণের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন উক্ত সংজ্ঞায় مَنْ لَقِيَهُ বাক্যটি দ্বারা সেসব লোক সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যারা তাঁর মজলিসে বেশি বা অল্প সময় সাক্ষাৎ করেছেন, চাই তাঁর থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করুক বা না করুক, তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক। আর যিনি তাঁকে একবার দেখেছেন অথচ মজলিসে বসতে পারেননি আর যিনি ওযরবশত তাঁকে দেখেননি তিনিও সাহাবী, যেমন- অন্ধ ব্যক্তি। তবে যে কাফের অবস্থায় তাঁকে দেখেছে; কিন্তু পরে মুসলিম হলেও দ্বিতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, সে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাহাবীর সংজ্ঞায় مُؤْمِنًا بِه-এর শর্ত দ্বারা সেসব লোক সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে; অথচ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। যেমন- আহলে কিতাব।

আর وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ এ শর্ত দ্বারা সে ব্যক্তিও সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যে মুমিন অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছে এরপর ঈমান থেকে বিমুখ হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ ও ইবনে খাতন; তবে তাঁরা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন যাঁরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে ফিরে এসেছেন, তাঁর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হোক বা না হোক এ ব্যাপারে উভয়ই সমান। এটাই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা।

৩ فَضْلُ الصَّحَابَةِ :

সাহাবীগণের মর্যাদা : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলভিত্তিই হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণ। তাঁরা ছিলেন নবী রাসূলগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের আকাশ ছোঁয়া মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. **পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সাহাবীগণের মর্যাদা :** পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সাহাবীদের মর্যাদার উপস্থাপনপূর্বক মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ অর্থাৎ, তাদের এ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে। এতে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ ছিলেন সকল নবীর উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে হাজার বছর পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

খ. **আল কুরআনে সাহাবীগণের মর্যাদা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সাহাবীগণের মর্যাদা নিম্নোক্ত পন্থায় আলোকপাত করা হয়েছে। যথা-

১. **সাহাবীগণের আত্মোৎসর্গের পরিচয় :** পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা এবং আত্মত্যাগের কথা উপস্থাপনপূর্বক তাঁদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে; তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২. **আল কুরআনে সকল সাহাবীর প্রশংসা :** রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল সাহাবীর প্রশংসা করতঃ তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৩. **আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের ঘোষণা :** বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার কথা বর্ণনাপূর্বক তাঁদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। যেমন আল কুরআনের বাণী–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

৪. **বিশেষ কিছু সাহাবীদের জান্নাতের সংবাদ :** বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١ـ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ

٢ـ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

৫. **ইবাদত বন্দেগির বর্ণনা :** সাহাবীগণ প্রতিটি মুহূর্তই মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং রুকু, সেজদার মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে قِيَامُ اللَّيْلِ তথা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١ـ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

٢ـ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ـ

৬. **চেহারায় ইবাদতের নিদর্শন :** আল্লাহর প্রিয়বান্দা সাহাবীগণের রুকু, সেজদা, অযু ইত্যাদি ইবাদতের চিহ্ন তাঁদের চেহারা মোবারকে ফুটে ওঠেছে। আমলের প্রভাব তথা নূরে তাঁদের চেহারা আলোকিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা এমর্মে বলেন– سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ;

৭. **সাহাবীগণের ইখলাস :** সাহাবীগণের ঈমান, ইবাদত ও তাবলীগে কোনো কুফর, নেফাক, লৌকিকতা ছিলো না। তারা সকল কর্ম, দান, ইবাদত একমাত্র আল্লাহর চূড়ান্ত সন্তুষ্টির জন্য করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ;

৮. **অন্যায়ের প্রতি কঠোর ও সত্যের প্রতি দুর্বল :** ইসলামের শত্রুগণের কুফরীর মোকাবেলায় তাঁরা ছিলেন আপসহীন ও বজ্রকঠোর এবং সত্যের নিকট তারা ছিলেন দুর্বল। সাথিগণের প্রতি উদার ও রহমতস্বরূপ। সকল ক্ষেত্রে অন্য ভাইয়ের সাথে আন্তরিকতা ও অগ্রাধিকার প্রদানের অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন সাহাবীগণ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔

٢. وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔

গ. **হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা :** অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. **সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত :** ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ (فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ) ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ۔

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁদের পরে তাদের পরবর্তীগণ এরপর তাঁদের পরবর্তীগণ অতঃপর মিথ্যা বিকাশ লাভ করবে।

২. **আমানতদার :** রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের আমানত। তাঁরা তাঁদের আমানত যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। যেমন হাদীসে এসেছে– اَصْحَابِىْ اَمَانَةٌ لِاُمَّتِىْ

৩. **মুজতাবা তথা নির্বাচিত :** তাঁদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন স্বীয় দীন ও রাসূল (স)-কে সাহায্য করার জন্য। যেমন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

فَاخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَنُصْرَةِ دِيْنِهٖ۔

৪. **জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী :** অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দশ জন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানপূর্বক ঘোষণা করেছেন–

اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنِ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ۔

৫. **রাসূল (স)-এর ভালোবাসার মানুষ :** সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দীনের সাহায্যকারী ও তাঁর অতিপ্রিয় পাত্র। তাই তাঁদের ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। যেমন আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন–

١. لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ۔

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) অথবা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।

٢. اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

৬. **অনুসরণীয় আদর্শ :** সাহাবীগণ মহান আল্লাহ ও স্বীয় রাসূল (স)-এর প্রতিটি বিধানকে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে থেকে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন– وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

এজন্য তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (স) বলেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ۔

কুরআন সুন্নাহর বর্ণনা থেকে সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত হয়, তার সারকথা হলো–

ক. মানবজাতির মধ্যে নবী রাসূলগণের পরেই সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে اَلْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ-এর শ্রেষ্ঠত্ব।

খ. অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে না, কারণ তা ঈমানের পরিপন্থি হবে।

৭. **হাদীসের আমানতদার :** রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পূর্ণ আমানতদার। তাঁরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

١. مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

٢. مَن يَّقُلْ مَا لَمْ اَقُلْ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ۔

ঘ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট তাঁদের মর্যাদা :

১. এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সাহাবীগণের প্রতি ইসলামী আকিদার বর্ণনা দিয়ে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَافْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ثُمَّ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ ... ـ عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ، نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيْعًا وَلَا نَذْكُرُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اِلَّا بِخَيْرٍ۔

অর্থাৎ, নবীগণের পরে মানবজাতির সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর সিদ্দীক, তারপর ওমর (রা)....। তাঁরা আজীবন আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন এবং সত্যের ওপর ও সত্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ভালোবাসি এবং অলী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা সাহাবীগণের কোনো একজন সাহাবীর বিষয়েও ভালো কথা ছাড়া কিছু বলি না।

২. ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

نُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) وَلَا نُفْرِطُ فِىْ حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُّبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ ـ وَلَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَاِيْمَانٌ وَاِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔

৩. ইসলামী আকিদার গ্রন্থ 'আল মুসামেরায়' বর্ণিত আছে যে- فَاعْتِقَادُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَزْكِيَةُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وُجُوْبًا অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকিদা হলো সকল সাহাবীগণকে দোষমুক্ত গণ্য করা ওয়াজিব।

اِثْبَاتُ عدالة الصحابة :

সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর عَدالَة তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন-

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ وَذٰلِكَ لِتَعْدِيْلِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَهُمْ وَلِشَهَادَةِ الْوَاقِعِ التَّارِيْخِ لَهُمْ۔

অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙে ফেলা। কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে ও প্রসার লাভ করেছে।

সাহাবীগণের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. আল কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে সাহাবীগণের عدالة প্রমাণিত হয়। যেমন-

١۔ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

٢۔ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

٣۔ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

٤۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ۔

٥۔ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى۔

২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মেলেনি; অথচ সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ প্রমাণ করে। তাঁদের সমাজের মানুষ এমনকি কাফেররাও তাঁদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন, এরপর আমরা কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তাঁরা জানতেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর সকল ইমাম ও আলেমের সর্বসম্মত মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ভাবা ও সমালোচনা করা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

■ **اَلسُّؤَالُ (٣٦) : مَنْ هُمُ الصَّحَابَةُ وَبِمَا يَعْرِفُوْنَ؟ وَمَا حُكْمُ تَنْقِيْدِهِمْ؟ بَيِّنْ مَعَ عَقَائِدِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالتَّفْصِيْلِ.**

■ **প্রশ্ন : ৩৬ ॥ সাহাবী কারা? কিভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যাবে? তাদের সমালোচনা করার বিধান কী? এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাঁদের মাধ্যমেই দিগ দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। এমনকি তাঁদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তাঁরা ছিলেন عُدُوْل তথা উম্মতের আমানতদার এবং অনুকরণীয় আদর্শ।

□ اَلصَّحَابَةُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الصَّحَابَةِ لُغَةً :

اَلصَّحَابَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : صَحَابَةٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَحَابِى; এ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি।

مَعْنَى الصَّحَابَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَلصَّحَابَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করতঃ তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন তাঁরাই সাহাবী।

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন– مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ (صـ) اَوْ رَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ অর্থাৎ, যাঁরা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাই সাহাবী।

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন–

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ اَوْ رَاٰهُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ.

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً اَوْ رَاٰهُ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهٖ.

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে– اَلصَّحَابِىُّ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

بِمَا يُعْرَفُ الصَّحَابَةُ :

কিভাবে সাহাবীগণের পরিচয় লাভ করা যাবে : যেসব ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন; তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। সাহাবীদের পরিচয় লাভের পদ্ধতি বর্ণনায় ড. মাহমুদ আত ত্বহান পাঁচটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **اَلتَّوَاتُرُ তথা মুতাওয়াতির পর্যায় :** সর্বজনস্বীকৃত মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে। যেমন– চার খলিফা, আশারায়ে মুবাশশারা, যাদের সাহাবী হওয়াটা مُتَوَاتِر পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এদের ব্যাপারে কোনো সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

২. **اَلشُّهْرَةُ তথা অধিক প্রসিদ্ধি :** সাহাবী এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং সাহাবী হিসেবে খ্যাত। যেমন– হযরত যিমাম ইবনে সালাবা, মুহকাশাহ ইবনে মুহসিন।

৩. **اِخْبَارُ الصَّحَابِى তথা সাহাবী কর্তৃক সংবাদ প্রদান :** কোনো সাহাবী কর্তৃক এভাবে সংবাদ প্রদান যে, অমুক ব্যক্তি সাহাবী ছিলেন। যেমন– হাম্মামা ইবনে আবি হাম্মাহ আদ দাওসী সম্পর্কে আবু মুসা আশয়ারী (রা) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন।

৪. **اِخْبَار ثِقَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ তথা নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর সংবাদ প্রদান :** কোনো নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী কর্তৃক সাক্ষ্য দেয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাহাবী ছিলেন।

৫. **شَهَادَةُ عَادِل তথা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য :** কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিজের পক্ষে এমর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সাহাবী অথবা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি; তবে উক্ত সাক্ষ্যদাতাকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

حُكْمُ تَنْقِيْدِ الصَّحَابَةِ :

সাহাবীগণের সমালোচনা করার বিধান : ১. সাহাবীগণের সমালোচনা করা নিষেধ। কুরআন হাদীসের আলোকে আহলে হকের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন–

١. قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِى لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ اَلخ (ترمذى)

অর্থাৎ, মহানবী (স) বলেন, সাবধান! সাবধান! আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর আমার সাহাবীদেরকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করো না। বস্তুত যে আমার সাহাবীদেরকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।

٢. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ গ্রন্থে বলেছেন– لَا نَذْكُرُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) اِلَّا بِخَيْرٍ অর্থাৎ, আমরা সাহাবীদের গুণ চর্চা করব, দোষ চর্চা করব না।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন– اِنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حَرَامٌ وَمِنْ اَكْبَرِ الْفَوَاحِشِ অর্থাৎ, সাহাবীদের গালি দেয়া হারাম এবং বড় অপরাধ।

৪. اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ-এর গ্রন্থকার বলেন– وَيَكُوْنُ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ (رضـ) اِلَّا الْخَيْرَ অর্থাৎ, সাহাবীদের আলোচনা করার সময় তাদের প্রশংসা ছাড়া অন্য আলোচনা হতে বিরত থাকবে।

৫. ইমাম আবু যুরয়া (র) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, সে কোনো সাহাবীর সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল (স) হক ও কুরআন হক। এ কুরআন ও হাদীস সাহাবায়ে কেরামই আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এ সূত্রপরম্পরাকে বিক্ষত করতে, যাতে পরিণামে পূর্ণ কুরআন সুন্নাহই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ এরা যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী।

৬. মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতে লিখেছেন, আমাদের কোনো কোনো আলেম স্পষ্টই বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে মন্দ বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

৭. ইবনে নুজাইম (র) اَلْاَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ গ্রন্থের سِيَر অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, কোনো কাফের যদি তওবা করে, তবে তার তওবা কবুল হবে; কিন্তু ঐ কাফেরদের তওবা কবুল হবে না, যারা কাফের প্রমাণিত হয়েছে নবী করীম (স)-কে মন্দ বলার কারণে। শায়খাইন (আবু বকর ও ওমর রা.)-কে মন্দ বলার কারণে কিংবা তাঁদের যে কোনো একজনকে মন্দ বলার কারণে, অথবা যাদু কিংবা নাস্তিকতার কারণে যারা কাফের হয়েছে, তাদের তওবা কবুল হবে না।

৮. কাযী আয়ায (র) বলেছেন, যে কোনো একজন সাহাবীকে মন্দ বলাও কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

৯. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা জঘন্যতম হারামের অন্তর্ভুক্ত।

১০. মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, এমন ব্যক্তির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

১১. তবে জমহুরের মাযহাব হলো, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না; তবে তাযীর করা হবে।

⊃ عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ :

সাহাবীগণ সম্পর্কে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আকিদা : সাহাবীগণ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার বর্ণনা দিয়ে ইমাম তাহাবী (র) شَرْحُ عَقِيْدَةِ الطَّحَاوِي গ্রন্থে বলেন–

وَنُحِبُّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) ولا نُفَرِّطُ فِيْ حُبِّ احدٍ مِّنْهُمْ ولا نتبرأُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ من يُّبْغِضُهُمْ وبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ ولا نَذْكُرُهُمْ الا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَاِيْمَانٌ وَاِحْسَانٌ وبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ونِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ-

অর্থাৎ, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণকে ভালোবাসি। তাঁদের কারো ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে বা ঘৃণা করে বা ভালোভাবে তাঁদের উল্লেখ করে না, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদের ভালো আলোচনাই করি। তাঁদেরকে ভালোবাসাই হলো দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর, নেফাক ও অবাধ্যতার নামান্তর।

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেমের সর্বসম্মত মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ভাবা ও সমালোচনা করা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল। অতএব যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত অনুসৃত নীতির বাইরে গিয়ে সাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হবে সে গোমরা, পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٧) : اُذْكُرْ اَقْوَال الْعُلَمَاء حَوْلَ عِصْمَة الْاَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالدَّلَائِل۔

■ প্রশ্ন : ৩৭ ॥ ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত প্রমাণসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১১]

اَوْ۔ مَا مَعْنَى النَّبِىِّ وَالرَّسُوْل وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ بَيِّنْ مَفْهُوْمَ الْاِيْمَان بِالْاَنْبِيَاءِ وَالرَّسُوْلِ مَعَ تَوْضِيْحِ عِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ۔

অথবা, নবী ও রাসূল অর্থ কী এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاء-এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখপূর্বক নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

اَوْ۔ مَنْ هُوَ الرَّسُوْلُ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِىِّ وَالرَّسُوْلِ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ فِىْ اِرْسَالِ الرُّسُلِ؟ بَيِّنْ بِالدَّلِيْل۔

অথবা, رَسُوْل কাকে বলা হয়? نَبِى ও رَسُوْل-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? রাসূল প্রেরণের রহস্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা দানের জন্য কিছুসংখ্যক মানবকে মনোনীত করে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে নবী বা রাসূল বলে। আল্লাহর রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান তথা ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম শর্ত। নবী রাসূলগণের পরিচয় এবং তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করার জন্যই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা।

➲ نَبِى-এর পরিচিতি :

مَعْنَى النَّبِىِّ لُغَةً :

نَبِى-এর আভিধানিক অর্থ : اَلنَّبِى শব্দটি نَبَأٌ ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. اَلنَّبَأُ তথা সংবাদ, খবর ইত্যাদি।

২. نَبَا ও أَنْبَا তথা সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো। শব্দটির শেষ অক্ষর হামযা এজন্য اَلنَّبِيْ হবে। শব্দটি মূলে ছিল اَلنَّبِئ; অত্যধিক ব্যবহারের কারণে হামযাটি পরিবর্তিত হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. আর نَبِى শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– অদৃশ্য জগতের দূত, সংবাদবাহক, সংবাদদাতা ইত্যাদি।

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন–

نَبَأُ الشَّىْءِ نُبُوَّةٌ لَمْ يَشْوِ فِىْ مَكَانِهِ الْمُنَاسِبِ لَهُ.

৫. اَلْقَامُوْسُ الْفِقْهِى গ্রন্থে এসেছে– اَلنَّبِيُّ هُوَ الرَّسُل

৬. অভিধানবেত্তাদের মতে– اَلنَّبِيُّ هُوَ الْمُخْبِرُ

৭. ইংরেজিতে বলা হয়– Prophet, Spokesman ইত্যাদি।

তবে শব্দটি বহুবচনে اَنْبِيَاء ও نَبِيُّوْن ব্যবহার হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ

مَعْنَى النَّبِيِّ اِصْطِلَاحًا :

نَبِى-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : نَبِى শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

مَنْ اُوْحِىَ اِلَيْهِ وَحْيًا خَاصًّا مِنَ اللّٰهِ بِتَوَسُّطِ مَلَكٍ اَوْ بِالْهَامٍ فِىْ قَلْبِهِ اَوْ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ.

অর্থাৎ, যিনি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে অথবা তাঁর অন্তরে ইলহামের মাধ্যমে অথবা সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অহীপ্রাপ্ত হন তিনিই নবী।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার নবীর সংজ্ঞায় বলেন– اَلْمُخْبِرُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩. কারো কারো মতে– اَنْ يَكُوْنَ مُخْبِرًا عَنِ اللّٰهِ بِاَحْكَامِهِ اَوْ سَفِيْرًا بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন তাঁকে নবী বলে।

৪. সর্বসম্মত মতানুসারে, যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোনো কিতাবপ্রাপ্ত হননি; বরং তাঁর পূর্ববর্তী শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহর বাণী প্রচার করেন তিনিই নবী।

◘ رَسُوْل-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الرَّسُوْلِ لُغَةً :

رَسُوْل-এর আভিধানিক অর্থ : رَسُوْل শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং فَعُوْل ওজনে اِسْم مَصْدَر-এর অন্তর্গত। এটা একবচন, বহুবচনে رُسُل; আভিধানিক অর্থ– প্রেরিত পুরুষ, সংবাদবাহক ও দূত।

১. لِسَانُ الْعَرَب অভিধানে اَلرَّسُوْل-এর অর্থ– اَلْمَبْعُوْث (প্রেরিত) লেখা হয়েছে।

২. اَهْلُ اللُّغَة অভিধানবেত্তাদের মতে– اَلرَّسُوْلُ هُوَ حَامِلُ الرِّسَالَةِ

৩. কেউ কেউ বলেন– اَلرَّسُوْلُ فِى اللُّغَةِ الْمُبَلِّغُ

৪. اَلرَّسُوْلُ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ- Messenger, Envoy ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

١. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ.

٢. قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

٣. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

مَعْنَى الرَّسُوْلِ اِصْطِلَاحًا :

رَسُوْل-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : رَسُوْل-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জমহুরের মতে, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্তবার্তা তথা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেন তিনিই রাসূল।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- مَن يَبْعَثُهُ اللّٰهُ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهٖ وَيُبَلِّغُهٗ অর্থাৎ, রাসূল হলেন যাঁকে আল্লাহ শরীয়ত সহকারে প্রেরণ করেছেন, যিনি সে শরীয়ত মতো আমল করেন এবং তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দেন।

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ.

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- هُوَ مَنْ اُوْحِىَ اِلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ وَبِتَنْزِيْلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল।

৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন-

اَلرَّسُوْلُ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ الصَّالِحِيْنَ نَبِيًّا ثُمَّ نَبَّأَهُ بِخَبْرِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يُّبَلِّغَ غَيْرَهُ.

৬. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ গ্রন্থকার বলেন-

اَلرَّسُوْلُ اِنْسَانٌ اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ بِشَرِيْعَةٍ وَاَمَرَهُ بِتَبْلِيْغِهَا لِلنَّاسِ.

اَلْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِىِّ وَ الرَّسُوْلِ ৩ :

নবী ও রাসূলের মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবী ও রাসূলের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

ক. আভিধানিক পার্থক্য : نَبِى শব্দটি نَبَأٌ থেকে صِفَة مُشَبَّهَة-এর সীগাহ; বহুবচনে نَبِيُّوْن ও اَنْبِيَاء ; যার অর্থ- সংবাদবাহক, দূত, আবির্ভূত হওয়া ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে- عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ;

আর رَسُوْل শব্দটি اِسْمُ جَامِد একবচন, বহুবচনে رُسُل যার অর্থ- দূত, বার্তাবাহক।

অর্থের দিক ও ব্যবহারের দিক থেকে শব্দ দুটি প্রায়ই সমার্থক।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় نَبِى বলা হয়- مَن يَكُوْنُ مُخْبِرًا عَنِ اللّٰهِ بِاَحْكَامِهٖ اَوْ سَفِيْرًا بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ عِبَادِهٖ অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার

বিধানসমূহ প্রচার করেন অথবা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন তাঁকে নবী বলে। সুতরাং নবী হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের জন্য নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত; صَاحِبُ الشَّرِيْعَة হওয়া শর্ত নয়। আর رَسُوْل বলা হয়–

هُوَ مَنْ اُوْحِىَ اِلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ وَبِتَنْزِيْلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল।

গ. **ব্যবহারিক পার্থক্য :** যিনি নবী তিনি রাসূল নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি রাসূল তিনি অবশ্যই নবী। সুতরাং নবী ও রাসূলের মধ্যে عَام خَاص مُطْلَق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন বলা হয়– كُلُّ رَسُوْلٍ نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُوْلاً

ঘ. **আলেমগণের মতভেদ :** এ ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই সকল নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী।

২. অধিকাংশের মতে, নবী ও রাসূলের মাঝে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সকল রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلرَّسُوْلُ مَنْ اُمِرَ بِالتَّبْلِيْغِ وَالنَّبِىُّ مَنْ اُوْحِىَ اِلَيْهِ اعَمُّ من ان يُّؤْمَرَ بِالتَّبْلِيْغِ اَمْ لا۔

অর্থাৎ, যাঁকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি রাসূল। আর যাঁর নিকট অহী প্রেরণ করা হয়েছে তিনি নবী, তাঁকে প্রচারের নির্দেশ দেয়া হোক বা না হোক।

৪. কাযী আয়ায (র) বলেন– اِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِىٌّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ

৫. ইবনুল হুমামসহ কতিপয় বলেছেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সর্বসম্মত অভিমত হলো, উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ۔

৩ مَفْهُوْمُ الْاِيْمَانِ بِالْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ :

নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য : নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক ও অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. **নবী রাসূলগণের সংখ্যা :** নবী রাসূলগণের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানাননি। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔

নবী রাসূলগণের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ হাদীসও পাওয়া যায় না। মুসনাদে আহমাদ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া

যায়। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা ৩১৫ জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং মুহাক্কিক আলেমগণ এ বিষয়ে সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার; তবে তাঁদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম।

২. **নবী রাসূলগণের নাম :** পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম এসেছে, তাদের ওপর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। এছাড়া ওযায়েরকে ইহুদিরা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু তার নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। যেমন রাসূল (স) বলেন– مَا اَدْرِىْ أَعُزَيْرُ نَبِىٌّ هُوَ امْ لَا

মুসা (আ)-এর খাদেমের নাম ইউশা ইবনে নূন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (স) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

৩. **নবী রাসূলগণের জীবন বৃত্তান্ত :** পবিত্র কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, কখনই নবীদের ব্যাপারে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক তথ্য প্রদানকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি; বরং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর মধ্যে কারো কারো বিষয়ে কিছু কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। যেমন– নূহ, ইবরাহীম, মুসা, ইউসুফ প্রমুখ। আর কারো কারো সম্পর্কে শুধু নবুয়তের উল্লেখ করেছেন।

৪. **তাঁরা সবাই আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন :** নবী রাসূলগণের মহত্ত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁদের মানবীয় দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন– তাঁদের খাদ্যগ্রহণ, বাজার করা, বিবাহ শাদি, সন্তানগ্রহণ, মানবীয় সীমাবদ্ধতা, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাইরে অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١ـ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىٓ اِلَيْهِمْ ـ

٢ـ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ـ

٣ـ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ

٤ـ وما كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ـ

٥ـ قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ـ

٦ـ قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا ـ

৫. **সকল নবী রাসূলের দাওয়াত এক :** সকল নবী রাসূলের মূল দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম। তারা জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে বলতেন– يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ; তবে তাঁদের বিস্তারিত শরীয়ত ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। মানুষদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা এবং পথের নির্দেশ দেয়াই ছিল তাঁদের দায়িত্ব।

৬. **তারা সবাই আয়াত তথা মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন :** সকল নবী ও রাসূল আল্লাহর অহী এবং মুজিযা লাভ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা অনেক মুজিযা তথা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহ্বান করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন– وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ তথা নবীগণের জন্য আয়াত প্রমাণিত।

الْحِكْمَةُ فِيْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ :

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ রহস্য বিদ্যমান। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবরচিত ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ.

৩. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী রাসূলগণ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

৪. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও আল্লাহর কিতাব শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

৫. ঐশী বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে হেকমতের জ্ঞান দানের মহান দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ.

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী করীম (স) বলেন– بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

১০. মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

১১. আল্লাহর ইবাদত করতে ও শয়তানের অনুসরণ করা হতে বিরত থাকতে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ۔

عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاءِ :

ইসমাতুল আম্বিয়া : عِصْمَة শব্দটি ع - ص - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা, নিষ্পাপ, নিষেধ করা, হেফাযত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি। এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ; নবী ও রাসূলগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং নিষ্পাপ ছিলেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

اَلْاَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ - وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتٌ وَخَطِيْئَاتٌ۔

অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিমুক্ত ছিলেন। তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্খলন ও ভুলত্রুটি তাঁদের ঘটেছে।

এখানে ইমাম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন–

১. নবীগণের ওপর ঈমান।

২. সকল নবী আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ এবং সকল নবী রাসূলই আল্লাহর মনোনীত প্রিয় বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়নপ্রাপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

এতে বোঝা যায়, কেবল বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন– اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ

আর নিষ্পাপ হওয়ার কারণেই মহান আল্লাহ মানবজাতিকে নবী রাসূলগণের অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তায়ালা আল্লাহ আরো বলেন–

١ـ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ۔ ٢ـ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ حَوْلَ عِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ :

ইসমাতুল আম্বিয়া সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী রাসূলগণ নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে শিরক, কুফর ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র। এ ঐকমত্য ইজমা পর্যায়ের। তবে তাঁদের থেকে সগীরা ও কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্য বাতিলপন্থির মাঝে মতভেদ লক্ষণীয়।

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** তাঁদের মতে, সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তবে যেসব সগীরা গুনাহ তাঁদের ব্যক্তিত্ববিধ্বংসী, সেগুলো থেকেও তাঁরা নিষ্পাপ।

দলীল : এ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশসমূহ নিম্নরূপ–

١ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ۔

٢- يَا بُنَىَّ لا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

٣- وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

২. **ফিকহুল আকবার গ্রন্থকারের অভিমত :** ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র।

দলীল : তাঁদের দলীল নিম্নরূপ–

١- وَالْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ يَعْنِىْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا -

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) সকলেই নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা সবধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র।

উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে– وَلَمْ يَرْتَكِبِ النَّبِىُّ (صـ) صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً قَطُّ يَعْنِى قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا অর্থাৎ, নবী করীম (স) নবুয়তের পূর্বে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোনো ধরনের পাপ করেননি।

৩. **মোল্লা আলী কারীর অভিমত :** আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) তাঁর মেরকাত ফী শরহে মেশকাত গ্রন্থে বলেন– عِصْمَةُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا অর্থাৎ, নবুয়তের পূর্বে বা পরে নবীগণ সগীরা ও কবীরা সবধরনের পাপ থেকে পবিত্র।

৪. **ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত :** ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, নবীগণ থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পর কবীরা বা সগীরা তো নয়ই, এমনকি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনি এটাকেই সঠিক মত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন– فَلَمْ يُمْكِنْ صُدُوْرُهُ (صُدُوْرُ الذَّنْبِ) مِنْهُ وَلَوْ صَغِيْرَةً قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَلَى الصَّوَابِ অর্থাৎ, সঠিক মতানুসারে নবুয়তের আগেও নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়; চাই তা সগীরা গুনাহ হোক না কেন।

৫. **মুফতি শফীর অভিমত :** মায়ারেফুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ শফী (র) লিখেছেন, চার ইমামসহ উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

৬. **মুতাযিলাদের অভিমত :** নবুয়তপূর্ব জীবনে নবী রাসূলগণ থেকে কোনো রকম কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাবে না। তবে সগীরা গুনাহ থেকে তাঁরা মুক্ত নন।

দলীল : তাদের দলীল প্রসঙ্গে ইমাম নাসাফী (র) বর্ণনা করেন–

لِاَنَّهَا تُوْجِبُ النَّفْرَةَ الْمَانِعَةَ عَنْ اِتِّبَاعِهِمْ فَتَفُوْتُ مَصْلَحَةُ الْبَعْثَةِ - وَالْحَقُّ مَنْعُ مَا يُوْجِبُ النَّفْرَةَ كَعُهْرِ الْاُمَّهَاتِ وَالْفُجُوْرِ وَالصَّغَائِرِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخِسَّةِ -

অর্থাৎ, নবী রাসূলদের থেকে কবীরা গুনাহ প্রকাশ পেলে তাঁদের ব্যাপারে জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাঁদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকবে। ফলে তাঁদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ব্যাহত হবে। অথচ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা তাঁদের জন্য আবশ্যক।

৭. **শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত :** শিয়া দার্শনিকদের মতে–

اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الْمَعَاصِىْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا عَلٰى سَبِيْلِ الْعَمَدِ وَالنِّسْيَانِ وَعَنْ كُلِّ رَذِيْلَةٍ وَمَنْقَصَةٍ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْخِسَّةِ وَالضَّعَةِ -

অর্থাৎ, নবী রাসূলগণ সকল প্রকার কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হবেন; অপরাধ থেকে মুক্ত, নবুয়তপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে; চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলক্রমে হোক। এছাড়াও সকল ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং ব্যক্তিত্ববিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকেও তাঁরা পবিত্র হবেন।

৮. **হাশবিয়া, কাররামিয়া ও মুরজিয়াদের অভিমত :** এসব বাতিল ও ভ্রষ্ট ধর্মীয় উপদলগুলোর মত হলো– اِنَّهُ يَمْكُنُ صُدُوْرُ الْكَبَائِرِ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ عَمَدًا وَسَهْوًا অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে কবীরা গুনাহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

দলীল : ১. মহানবী (স) একবার সালাতে সূরা আন নজম পাঠ করতে গিয়ে পাঠ করে ফেললেন–

اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى - تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْاُوْلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجٰى -

এ আয়াতে অনিচ্ছাকৃত হলেও মহানবী (স) কবীরা গুনাহ করে ফেলেন। কারণ দেবদেবী থেকে শাফায়াত প্রার্থনাকে তিনি স্বীকার করেন।

২. বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা কথা বলেন এবং এগুলো তিনি স্বীকারও করেন। অথচ মিথ্যা হলো সকল কবীরা গুনাহের মূল– اَلْكِذْبُ اُمُّ الذُّنُوْبِ

৩. আল কুরআনে এসেছে, হযরত মুসা (আ) এক কিবতীকে চড় মেরে হত্যা করেছেন। অথচ কুরআনের বাণী হলো– وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ, মানুষ হত্যা মহাপাপ। অতএব মুসা (আ) কবীরা গুনাহ করলেন।

দলীলের জবাব :

১. সূরা নজমের ঐ সৃষ্ট আয়াতটি মূলত শয়তান আবৃত্তি করেছিল এবং রাসূলের স্বরকে নকল করে অবিকল মহানবীর মতো আবৃত্তি করে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

২. ইবরাহীম (আ) মূলত কোনো মিথ্যাই বলেননি; বরং এগুলো ছিল ইলমে বালাগাতের تَوْرِيَةٌ তথা ইঙ্গিত (রূপক)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. মুসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যা ছিল নবুয়তপূর্ব ঘটনা। আর নবুয়তের পূর্বে কবীরা গুনাহ ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সেটা ছিল অনিচ্ছাকৃত হত্যা।

কাজেই তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিমূলক; তা মেনে নেয়া যায় না।

উপসংহার : নবীগণ কখনই কোনো কবীরা গুনাহ করেননি। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সকল ভুলত্রুটি হয়েছে তা ভুলত্রুটি বলেই গণ্য। আর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁদের থেকে সগীরা ও কবীরা তথা সকল প্রকার গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٨) : مَا الرِّسَالَةُ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ فِيْ إِرْسَالِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لِمَاذَا أَيَّدَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُوْلَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ أَهَمَّ مُعْجِزَاتِهِ بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ **প্রশ্ন : ৩৮ আররিসালাহ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার হেকমত কী? আল্লাহ কেন তাঁর রাসূল (স)-কে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তাঁর প্রধান মুজিযাসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৪]

او۔ مَا هِيَ الرِّسَالَةُ؟ وَمَا هِيَ الْحِكْمَةُ فِيْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ؟ وَلِمَاذَا أَيَّدَ اللّٰهُ تَعَالَى الرُّسُلَ بِالْمُعْجِزَاتِ؟

অথবা, রিসালাত কাকে বলে? রাসূলগণকে প্রেরণ করার রহস্য কী? আল্লাহ কেন মুজিযা দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন?

উত্তর।। উপস্থাপনা : মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়েছেন নানাপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির। তাই মহান আল্লাহ এই প্রতিকূলতা দূর করতে তাঁদের দিয়েছেন বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা। নবী রাসূলগণের এ অলৌকিক ক্ষমতাই মুজিযা। নিম্নে এতদসম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ رِسَالَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الرِّسَالَةِ لُغَةً :

رِسَالَة-এর আভিধানিক অর্থ : رِسَالَةٌ শব্দটি فِعَالَةٌ-এর ওযনে إِسْم جَامِد; বহুবচনে رَسَائِلُ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْبَعْثُ তথা প্রেরণ করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ۔

২. দূত পাঠানো। যেমন বলা হয়– أَرْسَلَنِيْ أُسْتَاذُ إِلَيْكَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ

৩. পয়গাম তথা বিশেষ বার্তা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ۔

৪. اَلْخَطُّ তথা চিঠি।

৫. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ-এর গ্রন্থকার বলেন– اَلرِّسَالَةُ مَا يُرْسَلُ

৬. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন– كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلٰى قَلِيْلٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ

৭. قَوَاعِدُ الْفِقْهِ-এর গ্রন্থকার মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–
اَلرِّسَالَةُ هِيَ الصَّحِيْفَةُ يَكُوْنُ فِيْهَا الْحُكْمُ۔

৮. رَائِدُ الطُّلَّابِ গ্রন্থকার বলেন– اَلصَّحِيْفَةُ الَّتِيْ يُكْتَبُ فِيْهَا الْكَلَامُ

৯. ইংরেজিতে বলা হয়– Letter, Message, Consignment, Communication, Shipment ইত্যাদি।

مَعْنَى الرِّسَالَةِ إِصْطِلَاحًا :

رِسَالَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন–

هِيَ سِفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَتِهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করাকে رِسَالَةٌ বলা হয়।

২. اَلْمُنْجِد অভিধান প্রণেতার মতে– هِيَ دَعْوَةُ الرَّسُوْلِ لِلنَّاسِ اِلَى مَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ রাসূলদের নিকট যা প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার নামই রিসালাত।

৩. আল্লামা ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلرِّسَالَةُ هِيَ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِيْنَ الصَّالِحِيْنَ نَبِيًّا ثُمَّ نَبَّأَهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يُّبَلِّغَ غَيْرَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর সৎ ও একনিষ্ঠ বান্দা থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর তাঁকে আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে অন্যদের নিকট তা পৌঁছানোর পর যে নির্দেশ দেন, তার নাম রিসালাত।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط প্রণেতা বলেন–

هُوَ مَا اَمَرَ بِتَبْلِيْغِهِ عَنِ اللّٰهِ وَدَعْوَتِهِ النَّاسَ اِلَى مَا اَوْحَى اللّٰهُ.

৫. ইমাম রাগেব (র) বলেন–

اَلرِّسَالَةُ هِيَ اَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ الرَّسُوْلَ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ وَيُبَلِّغُهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এমন শরীয়ত সহকারে কোনো দূত প্রেরণ, যা তিনি পালন করেন এবং প্রচার করে থাকেন।

اَلْحِكْمَةُ فِيْ اِرْسَالِ الرُّسُلِ :

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ রহস্য রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবরচিত ঈমান বিধ্বংসী মতবাদের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ.

৩. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী রাসূলগণ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

৪. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও আল্লাহর কিতাব শিক্ষাদান করতঃ তাদের

সার্বিক পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

৫. কিতাব পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে হেকমতের জ্ঞান দানের মহান দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ.

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী করীম (স) বলেন– بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

১০. মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

১১. আল্লাহর ইবাদত করতে ও শয়তানের অনুসরণ করা হতে বিরত থাকতে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

سَبَبُ تَأْيِيْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى الرُّسُلَ بِالْمُعْجِزَاتِ :

مُعْجِزَات দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ : মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন। অনেক অলৌকিক বিষয় দ্বারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। নবী রাসূলগণকে মুজিযা দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণ নিম্নরূপ–

১. বিশ্বমানবতার হেদায়াতকল্পে এ ধরাধামে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল। দাওয়াতী কাজে খোদাদ্রোহীদের সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে মুজিযা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ

২. নবুয়ত ও রিসালাতের দাবিকে সত্যায়ন করার জন্য রাসূলদের মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। যেমন– কুরাইশদের নিকট রাসূল (স) স্বীয় নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন।

৩. মানুষকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে–

مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلَّا اُعْطِىَ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ۔

৪. ভুয়া নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখার মানসে রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে।

৫. অবিশ্বাসী সমাজের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর রাসূলগণের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন– ফিরাউনের যাদুর ওপর হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযা প্রদর্শন।

৬. সাধারণ মানুষের জন্য যা অসম্ভব তা রাসূলদের পক্ষে সম্ভব, এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবুয়তের বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন– হযরত ঈসা (আ)-এর কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধ ভালো করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজিযা।

৭. দাওয়াতী কাজে সংকট মোকাবেলায় নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

اَهَمُّ مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান মুজিযাসমূহ : নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত কয়েকটি প্রধান মুজিযা উল্লেখ করা হলো–

১. **আল কুরআন :** যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন। আর তা হলো মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَقَالُوْا لَوْ لَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَ لَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى۔

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের নিকট হতে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি?

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **ইসরা ও মিরাজ :** অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রধান মুজিযা। কারণ عَامُ الْحُزْنِ তথা চিন্তার বছর মহানবী (স)-এর জীবনে এ মহান মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ যে বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন কাফেরদের শত্রুতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য তায়েফে হিজরত করেন। সেখানেই তিনি প্রথম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তখনো তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীনের দায়িত্ব পালন করেন। সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন করান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মাসজিদুল আকসা তথা জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। কেননা তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ اَسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى۔

বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন।

৩. **চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ :** মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية۔

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে। তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানির সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। বাকশক্তিহীন ব্যক্তি কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

উপসংহার : বিশ্বমানবতাকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শের পথপ্রদর্শন করার জন্যই নবী রাসূলগণের আগমন ঘটে। এ গুরুদায়িত্ব পালনে সহজতার জন্য তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা মুজিযা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٩) : مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ وَمَا حَقِيْقَتُهُ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ؟ ثُمَّ اَثْبِتْ اَنَّ الْكَرَامَةَ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ بِالْاَدِلَّةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৩৯ ॥ অলী কে এবং তার হাকীকত কী? মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য কী? অতঃপর 'অলীগণের কারামত সত্য' বিষয়টি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর।

او ـ عَرِّفِ الْوَلِيَّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ـ وَمَاذَا تَعْلَمُ عَنْ حَقِيْقَتِهِ؟ ثُمَّ اَثْبِتْ بِادِلَّةِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ اَنَّ الْكَرَامَةَ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ مَعَ تَرْدِيْدِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ

অথবা, অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে কী জান? অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন করতঃ কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর 'অলীগণের কারামত সত্য'।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাঁদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যেগুলোকে মুজিযা বলে। মূলত নবীগণের অলৌকিক ঘটনা মুজিযা, অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ড শয়তানদের অবাক করা ঘটনা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। অলীর পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ وَلِيّ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْوَلِيِّ لُغَةً :

وَلِيّ-এর আভিধানিক অর্থ : وَلِيٌّ শব্দটি আরবি اَلْوَلَاءُ বা اَلْوِلَايَةُ শব্দ থেকে গৃহীত। এর বহুবচন হলো- اَوْلِيَاءُ; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ক. নৈকট্য, বন্ধুত্ব, অভিভাবকত্ব, নিকটবর্তী, সাহায্যকারী ইত্যাদি।

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতানুসারে এর অর্থ হলো- ১. اَلصَّدِيْقُ তথা বন্ধু, ২. اَلنَّصِيْرُ তথা সাহায্যকারী, ৩. اَلْمُحِبُّ তথা প্রিয়, ৪. اَلْجَارُ তথা প্রতিবেশী, ৫. اَلْمُطِيْعُ তথা অনুগত।

গ. ইংরেজিতে বলা হয়- Closeness, Friendship, Guardianship ইত্যাদি।

مَعْنَى الْوَلِيِّ اِصْطِلَاحًا :

وَلِيّ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : অলী শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জমহুর আলেমের মতে, কুরআন সুন্নাহভিত্তিক وِلَايَة তথা শাসনক্ষমতা অর্জনকারীকে অলী বলা হয়।

২. কারো মতে, উত্তরাধিকার আইন ও রাজনৈতিক পরিভাষায় অলী ও মাওলা শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়।

৩. শরীয়তের পরিভাষায় বেলায়াত বা অলী শব্দদ্বয় وِلَايَةُ اللّٰه তথা আল্লাহর বন্ধুত্ব ও وَلِيُّ اللّٰه তথা আল্লাহর বন্ধু অর্থে সর্বাধিক ব্যবহৃত। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অলী তথা বন্ধুদের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলেন–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ۔

অর্থাৎ, জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। এমনকি যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে তাদেরও কোনো ভয় নেই।

৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে وَلِيّ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন–

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ حَسَبَ مَا يُمْكِنُ الْمُوَاظِبَ عَلَى الطَّاعَاتِ اَلْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِى اَلْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِى اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ۔

অর্থাৎ, وَلِيّ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর গুণাবলির পরিচয় লাভ করেছে, সাধ্যমতো আনুগত্য প্রদর্শন করে, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং প্রকৃতিগত বিষয়াদি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে।

মোটকথা, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামের দৃষ্টিতে অলী নামে খ্যাত।

حَقِيْقَةُ الْوَلِيِّ :

অলীর হাকীকত : পবিত্র কুরআনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, দুটি গুণের মধ্যে অলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। আর সে দুটি হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ দুটি গুণ যার মধ্যে যত বেশি এবং যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াত তথা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বড় অলী তথা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর অলী। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম তাহাবী, ইমাম আযম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র), আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বর্ণনাপূর্বক বলেন–

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ، وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَطْوَعُهُمْ وَاَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ۔

অর্থাৎ, সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর অলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী সে তত বেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত তথা তত বেশি বেলায়াতের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (স) অলীর পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ۔

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা-

ক. আভিধানিক পার্থক্য : مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। আর كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এবং اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال থেকে ব্যবহৃত মাসদার।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর কারামত অলীদের থেকে এবং ইসতিদরাজ বদকার, ফাসেক ও কাফেরদের থেকে প্রকাশ পায়।

গ. অন্যান্য পার্থক্য :

১. مُعْجِزَة আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এতে নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে। مُعْجِزَة প্রকাশের পূর্বেই তারা এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন। كَرَامَة প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয় এবং তারা পূর্ব থেকে তা অবহিত থাকে না। আর اِسْتِدْرَاج শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

২. অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট مُعْجِزَة প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ كَرَامَة প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর اِسْتِدْرَاج প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে।

৩. مُعْجِزَة ও كرامة শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শরীয়তে বৈধ নয়।

৪. مُعْجِزَة অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। আর كَرَامَة অস্বীকারকারী কাফের হয় না। পক্ষান্তরে اِسْتِدْرَاج-কে বিশ্বাস করা গুনাহের কাজ।

৫. مُعْجِزَة ও كَرَامَة আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শয়তানের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ।

৬. مُعْجِزَة ও كَرَامَة দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং اِسْتِدْرَاج দ্বারা শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

৭. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

৮. মুজিযা ও কারামতের মধ্যে تَعَلُّم তথা শিক্ষাগ্রহণ ও تَعْلِيْم তথা শিক্ষাপ্রদান নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে।

اَلْاَدِلَّةُ لِاِثْبَاتِ حَقِيْقَةِ كَرَامَةِ الْاَوْلِيَاءِ :

অলীগণের কারামতের সত্যতা প্রসঙ্গে দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্য হতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন- وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ

অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বর্ণনা করে আল্লামা নদভী (র) বলেন– كَرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ;

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে স্বীয় মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন–

১. মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔

এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মুজিযা ও কারামত উপস্থাপন করা হয়েছে। সাহাবী ও পুণ্যবান লোকগণের কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো ছিল মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় ও মর্জিমতো। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কখনো কোনো অলী বা বুযুর্গ কারামত প্রকাশ করতে পারেননি।

২. ওমর (রা)-এর বাণী– يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ অর্থাৎ তিনি মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে হাজার মাইল দূর থেকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন।

৩. ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়া।

اَقْوَالُ الْمُخَالِفِيْنَ وَالتَّرْدِيْدُ عَلَيْهِمْ :

বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত ও তার প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কারামতকে অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের মতে অলীগণের কারামত সত্য নয়।

তাদের দলীল : তারা যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করে বলে, যদি অলীদের থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহলে নবী রাসূলগণের বিশেষ কোনো মর্যাদা থাকে না। কারণ এতে অলী এবং নবীগণের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

তাদের দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও বিভ্রান্তদের যুক্তি খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন–

১. তাদের নিকট পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর نَقْلِى কোনো দলীল নেই।

২. তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীলটি অবাস্তব। কারণ রাসূল (স)-এর নবুয়ত অস্বীকারকারী কখনো অলী হতে পারে না; বরং অলীগণের কারামতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অলীগণ রাসূল (স)-এর খাঁটি উম্মত। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

لَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُوْلُ نَبِىٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ ۔ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ ۔

অর্থাৎ, আমরা কোনো অলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না; বরং আমরা একজন নবী সকল অলী থেকে শ্রেষ্ঠ একথা বলি। আমরা তাঁদের কারামত বিশ্বাস করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণকে তাঁদের স্তরে রাখা এবং তাঁদের স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٠) : مَا مَعْنَى الْمُعْجِزَة وَالْكَرامة وَالْاِسْتِدْرَاجِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ؟ ثُمَّ اَثْبِتْ اَنَّ كَرَامَةَ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ مَعَ تَرْدِيْدِ الْمُخَالِفِيْنَ.

■ **প্রশ্ন : ৪০ ॥ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের অর্থ কী? এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডনপূর্বক প্রমাণ কর যে, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য।**

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোঁকা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করা হলো।

➲ مَعْرِفَةُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

➲ **مُعْجِزَة-এর পরিচিতি :**

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি اِعْجَازٌ থেকে গৃহীত। এটা বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل এর-وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ। যা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থে এসেছে– مَا يَعْجَزُ الْبَشَرُ اَن يَّأْتُوْا بِمِثْلِهِ.

৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Miracle, Wonder ইত্যাদি।

মূলত মুজিযা শব্দটি اٰيَةٌ তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ اَىْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُعْجِزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভূত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত।

২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةُ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوَى لِنُبُوَّتِهِ ـ

অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. عِلْمُ الْكَلَام-এর পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ظَهَرَ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থপ্রণেতার মতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُ اللّٰهُ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ (صـ) تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهِ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা।

৫. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে–

اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَأَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى دَلِيْلًا عَلَى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَنُبُوَّتِهِ ـ

অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে।

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। যেমন– ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা, ৫. নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি।

⊃ كَرَامَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَرَامَةِ لُغَةً :

كَرَامَة-এর আভিধানিক অর্থ : كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, যা ك ـ ر ـ م মূলবর্ণ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি। আর ইংরেজিতে বলা হয়– Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি।

مَعْنَى الْكَرَامَةِ اِصْطِلَاحًا :

كَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলে।

২. عِلْمُ الْكَلَامِ-এর দৃষ্টিতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرُ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই কারামত; তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না।

৩. رَائِدُ الطُّلَّابِ গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِيْ بِهٖ شَخْصٌ

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অলৌকিকভাবে সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে।

দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা–

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ.

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন– كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য।

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন।

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে।

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করতঃ বলেছিলেন– يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ;

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি বিষ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হওয়া।

৫. কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে।

৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শত্রুর প্রতি এক মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করলে শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

لَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ.

◌ اِسْتِدْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْتِدْرَاجِ لُغَةً :

اِسْتِدْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি د ـ ر ـ ج মূলধাতু থেকে নির্গত, বাবে اِسْتِفْعَال-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ– চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া। আর اِسْتِدْرَاج অর্থ– ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের দিকে নামানো। ইংরেজিতে বলা হয়– To make advance gradually, To entice or To lure into destruction ইত্যাদি।

مَعْنَى الْإِسْتِدْرَاجِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর ওলামার মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْكَافِرِ اَوِ الْمُشْرِكِ حَسَبَ دَعْوَتِهٖ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَاَمَّا الَّتِىْ تَكُوْنُ لِاَعْدَائِهٖ مِثْلَ اِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ لَا نُسَمِّيْهَا اٰيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ، وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ ـ وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْضِىْ حَاجَاتِ اَعْدَائِهٖ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوْبَةً لَهُمْ ـ

অর্থাৎ, নবীদের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত এবং অলীদের জন্য কারামত সত্য। আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল অতিপ্রাকৃত কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন পূরণ বলে থাকি। কারণ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' তথা তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করণস্বরূপ এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।

৪. কারো কারো মতে– اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ الَّذِىْ يُخَالِفُ الْاِيْمَانَ وَالْعَمَلَ فَهُوَ اِسْتِدْرَاجٌ অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৫. কতিপয়ের মতে– مَا لَا يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَكُوْنُ اِسْتِدْرَاجًا অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের মধ্যে সম্পৃক্ত নয়, তাই ইসতিদরাজ।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা–

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। আর كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এবং اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال থেকে ব্যবহৃত মাসদার।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর কারামত অলীদের থেকে এবং ইসতিদরাজ বদকার, ফাসেক ও কাফেরদের থেকে প্রকাশ পায়।

গ. অন্যান্য পার্থক্য :

১. مُعْجِزَةٌ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এতে নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে। مُعْجِزَة প্রকাশের পূর্বেই তারা এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন। كَرَامَة প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয় এবং তারা পূর্ব থেকে তা অবহিত থাকে না। আর اِسْتِدْرَاج শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

২. অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট مُعْجِزَة প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ كَرَامَة প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর اِسْتِدْرَاج প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে।

৩. مُعْجِزَة ও كَرَامَة শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শরীয়তে বৈধ নয়।

৪. مُعْجِزَة অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। আর كَرَامَة অস্বীকারকারী কাফের হয় না। পক্ষান্তরে اِسْتِدْرَاج-কে বিশ্বাস করা গুনাহের কাজ।

৫. مُعْجِزَة ও كَرَامَة আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শয়তানের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ।

৬. مُعْجِزَة ও كَرَامَة দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং اِسْتِدْرَاج দ্বারা শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

৭. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

৮. মুজিযা ও কারামতের মধ্যে تَعَلُّم তথা শিক্ষাগ্রহণ ও تَعْلِيْم তথা শিক্ষাপ্রদান নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে।

بَيَانٌ عَلٰى اَنَّ كَرَامَةَ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ اَمْ لَا ؟ :

অলীগণের কারামতের সত্যাসত্যের বর্ণনা : আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য কিনা, এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

ক. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য। ইসলামী শরীয়তে এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ অসংখ্য সাহাবী ও পুণ্যবান লোকদের নিকট এরূপ অনেক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যা অস্বীকার করা অসম্ভব।

দলীল : এ ব্যাপারে দুটি প্রমাণ প্রণিধানযোগ্য। যথা–

১. হযরত মারইয়াম (আ)-এর থেকে প্রকাশিত কারামতের সত্যতা আল কুরআনেও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا - قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا - قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

সুতরাং এমনিভাবে যুগে যুগে হকপন্থি অলীগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ঘটনা সত্য।

২. হযরত ওমর (রা)-এর মদিনার মসজিদে মিম্বারে খোতবারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা দর্শন। হযরত ওমর (রা)-এর চিঠি দ্বারা নীল নদ প্রবাহিত হওয়া। অনেক অলীর পানির উপর দিয়ে চলা ইত্যাদি।

খ. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলাদের মতে, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য নয়।

দলীল : তাদের যুক্তি হলো, অলীগণের থেকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ঘটনা প্রকাশ পেলে তাদের কারামত এবং নবীগণের মুজিযা এক হয়ে যাবে। এমনকি উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

৩ اَلْاِجَابَةُ عَنْ اَقْوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা যায়-

১. মহানবী (স)-এর উম্মতের যে কোনো একজন থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া প্রকৃতপক্ষে মহানবী (স)-এর মুজিযা। কারণ কারামতের দ্বারা অলী একজন খাঁটি উম্মত, এ কথাই প্রমাণিত হয়।

২. আর নবীগণের সাথে সংমিশ্রণের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। মহানবী (স)-এর নবুয়তকে অস্বীকারকারী কখনো অলী হতে পারে না। অধিকন্তু বর্তমান যুগে আর কোনো নবী আসার সম্ভাবনা নেই। অতএব গ্রন্থকার (র)-এর কথা- كَرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ এটি যথার্থ ও সত্য। এজন্য আউলিয়ায়ে কেরাম প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

উপসংহার : মুজিযা নবী-রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٤١) : عَرِّفِ الْمُعْجِزَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْاِسْتِدْرَاجَ. ثُمَّ بَيِّنْ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيْهِنَّ مُدَلَّلًا بِالتَّفْصِيْلِ.

■ প্রশ্ন : ৪১ ॥ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলো সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোঁকা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করা হলো।

৩ مُعْجِزَةٌ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর **আভিধানিক অর্থ :** اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি اِعْجَازٌ থেকে গৃহীত। এটা বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ। যা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়।

যেমন– ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক কর্ম, ৫. অলৌকিক নিদর্শন, ৬. দুর্বলকারী, ৭. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থে এসেছে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِهٖ۔

৮. ইংরেজিতে বলা হয়– Miracle, Wonder ইত্যাদি।

মূলত মুজিযা শব্দটি اٰيَة তথা চিহ্ন নামে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ; পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ اَىْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الْمُسَمَّاةُ بِالْمُعْجِزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

অর্থাৎ, নিদর্শন তথা স্বভাব বহির্ভূত এমন অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা হয়, যা নবীগণদের জন্য প্রমাণিত।

২. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةٌ اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةُ مَقْرُوْنَةٌ بِدَعْوٰى لِنُبُوَّتِهٖ۔

অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজ এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং যা নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. عِلْمُ الْكَلَام-এর পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ظَهَرَ مِنَ النَّبِىِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল থেকে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলা হয়।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থপ্রণেতার মতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ النَّبِىِّ (ص) تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهٖ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক, প্রকৃতি বিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া, যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তাই মুজিযা।

৫. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে– اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَاَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلٰى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنُبُوَّتِهٖ অর্থাৎ, যা আল্লাহ তায়ালার রিসালাত এবং নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়, তাকে মুজিযা বলে।

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

মুজিযা-এর দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। যেমন– ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে

জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা, ৫. নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি।

৩ كَرَامَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَرَامَةِ لُغَةً :

كَرَامَة-এর আভিধানিক অর্থ : كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, যা ك - ر - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা । আর ইংরেজিতে বলা হয়– Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি।

مَعْنَى الْكَرَامَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَلْكَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কারামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর ওলামার মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলে।

২. عِلْمُ الْكَلَام-এর দৃষ্টিতে কারামত বলা হয়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرَ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাই কারামত; তবে শর্ত হলো ঐ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না।

৩. رَائِدُ الطُّلَّابِ গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِىْ بِهٖ شَخْصٌ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে।

দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা–

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন– كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য।

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী 'আসিফ' কর্তৃক রানী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন।

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে।

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করতঃ বলেছিলেন– يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ :

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি বিষ প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হওয়া।

৫. কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে।

৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শত্রুদের প্রতি এক মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করলে শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

لَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِّنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ.

اِسْتِدْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْتِدْرَاجِ لُغَةً :

اِسْتِدْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি د ـ ر ـ ج মূলধাতু থেকে নির্গত, বাবে اِسْتِفْعَال-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ– চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া। আর اِسْتِدْرَاج অর্থ– ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের দিকে নামানো। ইংরেজিতে বলা হয়– To make advance gradually, To entice or To lure into destruction ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِسْتِدْرَاجِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর ওলামার মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْكَافِرِ اَوِ الْمُشْرِكِ حَسَبَ دَعْوَتِهٖ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৩. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَاَمَّا الَّتِىْ تَكُوْنُ لِاَعْدَائِهٖ مِثْلَ اِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ لَا نُسَمِّيْهَا اٰيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ. وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ. وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْضِىْ حَاجَاتِ اَعْدَائِهٖ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوْبَةً لَهُمْ.

অর্থাৎ, নবীদের জন্য নিদর্শন প্রমাণিত এবং অলীদের জন্য কারামত সত্য। আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল অতিপ্রাকৃত কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন পূরণ বলে থাকি। কারণ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' তথা তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করণস্বরূপ এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।

৪. কারো কারো মতে– اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ الَّذِىْ يُخَالِفُ الْاِيْمَانَ وَالْعَمَلَ فَهُوَ اِسْتِدْرَاجٌ অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৫. কতিপয়ের মতে– مَا لَا يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَكُوْنُ اِسْتِدْرَاجًا অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের মধ্যে সম্পৃক্ত নয়, তাই ইসতিদরাজ।

عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِى الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা :

ক. মুজিযা : সকল মুমিন বিশ্বাস করেন যে, নবী রাসূলগণ আল্লাহর অহী ও মুজিযা লাভ করেছেন অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের পথে আহবান করার জন্য। আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশে তাঁরা অনেক মুজিযা তথা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে।

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞ আলেমগণের মতে, আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণের দাওয়াতী কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁদেরকে মুজিযা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। কুরআনে মুজিযা শব্দটির ব্যবহার হয়নি, এ শব্দটি اٰيَةٌ তথা নিদর্শন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। নিম্নে মুজিযার সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত কিছু আয়াত উপস্থাপন করা হলো–

١۔ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ۔

٢۔ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۔ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

٣۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ۔

٤۔ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

٥۔ وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ۔

٦۔ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ۔

খ. কারামত : অলীগণের কারামত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা নিম্নরূপ–

নবীগণের অলৌকিক কর্মকে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'আয়াত' ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের পরিভাষায় 'মুজিযা' বলা হয়। আর ঈমানদার, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে 'কারামত' বলা হয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য। ইসলামী শরীয়তে এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ অসংখ্য সাহাবী ও পুণ্যবান লোকের নিকট এরূপ অনেক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যা অস্বীকার করা অসম্ভব।

দলীল : এ ব্যাপারে দুটি প্রমাণ প্রণিধানযোগ্য। যথা–

১. হযরত মারইয়াম (আ)-এর থেকে প্রকাশিত কারামতের সত্যতা আল কুরআনেও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

সুতরাং এমনিভাবে যুগে যুগে হকপন্থি অলীগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ঘটনা সত্য।

২. হযরত ওমর (রা)-এর মদিনার মসজিদের মিম্বারে খোতবারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা দর্শন। হযরত ওমর (রা)-এর চিঠি দ্বারা নীল নদের প্রবাহিত হওয়া। অনেক অলীর পানির ওপর দিয়ে চলা ইত্যাদি।

গ. **ইসতিদরাজ :** ইসতিদরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো– কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইসতিদরাজ' বলা হয়। ইসতিদরাজের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, "বরং এগুলোকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজত তথা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকাড়াও করার জন্য এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য।

তাই এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ. وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ ـ وَاَمَّا الَّتِىْ تَكُوْنُ لِاَعْدَائِهٖ مِثْلِ اِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ مِمَّا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ اَنَّهٗ كَانَ وَيَكُوْنُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيْهَا اٰيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ. وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ. وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْضِىْ حَاجَاتِ اَعْدَائِهٖ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوْبَةً لَهُمْ فَيَغْتَرُّوْنَ بِهٖ وَيَزْدَادُوْنَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وَذٰلِكَ كُلُّهٗ جَائِزٌ وَمُمْكِنٌ ـ

অর্থাৎ, নবীগণের জন্য 'আয়াত' প্রমাণিত এবং অলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যেসব অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেসব অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা তাদের 'কাযায়ে হাজত' তথা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করার জন্য এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। এতে তারা ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। এগুলো সবই সম্ভব।

উপসংহার : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٢) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ؟ اِشْرَحْ مَعَ بَيَانِ وُجُوْهِ الْاِيْمَانِ بِالْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ وَالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ ـ ثُمَّ اذْكُرْ فَوَائِدَ الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ ـ

■ প্রশ্ন : ৪২ ॥ اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের অর্থ কী? কুরআনে কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর। অতঃপর উল্লেখ কর কিতাবসমূহে বিশ্বাসের উপকারিতা কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমানের তৃতীয় রোকন হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। নিম্নে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ :

اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ-এর অর্থ : আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাধারণ অর্থ হলো, মুমিনকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট অহীর মাধ্যমে কিতাব প্রেরণ করেছেন, যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, সত্য হেদায়াত ও মানবজাতির পথ নির্দেশক নূর। কালক্রমে সেগুলো বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেন, যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও সারনির্যাস। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَالْاَسْبَاطِ ـ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

তবে সেগুলো বিকৃতি তথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা উক্ত কিতাবসমূহ রহিত করে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ সর্বশেষ কিতাব মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানবজাতির মুক্তির পথ বিদ্যমান।

بَيَانُ وُجُوْهِ الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ السَّابِقَةِ :

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক : মহান আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন–

১. **আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন :** জাতির ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করে হেদায়াতের আলোকবর্তিকাস্বরূপ তাদের ওপর নাযিল করেছেন ঐশীগ্রন্থ তথা আসমানী কিতাব। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ, সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সে সকল বিষয়ে সমাধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন।

এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না; তবে এ সকল কিতাবের ওপর বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ ... وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

২. **জানা ও অজানা কিতাব :** আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি অসংখ্য কিতাব নাযিল করেছেন। সকল গ্রন্থই ছিল সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারি; কিন্তু আমরা সেগুলোর অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। হাদীস শরীফে দুর্বল সনদ দ্বারা একশত চারখানা কিতাব ও সহীফার বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব কিতাবের সংখ্যা ও বিধান যাই হোক না কেন সবগুলোর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক।

৩. **হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফা :** সহীফা অর্থ লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ তথা পুস্তিকা বা গ্রন্থ। অর্থাৎ এ বিশ্বাস করা যে, ইবরাহীম ও মুসা (আ)-কেও সহীফা প্রদান করা হয়েছিল।

দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى.

৪. **প্রসিদ্ধ তিন কিতাব :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে তিনটি কিতাবের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– ১. তাওরাত, ২. যাবুর, ৩. ইঞ্জিল। এ তিনটি কিতাব আল্লাহ তায়ালা প্রসিদ্ধ তিনজন নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

ক. তাওরাত : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত মুসা (আ)-এর নিকট এ কিতাব অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যেমন তাওরাতের বর্ণনায় আল্লাহর বাণী–

١. ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْۤ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ.

٢. اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ.

٣. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ.

খ. যাবুর : এ কিতাব আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত দাউদ (আ)-কে প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

গ. ইঞ্জিল : ইঞ্জিল আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী হযরত ঈসা (আ)-কে প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

১. وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ۔

২. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۔ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ۔

উল্লেখ্য, তাঁদের অনুসারীগণ এ গ্রন্থসমূহ বিকৃত করেছে। হযরত মুসা, দাউদ ও ঈসা (আ) ইসরাঈল সন্তানগণের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ তিন কিতাবের অনুসারীদের কুরআন ও হাদীসে বনি ইসরাঈল ও আহলে কিতাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করার কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

১. اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۔

২. فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔

৩. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ۔

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহুদিরা পাঁচটি তাওরাত কিতাবে বিশ্বাস করত, সেগুলো নাকি মুসা (আ) নিজ হাতে লিখেছেন। যথা–

ক. سَفَرُ التَّكْوِيْنِ
খ. سَفَرُ الْخُرُوْجِ
গ. سَفَرُ الْاَحْبَارِ
ঘ. سَفَرُ الْعَدَدِ
ঙ. سَفَرُ التَّثْنِيَةِ

আর বিকৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায় অহী ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি হলো পবিত্র কুরআন। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ, আপনার ওপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও নিয়ন্ত্রক।

এ বিষয়ে রাসূল (স) তাঁর উম্মতকে সহজ মূলনীতি শিখিয়েছেন, তোমাদের গ্রন্থে কোন কথাটি সঠিক এবং কোনটি বিকৃত, তা আল্লাহই ভালো জানেন এবং আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তা সঠিক। যেমন আবু হোরায়রা (রা) বলেন–

كَانَ اَهْلَ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ
لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ
وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ الخ۔

৫. **মহাগ্রন্থ আল কুরআন :** প্রতিটি মুমিনই বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতার উৎস। এ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্যান্য আসমানী গ্রন্থকে দান করেননি। সংক্ষেপে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক. **অলৌকিকত্ব :** পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী। নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন প্রদান করেছেন। যার অলৌকিকত্ব তাঁর সমকালীন মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন। যেমন আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ۔

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিকগুলো হলো, এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ। এটা তৎকালীন আরববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ; কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জটির জবাব দিতে পারেনি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

১. وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

২. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

খ. **সংরক্ষণ :** কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক হলো, এটি চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত। আল্লাহ নিজেই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং যে কোনো রূপের বিলুপ্তি কিংবা বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করেছেন এবং করবেন।

১. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ۔

২. لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۔

৩. بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ۔

কুরআন সংরক্ষণের অন্যতম দিক হলো, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মার জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۔ اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ۔

গ. **সর্বজনীনতা :** মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে কোনো নবী রাসূল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি। কারণ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া

অন্য মানুষের কাছে তাঁদের কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়ত ও কিতাবের নির্দেশনা মানবজাতির জন্য সর্বজনীন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ۔

٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ۔

ঘ. **একমাত্র মুক্তির দিশারি :** অসংখ্য গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেও বর্তমান থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পবিত্র কুরআনই তাদের মুক্তির দিশারি। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

١. وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

٢. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ۔

ঙ. **পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ :** কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাগুলোর সমর্থক ও নিশ্চয়তাদানকারী এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। কুরআনের শিক্ষার বাইরে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তার সবগুলোই রহিত হয়েছে। যেমন–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا .... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔

فَوَائِدُ الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ :

আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনের উপকারিতাসমূহ : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন–

১. **কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ :** আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা আমাদের জীবনের জন্য অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। কারণ এর মাধ্যমে আমরা মানবতার কল্যাণ অকল্যাণ ও বিভিন্ন যুগে মহান আল্লাহ ও স্বীয় নবী রাসূলের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের পরিণতি এবং প্রত্যেক নবীর সমসাময়িক অবস্থাও আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারি।

২. **বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়ন :** এ বিশ্বাস আমাদের প্রতিপালকের সাথে আমাদের মনের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে এবং তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে ওঠে। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ কিতাব দ্বারা হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

৩. **সঠিক পথের জ্ঞান লাভ :** মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যেসব বিষয় বুঝতে পারে না বা শুধু মানবীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বুঝতে গেলে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মানুষ ভালোমন্দ বুঝলেও পার্থিব স্বার্থ বা কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল মত দান করতে পারে, সে সকল বিষয়ে সঠিক পথ ও মতের জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ সর্বদা কল্যাণ ও

মঙ্গলের পথে থাকতে পারে। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এ এক অপরিসীম করুণা। এ করুণার উপলব্ধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গভীর করে।

৪. **জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণ :** এ বিশ্বাস আমাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থের অনুসরণ এবং তাঁর শিক্ষায় জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে।

৫. **পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে পরিচয় :** এর দ্বারা আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের ধর্মীয় আচার আচরণে বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি। কারণ মহান আল্লাহর বাণীর অনুসরণের মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

মূলত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন সকল আসমানী কিতাবের সংক্ষিপ্ত সার ও পরিপূর্ণ কিতাব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ;

উপসংহার : মহান আল্লাহপ্রদত্ত সকল গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস রেখে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুধাবন করে এর বিধিবিধানসমূহ আমলে বাস্তবায়ন করাই ঈমানের দাবি ও মুক্তির একমাত্র সোপান।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٣) : اِشْرَحْ وُجُوْهَ الْاِعْجَازِ فِى الْقُرْاٰنِ.

■ প্রশ্ন : ৪৩ ॥ পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের পদ্ধতিগুলোর ব্যাখ্যা কর।

او- اُذْكُرْ تَحَدِّىَ الْقُرْاٰنِ بِالْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ.

অথবা, আল কুরআনের চ্যালেঞ্জকে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে মানবজাতি ছিল চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবতা, আদল ও ইনসাফ বলতে কিছুই ছিলো না তাদের মাঝে। আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ জাতিকে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য প্রিয়নবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করলেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন; কিন্তু আরবজাতি সহজে এ কিতাবকে বিশ্বাস না করায় আল্লাহ তায়ালা কুরআনের চ্যালেঞ্জ করেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

وُجُوْهُ الْاِعْجَازِ فِى الْقُرْاٰنِ :

আল কুরআনের চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দিক : আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্যের মূল্যায়নে ছিল অতি পারঙ্গম। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। নিম্নে এ পর্যায়সমূহকে উপস্থাপন করা হলো-

১. **একটি কিতাবের চ্যালেঞ্জ :** সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় কোনো একটি কিতাব আনতে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

(سُوْرَةُ الْقَصَصِ)

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়; তবে তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথপ্রদর্শনকারী কোনো কিতাব আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে আস। আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করব।

সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ (سُوْرَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ : ٨٨)

অর্থাৎ, বলুন! যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।

২. **দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ :** এ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা হুদে ইরশাদ করেন–

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ (سُوْرَةُ هُوْد)

অর্থাৎ, তারা কি বলছে যে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছ? তুমি বল, তোমরা এর মতো দশটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ ব্যতীত যদি কেউ ক্ষমতা রাখে, তাকেও তোমরা ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩. **একটি সূরার চ্যালেঞ্জ :** প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ করে মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ـ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةُ : ٢٣-٢٤)

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তার অনুরূপ তোমরা একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার; তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না। অতএব তোমরা সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত مِثْلِهٖ শব্দের ه যমীরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলেমগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এ যমীর দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বোঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কুরআনের সূরার মতো কোনো সূরা রচনা করে দেখাও।
২. জারীর, তাবারী, যামাখশারী ও ইমাম রাযী (র) বলেন, আলোচ্য যমীর দ্বারা মহানবী (স)-কে বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়, মুহাম্মাদের মতো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে যদি এরূপ সূরা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তোমরাও করে দেখাও।

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউনুসে বলেন–

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মনগড়া রচনা নয়। উপরন্তু এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর এটি সবিস্তারে বর্ণিত কিতাব। বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে সন্দেহমুক্ত কিতাব। তারা কি একে মিথ্যা বলছে? তুমি বল, কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর ডেকে নাও (এর সাহায্যকারী হিসেবে) যাদেরকে নিতে সক্ষম হও, আল্লাহ ব্যতীত। যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাফেরদের ব্যর্থতা : কাফেররা মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিহত করতে তাদের জানমাল কুরবানি করেছে; কিন্তু এ সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটিও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। পবিত্র কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণে অবাক হয়ে কখনো তারা একে যাদু আবার কখনো পূর্ববর্তী যুগের গল্পকাহিনী এবং বানোয়াট কথা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি তারা বলত, মুহাম্মাদ (স) তা বানিয়েছেন। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথিদেরকে বলেছে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। এগুলো সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ; কিন্তু কখনই এর মোকাবেলায় একটি ছোট্ট সূরাও তারা উপস্থাপন করতে পারেনি। আর এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর, স্বভাবকবি আরবগণ যাদের কাহিনী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও নিজেদের মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভূতি সুপ্রসিদ্ধ। তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত ও জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল। অন্যদিকে তাদের সন্তানসন্ততি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দি হলো এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ এ সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলো না।

নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ (স) বারবার এ একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি, অবিশ্বাসী আরবদের এরূপ ক্ষমতা থাকলে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে পবিত্র কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে তা শুনিয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায়নি। কারণ তারা পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য তথা সাহিত্য কর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয়, তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা,

জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় এবং ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না গিয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল।

আমরা জানি, সাহিত্যিক তথা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয়, তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। এরূপ বাহাস তথা বিতর্ক অহরহ ঘটে থাকে; কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফের নেতৃবৃন্দ যদি পবিত্র কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত, তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত; কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে নিশ্চিত থাকায় এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয়নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী এবং অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

আল কুরআন রাসূল (স)-এর চিরন্তন মুজিযা : পবিত্র কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর অলৌকিকত্ব। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক আয়াত তথা মুজিযা প্রদান করেছেন। সেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাদের সমসাময়িক মানুষরা সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছে; তবে পরবর্তী যুগের মানুষরা আর তা প্রত্যক্ষ করেনি। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী (স)-কে মহান আল্লাহ অন্যান্য অসংখ্য আয়াত তথা মুজিযার পাশাপাশি চিরন্তন মুজিযা হিসেবে আল কুরআন প্রদান করেন। যার অলৌকিকত্ব যেমন তাঁর সমকালীন মানুষরা প্রত্যক্ষ করেছে এবং স্বীকার করেছে, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে।

আবু হোরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন–

مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ اُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ اِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

অর্থাৎ, নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত তথা মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন, যে মুজিযার ফলশ্রুতিতে ঐ সময়ের মানুষেরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে আয়াত তথা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহী। এজন্য আমি আশা করি যে, কেয়ামত দিবসে অন্যান্য নবীদের চেয়ে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।

কাফেরদের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত : পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কাফের মুশরিকরা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কিছু ব্যর্থ মনোরথ প্রচেষ্টার উপমা উল্লেখযোগ্য।

তারা আল্লাহ এবং তাঁর গ্রন্থের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি আয়াত রচনা করেছিল। তা হলো– اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحُبْلٰى অর্থাৎ, তুমি কি দেখছ তোমার প্রভু গর্ভবতী মহিলার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? (নাউযুবিল্লাহ)

সর্বশেষ তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বলেছে– لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়।

উপসংহার : রাসূলুল্লাহর চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং এর চ্যালেঞ্জ ছিল বিশ্বব্যাপী। কুরআন নাযিলের পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে না। এজন্যই মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জটি যথাযথ ছিল যে, এ কুরআন হেদায়াত গ্রন্থ ও সন্দেহাতীত সর্বজনীন মহাসংবিধান। আর এজন্যই তিনি বলেন– الٓمٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ;

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٤) : مَا مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ؟ اِشْرَحِ الْعَقِيْدَةَ الْاِسْلَامِيَّةَ فِى الْمَلَائِكَةِ مَعَ بَيَانِ ضَلَالِ عَقِيْدَةِ الْكُفَّارِ فِيْهِمْ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ ـ**

■ **প্রশ্ন : ৪৪ ॥ مَلَائِكَة অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে ইসলামী আকিদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং ফেরেশতাগণের বিষয়ে কাফেরদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি কুরআনে কারীমের আলোকে আলোচনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত ও অনুগত। তাঁদের একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করা। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই। তাঁদের আহার নিদ্রারও প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই; কিন্তু কিছু কিছু কাফের তাঁদের সম্পর্কে নানাভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাঁদের পরিচয়, তাঁদের প্রতি আকিদা ও কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১ مَلَائِكَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ لُغَةً :

مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটি مَلَكٌ-এর বহুবচন। শব্দটি মূলত اَلَكٌ ধাতুমূল থেকে গৃহীত। এতে মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত, মূল শব্দটি ছিল مَأْلَكٌ (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে লামের পরে এনে একে مَلْأَكٌ (মালআক) বলা হয়। বহুল ব্যবহারের ফলে হামযা অক্ষরটি লোপ পেয়ে পরবর্তীতে مَلَكٌ হয়েছে।

আরবি مَلَكٌ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– পত্র, চিঠি, দূত ইত্যাদি। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত (angel), স্বর্গীয় দূত বলা হয়।

আরবি ভাষায় مَلَكٌ শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফারসি শব্দই অধিক প্রচলিত। কখনো বহুবচনে مَلَكٌ আসে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ـ

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ إِصْطِلَاحًا :

مَلَائِكَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত।

২. আল্লামা নাসাফী (র) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ-তে উল্লেখ করেন-

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ اَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ مُبَرَّءَةٌ عَنْ مَبَادِي الشُّرُوْرِ وَالْآفَاتِ وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ قَوِيَّةٌ عَلَى الْاَفْعَالِ الْعَجِيْبَةِ عَالِمَةٌ بِالْكَوَائِنِ ـ

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যারা পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী।

৩. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ গ্রন্থকার বলেন-

اَلْمَلَائِكَةُ اَجْسَامٌ نُوْرَانِيَّةٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, مَلَائِكَة হলো জ্যোতির্ময় সত্তা, যারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয় না এবং তাঁদের যা আদেশ করা হয়, তা তাঁরা যথাযথ পালন করে।

৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

جِسْمٌ نُوْرَانِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

৫. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-

وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ وَلَا يُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ ـ

অর্থাৎ, ফেরশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তাঁর আদেশ পালনে রত আছেন এবং তাঁরা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণান্বিত নয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা ফেরেশতা, যারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তাঁরা নারী পুরুষ নন।

মহান আল্লাহ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

١ـ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ـ

٢ـ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

٣ـ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ـ

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রদানপূর্বক ইরশাদ করেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরেশতাদের দিয়েছেন দুটি করে, তিনটি করে এবং চারটি করে ডানা। আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছা করলে আরো বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুতে শক্তিমান।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা অনেক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাঁদের নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা তাঁর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা এবং তাঁর নির্দেশে সৃষ্টিকুলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করাই তাঁদের কর্ম।

⊃ اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ فِى الْمَلٰئِكَةِ :

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে চারটি মূলনীতি তথা দিক রয়েছে। যথা– ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস, গ. নামে বিশ্বাস ও ঘ. কর্মে বিশ্বাস।

ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের সম্পর্কে কাফেরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি এবং অদৃশ্য জগতের অংশ। এসবের যা কিছু পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা সবই ঈমানদার ব্যক্তি আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا - اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- (اَلْفَاطِرُ)

খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

১. ফেরেশতাগণকে আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন : আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বে তাঁদের সৃষ্টি করেছেন, মানবসৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদের জানিয়েছেন এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা আদম (আ)-কে সেজদা করেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ... فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ-

২. **ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা :** মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যাসন্তান বলে গণ্য করত, তাঁদের ইবাদত করত এবং তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করত। এসব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ۔

৩. **ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি :** মানুষকে মাটি থেকে এবং জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; কিন্তু ফেরেশতাগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁদেরকে নূর থেকে তৈরি করা হয়েছে। যেমন–

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ۔

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) جِبْرَائِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَلَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ التَّهَاوِيْلُ مِنَ الدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ۔

৪. **ফেরেশতাগণের আকৃতি :** তাঁদের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু জানানো হয়নি। তবে আমরা জানি যে, তাদের কমবেশি বিভিন্ন সংখ্যক পাখা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُوْلِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

اِنَّ النَّبِىَّ (صـ) رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ۔

৫. **আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। পূর্ণ মানব আকৃতিতে প্রকাশের বর্ণনায় আল্লাহ বলেন– فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অনুরূপ হাদীসেও মানুষের আকৃতি ধারণের বর্ণনা এসেছে।

গ. **নামে বিশ্বাস :** আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয়। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

দলীল : যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

ফেরেশতাগণের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) মিরাজের ঘটনায় বায়তুল মামূরে দায়িত্বরত (সত্তর হাজার) ফেরেশতার বর্ণনা দিয়ে বলেন–

قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يَدْخُلُهٗ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا مِنْهُ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ اٰخِرُ مَا عَلَيْهِمْ۔

এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম অহীর মাধ্যমে জানা যায়– জিবরাঈল, মিকাঈল ও মালেক। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ-

٢- وَنَادَوْا يَا مٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ-

রাসূল (স) তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করতেন এভাবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-

জিবরাঈল (আ)-কে কুরআনে اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে–

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-

কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতের ফেরেশতার নাম রিদওয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু ফেরেশতাকে আল্লাহ কর্মভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। যেমন– মালাকুল মাওত, মুনকার নাকীর, কিরামুন কাতিবুন ইত্যাদি।

ঘ. **ফেরেশতাগণের কর্মে বিশ্বাস :** ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

১. **আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ :** ফেরেশতাগণ মানবীয় জৈবিক চাহিদা। যেমন– দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। কারণ তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١- لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

٢- وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ - يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ-

২. **কর্মনির্বাহ ও কর্মবণ্টন :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে কর্মনির্বাহকারী বলে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেন–

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا-

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا

৩. **অহী পৌছানো :** ফেরেশতাগণের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর অহী পৌছানো। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-

৪. **মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ :** ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব হলো, আল্লাহ তায়ালার হুকুমে এবং তাঁরই মর্জিমতো মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ-

৫. **মানুষকে কল্যাণের কর্মে উৎসাহ প্রদান :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ثُمَّ قَرَأَ (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ)۔

৬. **মুমিনদের জন্য দোয়া করা :** ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম ঈমানদারদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দোয়া করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔

৭. মানুষের **কর্ম লিপিবদ্ধ করা :** মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, তাঁর সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআনুল কারীমে তাঁদেরকে কিরামুন কাতিবুন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন–

١۔ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔

٢۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔

৮. **মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ :** পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মাগ্রহণ করার জন্য একদল ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔

٢۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔

৯. **আরশ বহন করা :** ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো, মহান আল্লাহর আরশ বহন করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔

রাসূল (স) বলেন–

أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَحَدِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)۔

১০. **অন্যান্য কর্ম :** এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির ফেরেশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যেমন– চাঁদ সূর্যের জন্য, বৃষ্টির জন্য, পাহাড় পর্বতের জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রূণের জন্য, জাহান্নাম ও জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মের জন্য।

ضَلَالُ عَقِيدَةِ الْكُفَّارِ فِي الْمَلَائِكَةِ :

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে কাফেরদের ভ্রান্তবিশ্বাস : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে কাফেরদের কয়েকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা :** অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের মধ্যকার অনেক বীর বা সৎমানুষকে মৃত্যুর পরে ফেরেশতাগণের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি করেছে। এরপর তারা দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে। অতঃপর তাদের

ইবাদত করেছে, তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য কোনো কোনো ফেরেশতাকে বৃষ্টিপাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই বলে অমুসলিম অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মতো কখনোই সেই ফেরেশতাকে বৃষ্টির দেবতা বা দেবী মনে করে তাদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে না এবং তাদের উপাসনা করে না।

২. **সম্পর্ক ও সুপারিশ :** অমুসলিম অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত। তাঁরা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহর সাথে তাঁদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং ফেরেশতার পরিবর্তে আল্লাহ কোনো মানুষকে নবী মনোনীত করবেন একথা অবিশ্বাস্য। এ যুক্তি দিয়েই তারা তাঁদের নবীদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। তেমনিভাবে মক্কার কাফেররাও এ যুক্তি প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে।

এমনকি মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাদের সুপারিশ লাভের আশায় তাদের উপাসনা করত এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করত।

আল্লাহ তায়ালা তাদের বিভ্রান্তির জবাবে ইরশাদ করেন–

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى -

৩. **মর্যাদাগত পার্থক্য :** তৎকালীন কাফেররা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতাগণ মহান আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। এমনকি তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত। আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের বিশেষ ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে।

উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যম ও তাঁর বিশেষ বাহিনী। তাদের ব্যাপারে যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٥) : هَلِ الْبَشَرُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَمِ الْمَلَائِكَةُ اَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ؟**

■ **প্রশ্ন : ৪৫ ॥ মানুষ কি ফেরেশতার চেয়ে উত্তম? নাকি ফেরেশতা মানুষের চেয়ে উত্তম?**

او- اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ اَنَّ الْبَشَرَ اَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

অথবা, প্রমাণ কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানুষ ও ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট দুটি ভিন্ন জাতি। উভয় জাতিই আল্লাহর হুকুম আহকাম দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা মর্যাদা। তবে আল্লাহর সৃষ্ট এই দুটি জাতির মধ্যে কে মর্যাদায় উত্তম, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

هَلِ الْبَشَرُ اَفْضَلُ اَمِ الْمَلَائِكَةُ ؟ :

মানুষ উত্তম নাকি ফেরেশতা উত্তম : মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় হতে মর্যাদাবান, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং মুতাযিলা, দার্শনিক ও আশায়েরাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সকলের যুক্তি প্রমাণ ও প্রত্যুত্তরসহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** বিশিষ্ট কালামশাস্ত্রবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত নাসাফী এ বিষয়ে তিনটি সূত্র বর্ণনা করেছেন। যথা–

ক. رُسُلُ الْمَلَائِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, ফেরেশতাদের দূতগণ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। যেমন– হযরত জিবরাঈল (আ), মিকাঈল (আ), হযরত আযরাঈল (আ)। এর ওপর আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে।

খ. رُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যকার নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্যকার দূতগণের চেয়ে উত্তম। যেমন– হযরত মুহাম্মাদ (স), হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ সকল নবী প্রধান ফেরেশতা তথা জিবরাঈল, আযরাঈল (আ) প্রমুখ হতে অধিক সম্মানিত।

গ. عَامَّةُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা থেকে মর্যাদায় উত্তম।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের সমর্থনে নকলী ও আকলী দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন–

ক. নকলী দলীল : ১. সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ۔

অত্র আয়াতে দেখা যায়, হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যার মর্যাদা বেশি সে-ই মূলত সেজদা পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা মর্যাদার দিক থেকে প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

২. অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الخ۔

এ আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন, ফেরেশতাদের তুলনায় হযরত আদম (আ)-এর মর্যাদাই বেশি।

৩. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদেরকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখানে عَالَمِيْن তথা সৃষ্টজগতের মধ্যে ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ আয়াতও প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম।

৪. আদম (আ)-এর মর্যাদা যে ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি, তা ইবলিসের উক্তি থেকেই প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

١۔ قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ۔

٢۔ وَاَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ۔

৫. আমাদের প্রিয় নবীর শানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ, এতে বোঝা যায় নবী করীম (স) ফেরেশতাদের জন্যও রহমত।

৬. আর সাধারণ ফেরেশতা থেকে সাধারণ মানুষের মর্যাদা বেশি, তা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

খ. আকলী দলীল : আকলী যুক্তি দ্বারাও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রমাণ করেন যে, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। যেমন–

১. ফেরেশতা সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং সেবকের চেয়ে যাকে সেবা করা হয়, তার মর্যাদা সবসময় উর্ধ্বেই থাকে।

২. আল্লাহ তায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মানবজাতি থেকেই নির্বাচিত করেছেন। তাই বোঝা যায় মানুষই উত্তম।

৩. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে; কিন্তু ফেরেশতাদেরকে এরূপ কোনো কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে আল্লাহর ইবাদত করতে তাদের কোনো অন্তরায় নেই। সুতরাং এতে বোঝা যায় যে, মানুষ ফেরেশতার ওপর মর্যাদাবান।

২. **মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের অভিমত :** মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের অভিমত হচ্ছে, সার্বিক দিক থেকে মানবজাতি অপেক্ষা ফেরেশতাগণ মর্যাদাবান।

দলীল : তারা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে। যেমন–

১. ফেরেশতাদের দেহ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ আত্মা ও মন্দ উপাদান থেকে মুক্ত। অর্থাৎ মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি ফেরেশতাদের মধ্যে নেই। এজন্য তাঁরা মানুষ অপেক্ষা মর্যাদাবান।

২. নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَعَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স)-কে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং শিক্ষাদানকারী শিক্ষার্থীদের চেয়ে মর্যাদাবান।

৩. কুরআন ও হাদীসে নবীদের নাম সাধারণত ফেরেশতাদের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

৪. মহান আল্লাহর বাণী–

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ -

এ আয়াতে تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى হয়েছে। অতএব বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ) থেকে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি।

৫. ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয় না।

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও দলীলের খণ্ডনে বলেন–

১. তাদের উত্থাপিত প্রথম যুক্তিটি ইসলামী নীতিমালায় উপস্থাপিত নয়; বরং দার্শনিক মতবাদের ওপর উপস্থাপিত। কুরআন হাদীসের মোকাবেলায় কোনো দার্শনিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণ শিক্ষক নয়; বরং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাদান করে থাকেন। আল্লাহ নিজেই শিক্ষক, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বাণীবাহক মাত্র।

৩. ফেরেশতাগণকে মানবসৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনে তাঁদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মর্যাদার জন্য নয়।

৪. তাদের চতুর্থ দলীলের জবাবে বলা হয়, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে বিভিন্ন কারণে আল্লাহর পুত্র মনে করত। আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে অপনোদনের নিমিত্ত এ আয়াত উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না।

৫. শেষোক্ত যুক্তির জবাব হলো, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে প্রবৃত্তির চাহিদাহীন করে সৃষ্টি করায় তাঁরা তা থেকে মুক্ত। কেননা প্রবৃত্তির চাহিদা পাপে নিমজ্জিত করে। যেমন– হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় মানবীয় স্বভাব পেয়ে পাপকার্যে লিপ্ত ছিলেন।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা ও যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট, মানবজাতিই হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। মানবজাতি ফেরেশতা জাতির চেয়েও উত্তম। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٦) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ؟ اِشْرَحْ بِالتَّفْصِيْلِ مَعَ شَرْحِ عَقِيْدَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْقِيَامَةِ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ۔**

■ **প্রশ্ন : ৪৬ ॥ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? কবরের আযাব, কেয়ামত, হাশর, হিসাব, মীযান, সিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদার ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই জীবনই হলো, আখেরাত বা পরকাল। সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাউযে কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, পরকাল, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো।

⊃ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ :

আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ :

ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন– কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি,

কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

খ. مِنْهَاجُ الْمُسْلِم গ্রন্থকার বলেন-

اَلْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ بَعْثًا وَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا لِيُحَاسِبَهُمْ فَيَجْزِى الْاَبْرَارَ بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فِى الْجَنَّةِ وَيَجْزِى الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فِى النَّارِ۔

অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন।

গ. اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ-এর গ্রন্থকার বলেন-

هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْحِسَابِ وَالْمَجَازَاتِ۔

অর্থাৎ, اَلْاِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান প্রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৩ شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ فِى الْاُمُوْرِ الْمَسْئُوْلَةِ :

প্রশ্নসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ইসলামী আকিদার ব্যাখ্যা :

১. **عَذَابُ الْقَبْرِ-এর ব্যাখ্যা :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তন্মধ্যে কবরের আযাব অন্যতম। এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন-

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِى الْقَبْرِ وَاعَادَةُ الرُّوْحِ اِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِىْ قَبْرِهٖ حَقٌّ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهٗ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

অর্থাৎ, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরে করা হবে আর কবরে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়াও সত্য। কবরের চাপ ও আযাব সত্য। কাফেররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে।

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসেছে-

١۔ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ ۔ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۔ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ۔

অর্থাৎ, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও।

২- وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে বারযাখ প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

৩- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ-

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবন, পরজীবনে এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

পরকালীন জীবনের শুরু তথা কবরে রাখার সাথে সাথেই 'মুনকার নাকীর' নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

৪- وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ- اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ-

অর্থাৎ, যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাবে ও ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। সেজন্য আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আযাব ও নেয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বলে গণ্য। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার 'রূহ' তাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফেরেশতাদ্বয় স্বীয় প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। মুমিন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। তবে মুনাফিক ও কাফের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। অতএব কবরের আযাব সত্য এবং এর ওপর বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন।

২. **اَلْقِيَامَةُ তথা মহাপ্রলয়ের ব্যাখ্যা :** কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। পৃথিবীর বয়স কত হবে এবং কখন কেয়ামত হবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী–

১- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا- قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

২- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا-

৩. **اَلْحَشْرُ وَالنَّشْرُ তথা পুনরুত্থান ও হাশর :** কুরআন ও হাদীসের অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে–

১- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

২. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ـ

৩. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ

৪. اَلْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ তথা হিসাব ও প্রতিফল : হাশরবিষয়ক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুনরুত্থানের পর হিসাব এবং প্রতিফল প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি কুরআনের অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

১. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنَ ـ

২. اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

৫. اَلْمِيْزَانُ তথা মীযান : হিসাবের একটি বিশেষ দিক হলো, মহান আল্লাহ কেয়ামত দিবসে মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান তথা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

১. وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ـ

২. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ٍالْحَقُّ ـ

৩. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ

৬. اَلصِّرَاطُ তথা পুলসিরাত : صِرَاطٌ শব্দের অর্থ– পথ। সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত রাস্তা তথা সেতুকে বোঝানো হয়। আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা তথা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে, এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা মুমিনগণের জন্য আবশ্যক। নবী, সিদ্দীক, মুমিন, কাফের, হিসাবকৃত, হিসাবমুক্ত সকলকেই এ সেতু অতিক্রম করতে হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে কৃত আমল অনুযায়ী পথ অতিক্রম করবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ক. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلُ مَن يَّجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهٖ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ اِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلَ شُوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهٗ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرَ عَظْمِهَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن يُّوْبِقُ بِعَمَلِهٖ وَمِنْهُمْ مَن يَّخَرْدِلُ ثُمَّ يَنْجُوْ ـ

খ. মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন–

وَاِنَّ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে, এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. **اَلشَّفَاعَةُ তথা সুপারিশ :** اَلشَّفَاعَةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– সুপারিশ করা, কারো দাবি সমর্থন করা। শব্দটি اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। যার অর্থ– জোড়া বানানো। এ সম্পর্কে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

ক. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَشَفَاعَةُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ وَوَزْنُ الْاَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ. وَحَوْضُ النَّبِيِّ (ص) حَقٌّ. وَالْقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُوْمِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ.

অর্থাৎ, নবীগণের শাফায়াত সত্য, কেয়ামত দিবসে তুলাদণ্ডে আমল ওজন করাও সত্য, মহানবী (স)-এর হাউয সত্য। কেয়ামত দিবসে বিবাদকারীদের মধ্যে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যবস্থা করা সত্য।

খ. শাফায়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন–

قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيْثِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَهِيَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ وَالْجَرَائِمِ.

অর্থাৎ, হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফায়াত শব্দটি জাগতিক বা আখেরাতের বিষয়ে এসেছে। এর অর্থ পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

٢. مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيْعٌ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ.

৮. **হাউয :** اَلْحَوْضُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। আর এ হাউয থেকে তাঁর উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে।

اَلْحَوْضُ يُطْلَقُ عَلَى الْكَوْثَرِ هُوَ حَوْضٌ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ يَسْقِىْ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْهُ.

অর্থাৎ, اَلْحَوْض হচ্ছে اَلْكَوْثَر আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কূপ, যা হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন।

ত্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া' গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক তাঁর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন–

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِىْ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ ـ

অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব, আমার হাউযের পরিমাণ তদ্রূপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির ন্যায়।

খ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন–

بَيْنَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذَا اُغْفِىَ إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ .....)

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার ওপর একটি সূরা নাযিল করা হলো। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করেন।

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَّشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

৯. **اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ তথা জান্নাত ও জাহান্নাম :** জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। নচেৎ কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার বিধান অস্বীকার করা। যেমন– ক. মহান আল্লাহর বাণী–

١ـ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

٢ـ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ـ

٣ـ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ اَبَدًا وَلَا تَمُوْتُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَبَدًا وَلَا يَفْنِىْ عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَثَوَابُهُ سَرْمَدًا ـ

অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তালোচনা হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।

১০. اَشْرَاطُ السَّاعَةِ তথা কেয়ামতের নিদর্শন : কেয়ামতের নিদর্শন সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْاَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

অর্থাৎ, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং কেয়ামতের অন্যান্য পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। যথা- ক. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন, খ. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো–

ক. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন : সাধারণ পূর্বাভাসের অন্যতম হচ্ছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন। যেমন সাহাবী হযরত সাহল (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন– بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ অর্থাৎ, আমি প্রেরিত হয়েছি কেয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়া কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে; কিন্তু মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। এসব নিদর্শন প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে।

খ. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় নিদর্শন : এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشَرَ اٰيَاتٍ ... وَنُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔

অর্থাৎ, দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হলো–

১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. পশ্চিম দিকে ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, ৪. ধুম্র, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ। (মুসলিম)

এ বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সাথিদের আকিদা বর্ণনা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

وَنُؤْمِنُ بِاَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ... وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَّدَّعِىْ شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاِجْمَاعَ الْاُمَّةِ۔

অর্থাৎ, আমরা কেয়ামতের নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করি, যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, ...। আমরা কোনো গণক, জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করি না। অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্যের বিপরীত কোনো কিছু দাবি করে।

উপসংহার : পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন ও মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে না। মূলত আখেরাতের বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত ইবাদতকারী ও মুত্তাকী হতে সাহায্য করে।

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٧) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ؟ اِشْرَحْ بِالتَّفْصِيْلِ مَعَ شَرْحِ عَقِيْدَةِ الصِّرَاطِ وَالْحَوْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ۔**

■ **প্রশ্ন : ৪৭ ॥ আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম, কেয়ামতের পূর্বাভাসবিষয়ক আকিদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই জীবনই হলো, আখেরাত বা পরকাল। সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাউযে কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, পরকাল, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

➲ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ :

আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ : ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন– কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন।

খ. مِنْهَاجُ الْمُسْلِمِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ بَعْثًا وَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا لِيُحَاسِبَهُمْ فَيَجْزِى الْاَبْرَارَ بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فِى الْجَنَّةِ وَيَجْزِى الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فِى النَّارِ۔

অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন।

গ. اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ-এর গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْحِسَابِ وَالْمُجَازَاتِ۔

অর্থাৎ, اَلْاِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান প্রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

بَيَانُ عَقِيْدَةِ الصِّرَاطِ وَالْحَوْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاشْرَاطِ السَّاعَةِ :

সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের পূর্বাভাস বিষয়ক আকিদার বর্ণনা : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের আলামতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এ সকল বিষয়ের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. **সিরাত :** صِرَاطٌ শব্দের অর্থ– পথ। সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত রাস্তা তথা সেতুকে বোঝানো হয়। আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা তথা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে– এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা মুমিনগণের জন্য আবশ্যক। নবী, সিদ্দীক, মুমিন, কাফের, হিসাবকৃত, হিসাবমুক্ত সকলকেই এ সেতু অতিক্রম করতে হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে কৃত আমল অনুযায়ী পথ অতিক্রম করবে।

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

আহলুস সুন্নাতের অভিমত : তাদের মতে, সিরাত বাস্তব সত্য ও অবশ্যম্ভাবী। তাদের মতের পক্ষে পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেমন–

ক. আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَّجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهٖ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلَ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهِمَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسُ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْبِقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّخَرْدِلُ ثُمَّ يَنْجُوْ۔

খ. মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে বলেন–

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا۔

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুতাযিলাদের অভিমত : অধিকাংশ মুতাযিলা সিরাতকে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আবু আলী আল জুবায়ী থেকে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তার একমতে সিরাত সত্য, অন্য মতে সত্য নয়।

আবুল হোযাইল ও বিশর ইবনে মুতামার বলেন, সিরাত হওয়া বৈধ। তবে বাস্তবে হবে না।

তারা আকলী দলীল তথা যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক বলে, সিরাতের গুণ বর্ণনায় হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, তা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম, তরবারির চেয়েও ধারালো হবে। অথচ যদি সিরাত এমন হয়, তাহলে তা অতিক্রম করা অসম্ভব। আর অতিক্রম করা সম্ভব হলেও মুমিনদের জন্য তা হবে শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাতের অস্তিত্ব বিবেচ্য নয়।

সত্যপন্থিদের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : সত্যপন্থিগণ জবাব প্রদানকল্পে বলেন, আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মহাক্ষমতার অধিকারী, সেহেতু তিনি পুলসিরাত অতিক্রম করার সামর্থ্য দিতে পারেন। আর তিনি মুমিনদের ওপর তা খুব সহজ করে দেবেন। এমনকি মুমিনদের কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করবে।

২. **হাউয :** اَلْحَوْضُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। আর এ হাউয থেকে তাঁর উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে।

اَلْحَوْضُ يُطْلَقُ عَلَى الْكَوْثَرِ هُوَ حَوْضٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَسْقِى الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْهُ ـ

অর্থাৎ, اَلْحَوْض হচ্ছে اَلْكَوْثَر আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কূপ, যা হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন।

ত্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া' গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক তাঁর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন–

إِنَّ قَدْرَ حَوْضِى كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ ـ

অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব, আমার হাউযের পরিমাণ তদ্রূপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির ন্যায়।

খ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন–

بَيْنَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذَا اُغْفِىَ إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ .....)

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার ওপর একটি সূরা নাযিল করা হলো। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করেন।

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

৩. **জান্নাত ও জাহান্নাম :** জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। নচেৎ কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার বিধান অস্বীকার করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

٢ـ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ـ

٣ـ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

٤ـ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ـ

٥ـ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ـ

٦ـ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ـ

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ اَبَدًا وَلَا تَمُوْتُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَبَدًا وَلَا يَفْنِىْ عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَثَوَابُهُ سَرْمَدًا ـ

অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।

আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? আর জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকটস্থ করা হবে, কোনো দূরত্ব থাকবে না। যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীতচিত্তে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে, শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ কর; এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী হেফাযতকারীর জন্য। সেথায় যা কামনা করবে, তা-ই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক।

৪. **কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ :** কেয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। যেমন–

ক. কেয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই অবগত : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই; তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ-

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে।

١- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ الخ-

খ. কেয়ামতের আলামত তথা পূর্বাভাস : কেয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানাননি; কিন্তু কেয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰهُمْ-

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। যথা– ১. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন, ২. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো–

১. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট বা সাধারণ নিদর্শন : সাধারণ পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন। যেমন সাহাবী হযরত সাহল (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন– بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهٖ مِنْ هٰذِهٖ

অর্থাৎ, আমি প্রেরিত হয়েছি কেয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি।

এছাড়া হাদীস থেকে জানা যায়, কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে; কিন্তু মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। এসব নিদর্শন প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে।

২. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى **তথা বড় বা বিশেষ নিদর্শন :** এ ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন- اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشَرَ اٰيَاتٍ .... وَنُزُوْلُ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ অর্থাৎ, দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হলো- ১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. পশ্চিম দিকে ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, ৪. ধূম্র. ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব. ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ।

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এখানে কিছু আলামতের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তা মেনে নেয়া।

উপসংহার : কেয়ামত, হাউযে কাউসার, সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সবই সত্য। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই। অবিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না এবং অস্বীকারকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٨) : اَثْبِتْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَسُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ بِالْاَدِلَّةِ ـ ثُمَّ أذْكُرْ أَدِلَّةَ الْمُخَالِفِيْنَ فِيْهِ مَعَ جَوَابِ أَدِلَّتِهِمْ ـ

■ প্রশ্ন : ৪৮ ॥ কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন ও উত্তর দলীলসহ প্রমাণ কর। অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও। [ফা. প. ২০১৪]

او. اَثْبِتْ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَعَذَابَ الْقَبْرِ بِالْاَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ ـ وَمَنْ خَالَفَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ؟ وَمَاذَا دَلَائِلُهُمْ وَمَا الْجَوَابُ عَنْهَا؟

অথবা, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব এবং কবরের আযাব সাব্যস্ত হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। কারা এ মাসয়ালার বিরোধিতা করেছে? তাদের দলীল এবং প্রত্যুত্তর কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীবন মানবজাতির জন্য চিরন্তর নয়। এ ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন কালের সেই ঘোষিত আখেরাত। মহান আল্লাহ বলেন- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى; মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত مُنْكَرٌ ও نَكِيْرٌ নামক দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ প্রশ্নোত্তর পর্বের যথার্থতা সম্পর্কে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ঐকমত্য পোষণ করেছেন বটে; কিন্তু مُعْتَزِلَةٌ সম্প্রদায় এ মতে বিশ্বাসী নয়। এ বিতর্কিত বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১. سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيْرٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ :

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা। মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তাঁরা এসে তাকে মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন ৩টি হলো-

১. مَنْ رَّبُّكَ অর্থাৎ, তোমার রব কে? ২. وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ, তোমার দীন কী?

৩. وَمَنْ نَبِيُّكَ অর্থাৎ, তোমার নবী কে?

তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্বয় কবরবাসীদের সামনে মহানবী (স)-এর আকৃতি উপস্থাপন করে জিজ্ঞেস করবেন- مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ هَلْ تَعْرِفُهٗ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কে? তুমি কি তাঁকে চিন?

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরসমূহ : যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যেমন প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলবে- رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- دِيْنِى الْاِسْلَامُ অর্থাৎ, আমার দীন ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- نَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা هٰذَا الرَّجُلُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, এ ব্যক্তি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)।

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলবে, هَا هَا لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ, হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না।

মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল : মৃতব্যক্তিকে কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে নকলী ও আকলী একাধিক দলীল বিদ্যমান। যেমন-

ক. নকলী দলীল : ১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন-

اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ .... الخ۔

অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিকে কবর দেয়ার পর তার নিকট কৃষ্ণ ও হরিদ্র বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আগমন করবে। একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম নাকীর।

২, অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ اَنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ (صـ) ......۔

৩. রাসূল (স) অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন-

وَعَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ۔

৪. অপর এক হাদীসে এসেছে, মুনকার ও নাকীর ঈমানদারকে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তাঁরা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে। যেমন আবু দাউদ শরীফে এসেছে-

فَيُنَادِىْ مُنَادٍ عَنِ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ۔

খ. আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তাঁর কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন, আমাদের মনিব তথা প্রভু। তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগ যুগ ধরে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন?

مُخَالِفُ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ :

এ মাসয়ালার বিরোধিতাকারী : মুতাযিলা ও রাফেযীরা এ মাসয়ালার বিরোধিতা করেছে। তাদের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে, মুনকার নাকীরের প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; তবে কিছুসংখ্যক মুতাযিলা কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্ন স্বীকার করে না।

খ. রাফেযীদের অভিমত : রাফেযী সম্প্রদায়ের মতে, মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ স্বীকৃত নয়। তাদের মতে, কবরে প্রশ্ন করা হবে না; বরং হাশরে বিচার করা হবে।

উভয়ের দলীল : মুতাযিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতব্যক্তি হলো جَمَاد তথা জড়বস্তুর ন্যায়। এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অবাস্তব ও অসম্ভব কাজ।

اَلْاِجَابَةُ عَنْ اَقْوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ :

মুতাযিলা ও রাফেযীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে আহলে হকগণ বলেন–

১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড় পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই, তবে আত্মা মরে না। আত্মার অমরত্বে সবাই বিশ্বাসী। সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২. বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে জড় পদার্থকে আবার জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন। যেমন এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

৩. আহলে হকদের মতামত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মুতাযিলা ও রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

اِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ :

কবরের শাস্তির প্রমাণ : কবরের শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : দুনিয়া ত্যাগ করার পর মানুষ আখেরাতে প্রথম যে জগতে প্রবেশ করে, তার নাম কবর। মৃতব্যক্তি যদি গুনাহগার হয়, তাহলে কবর জগৎ থেকেই তার শাস্তি শুরু হয়। আর যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে কবর জগৎ থেকেই নেয়ামতপ্রাপ্তি শুরু হয়। এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত।

খ. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত হলো, মানুষ মারা গেলে নিষ্প্রাণ পাথরের ন্যায় হয়ে যায়। ফলে মৃতব্যক্তির ওপর আযাব দেয়া ও না দেয়া উভয়ই সমান। সুতরাং তাদের মতে, কবরে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং তাকে মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা সার্বিক কাফের ও কোনো কোনো মুমিনের ওপর কবরের আযাবের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। নিম্নে কবরের আযাবের প্রমাণকারী কুরআন ও হাদীসের দলীল পেশ করা হলো। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١ـ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ـ

আয়াতটি কবরের আযাব প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ـ

অত্র আয়াতের فَاُدْخِلُوْا উক্তির "ف" অব্যয় দ্বারা বোঝা যায় যে, ফিরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার সাথে সাথে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। সুতরাং মৃতব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার ওপর কবরের আযাব সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়।

অন্যদিকে রাসূল (স)-এর বাণী- اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

রাসূল (স) আরো ঘোষণা করেন-

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ ـ

মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন-

اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَسْئَلَانِ عَنْ رَبِّهٖ وَدِيْنِهٖ وَنَبِيِّهٖ ـ

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত হয়।

উপসংহার : অতএব একথা সুস্পষ্ট, মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং আমাদের উচিত সর্বদা তাঁর নির্দেশিত পথেই চলা।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٩) : اَثْبِتْ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ بِالْاَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৪৯ মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ দলীলসহ প্রমাণ কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীবন মানবজাতির জন্য চিরন্তর নয়। এ ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন কালের সেই ঘোষিত আখেরাত। মহান আল্লাহ বলেন-

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ـ

মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত نَكِيْر ও مُنْكَر নামক দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ প্রশ্নোত্তর পর্বের যথার্থতা সম্পর্কে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ঐকমত্য পোষণ করেছেন বটে; কিন্তু مُعْتَزِلَة সম্প্রদায় এ মতে বিশ্বাসী নয়। এ বিতর্কিত বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয়।

⊃ سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيْرٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ :

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা। তারা মৃতব্যক্তিকে যে সকল প্রশ্ন করবেন, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নসমূহ : মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তাঁরা এসে তাকে মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন ৩টি হলো-

১. مَنْ رَبُّكَ অর্থাৎ, তোমার রব কে? ২. وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ, তোমার দীন কী?

৩. وَمَنْ نَبِيُّكَ অর্থাৎ, তোমার নবী কে?

তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্বয় কবরবাসীদের সামনে মহানবী (স)-এর আকৃতি উপস্থাপন করে জিজ্ঞেস করবেন- مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ هَلْ تَعْرِفُهٗ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কে? তুমি কি তাঁকে চিন?

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরসমূহ : যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যেমন প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলবে– رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে– دِيْنِى الْاِسْلَامُ অর্থাৎ, আমার দীন ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে– نَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা هٰذَا الرَّجُلُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, এ ব্যক্তি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)। পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলবে– هَا هَا لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ, হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না।

মুনকার ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল : মৃতব্যক্তিকে কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে একাধিক নকলী ও আকলী দলীল বিদ্যমান। যেমন–

ক. নকলী দলীল : ১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ .... اَلْخ.

অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিকে কবর দেয়ার পর তার নিকট কৃষ্ণ ও হরিদ্র বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আগমন করবে। একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম নাকীর।

২. অন্য হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهٗ اَنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ (صـ) ....

৩. অন্য হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

وَعَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَا هٰذَا الرَّجُلُ.

৪. অপর এক হাদীসে এসেছে, মুনকার ও নাকীর ঈমানদারকে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তারা সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে। যেমন আবু দাউদ শরীফে এসেছে–

فَيُنَادِىْ مُنَادٍ عَنِ السَّمَاءِ اِنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ.

খ. আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তাঁর কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমাদের মনিব তথা প্রভু। তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগ যুগ ধরে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন?

মুতাযিলাদের অভিমত : مُعْتَزِلَة সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে, مُنْكَر ও نَكِيْر-এর প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; তবে কিছুসংখ্যক مُعْتَزِلَة কবরে مُنْكَر ও نَكِيْر-এর প্রশ্ন স্বীকার করে না।

রাফেযীদের অভিমত : রাফেযী সম্প্রদায়ের মতে, مُنْكَر ও نَكِيْر-এর জিজ্ঞাসাবাদ স্বীকৃত নয়। তাদের মতে, কবরে প্রশ্ন করা হবে না; বরং হাশরে বিচার করা হবে।

উভয়ের দলীল : মুতাযিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতব্যক্তি হলো, جماد তথা জড়বস্তুর ন্যায়। এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অবাস্তব ও অসম্ভব কাজ।

মুতাযিলা ও রাফেযীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে আহলে হকগণ বলেন–

১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড়পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই; তবে আত্মা মরে না। আত্মার অমরত্বে সবাই বিশ্বাসী। সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২. বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে জড়পদার্থকে আবার জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন– اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ;

৩. আহলে হকদের মতামত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মুতাযিলা ও রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উপসংহার : মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং আমাদের উচিত, সর্বদা তাঁর নির্দেশিত পথে চলা।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٠) : "اَلْاِيْمَانُ بِالْحَشْرِ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ الدِّيْنِ وَاِنْكَارُهٗ كُفْرٌ بِالْيَقِيْنِ" تَحَدَّثْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاِنْكَارِهٖ فِىْ ضَوْءِ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ مُدَلَّلًا وَمُفَصَّلًا۔

■ প্রশ্ন : ৫০ ॥ اَلْاِيْمَانُ بِالْحَشْرِ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ الدِّيْنِ وَاِنْكَارُهٗ كُفْرٌ بِالْيَقِيْنِ উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬,'১৮]

او۔ عَرِّفِ الْبَعْثَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ۔ ثُمَّ اَثْبِتْ بِاَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ بِالْاَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ. وَاجِبْ عَنْ اَدِلَّةِ مُنْكِرِيْهِ مُوْضِحًا۔

অথবা, আল বায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের উত্তর দাও। [ফা. প. ২০১৪]

او۔ مَا مَعْنَى الْبَعْثِ؟ هَلْ هُوَ مُحَالٌ عَقْلًا؟ وَمَا الدَّلِيْلُ عَلٰى حَقِّيَّتِهٖ؟ وَمَاذَا يَرِدُ عَلَيْهِ؟ وَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟

অথবা, بَعْث তথা পুনরুত্থান বলতে কী বোঝ? এটা কী যুক্তির মানদণ্ডে অসম্ভব? এর সত্যতার দলীল কী? এর ওপর কী কী আপত্তি উত্থাপিত হয়? এবং তার প্রত্যুত্তর কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনই মানবের শেষ জীবন নয়। এ জীবনের পর রয়েছে এক অনন্তকালের মহাজীবন। পার্থিব জীবনের সকল হিসাব নিকাশ দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিনজাতিকে পুনরুত্থান দিবসে সমবেত করবেন। সকল মৃতকে আবার জীবন দান করবেন। পুনরায় সেই জীবন লাভের নামই بَعْث; بَعْث তথা পুনরুত্থান আকাইদশাস্ত্রের একটি বিতর্কিত ও দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত পর্যালোচনা নিম্নরূপ।

بَعْث-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْبَعْثِ لُغَةً :

بَعْث-এর আভিধানিক অর্থ : بَعْثٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْإِرْسَالُ তথা প্রেরণ করা (To send)। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–
إِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا۔

২. اَلْإِحْيَاءُ তথা পুনর্জীবিত করা। যেমন আল্লাহ বলেন– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ

৩. اَلْإِيْقَاظُ তথা জাগ্রত করা। যেমন বলা হয়– بَعَثَهُ مِنْ نَوْمِهِ اَىْ اَيْقَظَهُ

৪. উত্তেজিত করা।

৫. তবে এখানে بَعْثٌ শব্দটি জীবিত করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

مَعْنَى الْبَعْثِ اِصْطِلَاحًا :

بَعْث-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় بَعْث-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ প্রণেতা আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন–
وَهُوَ اَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَوْتٰى مِنَ الْقُبُوْرِ بِاَنْ يَّجْمَعَ اَجْزَاءَهُمُ الْاَصْلِيَّةَ وَيُعِيْدَ الْاَرْوَاحَ اِلَيْهَا۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সকল মৃতকে তাদের প্রকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ কবর থেকে উত্থান করা এবং তাদের মাঝে পুনরায় আত্মা ফিরিয়ে দেয়াকে بَعْث বলে।

২. رَائِدُ الطُّلَّابِ প্রণেতার মতে– لَبَعْثُ أَيْ اَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মৃত্যুর পর বান্দাকে পুনরায় জীবিত করাই হচ্ছে بَعْث;

৩. কারো কারো মতে– يَوْمُ الْبَعْثِ أَيْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনই হচ্ছে بَعْث তথা পুনর্জীবিত করার দিন।

اِثْبَاتُ حَقِيْقَةِ الْبَعْثِ :

পুনরুত্থানের সত্যতার প্রমাণ : পুনরুত্থানের সত্যতা তথা যুক্তির মানদণ্ডে بَعْث অসম্ভব কিনা, এটা عِلْمُ الْعَقَائِد-এর একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** هَلْ هُوَ مُحَالٌ عَقْلًا এ মাসয়ালায় اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর মত বর্ণনা করে عَقَائِدُ النَّسَفِىْ প্রণেতা আল্লামা ওমর নাসাফী (র) বলেন– اَلْبَعْثُ حَقٌّ অর্থাৎ, بَعْث তথা পুনরুত্থান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ও সত্য। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলে অভিহিত করা হবে।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাঁদের মতের পক্ষে আকলী ও নকলী দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

ক. নকলী দলীল : নকলী দলীল হিসেবে তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেন–

١۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ۔

٢۔ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ۔ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ۔

٣. قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

٤. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا. هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ.

উপরিউক্ত প্রতিটি আয়াত প্রমাণ করে যে, بَعْثٌ তথা পুনরুত্থান অবশ্যই হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

খ. আকলী দলীল : তাঁদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো–

১. মনিব যেমন তাঁর কর্মচারী থেকে কর্মের শেষে হিসাব নিয়ে থাকেন, তেমনি আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মনিব তথা প্রভু। তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব নেবেন। আর হিসাবনিকাশের জন্য অবশ্যই পুনরুত্থান হতে হবে।

২. আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর নিকট অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কেননা তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যেমন তিনি বলেন– كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ, হয়ে যাও; সাথে সাথেই হয়ে যায়। তাই মৃত্যুর পর মানুষকে بَعْثٌ তথা পুনরুত্থান করাও তার পক্ষে সম্ভব।

৩. সকল ধর্ম ও মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই পার্থিব কর্মের হিসাবনিকাশে বিশ্বাসী। আর হিসাবনিকাশের জন্য পুনরুত্থান হতে হবে।

৪. যেহেতু প্রথমবার আল্লাহ কোনো মিসাল তথা নমুনা ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু পুনরায় হুবহু সৃষ্টি করা তো আরো সহজ।

২. অবিশ্বাসী দার্শনিকদের অভিমত : দার্শনিকগণ بَعْثٌ তথা পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না; বরং তারা বলেন بَعْثٌ তথا পুনরুত্থান কখনই সম্ভব নয়। কেননা اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ بِعَيْنِهٖ مُمْتَنِعٌ অর্থাৎ, ধ্বংসপূর্ণ বস্তুকে হুবহু পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব। মৃতের শরীর যেহেতু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাই তাকে আবার জীবিত করাও অসম্ভব ব্যাপার।

দার্শনিকদের অভিযোগ : দার্শনিকগণ পরকালীন জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনটি অভিযোগ আরোপ করে থাকে। যথা–

১. اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ অর্থাৎ, অস্তিত্বহীন বস্তু পুনঃসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আল কুরআন তাদের উক্তিকে এভাবে তুলে ধরেছে– قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ

২. কোনো ব্যক্তিকে যদি বাঘে খেয়ে ফেলে, তবে তাকে কিভাবে পুনর্জীবিত করা হবে?

৩. পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের মতবাদ। সুতরাং ইসলামী আকিদায় পুনর্জন্মের অনুরূপ بَعْثٌ তথা পুনরুত্থান বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অভিযোগের জবাব : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে দার্শনিকদের অভিযোগের জবাব নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হয়–

১. তাঁদের প্রথম অভিযোগের জবাবে বলা হয়, اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। কেননা বলা হয়েছে– كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ

২. দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে বলা হয়- اَجْزَاء اَصْلِيَّة দ্বারা بَعْث হবে। আর اَجْزَاء مَاكُوْلَة অতিরিক্ত অংশ।

৩. হিন্দুদের পুনর্জন্ম বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আবার এ জড় জগতেই মানুষ কিংবা জীবজন্তুর বেশে আগমন করে। আমাদের মতে, পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব শরীরে পুনরায় জীবন লাভ করবে। সুতরাং তাদের সাথে আমাদের ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. **কতিপয় مُتَكَلِّم-এর অভিমত :** কিছুসংখ্যক مُتَكَلِّم তথা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য হলো পুনরুত্থান সত্য, তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে তা ঘটবে না; বরং নতুন শরীরে পূর্বের رُوْح প্রদান করা হবে।

দলীল : হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতীদের দেহ পশমহীন হবে এবং জাহান্নামীদের দাঁত উহুদ পাহাড়সম হবে। অতএব বোঝা গেল, দুনিয়ার দেহ ও পরকালীন দেহ এক নয়।

প্রত্যুত্তর : হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে হকগণ বলেন, ব্যক্তির শরীরের গুণগত রূপ পরিবর্তন হবে; কিন্তু মূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকই থাকবে।

উপসংহার : মৃত্যুর পর সকলেরই পুনরুত্থান হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এ পুনরুত্থান মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরেই ঘটবে, নতুন করে সৃজিত শরীরে নয়।

■ **اَلسُّؤَالُ (٥١) : اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ اَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَاَنَّهُمَا مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ - اَجِبْ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُنْكِرِيْنَ -**

■ **প্রশ্ন : ৫১ ॥ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং এতদুভয় বর্তমানে বিদ্যমান আছে। অতঃপর অস্বীকারকারীদের দলীলের জবাব দাও।**

او - اَثْبِتْ وُجُوْدَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِالْاَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ مَعَ تَرْدِيْدِ اَقْوَالِ الْمُخَالِفِيْنَ -

অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি খণ্ডনপূর্বক নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সাব্যস্ত কর।

او - هَلِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ اَمْ لَا؟ فَصِّلِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ ذِكْرِ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ مُدَلَّلًا -

অথবা, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ মাসয়ালায় বিশেষজ্ঞদের মতভেদ দলীলসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا; অন্যদিকে কাফেরদের জন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করে বলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ; এখন প্রশ্ন হলো, এ جَنَّة ও جَهَنَّم বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা? এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

هَلِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُوْدَتَانِ الْأٰنَ : ○

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা : আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বর্ণনা করে اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةِ প্রণেতা আল্লামা ওমর নাসাফী (র) বলেন–

اَلْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانِ بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ وَلَا يَفْنَى اَهْلُهُمَا ـ

অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এতদুভয় আল্লাহর সৃষ্টি এবং বর্তমানে বিদ্যমান আছে। এ দুটি অনন্তকাল বহাল থাকবে। তা কখনো ধ্বংস হবে না এবং এতদুভয়ের অধিবাসীরাও কখনো ধ্বংস হবে না। তাদের মতে, جَنَّة ও جَهَنَّم আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃষ্টি করেছেন।

দলীল : ক. নকলী দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন–

১. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করার পর আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ, (হে আদম!) তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।

২. মুত্তাকীগণের সৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাতের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ـ

৪. মহান আল্লাহর ঘোষণা– تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

৫. মহানবী (স) মিরাজ ভ্রমণের সময় জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন তিনি (স) ইরশাদ করেন– اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ অর্থাৎ, (মিরাজ রজনীতে) আমি জান্নাতকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন সেখানে অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দরিদ্রগণকে দেখলাম এবং আমি জাহান্নামকে অবলোকন করলাম, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরূপে আমি মহিলাগণকে দেখলাম।

৬. হাদীসের ভাষ্য–

حَدِيْثُ اَنَسٍ فِىْ قِصَّةِ لَيْلَةِ الْاِسْرَاءِ ـ وَفِىْ اٰخِرِهٖ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) ثُمَّ انْطَلَقَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتٰى سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهُمَا اَلْذَانِ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ قَالَ (صـ) ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا هِىَ ..... اَلخ ـ

খ. আকলী দলীল : যুক্তির নিরিখেও আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি যে, جَنَّة ও جَهَنَّمْ বর্তমানে বিদ্যমান আছে। কেননা–

১. মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে রেখেছেন। কাজেই এখনো জান্নাত বিদ্যমান আছে। আর নবী করীম (স) জাহান্নামকে মিরাজ রজনীতে প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই জাহান্নাম এখনো বিদ্যমান আছে।

২. সৎকর্মপরায়ণ কবরবাসীর শান্তির জন্য কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ করা হয়, তা জান্নাতের একটি উদ্যানে পরিণত হয়। তদ্রূপ পাপীদের কবর অশান্তির গহ্বরে পরিণত হয়; যাতে সাপবিচ্ছু থাকে (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) যেমন হাদীসে এসেছে–
اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ۔
সুতরাং প্রমাণিত হলো جَنَّة ও جَهَنَّم এখনো বিদ্যমান আছে।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তবে বর্তমানে তা বিদ্যমান নেই; বরং বিচার দিবসে সৃষ্টি করা হবে।

দলীল : مُعْتَزِلَة সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলগুলো পেশ করে থাকে–

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ; অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, جَنَّة-এর প্রশস্ততা হবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়। অতএব পৃথিবীতে বর্তমানে جَنَّة ও جَهَنَّم-এর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। তাই পৃথিবীর ধ্বংসের পরই কেবল جَنَّة ও جَهَنَّم সৃষ্টি করা সম্ভব।

খ. মহান আল্লাহর বাণী– تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا; এ আয়াতে نَجْعَلُ-এর মধ্যে فِعْل مُضَارِع ব্যবহার করায় বুঝা যাচ্ছে جَنَّة পরকালে সাজানো হবে। বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

গ. مُعْتَزِلَة সম্প্রদায় আরো বলে থাকেন, মহান আল্লাহর বাণী– اُكُلُهَا دَائِمٌ দ্বারা বোঝা যায় যে, جَنَّة-এর ফলফলাদি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে; অথচ আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছুই কেয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ; সুতরাং এতে বোঝা গেল, জান্নাতের সৃষ্টি কেয়ামতের পরে হবে।

৩. **অবিশ্বাসী কতিপয় দার্শনিকের অভিমত :** ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী কিছুসংখ্যক দার্শনিকের মতে, জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ভবিষ্যতেও হবে না।

⊃ اَلرَّدُّ عَلٰى اَدِلَّةِ الْمُنْكِرِيْنَ :

অস্বীকারকারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. اَهْلُ الْحَقِّ তথা সত্যপন্থিগণ মুতাযিলাদের প্রথম দলীলের প্রত্যুত্তরে বলেন, আকাশ ও যমীনের পাশাপাশি এর সমতুল্য আরেকটি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা মহান আল্লাহর জন্য কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। যেমন তিনি বলেন– وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ; তিনি হলেন فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ; সুতরাং মুতাযিলাদের এ মন্তব্য ভ্রান্ত ও অবান্তর।

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, فِعْل مُضَارِع-এর সীগাহ দ্বারা অনেক সময় حَال বা اِسْتِمْرَارِىْ-এর অর্থ مُرَاد নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ;

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে اَهْلُ الْحَقِّ তথা সত্যপন্থিগণ বলেন, اُكُلُهَا دَائِمٌ-এর অর্থ যদি এটা নেয়া হয় যে, সর্বদা বিদ্যমান তথা অক্ষত থাকবে, তাহলে اَهْلُ الْجَنَّاتِ খাবে কী? সুতরাং এর অর্থ হবে– اَهْلُ الْجَنَّاتِ তথা জান্নাতের অধিবাসীগণ খেতে খেতে ফলফলাদি নিঃশেষ করে ফেলবে, তা আবার পূর্ণ করে দেয়া হবে।

৪. দার্শনিকদের বক্তব্যের জবাবে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বলেন, দার্শনিকদের এ বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা جَنَّة ও جَهَنَّم-কে অস্বীকার করা মানে আল্লাহকেই অস্বীকার করা।

উপসংহার : মানুষের মধ্যে যারা আস্তিক বা মুমিন তারা অবশ্যই একদিন জান্নাত লাভ করবে আর যারা নাস্তিক তাদেরকে জাহান্নাম দেয়া হবে। অতএব জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্য এবং এতদুভয় বর্তমানে বিদ্যমান আছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٢) : اَثْبِتْ بِالدَّلِيْلِ اَنَّ الْوَزْنَ حَقٌّ وَالْكِتَابَ حَقٌّ وَالصِّرَاطَ حَقٌّ - وَاَجِبْ عَنِ الْمُنْكِرِيْنَ-

■ প্রশ্ন : ৫২ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন সত্য, কিতাব সত্য এবং সিরাত সত্য। অতঃপর বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদ খণ্ডন কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে মীযান নামক দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পাপপুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। নিম্নে প্রশ্নালোকে وَزْن তথা আমলের পরিমাপ, كِتَاب তথা আমলনামা ও صِرَاط তথা পুলসিরাত এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

اَلْوَزْنُ حَقٌّ ◌ :

আমলের ওজন সত্য : মৃত্যুর পর পরকাল তথা কেয়ামত দিবসে মানুষের কৃতকর্মের পরিমাপ করা সম্ভব বা সত্য কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, اَلْوَزْنُ حَقٌّ অর্থাৎ কৃতকর্মের পরিমাপ করা সত্য। মহান আল্লাহ মীযানের মাধ্যমে মানুষের আমলের পরিমাপ করবেন। আর মীযান বলা হয় عَمَّا يُعْرَفُ بِهٖ مَقَادِيْرُ الْاَعْمَالِ অর্থাৎ এমন যন্ত্র যার দ্বারা আমলের পরিমাণ জানা যায়। অবশ্য এর ধরন তথা প্রকৃতি মানবজ্ঞান বহির্ভূত।

দলীল : আল্লাহ তায়ালা আমলের ওজনের সত্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

١ـ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

٢ـ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ

এছাড়াও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পরিমাপের জন্য দুটি পাল্লা ও একটি দাঁড়ি থাকবে, এক পাল্লায় পুণ্য ও অপর পাল্লায় পাপ রাখা হবে। নেকের পাল্লা ভারী হলে বেহেশতে এবং পাপের পাল্লা ভারী হলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো পরকালে আমলের ওজন করা হবে, এটা সত্য নয়; বরং এটা অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার।

দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে থাকে–

ক. আমলসমূহ হচ্ছে কায়াবিহীন বস্তু। যার শরীর নেই, অস্তিত্ব নেই, তাকে কিভাবে ওজন করা হবে?

খ. আল্লাহ তায়ালা সকল আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আল্লাহর জ্ঞানে থাকা বস্তুকে আবার পরিমাপ করা অর্থহীন।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুতাযিলাদের দলীলের উত্তরে বলেন–

ক. اِنَّ كِتَابَ الْاَعْمَالِ هِيَ الَّتِيْ تُوْزَنُ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমলসমূহের কিতাব ওজন করা হবে। হাদীসের এ উক্তির আলোকে বলতে হবে, আমলনামা ওজন করা হবে, এতে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

খ. আমলের পরিমাপ করার মধ্যে মহান আল্লাহর হেকমত নিহিত রয়েছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা– فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ সুতরাং আমাদের বোধগম্য না হলেও সে বিষয়কে অবাস্তব মনে করা উচিত নয়।

৩ اَلْكِتَابُ حَقٌّ :

কিতাব সত্য : পরকালীন জীবনে মানুষের আমলনামা তথা কিতাব সত্য হওয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হলো– اَلْكِتَابُ حَقٌّ তথা কিতাব সত্য। যাতে মানুষের সৎকর্ম ও অসৎ কর্মসমূহের খতিয়ান লিপিবদ্ধ থাকবে। আর এ আমলনামা মুমিনদের ডান হাতে এবং কাফেরদের বাম হাতে ও পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١ـ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا ـ

٢ـ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

٣ـ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

২. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো– اِنَّ الْكِتَابَ عَبَثٌ তথা কিতাব হলো নিরর্থক; পরকালীন জীবনে কিতাব বলতে কিছুই প্রদান করা হবে না।

দলীল : মুতাযিলাদের যুক্তি হলো, মানুষের আমলের যেহেতু কোনো দেহ নেই, সেহেতু তাকে সংরক্ষণ করে কিতাব আকারে প্রদান করাও অনর্থক ব্যাপার। সুতরাং কিতাব তথা আমলনামা বৃথা।

মুতাযিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে মুতাযিলাদের দলীলের উত্তরে বলা হয়, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যভিত্তিক হয় না। আর যদি এটা মেনে নেয়া হয়, তার কার্যাবলি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, কিতাব তথা আমলনামা প্রদানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহাকৌশল বিদ্যমান, যা আমাদের চিন্তার বাইরে। সুতরাং কিতাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয়।

ঃ اَلصِّرَاطُ حَقٌّ :

সিরাত সত্য : জাহান্নামের ওপরে অবস্থিত দীর্ঘ সেতু তথা সিরাত সত্য হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো– اَلصِّرَاطُ حَقٌّ অর্থাৎ, সিরাত সত্য। এটি এমন পুল, যা জাহান্নামের ওপর নির্মিত। যার দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান। যা চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তা পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। এটা বাস্তব সত্য। এতে কোনো সংশয় নেই।

দলীল : তাঁরা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন– وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ, তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে। আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ সুদীর্ঘ পথ পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে। পুণ্যবানরা সহসাই পার হয়ে যাবে আর পাপীরা নিমজ্জিত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

২. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য নয়। তারা উল্লিখিত صِرَاط-কে صِرَاط مُسْتَقِيْم দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো–

ক. لَا يُمْكِنُ الْعُبُوْرُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

খ. وَاِنْ اَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয় তবুও এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্বীকারকারী মুতাযিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সব কিছুর ওপর শক্তিমান। সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত মুমিনদের জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার।

এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো মুমিন বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ কেউ আবার প্রবল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উক্ত সিরাত পার হয়ে যাবে।

উপসংহার : একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আখেরাতের জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার আমলের জন্য মীযান, সিরাত এবং আমলনামার সম্মুখীন হতে হবে। এ বিশ্বাসকে সামনে রেখেই একজন মুমিন ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনের সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে হবে। নতুবা কাফের শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

■ السُّؤَالُ (٥٣) : مَا مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ الشَّفَاعَةِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ أَنْوَاعَ الشَّفَاعَةِ بِالتَّفْصِيلِ.

■ প্রশ্ন : ৫৩ শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শাফায়াতের অধিকারী কারা? অতঃপর বিস্তারিতভাবে شَفَاعَة-এর প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। তবে নবী রাসূলগণ এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ أَهْلُ الْكَبَائِر-দের জন্য কার্যকর হবে কিনা, এ বিষয়টিসহ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ شَفَاعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً :

شَفَاعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّفَاعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার, যা اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

আর اَلشَّفَاعَةُ শব্দের আভিধনিক অর্থ হচ্ছে-

১. সুপারিশ করা। যথা- مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
২. اَلضَّمُّ তথা মিলিত করা। যথা- كَانَ وِتْرًا فَشَفَّعَهُ بِاٰخَرَ
৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থকার বলেন- اَلشَّفَاعَةُ كَلَامُ الشَّفِيْعِ অর্থাৎ, সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত।
৪. কেউ কেউ বলেন- اَلشَّفَاعَةُ اَلتَّوَسُّلُ
৫. ইংরেজীতে বলা হয়- Intercession, Mediation, Advocacy ইত্যাদি।

مَعْنَى الشَّفَاعَة شَرْعًا :

شَفَاعَة-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. আল্লামা ইবনুল আমীর বলেন-

وَالشَّفَاعَةُ يَتَعَلَّقُ بِأُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَة وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ وَالْجَرَائِمِ.

অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক তথা আখেরাতের বিষয়ে। এর অর্থ হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা।

২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন–

هِيَ تَوَسُّلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ اِلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمُذْنِبِيْنَ لِاِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ يَوْمِ الْحِسَابِ ـ

অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করা।

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ الْاِنْضِمَامُ اِلَى اٰخَرَ نَاصِرًا لَهُ وَسَائِلًا عَنْهُ ـ

অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত।

৪. اَلْمُفْرَدَاتُ فِيْ غَرِيْبِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ اَنْ يَشْرَعَ الْاِنْسَانُ لِلْاٰخَرِ طَرِيْقُ خَيْرٌ اَوْ طَرِيْقُ شَرٌّ فَيَقْتَدِىْ بِهِ ـ

৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–

هِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِىْ وَقَعَ الْجِنَايَةُ فِىْ حَقِّهِ ـ

অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের নিকট অনুরোধ করাকে شفاعة বলে।

৬. কতিপয় মনীষী বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ فِى الْاِصْطِلَاحِ دَفْعُ الْعُقُوْبَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوُزِ عَنِ الذَّنْبِ ـ

অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া।

مَنْ لَهُ حَقُّ الشَّفَاعَة :

শাফায়াতের অধিকারী : শাফায়াত তথা সুপারিশের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আল কুরআনের ঘোষণা– قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ, বলুন! সকল সুপারিশ আল্লাহর জন্য, আসমান ও যমীনের কর্তৃত্বও তাঁর।

তবে আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টির কারণে কিছু লোক তাঁর নিকট শাফায়াত করতে পারবেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ অর্থাৎ, যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাদেরকে কেয়ামত দিবসে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হবে তাদের আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো–

১. কেয়ামত দিবসে হযরত মুহাম্মাদ (স) শাফায়াতের অধিকারী হবেন। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন। তিনি সুপারিশ করে উম্মতদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পাপীদের ক্ষমা করাবেন এবং জাহান্নামীদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এ মর্মে রাসূল (স) বলেন–

١. عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ۔

٢. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُدُلُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ۔

রাসূল (স)-এর শাফায়াত বিষয়ে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আকিদা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

شَفَاعَةُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ حَقٌّ وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ حَقٌّ ثَابِتٌ۔

সুতরাং নবীগণের শাফায়াত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গুনাহকারীদের জন্য পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন আমাদের নবী (স)-এর শাফায়াতও সত্য।

২. উম্মতে মুহাম্মদীর অনেক পুণ্যবান ও নেককার ব্যক্তিবর্গ শাফায়াত করবেন।
৩. সন্তানগণ তাদের পিতামাতার জন্য শাফায়াত করবে।
৪. কুরআন তার তেলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফায়াত করবে। যেমন- হাদীসে এসেছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ۔

৫. সর্বোপরি মহান আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অনুমতি দিবেন তারাও সুপারিশ করবেন। আল কুরআনের বাণী–

١. يَوْمَ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلاً۔

٢. وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ۔

اَقْسَامُ الشَّفَاعَةِ :

শাফায়াতের প্রকারভেদ : আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেছেন– شَفَاعَة মোট পাঁচ প্রকার। যথা–

১. اَلشَّفَاعَةُ الْكُبْرٰى لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : হাশরের ময়দানে ভীতিজনক অবস্থা দেখে হিসাবনিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য এ ধরনের সুপারিশ করা হবে। এটা শুধু আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর জন্য বিশেষত্ব। তিনি ছাড়া এ জাতীয় সুপারিশ আর কেউ করতে পারবে না।

২. اَلشَّفَاعَةُ لِاِدْخَالِ قَوْمٍ فِى الْجَنَّةِ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ। এটা কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য খাস।

৩. اَلشَّفَاعَةُ لِقَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে পড়েছে। এটা নবী (স)-এর জন্য নির্ধারিত।

৪. اَلشَّفَاعَةُ لِزِيَادَةِ الدَّرَجَةِ فِى الْجَنَّةِ : জান্নাতে বেহেশতবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা।

৫. اَلشَّفَاعَةُ بِاِخْرَاجِ الْمُدْخَلِيْنَ مِنَ النَّارِ : ঐ সকল অপরাধী মুমিনের জন্য সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের সুপারিশ নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকগণ করতে পারবেন।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের সাথে আরো তিন প্রকার শাফায়াত হচ্ছে–

৬. রাসূল (স) কর্তৃক তাঁর উম্মতের মাঝে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করা।

৭. অবধারিত শাস্তিকে কিছুটা হালকা করার জন্য সুপারিশ করা। যেমন– রাসূল (স)-এর চাচা আবু তালিবের জন্য তাঁর সুপারিশ করা।

৮. রাসূল (স) কর্তৃক তাঁর সকল মুমিনের জন্য সুপারিশ করা।

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে নবী, রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদের রক্ষার জন্য شَفَاعَة করবেন। মুশরিকরা এ শাফায়াতকে অস্বীকার করে মূলত মহান আল্লার সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٤) : مَا مَعْنَى الشَّفَاعَةِ؟ بَيِّنِ الشَّفَاعَةَ عَلَى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ ـ هَلْ هِىَ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالصَّالِحِيْنَ فِىْ اَهْلِ الْكَبَائِرِ ؟ وَمَا فِيْهِ الْاِخْتِلَافُ؟ بَيِّنْ ـ

■ প্রশ্ন : ৫৪ শাফায়াত অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফায়াতের বর্ণনা দাও। কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূলগণের এবং সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কিনা? এতে কী মতভেদ আছে? বর্ণনা কর।

او ـ مَا مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ ثُمَّ بَيِّنْ قَوْلَ النَّبِىِّ (صـ) "شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ" مَعَ ذِكْرِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ ـ

অথবা, শাফায়াতের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ইমামদের মতবিরোধসহ রাসূল (স)-এর বাণী– شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ-এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় নেককার লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন; তবে নবী রাসূলগণ এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ اَهْلُ الْكَبَائِرِ-দের জন্য কার্যকর হবে কিনা, এ বিষয়টিসহ প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ شَفَاعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً :

شَفَاعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّفَاعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। যা اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

আর اَلشَّفَاعَةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. সুপারিশ করা। যথা– مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

২. اَلضَّمُّ তথা মিলিত করা। যথা– كَانَ وِتْرًا فَشَفَّعَهٗ بِاٰخَرَ

৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থকার বলেন– اَلشَّفَاعَةُ كَلَامُ الشَّفِيْعِ অর্থাৎ সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত।

৪. কেউ কেউ বলেন– اَلشَّفَاعَةُ اَلتَّوَسُّلُ

৫. ইংরেজীতে বলা হয়– Intercession, Mediation, Advocacy ইত্যাদি।

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ شَرْعًا :

شَفَاعَة-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন–

وَالشَّفَاعَةُ تَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَهِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ وَالْجَرَائِمِ.

অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক ও আখেরাতের বিষয়ে। এর অর্থ হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা।

২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন–

هِىَ تَوَسُّلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ اِلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْمُذْنِبِيْنَ لِاِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِىْ يَوْمِ الْحِسَابِ.

অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করা।

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ اَلْاِنْضِمَامُ اِلٰى اٰخَرَ نَاصِرًا لَهٗ وَسَائِلًا عَنْهُ.

অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত।

৪. اَلْمُفْرَدَاتُ فِىْ غَرِيْبِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ اَنْ يَّشْرَعَ الْاِنْسَانُ لِلْاٰخَرِ طَرِيْقَ خَيْرٍ اَوْ طَرِيْقَ شَرٍّ فَيَقْتَدِىْ بِهٖ.

৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–

هِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِىْ وَقَعَ الْجِنَايَةُ فِىْ حَقِّهٖ.

অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের নিকট অনুরোধ করাকে شَفَاعَة বলে।

৬. কতিপয় মনীষী বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ فِى الْاِصْطِلَاحِ دَفْعُ الْعُقُوْبَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوُزِ عَنِ الذَّنْبِ.

অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া।

الشَّفَاعَةُ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ :

পবিত্র কুরআনে শাফায়াত : এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. **শাফায়াত শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট :** কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ শাফায়াতের অধিকারী হবে না এবং কেয়ামত দিবসে কারো শাফায়াত কবুল করা হবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শাফায়াতকারীও থাকবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

٢. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

٣. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَّالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

٥. وَذَكِّرْ بِهٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ.

২. **অন্যদের জন্য শাফায়াতের স্বীকৃতি :** কিছু আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও শাফায়াতের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অর্থাৎ, যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।

৩. **শাফায়াতের জন্য অনুমতি :** মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য শাফায়াত করতে পারবে না। কোনো পুণ্যবান ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ কারো জন্য শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করলে তিনি কেবল এ ব্যক্তির জন্যই শাফায়াত করার সুযোগ পাবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١. مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

٢. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ.

٣. لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

٤. يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا.

اَلشَّفَاعَةُ عَلٰى ضَوْءِ الْحَدِيْثِ :

হাদীস শরীফে শাফায়াত : অসংখ্য হাদীসে কেয়ামত দিবসে নবীগণ, অন্যান্য মানুষ, মানুষের বিভিন্ন আমল শাফায়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং তাদের শাফায়াত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

١ـ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا الْخَيْرَ قَطُّ ـ

٢ـ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ـ

٣ـ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ ـ

٤ـ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ اَوْ نَحْوِهٖ ـ

هَلِ الشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ فِىْ حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ ؟ :

কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত সাব্যস্ত কিনা : আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর আলেম বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ اَوِ الصَّالِحِيْنَ فِىْ حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ ـ

অর্থাৎ, কবীরা গুনাহগারদের পাপমোচনের জন্য নবী রাসূল ও নেক বান্দাগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অবকাশ রয়েছে।

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ الْعِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ ـ

অর্থাৎ, পাপী মুমিনগণ ও কবীরা গুনাহকারীদের জন্য পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমাদের নবী (স)-এর শাফায়াত সত্য ও প্রমাণিত।

৩. ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ الَّتِىْ اِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ لِمَا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ ـ

অর্থাৎ, শাফায়াত সত্য যা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

দলীল : কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিম্নোক্ত দলীল প্রদান করেছেন–

১. কুরআনের দলীল :

١ـ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

٢ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ

٣ـ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ

٤ـ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ـ

٥ـ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ـ

২. **সুন্নাহভিত্তিক দলীল :**

١. شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ.

٢. يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

٣. شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ. فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا الْخَيْرَ قَطُّ.

٤. اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, কবীরা গুনাহকারীদের জন্য شفاعة গ্রহণযোগ্য এবং নবী, রাসূল ও সৎকর্মশীলগণের শাফায়াত মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

৩. **ইজমাভিত্তিক দলীল :** شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে।

৪. **কেয়াসভিত্তিক দলীল :** شفاعة-এর বৈধতাকে যুক্তি ও বিবেক স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। কেননা شفاعة ব্যতীত কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে যেহেতু ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। যেমন– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ সেহেতু সুপারিশের মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দেয়া যুক্তিযুক্ত।

খ. **মুতাযিলাদের অভিমত :** জমহুর মুতাযিলার মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ কবীরা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ কেবল পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে।

গ. **কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজিদের অভিমত :** পথহারা ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা ও খাওয়ারিয এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো–

لَا شَفَاعَةَ لِتَخْلِيْصِ يَوْمِ الْجَزَاءِ.

বিচার দিবসে অপরাধীর মুক্তির জন্য شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য নয়। তারা নবী রাসূল ও পুণ্যবানদের পাপীর জন্য সুপারিশ অস্বীকার করেছে।

দলীল : তাদের দলীলগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. **কুরআনভিত্তিক দলীল :** তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন–

١. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ.

٢. وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ.

٣. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

٤. قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا.

٥. مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

জবাব : বস্তুত এ সকল আয়াতে شَفَاعَة অস্বীকার করা হয়নি; বরং শাফায়াত বিষয়ে মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

২. **হাদীসভিত্তিক দলীল :** তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো–

١- مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ -

٢- يَا عَبْدَ مَنَافٍ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে জবাব :

ক. لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ-এর দ্বারা شَفَاعَة বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে।

খ. لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا একইভাবে এর দ্বারাও شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য নয়, এটা উদ্দেশ্য নয়।

৩. **মুতাযিলাদের আকলী দলীল :** তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না।

জবাব : এ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। মহান আল্লাহর বাণী– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ الاية

আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে নবী, রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাগণ মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদের রক্ষার জন্য شَفَاعَة করবেন। মুশরিকরা এ শাফায়াতকে অস্বীকার করে মূলত মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

■ **اَلسُّؤَالُ (৫৫) : مَا مَعْنَى الْقَدْرِ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ؟ اِشْرَحِ الْعَقِيْدَةَ الْاِسْلَامِيَّةَ فِى الْقَدْرِ مَعَ بَيَانِ ضَلَالِ عَقِيْدَةِ الْكُفَّارِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ - ثُمَّ بَيِّنْ اَثَرَ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ فِىْ حَيٰوةِ الْاِنْسَانِ -**

■ **প্রশ্ন : ৫৫ ॥ قَدْر অর্থ কী? قَدْر-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের আলোকে قَدْر সম্পর্কে ইসলামী আকিদা এবং ভ্রান্ত কুফরী আকিদা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর মানবজীবনে قَدْر-এর প্রতি ঈমানের প্রভাব বর্ণনা কর।**

او- مَا هُوَ الْقَدْرُ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ؟ وَمَا هِىَ الْاَشْيَاءُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهٖ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَهَمِّيَّةَ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ وَفَوَائِدَهٗ -

অথবা, قَدْر-এর অর্থ কী? قَدْر-এর প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য কী? এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কী? অতঃপর قَدْر-এর প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো।

قَدْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدْرِ لُغَةً :

قَدْر-এর আভিধানিক অর্থ : قَدْرٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَقْدَارٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো- নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি।

১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- مِقْدَارُ الشَّيْءِ وَحَالَتُهُ الْمُقَدَّرَةُ لَهُ তথা কোনো কিছুর পরিমাণ ও নির্দিষ্ট অবস্থা। যেমন কুরআনে এসেছে- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

২. مَقَايِسُ اللُّغَةِ অভিধান প্রণেতা বলেন, اَلْقَدْرُ-এর অর্থ اَلْقَضَاءُ তথা সিদ্ধান্ত।

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- اَلْقَدْرُ وَالتَّقْدِيْرُ مُتَبَيِّنٌ كَمِّيَّةِ الشَّيْءِ

৪. ইংরেজীতে বলা হয়- Luck, Fortune ইত্যাদি।

مَعْنَى الْقَدْرِ اِصْطِلَاحًا :

قَدْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় قَدْر হলো- هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حَسَنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرَرٍ وَغَيْرِهِمَا অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির পরিসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর।

২. কতিপয় আলেমের মতে-
هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَضَرَرٍ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ.

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন-
اَلْقَدْرُ خُرُوْجُ الْمُمْكِنَاتِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مُطَابِقًا لِلْقَضَاءِ.

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- اَلْقَدْرُ قُدْرَةُ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ

مُرَادُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

তাকদীরে বিশ্বাসের দ্বারা উদ্দেশ্য : তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো এ বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভালো মন্দ, আনন্দ কষ্টের যা কিছু ঘটে থাকে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। অন্যত্র তিনি বলেন-

١- اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ.

٢- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ.

اَلْعَقِيْدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِى الْقَدْرِ ৩ :

তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা হলো নিম্নে ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা। যথা–

১. **আল্লাহর অনাদি, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস করা :** প্রকৃত মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয়ে কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে, তা সবই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই।

২. **আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস :** আল্লাহর লিখনে বিশ্বাসের অর্থ হলো তিনি অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'কিতাবে মুবীন' তথা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةً ـ

তবে লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে–

١ـ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رُطَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

٢ـ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ـ

٣ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

٤ـ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

৩. **আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস :** আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশ্বাসের অর্থ হলো মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর জ্ঞানে হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনা ঘটে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١ـ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظَّالِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

٢ـ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ـ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৪. **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট। এমনকি মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে–

١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ-

٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ-

৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস : মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের ওপরই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি। প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিবেক, বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তাঁর নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে, তার ফল সে ভোগ করবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا- اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا-

٢- اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاه النَّجْدَيْنِ-

٣- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا-

عَقِيْدَةُ الْكُفَّارِ عَنِ التَّقْدِيْرِ :

তাকদীরের ব্যাপারে কাফেরদের আকিদা : ঈমান সংক্রান্ত বিষয়ে অহীর শিক্ষাকে আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে বিচার গ্রহণ ও সংযোজন করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ। কাফেররা তাকদীরের বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। কাফেরদের এরূপ উক্তির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١- وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ-

٢- سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا-

কাফেরদের দাবি : কাফেররা বলে আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না। শিরক করতাম না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তিনি চাইলে আমাদেরকে হেদায়াত করতেন। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ চান বলেই আমরা পাপ করি এবং শিরক করি। আরো বোঝা যায়, তিনি আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট।

কাফেররা যেরূপ দাবি করছে, সে কথা কোনোভাবে কোনো অহীর শিক্ষায় নেই। তা অহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি ও তর্কনির্ভর ধারণা এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা মাত্র। আল্লাহর ভাষায়, এ সকল মনগড়া তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা রাসূলের দায়িত্ব নয়; বরং অহীর হুবহু শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেয়াই তাঁর দায়িত্ব।

اَلْاَشْيَاءُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَدْرِ :

তাকদীরের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ : যে সকল বিষয়াবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে তা চারটি স্তরে বিভক্ত। যথা– ১. সৃষ্টি ও তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহর আগাম জ্ঞান। ২. আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণে বিশ্বাস। ৩. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মে বিশ্বাস। ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লিখিত স্তরগুলো আলোকপাত করা হলো–

১. **সৃষ্টি ও তাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহর আগাম জ্ঞান :** এ বিশ্বজগতে তিনি যেসব মানুষ সৃষ্টি করবেন, তাদের মধ্যে মুমিন, কাফের, ফাসেক নির্বিশেষে তাদের সকলের জীবন, জীবিকা ও কর্ম যা হবে, সে সম্পর্কে তিনি তাদের সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ۔

অর্থাৎ, জেনে রাখ! তিনি (আল্লাহ) যাদের সৃষ্টি করবেন, তাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছেন। আর তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক অবহিত।

২. **আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণে বিশ্বাস :** প্রত্যেক মানুষের জীবন, জীবিকা, ঈমান ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিতভাবে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং তাকদীরে বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ সম্পর্কে ঈমান আনা যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জীবন এবং তাদের কর্ম পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন–

١۔ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا۔

অর্থাৎ, পৃথিবী এবং তোমাদের জীবনে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে থাকে, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

٢۔ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ۔

٣۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ۔

٤۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ۔

٥۔ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ۔

৩. **মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মে বিশ্বাস :** এ স্তরে মুমিনকে এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন বিচার বিবেকশক্তি ও জ্ঞানদান করেছেন। সুতরাং মানুষ যদি স্বীয় ইচ্ছা ও বিচার বিবেক অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে, তবে তা আল্লাহর জ্ঞান ও পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুযায়ী। আল্লাহর এ ইচ্ছার মধ্যে বান্দার এমন কর্মও রয়েছে, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এভাবে বান্দা ভালোমন্দ যে কর্মের প্রতি ইচ্ছা করে আল্লাহও তার জন্য সেরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন। ইচ্ছার বাইরে ঈমান আনার বিষয়টিও তিনি কারো ওপর চাপিয়ে দেন না। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا۔

অর্থাৎ, তোমার রবের ইচ্ছা হলে প্রতিটি মানুষই ঈমানদার হয়ে যেত।

৪. **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস :** মহান আল্লাহ আগাম জ্ঞানের ভিত্তিতে সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণের পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী ও সৃষ্টির নিয়তির লিখনানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। সুতরাং এ স্তরে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে সাথে তাদের কর্মেরও স্রষ্টা। বান্দার ভালো মন্দ উভয় কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। আর বান্দাগণ সে কর্মের كَاسِب তথা অর্জনকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, আর আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর (তাও সৃষ্টি করেছেন)।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন–

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ -

অর্থাৎ, এই তো আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

أَثَرُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ فِيْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَاَهَمِّيَّتُهُ وَفَوَائِدُهُ :

মানবজীবনে তাকদীরে বিশ্বাসের প্রভাব, গুরুত্ব ও উপকারিতা : তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপনের অনেক প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–

১. মুসলিমকে কর্মমুখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমুখ করে না।
২. মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়।
৩. মুসলিমকে সকল অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নেয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে ওঠে না; বরং শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে তার হৃদয় বিগলিত হয়।
৪. তাকদীরে বিশ্বাসকারী কখনো ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না; বরং সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত।
৫. তাকদীরে বিশ্বাসের এসব ফলাফল যাদের জীবনে সর্বপ্রথম এসেছিল তাঁরা হলেন, মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কেরাম। তাকদীরের ওপর সবচেয়ে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল মুহাম্মাদ (স)-এর, তাই তিনি হলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী কর্মবীর। ঠিক তেমনি ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ। তাকদীরে বিশ্বাস তাঁদের সকল সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ ... رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ -

এ বিশ্বাসের জন্যই অতি অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। এটাই তাকদীরে বিশ্বাসের উপকারিতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের মর্জি। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلِّ خَيْرٍ اَحْرَصُ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزَنَّ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اِنِّىْ فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ -

অর্থাৎ, শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও অতি উত্তম। তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমরা কল্যাণের বিষয়টিতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে থাক। আর আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও; হতাশ হইও না। আর যদি কোনো অকল্যাণে পতিত হও তবে একথা বলো না যে, যদি আমি এমনটি করতাম তাহলে এমন এমন হতো; বরং (তাকদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) বলবে, আল্লাহ কর্তৃক তাকদীরে যা ছিল তাই হয়েছে, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই করেছেন। অন্যথা শয়তানী কর্মকাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। যাতে শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে না পারে। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের, কর্মের, দেহের এবং জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় মুমিন হওয়ার তাওফীক দিন।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٦) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ وَمَا هِىَ؟ ثُمَّ بَيِّنْ عَقِيْدَةَ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ فِى التَّقْدِيْرِ مَعَ الْاِجَابَةِ مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ -

■ প্রশ্ন : ৫৬ ॥ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কী এবং এগুলো কী কী? তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের রোকনসমূহের অন্যতম। মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি আগাম অবগতির ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সবকিছুই তাঁর নির্ধারিত পরিমাপ বা قَدْر-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ তথা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

⊃ اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ لُغَةً :

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের আভিধানিক অর্থ : اَلْقَدْرُ শব্দটি ق - د - ر শব্দমূল হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো– অনুমান করা, নির্ধারণ করা, পরিমাপ করা, নির্দিষ্ট করা। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, اَلْقَدْرُ শব্দটি اَقْدَارٌ শব্দের একবচন, যা পরিমাপ ও অনুমান অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক বস্তু পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন।

১. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلْقَدْرُ اَلتَّقْدِيْرُ مُتَبَيِّنٌ كَمِّيَّةُ الشَّيْءِ

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থকার বলেন– مِقْدَارُ الشَّيْءِ وَحَالاَتُهُ الْمُقَدَّرَةُ لَهُ অর্থাৎ, কোনো বস্তুর পরিমাণ ও নির্দিষ্ট অবস্থা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔

৩. ইবনে ফারেস (র) বলেন– اَلْقَدْرُ يَدُلُّ عَلٰى مَبْلَغِ الشَّيْءِ وَنِهَايَتِهٖ অর্থাৎ, اَلْقَدْر কোনো বস্তুর শেষ ও প্রান্তসীমাকে নির্দেশ করেন।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ اِصْطِلاَحًا :

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকদীর হলো, বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালি ও ব্যবস্থা নির্ধারণে লওহে মাহফুযে যা লিখে রেখেছেন, তাই মূলত ভাগ্যলিপি বা তাকদীর হিসেবে গণ্য।

২. اَلْمُعْظَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থকার বলেন– اَلْقَضَاءُ الَّذِىْ يَقْضِىْ بِهٖ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ অর্থাৎ, এমন সিদ্ধান্ত যা আল্লাহ তার বান্দার জন্য ফয়সালা করে রেখেছেন।

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–
اَلْقَدْرُ خُرُوْجُ الْمُمْكِنَاتِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مُطَابِقًا لِلْقَضَاءِ۔

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন– اَلْقَدْرُ قَدَرَهُ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ অর্থাৎ, বান্দার জন্য যা কিছু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, তাই তাকদীর।

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ : তাকদীর তথা অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ হলো, একজন মুসলিম মনেপ্রাণে দ্বিধাহীন চিত্তে এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বহু পূর্বে পূর্ণ বিজ্ঞতা ও হেকমতের সাথে মহান আল্লাহ আগাম অবগতির ভিত্তিতে লওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেকের জীবনকাল, মৃত্যু, জীবিকার বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়াও পরকালে ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিণাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا
অর্থাৎ, বলুন! আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের নিকট পৌঁছবে না।

এছাড়াও আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞানে বিশ্বাস, তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিশ্বাসসহ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস স্থাপনও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

عَقِيْدَةُ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ فِى التَّقْدِيْرِ :

তাকদীর সম্পর্কে ভ্রষ্টদলের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) বলেন, "তাকদীরের মূল বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য। কোনো নিকটতম ফেরেশতা ও নবীগণও তা অনুধাবন করতে পারেন না। এটা নিয়ে অধিক চিন্তা পথভ্রষ্টতার পন্থা, বদনসীব হওয়ার সিঁড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের ধাপ।" এ কারণেই যুগে যুগে বহু মুসলিম তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. **মুতাযিলাদের আকিদা :** মুতাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহকে বান্দার কর্মের স্রষ্টা অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ কাফেরদের নিকট ঈমান কামনা করেন; কিন্তু কাফেররা নিজ ইচ্ছার কারণে কুফরী করে। তাদের কুফরী কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ নন; বরং কাফেররাই তাদের স্বীয় কুফরী কর্মের জন্য দায়ী। এ মতের সমর্থনে তারা আল্লাহর বাণী থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ অর্থাৎ, অতঃপর যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করুক, আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, মুতাযিলাগণ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে আগাম জ্ঞান ও লিখনীকে অস্বীকার করেছে, যা ভ্রান্ত আকিদা।

২. **কাদারিয়্যাদের আকিদা :** কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্ব নির্ধারণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন تَقْدِيْر তথা নিয়তি বলে কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা। মুতাযিলাদের সাথে তাদের বক্তব্যের মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে বলেন, اَمْر তথা আদেশ হলো একটি নতুন বিষয়। এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন– جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

৩. **জাবারিয়্যাদের আকিদা :** তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মত ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থ তুল্য। বান্দা তা-ই করে, যা আল্লাহ করান। তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ভোগ করেন না। তারা এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী দলীলরূপে পেশ করেন– هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব প্রতীয়মান হয়, জাবরিয়্যা সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে।

الْاِجَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ :

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : তাকদীর সম্পর্কে আহলে হক বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক কর্মই আল্লাহর ফয়সালা, পূর্ব নির্ধারিত ও কিতাবে লিপিবদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ মানুষের সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা। আর মানুষ সে কর্মের كَاسِب তথা অর্জনকারী।

তাদের এ অভিমত অনুযায়ী তারা বিরুদ্ধবাদীদের প্রদানকৃত দলীলের প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন–

১. মুতাযিলা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায়; যারা আল্লাহর আগাম জ্ঞান, লিপিবদ্ধকরণকে অস্বীকার করে বান্দাকে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করেন, তাদের প্রদত্ত দলীলের প্রত্যুত্তরে আহলে হক বলেন– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ আয়াতের মাধ্যমে বান্দাকে স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করা গেলেও আল্লাহকে অক্ষম ভাবা বৈধ নয়। সুতরাং বান্দা পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

২. আর জাবরিয়্যাদের সম্পর্কে আহলে হক বলেন, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা বটে তবে বান্দাদেরকে তিনি বিবেক ও বিচারশক্তি দান করেছেন এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করে তাদেরকে সঠিক ও ভ্রান্ত উভয় পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্প্রদায়ের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

উপসংহার : ঈমানের ষষ্ঠতম রোকন হিসেবে তাকদীরে বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর মতভেদ ও বাড়াবাড়ি ব্যতীত এর ওপর নির্দ্বিধায় ঈমান আনয়ন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। অন্যথা এর মাধ্যমেই যে কেউ অতি সহজেই পদস্খলিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত হতে পারে।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٧) : عَرِّفِ الْقَدَرَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. وَمَا مَرَاتِبُهُ؟ ثُمَّ اشْرَحِ الْكَلَامَ "اِنَّ اللّٰهَ خَالِقٌ لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ" مَعَ ذِكْرِ اٰرَاءِ الْعُلَمَاءِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ.

■ প্রশ্ন : ৫৭ ■ قَدْر-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর স্তরগুলো কী কী? অতঃপর ব্যাখ্যা কর যে "আল্লাহই বান্দার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা" এবং এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ তাকদীরের ভালো মন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো।

১ قَدْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدْرِ لُغَةً :

قَدْر-এর আভিধানিক অর্থ : قَدْرٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَقْدَارٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো– নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি।

১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে– مِقْدَارُ الشَّىْءِ وَحَالَتُهُ الْمُقَدَّرَةُ لَهُ তথা কোনো কিছুর পরিমাণ ও নির্দিষ্ট অবস্থা। যেমন কুরআনে এসেছে–

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

২. مَقَايِسُ اللُّغَةِ অভিধানবেত্তা বলেন, اَلْقَدْرُ-এর অর্থ اَلْقَضَاءُ তথা সিদ্ধান্ত।

৩. আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلْقَدْرُ وَالتَّقْدِيْرُ مُتَبَيِّنٌ كَمِيَّةُ الشَّيْءِ

مَعْنَى الْقَدْرِ اِصْطِلَاحًا :

قَدْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় قَدْر হলো–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ حَسَنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرَرٍ وَغَيْرِهِمَا۔

অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভক্ষতি ইত্যাদির পরিসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর।

২. কতিপয় আলেমের মতে–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِيْ يُوْجَدُ مِنْ حَسَنٍ وَقُبْحٍ وَضَرَرٍ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ۔

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–

اَلْقَدْرُ خُرُوْجُ الْمُمْكِنَاتِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مُطَابِقًا لِلْقَضَاءِ۔

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন– اَلْقَدْرُ قُدْرَةُ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ

مَرَاتِبُ الْقَدْرِ :

কদরের স্তরসমূহ : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) তাঁর طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ وَبَابُ السَّعَادَتَيْنِ গ্রন্থে قَدْر-এর বর্ণনায় বলেন– اِنَّ لِلْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ اَرْبَعُ مَرَاتِبَ عِنْدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আলেমদের মতে, قَدْر ও قَضَاء-এর ৪টি স্তর রয়েছে। নিম্নে সে স্তরসমূহ আলোচনা করা হলো–

প্রথম স্তর : اَلْاِيْمَانُ بِعِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ السَّابِقِ بِكُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ اِيْجَادِهِمْ

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বেই সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহর অগ্রীম জ্ঞান লাভ সম্পর্কে বিশ্বাস করা। সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। তাঁর ইলমের বাইরে কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ۔

٢۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔

٣۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔

দ্বিতীয় স্তর : اَلْاِيْمَانُ بِكِتَابَةِ الْمَقَادِيْرِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে কদর লিপিবদ্ধ সংক্রান্ত ঈমান।

এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর ভাগ্য আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ۔

٢۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ ۔ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ۔

٣۔ وَمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ۔

তৃতীয় স্তর : اَلْاِيْمَانُ بِالْمَشِيْئَةِ وَالْقُدْرَةِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতি ঈমান। সকল কিছু সৃষ্টি ও ধ্বংস একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে অন্য কারো ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব চলে না। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١۔ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ۔

٢۔ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔

٣۔ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

চতুর্থ স্তর : اَلْاِيْمَانُ بِخَلْقِ اللّٰهِ اَىْ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ, সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ঈমান। মুমিন এভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। বান্দা যে কর্ম করে তারও স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔

٢۔ سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ۔

٣۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ۔

تَشْرِيْحُ الْكَلَامِ اِنَّ اللّٰهَ خَالِقٌ لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ ⊃ :

আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা– এ উক্তির ব্যাখ্যা : বান্দার যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ, নাকি বান্দা নিজেই; এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং মুতাযিলাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– وَاللّٰهُ خَالِقٌ لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ অর্থাৎ, বান্দার প্রতিটি কর্ম। যেমন– কুফর, ঈমান, আনুগত্য, অবাধ্যতা ইত্যাদি সব কিছুরই স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।

দলীল : এক্ষেত্রে তারা নকলী এবং আকলী এ দু'ধরনের দলীল উপস্থাপন করেন। যথা–

ক. নকলী : তারা নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দলীল পেশ করেন। যেমন–

١۔ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ الاية۔

٢۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ الاية۔

٣۔ وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا الاية۔

٤۔ اَللّٰهُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الاية۔

٥. افَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ الايَة.

٦. انّ اللّه صانِعُ كُلِّ شَيْءٍ الحديث.

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এ বিশ্বজগৎ এবং এর সমুদয় বস্তু ও মানুষের যাবতীয় কর্মের خَالِق তথা স্রষ্টা। মানুষ নিজে তার কর্মের স্রষ্টা নয়।

খ. আকলী : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আকলী তথা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমেও প্রমাণ করেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। তাঁদের যুক্তি হলো নিম্নরূপ–

১. কোনো কাজ সৃষ্টি করতে হলে তার সম্পর্কে পূর্বাপর ফলাফল এবং সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানা ও অভিজ্ঞতা লাভ জরুরি; কিন্তু বান্দা এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। সুতরাং বান্দা স্বীয় কর্মের স্রষ্টা হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একজন পথচারী পথ চলতে কোনো পদক্ষেপ দ্রুত আবার কোনো পদক্ষেপ ধীরে ফেলে; অথচ সে এ সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। তাই কর্মের স্রষ্টা পথচারী নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা।

২. বান্দা যদি তার কর্মের خَالِق হতো, তাহলে সম্পাদিত কর্মটি প্রথম যেভাবে করেছিল, ইচ্ছা করলে পূর্ণরূপে হুবহু পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম হতো; অথচ বান্দা তা পারে না। সুতরাং সে তার কর্মের خَالِق নয়।

৩. বান্দার যদি خَالِق হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে সে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা হতে উত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের خَالِق নয়।

দলীল : তারাও নিজেদের মতের পক্ষে নকলী ও আকলী দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন–

ক. নকলী : ১. কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

١. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এখানে اَلْخَالِقِيْنَ শব্দটি جَمْع ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও অন্য সৃষ্টিকর্তা আছে–

٢. وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ.

এ আয়াত اَلْخَلْقُ তথা সৃষ্টি করাকে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

٣. جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, বান্দা তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান কিংবা শাস্তির যোগ্য হবে। যদি আল্লাহ তায়ালাই خَالِق হবেন, তাহলে কৃতকর্মের জন্য বান্দাকে প্রতিদান দেয়া হবে কেন?

খ. আকলী : মুতাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি হচ্ছে–

১. حَرَكَةُ الْمَاشِىْ তথা চলন্ত ব্যক্তির নড়াচড়া এবং حَرَكَةُ الْمُمْشِىْ তথা স্নায়ুদুর্বল রোগীর নড়াচড়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে; حَرَكَةُ الْمَاشِىْ-এর কার্যক্রম তার ইচ্ছানুযায়ী আর اَلْمُمْشِىْ-এর কাজ অনিচ্ছাকৃত। সুতরাং مَاشِىْ-এর কর্মের স্রষ্টা ব্যক্তি নিজেই।

২. যদি বান্দার কর্মের خَالِق আল্লাহ তায়ালা হবেন, তাহলে বান্দার সৎকাজের প্রশংসা, অসৎ কাজের নিন্দা এবং পুণ্যের জন্য নেকি প্রদান ও পাপের শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যেত।

৩. আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের স্রষ্টা হলে আল্লাহ তায়ালাকে বান্দার অনেক স্বভাব। যেমন– شَارِب - قَائِم - اٰكِل ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক; অথচ আল্লাহ তায়ালা এসব গুণাবলির উর্ধ্বে। অতএব আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের خَالِق নন।

মুতাযিলাদের উত্থাপিত দলীলের জবাব :

১. দলীল হিসেবে মুতাযিলাদের উত্থাপিত আয়াতগুলোর জবাবে আহলে হক বলেন, যেসব আয়াতে خَلَق শব্দটিকে বান্দার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা حَقِيْقِىْ অর্থে নয়; বরং مَجَازِىْ তথা রূপক অর্থে এসেছে। আয়াতে اِيْجَادُ الْفِعْل তথা কর্মসৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়; বরং تَقْدِيْر তথা পরিকল্পনাকরণ উদ্দেশ্য।

২. আর যুক্তিভিত্তিক দলীলগুলোর মধ্যে প্রথম যুক্তির জবাবে বলেন, এ যুক্তি জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের বিপরীতে পেশ করা উচিত। কেননা তারা বান্দাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম মনে করে। আর আমরা বান্দার اِخْتِيَار-কে স্বীকার করি। তাই বান্দাকে আমরা كَاسِب তথা কর্ম সম্পাদনকারী এবং আল্লাহ তায়ালাকে خَالِق তথা সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা বলে থাকি।

৩. দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা হয়, বান্দার জন্য কর্মের প্রতি ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, তাই তাকে কৃতকর্মের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়।

৪. শেষ যুক্তির জবাবে বলা হয়, এটা মুতাযিলাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা কোনো কর্মের স্রষ্টা তার সে কর্মের গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক নয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার যাবতীয় কর্ম সৎ কিংবা অসৎ ভালো কিংবা মন্দ যাই হোক না কেন আল্লাহই তার স্রষ্টা। বান্দা হলো كَاسِب তথা কর্ম সম্পাদনকারী; خَالِق তথা সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

নাওয়াকিদুল ঈমান

■ السُّؤَالُ (٥٨): تَحَدَّثْ عَنْ نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ.

■ প্রশ্ন : ৫৮ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]

او. اُكْتُبْ نَوَاقِضَ الْاِيْمَانِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ.

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে লেখ। [ফা. প. ২০১২,'১৫]

او. مَا مَعْنٰى نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ وَمَا مَوَادُّهَا؟ وَكَمْ هِيَ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ بِاعْتِبَارِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ.

অথবা, নাওয়াকিদুল ঈমানের অর্থ ও এর বিষয়বস্তু কী? তা কয়টি ও কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর।

او. عَرِّفْ نَوَاقِضَ الْاِيْمَانِ. ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهُ بِاعْتِبَارِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ مُفَصَّلًا.

অথবা, نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর প্রকারভেদগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী– صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً অর্থাৎ, আল্লাহর রঙে রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ অধিক উত্তম। আল্লাহপ্রদত্ত, রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার বাস্তব রূপরেখা। ঈমান এ দাবি নিয়েই আগত। এর বিপরীত সবগুলোই ঈমান পরিপন্থি, যাকে আরবিতে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয়। মূলত যে সকল বিশ্বাস বা কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর পরিচিতি :

مَعْنٰى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ لُغَةً :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর আভিধানিক অর্থ : نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ একটি যৌগিক শব্দ, একটি نَوَاقِضُ অপরটি اَلْاِيْمَانُ; এরূপ দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে تَرْكِيْبِ اِضَافِيْ বলে। এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন–

نَوَاقِضُ-এর অর্থ : نَوَاقِضُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَاقِضَةٌ; এটা ن - ق - ض মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

ক. نَقَضَ الشَّيْءَ نَقْضًا : এর অর্থ اَفْسَدَ بَعْدَ اِحْكَامِهِ তথা কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করার পর নষ্ট করা।

খ. نَقَضَ الْبِنَاءَ : এর অর্থ هَدَمَهُ তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা।

গ. نَقْضُ الْحَبْلِ أَوِ الْغَزْلِ : এর অর্থ حَلُّ طَاقَاتِهٖ তথা সুতার পাক খুলে দেয়া, ঢিলা করা, শিথিল করা। যেমন কুরআনে এসেছে–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ـ

২. কেউ কেউ বলেন– ক. اَلْاِنْكَارُ তথা অস্বীকার করা, খ. اَلْاِفْسَادُ তথা নষ্ট করা, গ. اَلْاِهْدَامُ তথা ধ্বংস করা, ঘ. اَلْاِبْطَالُ তথা বাতিল করা, ঙ. اَلْاِعْرَاضُ তথা বিমুখ হওয়া।

৩. মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন– مَا تَسَاقَطَ مِنَ الْوَرَقِ وَالثِّمَارِ অর্থাৎ, পাতা ও ফল থেকে যা পড়ে যায়।

৪. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে– مُفْسِدَاتُ مَا اَبْرَمَ مِنْ عُقْدٍ اَوْ بِنَاءٍ সুতরাং বোঝা গেল نَوَاقِضُ অর্থ– ১. مُهْلِكَاتٌ তথা ধ্বংসকারী, ২. مُضِرَّات তথা ক্ষতিকারী, ৩. اَلرَّدُّ তথা প্রত্যাখ্যান করা, ৪. مُدَمِّرَاتٌ তথা বিধ্বংসী, ৫. مُوْبِقَاتٌ তথা বিনাশকারী, ৬. اِبْطَال তথা বাতিল করা, ৭. اِهْدَام তথা নষ্ট করা, ৮. اِفْسَاد তথা ক্ষতি করা, ৯. اِنْكَار তথা অস্বীকার করা। পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

١ـ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ـ

٢ـ اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ـ

٣ـ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ـ اَلَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ـ

٤ـ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ـ

اَلْاِيْمَانُ-এর অর্থ : اِيْمَانٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি كُفْر-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা। ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৪. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া।
৫. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি। ৬. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা।

সুতরাং نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো– ঈমান বা বিশ্বাস বিনষ্টকারী, مُهْلِكَاتُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের বিপরীত করা, আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি।

مَعْنٰى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় জমহুর আলেম বলেন– نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ الَّتِىْ تَخْرُجُ مَنْ يَفْعَلُهَا عَنْ دَائِرَةِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয় এমন কাজকে, যে ব্যক্তি তা করবে, তাকে তা ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে।

২. কেউ কেউ বলেন–

هِىَ الَّتِىْ اَحْبَطَتْ اِيْمَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَزَالَتْ عَنْهُمُ الْاِسْلَامَ يُقَالُ لَهَا نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ ـ

অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয়।

৩. কতিপয় আলেম বলেন–

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ مَا اَبْعَدَ النَّاسَ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْقُرْاٰنِ وَمِنَ الْحَقِّ يُقَالُ لَهٗ نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়।

৪. কারো কারো মতে– نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ مَا تُخَالِفُ الْاِيْمَانَ وَاُصُوْلَهٗ وَقَوَاعِدَهٗ

অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয় যা ঈমান, তার নীতি ও ভিত্তিগুলোর বিরোধী।

৫. কারো কারো মতে–

مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ يُقَالُ لَهَا نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ হচ্ছে সে সকল বিষয়, যা শিরক, নেফাক, কুফর ও বিদয়াতের সাথে যুক্ত।

মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস ও এমন কার্যাবলি যা মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলে।

مَوَادُّ نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ ⊃ :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ : আকাইদের যাবতীয় কিতাব পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমান বিনষ্টকারী মূল বিষয় তিনটি। যথা– ১. اَلنِّفَاقُ ২. اَلْكُفْرُ ৩. اَلشِّرْكُ; তবে এগুলোর শাখা প্রশাখা মিলে ১০টি বিষয় বা প্রকার পাওয়া যায়। যথা–

১. اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ তথা আল্লাহর সাথে শরীক করা।

২. جَعْلُ الْوَسَائِطِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ তথা আল্লাহ ও তাঁর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা।

৩. اَنْ لَا يُقَالَ الْمُشْرِكُ كَافِرًا তথা কোনো মুশরিককে কাফের না বলা।

৪. اَلْاِعْتِقَادُ بِعَدَمِ الْاِكْمَالِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى তথা নবী করীম (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করা।

৫. اَلْكَرَاهِيَةُ بِاَحَدٍ مِّمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) তথা মহানবী (স) প্রদর্শিত কোনো বিধান অপছন্দ করা।

৬. اَلْكَرَاهِيَةُ بِاَحَدٍ مِّمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) তথা আল্লাহর অঙ্গীকার এবং ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্রূপ করা।

৭. اَلْاِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া।

৮. مُسَاعَدَةُ الْمُشْرِكِيْنَ তথা মুশরিকদের সাহায্য করা।

৯. تَفْضِيْلُ اَحَدٍ عَلٰى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ (صـ) তথা মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়তের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া।

১০. اَلسِّحْرُ তথা যাদু টোনা করা। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা : اَلشِّرْكُ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ, তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করিও না। হাদীসে এসেছে– اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

শিরকের পরিচয়ে ড. সালেহ বলেন–

اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَالُوْهِيَّتِهٖ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতে অংশীদার সাব্যস্ত করার নামই শিরক।

شِرْك-এর হুকুম : শিরকের হুকুম নিম্নরূপ–

১. শিরক সবচেয়ে ভয়াবহ জুলুম। যেমন কুরআনের বাণী– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

২. শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ۔

৩. শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۔

৪. শিরককারীর সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কুরআনের বাণী–
١۔ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔
٢۔ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

৫. শিরককারীর জান ও মাল হালাল। যেমন কুরআনে এসেছে–
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔

৬. শিরক হলো সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ। যেমন হাদীসে রয়েছে–
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ۔

২. **আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা :** আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এ আশায় মাধ্যম সাব্যস্ত করা যে, সে তার জন্য কেয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। যেমন বর্ণিত আছে–

مَنْ يُّثْبِتُ الْوَسَائِطَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِيَشْفَعُوْهُ اِلَيْهِ فَهُوَ خَرَجَ مِنَ الْاِيْمَانِ۔

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

٢۔ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔

৩. **মুশরিককে কাফের না বলা :** মুশরিকরা কাফের। যারা এ কথায় বিশ্বাস করবে না, অথবা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, অথবা তাদের কর্মতৎপরতাকে সঠিক মনে করবে, তারা কুফরী করবে। যেমন বর্ণিত আছে–

مَنْ لَمْ يَكْفِرِ الْمُشْرِكِيْنَ اَوْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهِمْ اَوْ صَحَّحَ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ۔

মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআনের বাণী–

১- اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ -

٢- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا -

٣- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -

٤- اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ -

৪. **রাসূল (স) কর্তৃক আনীত দীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করা :** আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থাই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ দীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করে অন্য কোনো দীনকে গ্রহণ করা কুফরী। যেমন বর্ণনায় এসেছে–

مَنِ اعْتَقَدَ اَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبِيِّ اَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهٖ وَسِيَاسَةُ غَيْرِهٖ اَكْمَلُ مِنْ سِيَاسَتِهٖ وَوَظِيْفَةُ غَيْرِهٖ اَتَمُّ مِنْ وَظِيْفَتِهٖ فَهُوَ كَافِرٌ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, নবী করীম (স)-এর হেদায়াত ছাড়া অন্য হেদায়াত পরিপূর্ণ এবং তাঁর রাজনীতির চেয়ে অন্য ব্যক্তি বা শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতি পরিপূর্ণ এবং তাদের রেখে যাওয়া পথ ছাড়া অন্য পীর মাশায়েখ, বুযুর্গ ও অলীদের রেখে যাওয়া পথ অধিক পরিপূর্ণ সে কাফের।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী–

١- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

٢- وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

٣- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

٤- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

৫. **মহানবী (স) প্রদর্শিত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা :** মহানবী (স)-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর সকল কাজই ছিল আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং তাঁর চরিত্রই হলো আল কুরআন। সুতরাং মহানবী (স) প্রদর্শিত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা ঈমান নষ্ট হওয়ার মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী–

١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

٢- اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ -

৬. **আল্লাহর অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্রূপ করা :** আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে যে পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলেছেন এর কোনোটি সম্পর্কে বিদ্রূপ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ ও কুফরী। যেমন বর্ণিত আছে–

مَنِ اسْتَهْزَاَ بِاَحَدٍ مِّنْ دِيْنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَوْ ثَوَابِهٖ اَوْ عِقَابِهٖ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْاِيْمَانِ -

এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত–

١- وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

٢- وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا -

٣- وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ -

৭. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া : আল্লাহর দীনের প্রতিটি বিধান বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী আমল করা ঈমানী দায়িত্ব। এর কোনো একটি থেকে নিজেকে বিমুখ রাখাই ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী–

১. مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا۔

২. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ۔

৩. فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ۔

৮. মুশরিকদের সাহায্য করা : কাফের ও মুশরিকদের এমন সাহায্য করা, যার দ্বারা ঈমান, ইসলাম অথবা মুমিন এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়, এসবই ঈমান নষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে এর স্বরূপ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন–

ক. মুশরিকদের সমর্থনে বক্তৃতা, বিবৃতি ও সেমিনার করা।
খ. প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি লিখে তাদের সাহায্য করা।
গ. মুসলিমদের গোপন তথ্য তাদের নিকট ফাঁস করে দেয়া।
ঘ. মুসলিমদের ক্ষতির জন্য তাদের মদদ দেয়া।
ঙ. ইসলামের আদর্শ ত্যাগ করে তাদের আদর্শ গ্রহণ করা।
চ. ইসলামী রাজনীতি ত্যাগ করে সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, অথবা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী–

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

৯. মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়তের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া : মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত জীবনবিধানকে জীবনের একমাত্র জীবনব্যবস্থা মনে করতে হবে। এর বাইরে কোনো জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন ঈমান নষ্টের কারণ, তেমনি নিজেকে শয়তানের ন্যায় অনেক বড় জ্ঞানী বা উত্তম মনে করে রাসূল (স)-এর জীবনাদর্শ ত্যাগ করাও কুফরী। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে–

১. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔

হাদীসে এসেছে–

১. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔

২. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ۔

১০. যাদু টোনা : যাদু টোনা একটি শয়তানী কাজ। এটা দ্বারা মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করা হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, কাউকে আকৃষ্ট করা এবং শত্রুতাবশত কাউকে হত্যা করা হয়, এসব করা কুফরী। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত–

১. وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ۔

২. وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔

৩. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ۔ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ۔ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ۔

নবী করীম (স)-এর বাণী–

١- اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا وَمَا هِىَ؟ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ الخ-

٢- مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ (صـ)-

উপসংহার : ঈমান আল্লাহপ্রদত্ত মহা নেয়ামত। ঈমান গ্রহণকারী কখনো ঈমান বিধ্বংসী কোনো কাজ করতে পারে না। তাহলে সে ঈমানের সীমা থেকে কুফরীর সীমায় পৌঁছে যায়। তাই ঈমান গ্রহণকারী মুমিনকে বর্ণিত বিষয়াবলি থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

■ **اَلسُّؤَالُ (٥٩) : مَا مَعْنَى النَّوَاقِضِ؟ اِشْرَحْ نَوَاقِضَ الْاِيْمَانِ اَىِ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ وَالنِّفَاقَ بِالتَّفْصِيْلِ-**

■ **প্রশ্ন : ৫৯ ॥ نَوَاقِضْ অর্থ কী? ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।**

او - عَرِّفْ نَوَاقِضَ الْاِيْمَانِ - ثُمَّ اَوْضِحْ نَوَاقِضَ الْاِيْمَانِ يَعْنِى الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ وَالنِّفَاقَ مُفَصَّلاً-

অথবা, نَوَاقِضُ الْإِيْمَان-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলো তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বর্ণনা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী– صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً অর্থাৎ, আল্লাহর রঙে রঙিন হও, আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রঙ অধিক উত্তম। আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার বাস্তব রূপরেখা। ঈমান এ দাবি নিয়েই আগত। এর বিপরীত সবগুলোই ঈমান পরিপন্থি, যাকে আরবিতে نَوَاقِضُ الْاِيْمَان বলা হয়। মূলত যে সকল বিশ্বাস বা কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَان বলা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

◌ نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ لُغَةً :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর আভিধানিক অর্থ : نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ একটি যৌগিক শব্দ, একটি نَوَاقِضُ অপরটি اَلْاِيْمَانُ; এরূপ দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে تَرْكِيْبِ اِضَافِىْ বলে। এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন–

نَوَاقِضُ-এর অর্থ : نَوَاقِضُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَاقِضَةٌ; এটা ن - ق - ض মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ :

১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

ক. نَقَضَ الشَّىْءُ نَقْضًا : এর অর্থ– اَفْسَدَ بَعْدَ اِحْكَامِهٖ তথা কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করার পর নষ্ট করা।

খ. نَقَضَ الْبِنَاءَ : এর অর্থ– هَدَمَهُ তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা।

গ. نَقَضَ الْحَبْلَ اَوِ الْغَزْلَ : এর অর্থ– حَلَّ طَاقَتَاهُ তথা সুতার পাক খুলে দেয়া, ঢিলা করা, শিথিল করা। যেমন কুরআনে এসেছে–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا۔

২. কেউ কেউ বলেন–

ক. اَلْاِنْكَارُ তথা অস্বীকার করা, খ. اَلْاِفْسَادُ তথা নষ্ট করা, গ. اَلْاِهْدَامُ তথা ধ্বংস করা, ঘ. اَلْاِبْطَالُ তথা বাতিল করা, ঙ. اَلْاِعْرَاضُ তথা বিমুখ হওয়া।

৩. মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন– مَا تَسَاقَطَ مِنَ الْوَرَقِ وَالثِّمَارِ অর্থাৎ, পাতা ও ফল থেকে যা পড়ে যায়।

৪. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে– مُفْسِدَاتُ مَا اَبْرَمَ مِنْ عُقَدٍ اَوْ بِنَاءٍ ; সুতরাং বোঝা গেল نَوَاقِضُ অর্থ– ১. مُهْلِكَاتٌ তথা ধ্বংসকারী, ২. مَضَرَّاتٌ তথা ক্ষতিকারী, ৩. اَلرَّدُّ তথা প্রত্যাখ্যান করা, ৪. مُدَمِّرَاتٌ তথা বিধ্বংসী, ৫. مُوْبِقَاتٌ তথা বিনাশকারী, ৬. اِبْطَالٌ তথা বাতিল করা, ৭. اِهْدَامٌ তথা নষ্ট করা, ৮. اِفْسَادٌ তথা ক্ষতি করা, ৯. اِنْكَارٌ তথা অস্বীকার করা। পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ۔

٢۔ اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ۔

٣۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۔ اَلَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۔

٤۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ۔

اَلْاِيْمَان-এর অর্থ : اِيْمَانٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা। ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।

৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৪. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া।

৫. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি। ৬. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা।

সুতরাং نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো– ঈমান বা বিশ্বাস বিনষ্টকারী, مُهْلِكَاتُ الْاِيْمَان তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের বিপরীত করা, আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি।

مَعْنٰى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় জমহুর আলেমগণ বলেন– نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ الَّتِىْ تَخْرُجُ مَنْ يَفْعَلُهَا عَنْ دَائِرَةِ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْاِيْمَان বলা হয় এমন কাজকে, যে ব্যক্তি তা করবে তাকে তা ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে।

২. কেউ কেউ বলেন–

هِىَ الَّتِىْ اَحْبَطَتْ اِيْمَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَزَالَتْ عَنْهُمُ الْاِسْلَامَ يُقَالُ لَهَا نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ বলা হয়।

৩. কতিপয় আলেম বলেন–

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِيَ مَا اَبْعَدَ النَّاسَ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْقُرْاٰنِ وَمِنَ الْحَقِّ۔

অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়।

৪. কেউ কেউ বলেন–

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِيَ مَا تُخَالِفُ الْاِيْمَانَ وَاُصُوْلَهُ وَقَوَاعِدَهُ۔

অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ বলা হয় যা ঈমান, তার নীতি ও ভিত্তিগুলোর বিরোধী।

৫. কারো কারো মতে–

هِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ يُقَالُ لَهَا نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ হচ্ছে সে সকল বিষয়, যা শিরক, নেফাক, কুফর ও বিদয়াতের সাথে যুক্ত।

মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস এবং এমন কার্যাবলি যা মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْإِيْمَانِ তথা ঈমান ধ্বংসকারী বলে।

⊃ بَيَانُ نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ اَيِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ :

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের বর্ণনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ তথা কুফর, শিরক ও নেফাকের পরিচিতি আলাদা আলাদাভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

⊃ اَلْكُفْرُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً :

كُفْر-এর আভিধানিক অর্থ : كُفْرٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার; যা ك ـ ف ـ ر মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. جُحُوْدُ النِّعْمَةِ وَالْاِحْسَانِ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে রয়েছে– يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

২. اَلسَّتْرُ তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি–

فِيْ لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمَ غَمَامُهَا اَيْ سَتَرَهَا۔

৩. اَلتَّغْطِيَةُ তথা ঢেকে ফেলা।

৪. سَتْرُ الْحَقِّ তথা সত্যকে গোপন করা।

৫. اَلْاِخْتِفَاءُ তথা লুকিয়ে ফেলা।

৬. اَلظُّلْمَةُ তথা অন্ধকার।

৭. نَقِيْضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের বিপরীত।

৮. نَقِيْضُ الشُّكْرِ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত।

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- اَلْكُفْرُ هُوَ الْجَحْدُ وَالْاِنْكَارُ وَالسَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ

১০. اَلْبُغْضُ তথা হিংসা। যেমন আরবরা বলে- كُفْرٌ عَلٰى كُفْرٍ অর্থাৎ بُغْضٌ عَلٰى بُغْضٍ

১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- اَلْكُفْرُ هُوَ الْعِصْيَانُ وَالْاِمْتِنَاعُ অর্থাৎ, কুফর হলো অবাধ্যতা ও বিরত থাকা।

مَعْنَى الْكُفْرِ اِصْطِلَاحًا :

كُفْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) বলেন- اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- اَلْكُفْرُ عَدَمُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন-

اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ مِمَّا اشْتَهَرَ.

৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন-

اَلْكُفْرُ هُوَ اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন-

كَفَرَ الرَّجُلُ كُفْرًا اَىْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْوَحْدَانِيَّةِ اَوِ النُّبُوَّةِ اَوِ الشَّرِيْعَةِ اَوْ بِثَلَاثَتِهَا.

অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে- আল্লাহর একত্ববাদ অথবা নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা।

৬. عَلَّامَةُ مُحَمَّدُ الْحَسَنُ الْمَدَنِىُّ বলেন-

عَدَمُ التَّصْدِيْقِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (ص).

৭. কেউ কেউ বলেন- هُوَ اِنْكَارُ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

الشِّرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْكٌ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- اَلشَّرَكُ শব্দটির ش-এর ওপর যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচনে شُرُكٌ বা اَشْرَاكٌ:

আবার اَلشِّرْكُ শব্দের ش-এর নিচে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। বহুবচন হবে اَشْرَاكٌ; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-

১. এটা বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়– أَشْرَكَ فِىْ أَمْرِهِ اَىْ أَدْخَلَهُ فِيْهِ অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা أَشْرَكَ بِاللّٰهِ اَىْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِهِ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

২. বাবে مُفَاعَلَة থেকে ব্যবহার হলে তখন অর্থ হবে– অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمِ كَذَا أَىْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهُ

৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে– মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া।

তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ عُرْفًا :

شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো–

১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

২. جَعْلُ الشَّيْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যেমন– لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلٰى * اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوَالًا

৩. اَلتَّشَبُّهُ তথা সদৃশ করা।

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্‌সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো– اِعْتِقَادُ تَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ اِصْطِلَاحًا :

شِرْك-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো–

هُوَ اِشْرَاكُ شَيْءٍ بِاللّٰهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ اللّٰهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়।

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন– اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهِ وَاُلُوْهِيَّتِهِ অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন–

اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهُ اَوْ يَصْرِفَ لَهُ شَيْئًا مِّنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَل গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

প্রথমত : اَلشِّرْكُ الْعَام তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رُبُوبِيَّة এবং اَلُوهِيَّة ও اَلاسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

দ্বিতীয়ত : اَلشِّرْكُ الْخَاصّ তথা বিশেষ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰه-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

❍ اَلنِّفَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى النِّفَاق لُغَةً :

نِفَاق-এর আভিধানিক অর্থ : اَلنِّفَاقُ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। এটি ن ـ ف ـ ق মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلنَّقْبُ الْخَافِضُ مِنَ الْاَرْضِ তথা ভূমির নিচের গর্ত।
২. اِظْهَارُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা।
৩. اِخْفَاءُ الْاَصْلِ তথা মূলকে গোপন করে রাখা।
৪. دُخُوْلُ الثَّعْلَبِ مِنْ طَرْفِ غَارِهِ وَخُرُوْجُهُ بِطُرُقٍ اُخَرَ لِيَفِرَّ بِهِ الصَّائِدُ
অর্থাৎ, শিকারিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য শৃগালের সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যাওয়া।
৫. اَلْمَرَضُ তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَىْ نِفَاقٌ.

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

نَافَقَ فُلَانٌ اَىْ اَظْهَرَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ.

তথা অমুক নেফাকী করল তথা গোপনের বিপরীত বিষয়কে ফাঁস করে দিল।

مَعْنَى النِّفَاقِ اِصْطِلَاحًا :

نِفَاق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. اَلتَّعْرِيْفَات প্রণেতা বলেন–

اَلنِّفَاقُ هُوَ اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ بِاللِّسَانِ وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ.

অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক।

২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন– اَلنِّفَاقُ اِسْرَارُ الْكُفْرِ وَاِظْهَارُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়।

৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয়্যা প্রণেতা বলেন– اَلنِّفَاقُ اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ مَعَ اِسْرَارِ الْكُفْرِ অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ করা।

৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত–

قِيْلَ لَهُ مَا النِّفَاقُ؟ قَالَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِالْاِسْلَامِ وَلَا يَعْمَلَ بِهِ.

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন– اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يُّظْهِرَ الْاِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ

৬. আল্লামা হাসান (র) বলেন–

النِّفَاقُ اخْتِلَافُ الْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ وَاخْتِلَافُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔

অর্থাৎ, নেফাক হলো প্রবেশ ও বহিরাগমন দ্বারা ভিন্ন এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়ে বিপরীত হওয়া।

৭. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন–

اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يَّدْخُلَ فِى الْاِسْلَامِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْرُجَ عَنْهُ مِنْ اٰخَرَ۔

উপসংহার : ঈমান একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত। মুমিন কখনো ঈমান বিধ্বংসী উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হতে পারে না। কেননা তাহলে সে ঈমানের সীমা থেকে কুফরীর সীমায় পৌছে যায়। তাই সকল মুমিনের উচিত কুফর, শিরক ও নেফাক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ঈমানের মযবুতি অর্জন করা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٦٠) : وَازِنْ حَقِيْقَةَ الشِّرْكِ وَطَبِيْعَتَهٗ فِى الْاُمَمِ السَّابِقَةِ وَلِهٰذِهِ الْاُمَّةِ ـ ثُمَّ بَيِّنْ مَفَاسِدَ الشِّرْكِ فِىْ بَنْغَلَادِيْش مَعَ بَيَانِ رَأْيِكَ فِىْ اِسْتِئْصَالِهٖ۔**

■ **প্রশ্ন : ৬০ ॥ অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর। বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এবং শিরকের মূলোৎপাটনে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।** [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক। শিরক মুমিনের ঈমান বিধ্বংসী একটি মারাত্মক ব্যাধি। কথায় ও কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশীদারত্ব স্থাপন করাকে শিরক বলা হয় । এটি জঘন্য অপরাধ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শিরককে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ও চরম অকৃতজ্ঞতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

১ حَقِيْقَةُ الشِّرْكِ وَطَبِيْعَتُهٗ فِى الْاُمَمِ السَّابِقَةِ :

অতীত জাতীর মধ্যে শিরকের ধরন ও প্রকৃতি : অতীত জাতীর মধ্যে যেসব শিরক প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে–

১. **মূর্তি, পাথর, গাছ ও গ্রহ-নক্ষত্রের সেজদা :** অতীতের মুশরিক জাতি নিজেদের হাতে মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করত। এছাড়া বড় পাথর, বড় বড় গাছ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিকে প্রভু মনে করে সেজদা করত। অথচ পবিত্র কুরআন মাজীদে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۔

অর্থাৎ, তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর একমাত্র আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা ফুসসিলাত : ৩৭)

২. **প্রতিমার নিকট সাহায্য :** অতীতের মুশরিক জাতি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের তৈরি করা প্রতিমার নিকট নিজেদের বিপদ-আপদে সাহায্য প্রার্থনা করত। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা তাদের নামে মানত করত। তারা আশা করত যে,

এসব মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ হতে মুক্তি পাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম জপ করত এবং ডাকত। আল্লাহ তা নিষেধ করে ঘোষণা করেন– فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কউকে ডেকো না। (সূরা জ্বিন : ১৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ۔

অর্থাৎ, বরং তোমরা শুধু তাঁকেই (আল্লাহকেই) ডাকবে। যে বিপদের জন্য তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সে বিপদ দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে ভুলে যাবে। (সূরা আনআম : ৪০ - ৪১)

৩. **শরীকদেরকে আল্লাহর সন্তান নামে আখ্যায়িতকরণ :** মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ বান্দা বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত, তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। এজন্য তাদেরকে এরূপ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

৪. **আলেম ও আবেদগণকে রব ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ :** পূর্বের মুশরিক জাতি তাদের আলেম ও আবেদগণকে রব, মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করত। তারা মনে করত, এসব আলেম ও আবেদ যা হালাল বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ। আর যা হারাম বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হারাম, অবৈধ, নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. **পশু জবাইয়ের মাধ্যমে প্রতিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা :** মুশরিকরা পশু জবাই ও উৎসর্গের মাধ্যমে মূর্তি ও প্রতিমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। এজন্য তারা পশু জবাইয়ের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। কুরআনে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۔

অর্থাৎ, বাহীরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেননি; কিন্তু কাফেরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না। (সূরা মায়িদা : ১০৩)

৬. **সম্মানিত মানুষ ও প্রতিমার নামে শপথ :** কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকরা বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলো খুবই সম্মানিত ও পবিত্র। কাজেই তারা তাদের নামে ও তাদের প্রতিমাদের নামে শপথ করত। তাদেরকে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন– مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শিরক করল।

৭. **সন্তানদের عَبْدُ الْعُزّٰى ও عَبْدُ الشَّمْس ইত্যাদি নাম রাখা :** অতীতের মুশরিক সম্প্রদায় তাদের সন্তানদের নাম রাখতো নিজেদের প্রতিমাদের সাথে সম্পৃক্ত করে عَبْدُ الْعُزّٰى তথা উযযার বান্দা, আবদুল লাত তথা লাতের বান্দা, আবদুল মানাত তথা মানাতের বান্দা এবং আবদুশ শামস তথা সূর্যের বান্দা ইত্যাদি।

حَقِيْقَةُ الشِّرْكِ وَطَبِيْعَتُهُ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ :

বর্তমান জাতির মধ্যে শিরকের ধরন প্রকৃতি : পূর্ববর্তী সকল জাতি আসমানী কিতাব, হেদায়াত ও দীন পাওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের মধ্যে অনেক মানুষ একই কারণে এবং একইভাবে বিভিন্ন প্রকারের শিরকের মধ্যে নিপতিত রয়েছে । যেমন–

১. **পীর-ফকির ও মাজারে সেজদা :** বর্তমান সমাজে অনেক ভণ্ড তথাকথিত পীর ফকির ও জ্ঞানপাপী আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে। আর তারাও সন্তুষ্ট চিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। আবার বিভিন্ন মাজারে গিয়েও মাজারকে সেজদা করে। মাজারের খাদেমরা তাতে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না। অথচ এসবই প্রকাশ্য শিরক ও মারাত্মক অপরাধ; যার পরিণতি জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

২. **পীর-ফকির ও দরবেশের নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা :** বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যায় যে, কতিপয় লোক নিজেদের দুরবস্থার অবসান ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। যেমন কোনো পীর-ফকির কিংবা দরবেশের নিকট ব্যবসায়ের উন্নতি চায়, সন্তান কামনা করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ করে। অথচ সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজনে মুসলিমগণ সাহায্য চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে; অন্য কারো কাছে নয়। যেমন রাসূল (স) বলেন– إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

৩. **মাযারের উদ্দেশ্যে মানত বা নযর পেশ :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নযর তথা মানত পেশ করা শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর তথা মানত পেশ করা। বর্তমান সমাজে দেখা যায়, কতিপয় মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার ও কবরের জন্য টাকা-পয়সা, মোমবাতি, আগর বাতি, সুগন্ধি তেল, আতর, লোবান ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করছে ও গ্রহণ করছে। বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়।

৪. **গাইরুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো عِلْمُ الْغَيْبِ তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। অথচ বর্তমান সমাজে কিছু জ্ঞানপাপী আলেম ও লোক আছে যারা এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। এ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেছেন–

إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمِ الْمُغَيَّبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ اَحْيَانًا۔

অর্থাৎ, নবীগণ গাইবী তথা অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন, তা ছাড়া কিছুই জানতেন না।

উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরকের নমুনা হচ্ছে–

৫. রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত করা। কেননা রাসূল (স) বলেন–
اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ.

৬. যাদু করা। কেননা রাসূল (স) বলেন– مَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ

৭. তাবিজ কবজ গলায় ঝুলানো। যেমন রাসূল (স) বলেন–
مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

৮. মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

৯. বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও জুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন।

১ مَفَاسِدُ الشِّرْك :

শিরকের অনিষ্টতা : শিরক যেমন মারাত্মক অপরাধ, তেমনি এর অনিষ্টতা বা ক্ষতিকর দিকগুলোও ভয়াবহ। যেমন–

১. **শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না :** মহান আল্লাহ বান্দার তওবা ছাড়াও নেক আমল ও শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

২. **শিরক সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয় :** শিরকের গুনাহ বান্দার সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

৩. **শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :** কোনো ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলে তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ ও জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ করবেন আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। জালেমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা : ৭২)

৪. **মানবতার জন্য অমর্যাদাকর :** আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে আর সমস্ত সৃষ্টি জগৎ মানুষের সেবা করবে। অথচ মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে সেসব সৃষ্টির নিকট মাথা অবনত করছে। এটা মানবতার জন্য চরম অমর্যাদাকর।

৫. **মূর্খতার প্রকাশ :** মুশরিক সম্প্রদায় নিজের হাতে তৈরি মূর্তির তথা জড় পদার্থের ইবাদত করে। এরূপ তুচ্ছ জড় পদার্থকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা এবং তার ইবাদত করা নিঃসন্দেহে বড় মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. **শিরক বড় ধরনের জুলুম :** শিরককে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বড় ধরনের জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন-- إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ; আর আল্লাহর প্রতি জুলুমের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ۔

অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে ও তাদের নিকট দোয়া করে, যারা তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে।

৩ رَأْيِىْ فِىْ اِسْتِئْصَالِ الشِّرْكِ :

শিরকের মূলোৎপাটনে আমার অভিমত : শিরক ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক অপরাধ। শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কাজেই মানুষকে মারাত্মক অপরাধ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে সমাজ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করতে হবে। আর এজন্য প্রতিটি মুসলিমের করণীয় হচ্ছে–

১. **গণসচেতনতা সৃষ্টি করা :** শিরকের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ, মাদরাসার শিক্ষকগণ এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ ওয়াজমাহফিল ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে শিরকের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে হবে। এভাবে সমাজ থেকে শিরক উৎখাত করতে হবে।

২. **পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা :** সমাজ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট শিরকের পরিচিতি ও পরিণতি তুলে ধরার জন্য দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাপক হারে লেখালেখি করতে হবে।

৩. **সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা :** কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান রাখেন এমন বক্তা ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে আলোচক রেখে পাড়া, মহল্লায়, মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসায় ব্যাপক ভিত্তিতে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে শিরক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং সমাজে শিরকের কুফল তুলে ধরতে হবে।

৪. **প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা :** সমাজে প্রচলিত যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় দমন ও উৎপাটন করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ অধিক ফলপ্রসু। সুতরাং সমাজ থেকে শিরকের মতো জঘন্য অপরাধের মূলোৎপাটনে প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

৫. **শিরককারীদেরকে শক্ত হস্তে দমন করা :** যেখানেই শিরক পরিলক্ষিত হবে, প্রথমেই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শক্ত হাতে দমন করতে হবে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ۔

৬. **শিরকের উৎসস্থলের যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া :** কবর ও মাযারসহ যেসব স্থানকেন্দ্রিক শিরক সংঘটিত হয়, সেসব স্থানের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং আস্তে আস্তে শিরকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ। তওবা তথা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত আর পরকালেও হবে অপমানিত। জাহান্নাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা। সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের উচিত সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং শিরক দেখা গেলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিরোধ করা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٦١) : مَا هُوَ الشِّرْكُ؟ اُذْكُرْ مَفَاسِدَ الشِّرْكِ فِىْ بَنْغَلَادِيْش مَعَ بَيَانِ رَأْيِكَ فِى اِسْتِئْصَالِهِ.**

■ **প্রশ্ন : ৬১ ॥ শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আলোচনাপূর্বক এর মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৬]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক বলে। এটা এমনই এক প্রবৃত্তিপ্রসূত গতানুগতিক লোকাচার, যদ্দারা প্রকৃত রবের অবস্থান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অক্ষমার্হ্য। আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

⊃ شِرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْكٌ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা– اَلشَّرْكُ শব্দটির ش বর্ণে যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচনে شَرَكٌ বা اَشْرَاكٌ;

আবার اَلشِّرْكُ শব্দের ش বর্ণে যের দ্বারা তখন অর্থ হবে اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। বহুবচন হবে اَشْرَاكٌ; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. এটা বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়– اَشْرَكَ فِىْ اَمْرِهٖ اَىْ اَدْخَلَهُ فِيْهِ অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা اَشْرَكَ بِاللّٰهِ اَىْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِهٖ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

২. বাবে مُفَاعَلَة থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে– অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمٍ كَذَا أَىْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهُ

৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে– মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ عُرْفًا :

شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো– ১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

২. جَعْلُ الشَّئْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।
যেমন– لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلٰى * اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوَالَ

৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা।

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্‌সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো– اِعْتِقَاد تَعَدُّدِ الْاِلٰهَةِ অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ شَرْعًا :

شِرْك-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো–
هُوَ اِشْرَاكُ شَئٍ بِاللّٰهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ اللّٰهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়।

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন–
اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ.
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন–
اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَّدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهٗ اَوْ يَصْرِفَ لَهٗ شَيْئًا مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.
অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَل গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

প্রথমত : اَلشِّرْكُ الْعَام তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رُبُوْبِيَّة এবং اُلُوْهِيَّة ও اَلْاَسْمَاءُ وَالصِّفَات-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

দ্বিতীয়ত : اَلشِّرْكُ الْخَاص তথা বিশেষ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰه-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

৩ : مَفَاسِدُ الشِّرْكِ فِيْ بَنْغَلَادِيْش

বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাব : শিরক যেমন মারাত্মক অপরাধ, তেমনি এর অনিষ্টতা বা ক্ষতিকর দিকগুলোও ভয়াবহ। যেমন–

১. **শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না :** মহান আল্লাহ বান্দার তওবা ছাড়াও নেক আমল ও শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا۔

২. **শিরক সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয় :** শিরকের গুনাহ বান্দার সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔

৩. **শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :** কোনো ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলে তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ ও জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۔
অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ করবেন আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। জালেমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা : ৭২)

৪. **মানবতার জন্য অমর্যাদাকর :** আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে আর সমস্ত সৃষ্টি জগৎ মানুষের সেবা করবে। অথচ মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করে সেসব সৃষ্টির নিকট মাথা অবনত করছে। এটা মানবতার জন্য চরম অমর্যাদাকর।

৫. **মূর্খতার প্রকাশ :** মুশরিক সম্প্রদায় নিজের হাতে তৈরি মূর্তির তথা জড় পদার্থের ইবাদত করে। এরূপ তুচ্ছ জড় পদার্থকে সৃষ্টিকর্তা মনে করা এবং তার ইবাদত করা নিঃসন্দেহে বড় মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. **শিরক বড় ধরনের জুলুম :** শিরককে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বড় ধরনের জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ; আর আল্লাহর প্রতি জুলুমের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম।

শিরকের অপকারিতা বা শিরক করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ۔

অর্থাৎ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সবকে ডাকে ও তাদের নিকট দোয়া করে, যারা তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্তও জবাব দিতে পারবে না আর তারা তাদের দোয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ শ্রেণির লোকদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে।

رَأْيِىْ فِىْ اِسْتِئْصَالِ الشِّرْكِ ১ :

শিরকের মূলোৎপাটনে আমার অভিমত : শিরক ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক অপরাধ। শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কাজেই মানুষকে মারাত্মক অপরাধ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে সমাজ থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করতে হবে। আর এজন্য প্রতিটি মুসলিমের করণীয় হচ্ছে–

১. **গণসচেতনতা সৃষ্টি করা :** শিরকের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ, মাদরাসার শিক্ষকগণ এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ ওয়াজমাহফিল ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে শিরকের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে হবে। এভাবে সমাজ থেকে শিরক উৎখাত করতে হবে।

২. **পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা :** সমাজ ও দেশের সর্বস্তরের জনগণের নিকট শিরকের পরিচিতি ও পরিণতি তুলে ধরার জন্য দেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাপক হারে লেখালেখি করতে হবে।

৩. **সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা :** কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান রাখেন এমন বক্তা ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে আলোচক রেখে পাড়া, মহল্লায়, মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসায় ব্যাপক ভিত্তিতে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে শিরক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং সমাজে শিরকের কুফল তুলে ধরতে হবে।

৪. **প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা :** সমাজে প্রচলিত যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় দমন ও উৎপাটন করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ অধিক ফলপ্রসু। সুতরাং সমাজ থেকে শিরকের মতো জঘন্য অপরাধের মূলোৎপাটনে প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

৫. **শিরককারীদেরকে শক্ত হস্তে দমন করা :** যেখানেই শিরক পরিলক্ষিত হবে, প্রথমেই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শক্ত হাতে দমন করতে হবে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ-

৬. **শিরকের উৎসস্থলের যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া :** কবর ও মাযারসহ যেসব স্থানকেন্দ্রিক শিরক সংঘটিত হয়, সেসব স্থানের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং আস্তে আস্তে শিরকের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

উপসংহার : শিরক গুরুতর অপরাধ। তওবা তথা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া এ গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। মুশরিকদের দোয়া কবুল হয় না। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত আর পরকালেও হবে অপমানিত। জাহান্নাম হবে তাদের শেষ ঠিকানা। সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও শিরকমুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের উচিত সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং শিরক দেখা গেলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রতিরোধ করা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٦٢) : عَرِّفِ الشِّرْكَ لُغَةً وَشَرْعًا ـ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ ـ**

■ **প্রশ্ন : ৬২ ॥ شِرْك-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।** [ফা. প. ২০০৭]

أو ـ مَا مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ اَقْسَامَهُ وَاَسْبَابَهُ وَحُكْمَهُ بِالتَّفْصِيْلِ ـ

অথবা, শিরক-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? শিরকের প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক বলে। এটা এমনই এক প্রবৃত্তিপ্রসূত গতানুগতিক লোকাচার, যদ্দারা প্রকৃত রবের অবস্থান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অক্ষমার্হ্য। আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ;

شِرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْكٌ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা– اَلشَّرَكُ শব্দটির ش বর্ণে যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচনে شَرِكٌ বা اَشْرَاكٌ;

আবার اَلشِّرْكُ শব্দের ش বর্ণে যের দ্বারা তখন অর্থ হবে اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। বহুবচন হবে اَشْرَاكٌ; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. এটা বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়– اَشْرَكَ فِىْ اَمْرِهٖ اَىْ اَدْخَلَهُ فِيْهِ অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা اَشْرَكَ بِاللّٰهِ اَىْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِهٖ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

২. বাবে مُفَاعَلَة থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে– অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمٍ كَذَا أَىْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهُ

৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে– মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ عُرْفًا :

شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো– ১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

২. جَعْلُ الشَّيْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যেমন– لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلٰى * اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوَالَ

৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা।

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো– اِعْتِقَادُ تَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ شَرْعًا :

شِرْك-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো–

هُوَ اِشْرَاكُ شَيْءٍ بِاللّٰهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ اللّٰهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়।

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওয়ান বলেন– اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন–

اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَّدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهٗ اَوْ يَصْرِفَ لَهٗ شَيْئًا مِّنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَل গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

প্রথমত : اَلشِّرْكُ الْعَام তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رُبُوْبِيَّة এবং اُلُوْهِيَّة ও اَلْاَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

দ্বিতীয়ত : اَلشِّرْكُ الْخَاصّ তথা বিশেষ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰه-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

اَقْسَامُ الشِّرْك ⊃ :

شِرْك-এর প্রকারভেদ : شِرْك প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَر তথা বড় শিরক। ২. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر তথা ছোট শিরক।

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَر-এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন–

اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক হলো– ইবাদতের কোনো প্রকারকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ هُوَ اِثْبَاتُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা।

২. **اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر-এর পরিচয় :** আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন–

اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ هُوَ مُرَاعَاةُ غَيْرِ اللّٰهِ مَعَهُ فِىْ بَعْضِ الْاُمُوْرِ۔

অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাথে غَيْرُ اللّٰه-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر তথা ছোট শিরক আবার দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الظَّاهِر তথা প্রকাশ্য শিরক,

২. اَلشِّرْكُ الْخَفِىّ তথা গোপন শিরক।

اَلشِّرْكُ الظَّاهِر আবার দু'প্রকার। যথা–

ক اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَلْفَاظِ তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক।

খ. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَفْعَالِ তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক।

ক. শব্দের দ্বারা শিরক : মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে। যেমন–

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা। এমর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেন– مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ

২. مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ অর্থাৎ, কথা বলতে গিয়ে এরূপ বলা, আল্লাহর ইচ্ছা এবং তোমার ইচ্ছা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী–

لَمَّا قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ فَقَالَ اَجَعَلْتَنِىْ لِلّٰهِ نِدًّا قُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ۔

খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে তাবিজ, সুতা ইত্যাদি বাঁধা।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক।

২. اَلشِّرْكُ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক।

১. **اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ-এর পরিচয় :** اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ وَاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَاَفْعَالِهِ তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলিতে শিরক করা। এক্ষেত্রে ছোট শিরক নেই; বরং সবগুলোই বড় ও জঘন্য। এ ধরনের শিরক দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَر তথা সবচেয়ে বড় শিরক।

২. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر তথা সবচেয়ে ছোট শিরক।

তবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

ক. شِرْكُ التَّعْطِيْل তথা আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় ও শূন্য করার শিরক। এ প্রকার শিরক নাস্তিকতার নামান্তর। যেমন ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিত্বহীন মনে করে নিজেই রব তথা লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল।

খ: আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যস্ত করে নেয়া। যেমন–

১. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা ও মারইয়াম (আ)-কে ইলাহ সাব্যস্ত করেছে।

২. সূর্য ও চন্দ্র পূজারিদের শিরক।

৩. নমরূদের ন্যায় কেউ নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা মনে করা।

৪. আলো ও আঁধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করা।

আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন, শিরক ছয় প্রকার। যথা–

১. شِرْكُ الْإِسْتِقْلَال তথা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন– অগ্নিপূজারিদের শিরক।

২. شِرْكُ التَّبْعِيْض তথা একাধিক মাবুদের সমন্বয়ে এক মাবুদ হওয়ার বিশ্বাস করা।

৩. شِرْكُ التَّقْرِيْب তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় غَيْرُ اللّٰه-এর ইবাদত করা। যেমন– পীর পূজারি মুসলিম, পুরোহিত পূজারি হিন্দু ইত্যাদি।

৪. شِرْكُ التَّقْلِيْد তথা অন্যের অন্ধ অনুসরণে غَيْرُ اللّٰه-এর ইবাদত করা। যেমন– পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণে জাহেলদের শিরক।

৫. شِرْكُ الْاَسْبَاب তথা প্রকৃতি পূজারি। যেমন– দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা।

৬. شِرْكُ الْاَغْرَاض তথা সম্পূর্ণ غَيْرَ اللّٰه-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। যেমন– প্রকৃত মুনাফিকদের সালাত।

২. **اَلشِّرْكُ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰه-এর পরিচয় :** আল জাওয়াবুল কাফী প্রণেতা বলেন–

شِرْكٌ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَمُعَامَلَتِهٖ وَهٰذَا الشِّرْكُ يَنْقَسِمُ اِلٰى مَغْفُوْرٍ وَغَيْرِ مَغْفُوْرٍ وَاَكْبَرَ وَ اَصْغَرَ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির শিরক মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় শিরক ও ছোট শিরকে বিভক্ত।

ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান বলেন– شِرْكٌ فِى الْعِبَادَةِ তিন প্রকার। যথা–

ক. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَر তথা বড় শিরক। এর অর্থ হলো আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মতোই তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা।

খ. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر তথা ছোট শিরক। এর অর্থ হলো– আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা।

গ. اَلشِّرْكُ الْخَفِىّ তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো, মনের মধ্যে এমন কথা, গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও غَيْرُ اللّٰه সমান হয়ে যায়।

اَسْبَابُ الشِّرْك ٤ :

শিরকের কারণসমূহ : কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে মুশরিকদের শিরক তথা বিভ্রান্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. **বিশেষ বান্দাগণের প্রতি অতি ভক্তি :** শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল মানুষের মুজিযা, কারামত তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাদের উলুহিয়াত বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। তাদের এ দাবি বা যুক্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔

২. **বিশেষ বান্দাদের সুপারিশের বিশ্বাস :** মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা দলীল ছিল সুপারিশের দলীল। মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۔ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

কুরআনের বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, শিরকের পথে মুশরিকদের পদক্ষেপগুলো ছিল নিম্নরূপ–

ক. তারা বিশ্বাস করত, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক। তাদের এ বিশ্বাস সঠিক ছিল।

খ. তারা বিশ্বাস করত, ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও অন্যান্য কিছু থেকে মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসেন। ফেরেশতা ও নবীগণের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস সঠিক ছিল, তবে অন্যান্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল।

গ. তারা বিশ্বাস করত, এ সকল প্রিয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারেন। তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার সমন্বিত রূপ। মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, ফেরেশতাগণ বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামতো নয়; বরং সুপারিশ বা শাফায়াতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, তিনি সুপারিশ করবেন কেবল তার জন্য, যার বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার ওপরে আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারাই সুপারিশ করতে পারবেন।

ঘ. তারা বিশ্বাস করত, এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন এবং এরাও সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজনগুলো আল্লাহর নিকট থেকে আদায় করে দেন। এ বিশ্বাসটি ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

৩. **শয়তানের প্রতারণা :** মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

١۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ۔

٢- وَاِذَا رَاَى الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِكَ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ-

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায়, জিন শয়তানরা ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো উপাস্যের আকৃতি ধারণ করে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত, তারা ফেরেশতাদের ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

৪. **পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ :** মহানবী (স) যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের সকল যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন, তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসেবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত এবং শিরক পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

١- قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

٢- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ-

৫. **ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি :** ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিবিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ এবং মুখাপেক্ষিতা। অথচ তারা অহীর সাথে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসে পরিণত করে শিরকে নিমজ্জিত হয়। তাদের শিরকের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিত্ববাদ ও ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়ম (আ)-কে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

৩ حُكْمُ الشِّرْك :

শিরকের বিধান বা পরিণতি : মানবজীবনের ভয়ঙ্করতম অধঃপতন ও ধ্বংস শিরকের মধ্যে নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ–

১. **শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না :** বান্দা গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এছাড়া নেক আমলের মাধ্যমেও গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে শিরকের পাপ তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

২. **শিরক সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে :** আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহর বাণী–

١- وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা হয়েছে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২- وَمَن يَّكفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. **শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :** মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির শান্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চির শাস্তির স্থান জাহান্নাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

اِنَّهٗ مَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ। একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ **اَلسُّؤَالُ (٦٣) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ؟ هَلْ يُكَفَّرُ الرَّجُلُ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ؟ وَهَلْ يَجُوْزُ اَن يُّقَالَ لِاَهْلِ الْقِبْلَةِ اَوِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا؟ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ -**

■ **প্রশ্ন : ৬৩ ॥ কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কী? কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে কি? এবং কোনো মুসলিম অথবা কিবলার অনুসারীকে কাফের বলা যাবে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। এটা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা, অভদ্রতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। এটা আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করে, যার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। মুশরিকের জন্য পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ :

কুফর ও শিরকের পার্থক্য : কুফর ও শিরকের মধ্যে অর্থগত ও মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** اَلْكُفْر-এর আভিধানিক অর্থ اَلسَّتْرُ তথা গোপন করা, اَلْجُحُوْدُ তথা অস্বীকার করা, اَلْكِتْمَانُ তথা গোপন করা বা ঢেকে রাখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ -

পক্ষান্তরে اَلشِّرْكُ শব্দের আভিধানিক অর্থ–
১. حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি, ২. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা,
৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা,
৪. جَعْلُ الشَّيْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।
পক্ষান্তরে শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–
اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ۔
অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. শিরক হলো عَام আর কুফর হলো خَاص;
২. মুশরিক আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করে না; বরং তার সাথে অন্যকেও অংশীদার সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে কাফের আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।
৩. শিরকে খফী বা আসগরের ফলে মুমিন কবীরা গুনাহকারী হয়, ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে কুফর কাউকে ঈমান থেকে বের করে দেয়।

حُكْمُ تَكْفِيْرِ مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ ⊃ :

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলার বিধান : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে কিনা, এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হবে না; বরং সে মুমিনে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সে خُلُوْد فِى النَّار হবে না। যদি তওবা ব্যতীত মারা যায়, তাহলে পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে।
দলীল : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
١۔ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا۔
٢۔ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا۔
٣۔ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى۔
উল্লিখিত আয়াতসমূহে কবীরা গুনাহ করার পরও তাদেরকে মুমিন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরদিকে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

২. মুতাযিলাদের অভিমত : তাদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও হয় না আবার মুমিনও থাকে না। সে ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। অর্থাৎ তার অবস্থান হলো مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ; উক্ত ব্যক্তি তওবা ব্যতীত মারা গেলে مُخَلَّدٌ فِى النَّار হবে।
দলীল : এ বিষয়ে তারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন–
ক. আল কুরআন–
وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا۔

খ. আল হাদীস– ١۔ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا۔

٢۔ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

৩. **খারেজীদের অভিমত :** তাদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়।

দলীল : এ বিষয়ে তারাও কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন–

ক. আল কুরআন– وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

খ. হাদীস– مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. **মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর :** ক. তাদের উত্থাপিত আয়াতে خَالِدًا দ্বারা دَوَام উদ্দেশ্য নয়; বরং مُكْث طَوِيْل উদ্দেশ্য।

খ. হাদীসে نَفْس اِيْمَان তথা মূল ঈমানকে نَفِى করা হয়নি; বরং ঈমানের পূর্ণাঙ্গতাকে نَفِى করা হয়েছে।

গ. উক্ত হাদীসদ্বয়ে تَغْلِيْظ ও تَشْدِيْد-এর হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. **খারেজীদের দলীলের প্রত্যুত্তর :** ক. আয়াতে কুফর দ্বারা সব বিধিবিধানকে অস্বীকার করা বোঝানো হয়েছে। আর যারা দীনের সকল বিধিবিধানকে অস্বীকার করবে, তারা নিশ্চিতভাবেই কাফের হবে।

খ. হাদীসে সালাত পরিত্যাগের ব্যাপারে কঠোরতা ও ধমকিস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অথবা এর দ্বারা সালাত অস্বীকার করা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এ ব্যক্তিও কাফের হবে।

حُكْمُ تَكْفِيْرِ اَهْلِ الْقِبْلَةِ :

কিবলার অনুসারীকে কাফের বলার বিধান : কোনো আহলে কিবলা তথা কিবলার অনুসারীকে কবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদগণের নিকট থেকে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

ক. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে– لَا يَجُوْزُ اَنْ يُقَالَ كَافِرًا لِاَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ অর্থাৎ, আহলে কিবলাকে কোনো গুনাহের কারণে কাফের বলা জায়েয নেই। তাঁদের দলীল হলো–

ক. আল কুরআন– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه

খ. আল হাদীস– ١۔ لَا تُكَفِّرُ بِذَنْبٍ وَلَوْ كَبِيْرَةً۔

٢۔ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

٣۔ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

খ. **মুতাযিলাদের অভিমত :** এ বিষয়ে তাদের অভিমত হলো, কবীরা গুনাহের কারণে আহলে কিবলাকে কাফের বলা যাবে না; তবে সে মুমিনও নয়; বরং তার অবস্থান হলো– مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ; সে যদি তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহলে خُلُوْدٌ فِى النَّارِ হবে।

দলীল : ক. আল কুরআন–

وَمَن يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ـ

খ. আল হাদীস– مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

গ. খারেজীদের অভিমত : তাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী কাফের। তাই কিবলার অনুসারী হলেও তাকে কাফের বলা যাবে।

দলীল : এক্ষেত্রেও তারা পূর্বের মতো দলীল পেশ করেন–

ক. আল কুরআন– وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

খ. আল হাদীস– مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও খারেজীদের দলীলের জবাবে বলা যায়–

১. عَمَل ঈমানের রোকন নয়; কিন্তু এটা مُؤْمِن كَامِل হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। কেননা تَصْدِيْقُ الْقَلْبِ-কে ঈমান বলা হয়।

২. মুতাযিলাদের দলীলে تَهْدِيْد তথা ধমকস্বরূপ বলা হয়েছে।

৩. কোনো ব্যক্তি হালাল মনে করে অথবা মুসলিম হওয়ার দায়ে কাউকে হত্যা করলে সে কাফের হয়ে যাবে।

حُكْمُ تَكْفِيْرِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا ❍ :

কোনো মুসলিমকে কাফের বলার বিধান : সকল ইমাম ও ফকীহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না। যদি কোনো মুসলিম অপর মুসলিম সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করে; অথচ বাস্তবে সে কাফের না হয়, তাহলে উক্তিকারী নিজেই কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

١ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) لا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا اِرْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ لِذٰلِكَ ـ

٢ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا جَارَ عَلَيْهِ ـ

٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ اَحَدُهُمَا ـ

উপসংহার : শিরক হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর কুফর হলো আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। যার অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, সেই প্রকৃত কাফের। আর তাই কবীরা গুনাহকারী কিবলার অনুসারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٤) : مَا مَعْنَى الْكُفْرِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا وَمُدَلَّلًا

■ **প্রশ্ন : ৬৪ ॥ কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৯]

او- مَا الْكُفْرُ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ-

অথবা, 'কুফর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

او- مَا مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ-

অথবা, كُفْر-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। كُفْرٌ শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, গোপন করা। আর যে হতভাগা আল্লাহর জাত ও সিফাত এবং তার যাবতীয় হুকুম অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ কিংবা গোপন করে সেই কাফের। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ; নিম্নে প্রশ্নালোকে কুফর সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ كُفْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً :

كُفْر-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْكُفْرُ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার, যা ك - ف - ر মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. جُحُوْدُ النِّعْمَةِ وَالْاِحْسَانِ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে রয়েছে- يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

২. اَلسَّتْرُ তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি-

فِيْ لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمُ غَمَامُهَا اَىْ سَتَرَهَا -

৩. اَلتَّغْطِيَةُ তথা ঢেকে ফেলা।

৪. سَتْرُ الْحَقِّ তথা সত্যকে গোপন করা।

৫. اَلْاِخْتِفَاءُ তথা লুকিয়ে ফেলা।

৬. اَلظُّلْمَةُ তথা অন্ধকার।

৭. نَقِيْضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের বিপরীত।

৮. نَقِيْضُ الشُّكْرِ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত।

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন- اَلْكُفْرُ هُوَ الْجَحْدُ وَالْاِنْكَارُ وَالسَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ

১০. اَلْبُغْضُ তথা হিংসা। যেমন আরবরা বলে- كُفْرٌ عَلٰى كُفْرٍ অর্থাৎ بُغْضٌ عَلٰى بُغْضٍ

১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে- اَلْكُفْرُ هُوَ الْعِصْيَانُ وَالْاِمْتِنَاعُ অর্থাৎ, কুফর হলো- অবাধ্যতা ও বিরত থাকা।

مَعْنَى الْكُفْرِ شَرْعًا :

كُفْر-এর শরয়ী অর্থ : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ عَدَمُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ مِمَّا اشْتَهَرَ-

৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

كَفَرَ الرَّجُلُ كُفْرًا اَىْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْوُحْدَانِيَّةِ اَوِ النُّبُوَّةِ اَوِ الشَّرِيْعَةِ اَوْ بِثَلَاثَتِهَا-

অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে– আল্লাহর একত্ববাদ অথবা নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা।

৬. عَلَّامَة مَحْمُوْدُ الْحَسَنِ الْمَدَنِىّ বলেন–

عَدَمُ التَّصْدِيْقِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (ص)-

৭. কেউ কেউ বলেন– هُوَ اِنْكَارُ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

اَقْسَامُ الْكُفْرِ :

كُفْر-এর প্রকারভেদ : কুফরকে دَلَائِلُ التَّوْحِيْد-এর গ্রন্থকার مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيْمِىّ প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. كُفْرُ اَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা বড় কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়।

২. كُفْرُ اَصْغَرُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা ছোট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না।

১. كُفْرُ اَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা বড় কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এটা আবার পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. كُفْرُ التَّكْذِيْبِ অর্থাৎ, অন্তর ও মৌখিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করাকে كُفْرُ التَّكْذِيْبِ বলে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ-

খ. كُفْرُ الْاِبَاءِ وَالْاِسْتِكْبَارِ مَعَ التَّصْدِيْقِ তথা বিশ্বস্ততার সাথে অহংকার বশত কুফরী করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔

গ. كُفْرُ الشَّكِّ তথা সন্দেহ বা ধারণাবশত কুফরী করা। এটাকে كُفْرُ الظَّنِّ-ও বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا ۔ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا۔

ঘ. كُفْرُ الْاِعْرَاضِ তথা বিমুখতার কুফরী। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ۔

ঙ. كُفْرُ النِّفَاقِ তথা নেফাকীর কুফরী। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ۔

২. كُفْرٌ اَصْغَرُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা ছোট কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ প্রকারের কুফর বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–

ক. كُفْرُ النِّعْمَةِ তথা নেয়ামতের কুফরী বা নেয়ামতের অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ۔

খ. كُفْرُ قِتَالِ الْمُسْلِمِ তথা মুসলিম হত্যার মাধ্যমে কুফরী। যেমন হাদীসে এসেছে–

١۔ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ۔

٢۔ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ۔

গ. كُفْرُ الْحَلَفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কুফরী। যেমন হাদীসে এসেছে–

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ ۔

তাফসীরে খাযেন প্রণেতা কুফরকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. كُفْرُ الْاِنْكَارِ তথা অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী। এটি হলো– هُوَ اَنْ يَّكْفُرَ بِقَلْبِهٖ وَلِسَانِهٖ وَلَا يَعْرِفُ مَا يُذْكَرُ لَهٗ مِنَ التَّوْحِيْدِ অর্থাৎ, মনে ও মুখে কুফরী করা। যদি তার নিকট তাওহীদকে পেশ করা হয়, তা সে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন ফিরাউনের কুফরী এবং তার কথা– مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ

২. كُفْرُ الْجُحُوْدِ তথা অস্বীকৃতির কুফরী। এটা বলা হয়– وَهُوَ اَنْ يَّعْرِفَ اللّٰهَ بِقَلْبِهٖ اَصْلًا وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهٖ অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে মূলগতভাবে আল্লাহকে চিনে কিন্তু মুখে তা স্বীকার করে না। যেমন ইবলিসের কুফরী।

৩. كُفْرُ الْعِنَادِ তথা সীমালঙ্ঘনের কুফরী। এটা বলা হয়– هُوَ اَنْ يَّعْرِفَ اللّٰهَ بِقَلْبِهٖ وَيُقِرُّ بِلِسَانِهٖ وَلَا يَدِيْنُ بِهٖ অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনে এবং মুখে স্বীকার করে কিন্তু ঐ আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করে না। যেমন উমাইয়া ইবনে আবু সালতের কুফরী। এ ব্যাপারে তার কবিতা রয়েছে–

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ * مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حَذَارَ مَسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذَاكَ بَيْنًا۔

৪. كُفْرُ النِّفَاقِ তথা নেফাকীর কুফরী। এটা বলা হয়–

هُوَ اَنْ يُّقِرَّ بِلِسَانِهٖ وَلَا يَعْتَقِدُ صِحَّةَ ذٰلِكَ بِقَلْبِهٖ۔

অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে মুখে স্বীকার করে কিন্তু তার সত্যতা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করে না।

উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ। এর দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এ কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী। এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও ইসলামের সাথে দুশমনির শামিল। তাই কুফর থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٥) : مَا مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا هِيَ اَوْصَافُ الْكَافِرِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ بَعْضَ مَظَاهِرِ الْكُفْرِ الْمُرَوَّجَةَ فِى الْمُجْتَمَعِ۔

■ প্রশ্ন : ৬৫ ॥ কুফরের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কাফেরদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সমাজে প্রচলিত কিছু কুফরের বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। كُفْرٌ শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, গোপন করা। আর যে হতভাগা আল্লাহর জাত ও সিফাত এবং তার যাবতীয় হুকুম অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ কিংবা গোপন করে সেই কাফের। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

কুফর-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً :

كُفْر-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْكُفْرُ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার, যা ك ـ ف ـ ر মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. جُحُوْدُ النِّعْمَةِ وَالْاِحْسَانِ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে রয়েছে– يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

২. اَلسَّتْرُ তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি–

فِيْ لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمُ غَمَامُهَا اَيْ سَتَرَهَا۔

৩. اَلتَّغْطِيَةُ তথা ঢেকে ফেলা।

৪. سَتْرُ الْحَقِّ তথা সত্যকে গোপন করা। ৫. اَلْاِخْتِفَاءُ তথা লুকিয়ে ফেলা।

৬. اَلظُّلْمَةُ তথা অন্ধকার। ৭. نَقِيْضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের বিপরীত।

৮. نَقِيْضُ الشُّكْرِ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত।

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ الْجَحْدُ وَالْاِنْكَارُ وَالسَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ

১০. اَلْبُغْضُ তথা হিংসা। যেমন আরবরা বলে থাকে– كُفْرٌ عَلٰى كُفْرٍ অর্থাৎ بُغْضٌ عَلٰى بُغْضٍ;

১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে– اَلْكُفْرُ هُوَ الْعِصْيَانُ وَالْاِمْتِنَاعُ অর্থাৎ কুফর হলো– অবাধ্যতা ও বিরত থাকা।

مَعْنَى الْكُفْرِ شَرْعًا :

كُفْر-এর শরয়ী অর্থ : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (র) বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ عَدَمُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনাই কুফর।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ مِمَّا اشْتَهَرَ.

৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْكُفْرُ هُوَ اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

كَفَرَ الرَّجُلُ كُفْرًا اَىْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْوَحْدَانِيَّةِ اَوِ النُّبُوَّةِ اَوِ الشَّرِيْعَةِ اَوْ بِثَلَاثَتِهَا.

অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে– আল্লাহর একত্ববাদ অথবা নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা।

৬. আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান আল মাদানী বলেন–

عَدَمُ التَّصْدِيْقِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (ص).

৭. কেউ কেউ বলেন– هُوَ اِنْكَارُ التَّوْحِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

اَوْصَافُ الْكَافِرِ :

কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি : ১. কাফেররা অত্যাচারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

২. কাফেররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

৩. তারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

৪. তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে গোপন করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى۔

৫. তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মুমিনের অভিশাপ। যেমন কুরআনের বাণী–
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

৬. তাদের অন্তরে ভয়ভীতি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ۔

৭. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ۔

৮. আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔

৯. তারা নিজেরা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকে এবং মানুষকে বিরত রাখে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا۔

১০. নির্বোধদের ন্যায় আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔

উল্লিখিত গুণাবলি ছাড়াও কুরআন হাদীসে কাফেরদের আরো অনেক গুণের উল্লেখ রয়েছে।

مَظَاهِرُ الْكُفْرِ فِي الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ, হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফরী। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) شَرْحُ فِقْهِ الْأَكْبَرِ গ্রন্থে বলেছেন–
تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ مِنَ الْغَيْبِ كُفْرٌ۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

২. কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে সে পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসি তামাশা করাও কুফর।

৩. মহান আল্লাহর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তাঁর ওপর আরোপ করা অথবা তাঁর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর।
সমাজে প্রচলিত এসব কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, ইসলামী আইন, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা।

৪. কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম করা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে করে, তাহলে তা কুফর বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা কুফরী। যেমন সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

৫. কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা।

৭. অলীগণের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা।

৮. মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ.

৯. সত্য জানা সত্ত্বেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা। যেমন কুরআনে এসেছে–
وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ. اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা। যেমন– যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা।

উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ। এর দ্বারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা হয়। এ কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী। এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও ইসলামের সাথে দুশমনির শামিল। তাই কুফর থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ **اَلسُّؤَالُ (٦٦) : عَرِّفِ النِّفَاقَ مَعَ بَيَانِ اَقْسَامِهٖ وَحُكْمِهٖ مُفَصَّلًا.**

■ **প্রশ্ন : ৬৬ ॥ নেফাক-এর সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর শ্রেণিবিন্যাস ও হুকুম বিস্তারিত আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০০৯]

او. مَا مَعْنَى النِّفَاقِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ. وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِىِّ وَالْعَمَلِىِّ؟

অথবা, اَلنِّفَاق-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। نِفَاق عَمَلِى ও نِفَاق اِعْتِقَادِى-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

او. عَرِّفِ النِّفَاقَ. ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهٗ وَاَسْبَابَهٗ وَحُكْمَهٗ مَعَ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ مُفَصَّلًا.

অথবা, نِفَاق-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, কারণ ও বিধান বর্ণনাসহ কাফের ও মুনাফিক-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নেফাক তথা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম ক্ষতিকর বিষয়। এটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। কাফের মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত; কিন্তু নেফাকের চর্চাকারী তথা মুনাফিকরা ছদ্মবেশে প্রতারণা ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে। এদের

কারণে সমাজে নানাবিধ ফেতনা ফাসাদের উদ্ভব হয়। এরা হৃদয়ে কুফরী ও শিরক গোপন রেখে কেবল সাময়িক সুবিধা লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে নেফাকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ نِفَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى النِّفَاقِ لُغَةً :

نِفَاق-এর আভিধানিক অর্থ : نِفَاقٌ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। এটি ن ـ ف ـ ق মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلنَّقَبُ الْخَافِضُ مِنَ الْاَرْضِ তথা ভূমির নিচের গর্ত।

২. اِظْهَارُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা।

৩. اِخْفَاءُ الْاَصْلِ তথা মূলকে গোপন করে রাখা।

৪. دُخُوْلُ الثَّعْلَبِ مِنْ طَرَفِ غَارِهِ وَخُرُوْجُهُ بِطَرَفِ اُخَرَ لِيَفِرَّ بِهِ الصَّائِدُ
অর্থাৎ, শৃগালের শিকারিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যাওয়া।

৫. اَلْمَرَضُ তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَىْ نِفَاقٌ

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

نَافَقَ فُلَانٌ اَىْ اَظْهَرَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ.

তথা অমুক নেফাকী করল তথা গোপনের বিপরীত বিষয়কে ফাঁস করে দিল।

مَعْنَى النِّفَاقِ شَرْعًا :

نِفَاق-এর শরয়ী অর্থ : ১. اَلتَّعْرِيْفَات প্রণেতা বলেন–

اَلنِّفَاقُ هُوَ اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ بِاللِّسَانِ وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ.

অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক।

২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন–

اَلنِّفَاقُ اِسْرَارُ الْكُفْرِ وَاِظْهَارُ الْاِيْمَانِ.

অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়।

৩. আল ফুরূকুল লুগাবিয়্যা প্রণেতা বলেন– اَلنِّفَاقُ اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ مَعَ اِسْرَارِ الْكُفْرِ অর্থাৎ, নেফাক হলো কুফরী গোপন করার সাথে ঈমান প্রকাশ করা।

৪. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত–

قِيْلَ لَهُ مَا النِّفَاقُ؟ قَالَ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْاِسْلَامِ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন– اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يُظْهِرَ الْاِسْلَامَ وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ

৬. আল্লামা হাসান (র) বলেন–

اَلنِّفَاقُ اِخْتِلَافُ الْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ وَاخْتِلَافُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

অর্থাৎ, নেফাক হলো প্রবেশ ও বহিরাগমন দ্বারা ভিন্ন এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়ে বিপরীত হওয়া।

৭. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন–

اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يَدْخُلَ فِى الْاِسْلَامِ مِنْ وَجْهٍ وَيَخْرُجَ عَنْهُ مِنْ اٰخَرَ.

اَقْسَامُ النِّفَاقِ ৩ :

নেফাক-এর প্রকারভেদ : نِفَاق প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ তথা বিশ্বাসগত নেফাক।

২. اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِىْ তথা আমলগত নেফাক।

১. اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ-এর পরিচয় : ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন–

اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ وَهُوَ النِّفَاقُ الْاَكْبَرُ الَّذِىْ يُظْهِرُ صَاحِبُهُ الْاِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ۔

অর্থাৎ, اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ এটা বড় নেফাক, যার মালিক ইসলামকে প্রকাশ করে এবং কুফরীকে গোপন করে। সুতরাং অন্তরে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ বলা হয়। উল্লেখ্য, এ ধরনের নেফাক ৬ প্রকার। যথা–

১. تَكْذِيْبُ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূল (স)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা।

২. تَكْذِيْبُ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূল (স) যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

৩. بُغْضُ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূল (স)-কে ঘৃণা করা।

৪. بُغْضُ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ (صـ) তথা রাসূল (স) যা নিয়ে এসেছেন, তার কতিপয়কে ঘৃণা করা।

৫. اَلْمَسَرَّةُ بِانْخِفَاضِ دِيْنِ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূল (স)-এর আনীত দীনের ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশ করা।

৬. اَلْكَرَاهِيَةُ لِاِنْتِصَارِ دِيْنِ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূল (স)-এর আনীত দীনের বিজয় অপছন্দ করা।

২. اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِىْ-এর পরিচয় : ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন–

اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِىُّ وَهُوَ عَمَلُ شَيْءٍ مِّنْ اَعْمَالِ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ بَقَاءِ الْاِيْمَانِ فِى الْقَلْبِ۔

অর্থাৎ, অন্তরে ঈমান থাকা সত্ত্বেও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের ন্যায় কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে نِفَاق عَمَلِىْ বলা হয়। এ প্রকার নেফাক মুনাফিককে দীন থেকে বের করে না। এ প্রকারের নেফাক নিম্নরূপ–

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔

হাদীসে বর্ণিত কার্যাবলি বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে অন্তরে যদি অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম কুফর বা অবিশ্বাসের নেফাক বলে গণ্য হবে না; বরং কুফরে আসগরের ন্যায় নেফাকে আমালী বা কর্মের নেফাক বলে গণ্য হবে।

أَسْبَابُ النِّفَاقِ :

নেফাকের কারণ : মুনাফিকরা জাগতিক সুযোগ সুবিধা লাভ এবং স্বার্থ রক্ষা, ঈমানদারদের হেয় প্রতিপন্ন করা, ইসলামের ক্ষতি ও সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নেফাকের আশ্রয় নেয়। এর মাধ্যমে তারা মুমিনদেরকে ধোঁকায় ফেলে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নেয়। এরা কাফেরদের চেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধূর্ত। মূলত তারা মূর্খতাবশত নেফাকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে থাকে।

حُكْمُ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِىْ :

বিশ্বাসগত নেফাকের বিধান : বিশ্বাসগত নেফাকের বিধান নিম্নরূপ–

১. **তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে :** কেয়ামত দিবসে এ ধরনের মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

١- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا -

٢- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

٣- بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুনাফিকদের শাস্তি হবে সবচেয়ে কঠিন; কারণ এরা কাফেরের চেয়ে জঘন্য।

২. **মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয :** আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا -

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ থেকে নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয়, তাই এর পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৩. **মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

৪. **মুনাফিকদের জানাযা পড়া ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ মুনাফিকদের জানাযা ও কবর যেয়ারত করতে রাসূল (স)-কে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না।

৫. **মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা :** মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا۔

অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে। আয়াতের হুকুম সময় ও প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট।

⊃ حُكْمُ النِّفَاقِ الْعَمَلِىْ :

আমলগত নেফাকের বিধান : اَلنِّفَاقُ فِى الْعَمَلِ-এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলতে হবে না। মুসলিমদের মধ্যে কারো এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে তাকে مُنَافِق فِى الْعَمَل বলা হবে। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও অন্যান্যদের অভিমত নিম্নরূপ :

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, نِفَاق দু'প্রকার। যথা– আকিদাগত নেফাক ও আমলগত নেফাক। আমাদের যুগে মুসলিমদের মধ্যে নেফাকের উল্লিখিত নিদর্শনগুলো বিদ্যমান থাকলেও তারা হাদীস অনুযায়ী প্রকৃত মুনাফিক নয়। কারণ তাদের নেফাক হচ্ছে আমলগত। তাই তারা مُخَلَّد فِى النَّار হবে না।

২. **ইমাম নবুবীর অভিমত :** তিনি বলেন, সে যুগের মুসলিমদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো বেশি ছিল বলে রাসূল (স) এগুলোকে عَلَامَةُ النِّفَاق বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানে পাওয়া গেলেই তাকে مُنَافِق خَالِص বলা হবে; বরং এ স্বভাবগুলো বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের কিংবা মুনাফিক কোনোটাই বলা যাবে না। তবে ফাসেক মুমিন বলা যাবে।

৩. **কাযী আয়াযের অভিমত :** তিনি বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রাসূল (স)-এর যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল, বর্তমানে এ স্বভাবের লোকেরা প্রকৃত মুনাফিক নয়।

৪. **কতিপয়ের অভিমত :** কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে مُشَبَّهَةٌ بِالْمُنَافِق বলা হবে।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ :

কাফের ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য : কাফের ও মুনাফিকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নরূপ–

ক. আভিধানিক পার্থক্য :

১. اَلْكَافِرُ শব্দটি مُشْتَق হয়েছে اَلْكُفْرُ থেকে। এটা وَاحِد مُذَكَّر বাহাস نَصَرَ বাবে اِسْم فَاعِل; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

ক. سَاتِرُ الْحَقِّ তথা সত্যকে গোপনকারী, খ. جَاحِدُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকারকারী ইত্যাদি।

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, كَافِرٌ শব্দের অর্থ হলো سَاتِرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর নেয়ামতকে গোপনকারী। যেমন আল্লাহর বাণী– كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ـ

২. مُنَافِقٌ শব্দটি اَلنِّفَاقُ অথবা اَلنَّفَقُ অথবা اَلنَّفَقَةُ শব্দ থেকে উৎকলিত। এটা وَاحِد مُذَكَّر বাহাস اِسْم فَاعِل বাবে مُفَاعَلَة; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

ক. مُظْهِرُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ তথা মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশকারী,

খ. مُخْفِى الْاَصْل তথা মূল বিষয় গোপনকারী। গ. প্রতারক, ঘ. ধোঁকাবাজ ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য :

১. লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন–

اَلْكَافِرُ هُوَ مُنْكِرٌ بِقَلْبِهٖ وَلِسَانِهٖ وَلَا يَعْرِفُ مَا يُذْكَرُ لَهٗ مِنَ التَّوْحِيْدِ ـ

অর্থাৎ, কাফের হচ্ছে মুখে ও অন্তরে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা। তাওহীদ সম্পর্কে কোনো কিছু তার কাছে উপস্থাপন করা হলে সে তা বোঝে না।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

كَفَرَ الرَّجُلَ كُفْرًا اَىْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْوُحْدَانِيَّةِ اَوِ النُّبُوَّةِ اَوِ الشَّرِيْعَةِ اَوْ بِثَلَاثَتِهَا ـ

আর اَلْمُنَافِق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়–

اَلْمُنَافِقُ هُوَ مُظْهِرُ الْاِسْلَامِ وَمُسْتِرُ الْكُفْرِ فِى الْقَلْبِ ـ

অর্থাৎ, মুনাফিক হচ্ছে, যে অন্তরে কুফর গোপন করতঃ মুখে মুখে ইসলামী নীতি প্রকাশ করে।

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন– اَلْمُنَافِقُ هُوَ مُظْهِرُ الْاِسْلَامِ وَمُبْطِنُ الْكُفْرِ

৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْمُنَافِقُ هُوَ سَاتِرُ كُفْرِهٖ بِقَلْبِهٖ وَظَاهِرُ اِيْمَانَهٗ بِلِسَانِهٖ ـ

গ. প্রকারভেদগত পার্থক্য : ১. كَافِر-এর প্রকারভেদ : دَلَائِلُ التَّوْحِيْد গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবনে সোলায়মান আত তাইমী বলেন, কাফের দু'প্রকার। যথা–

ক. كُفْرٌ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা এমন কুফরী, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়।

খ. كُفْرٌ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ তথা এমন কুফরী, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয় না।

২. مُنَافِق-এর প্রকারভেদ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুনাফিককে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা– ক. اَلْمُنَافِقُ فِى الْعَقِيْدَةِ তথা আকিদাগত মুনাফিক। খ. اَلْمُنَافِقُ فِى الْعَمَلِ তথা আমলগত মুনাফিক।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِىْ وَالْعَمَلِىْ :

نِفَاق اِعْتِقَادِىْ ও عَمَلِىْ-এর পার্থক্য : বড় কুফর ও ছোট কুফর-এর মাঝে যে পার্থক্য, এ উভয় প্রকার নেফাকের মাঝেও ঠিক একই রকম পার্থক্য বিদ্যমান। اِعْتِقَادِىْ তথা বিশ্বাসগত মুনাফিক কাফের হিসেবে গণ্য হবে; কিন্তু عَمَلِىْ তথা

কর্মগত মুনাফিক কাফের নয়। তবে নেফাক কুফরের চেয়েও অধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। কারণ বিশ্বাসগত মুনাফিক দীন থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু কর্মগত মুনাফিক দীন থেকে বের হয় না। কর্মগত নেফাক হচ্ছে সেই নেফাক যা আকিদার মধ্যে না হয়ে কেবল আমলের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করে ঠিকই; কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিতে তার আমল যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেরূপ হয় না; উপরিউক্ত দু'প্রকারের নেফাককে কোনো কোনো মনীষী যথাক্রমে বড় নেফাক ও ছোট নেফাক নামেও নামকরণ করেছেন।

উপসংহার : নেফাক মানব চরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। এটি দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশেষত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। নেফাকের মাধ্যমে মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। তাই মুনাফিকী আচরণ পরিহার এবং মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٧) : اَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ مَا هِىَ؟ وَمَا حُكْمُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَضْرَارَ النِّفَاقِ فِى الْحَيَاةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ.

■ প্রশ্ন : ৬৭ ॥ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য কী? প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : যুগে যুগে কাফের ও মুশরিকরা যত না দীনের ক্ষতি সাধন করেছে; কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুনাফিকরা তার চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছে। এরা পার্থিব স্বার্থ হাসিল ও ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে অন্তরে কুফর ও শিরক লালন করে; কিন্তু বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে। কুরআন ও হাদীসে এদের পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এদের ভয়াবহ পরিণতি এবং মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। নিম্নে মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও সমাজে নেফাকীর ক্ষতির প্রভাব আলোচনা করা হলো।

١ اَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ :

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি : কপটতা ও ধোঁকার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে।

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাস করা।
সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন–
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ. وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. (سُوْرَةُ التَّوْبَة - ٢٧)

৩. তাদের দানের হাত সংকুচিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا۔

৪. মুমিনদের সম্পর্কে তাদের বিরূপ মন্তব্য। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَاۤءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔

৫. মুনাফিক তাগুত তথা কাফেরের নিকট বিচারের ভার অর্পণ করতে চায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ۔ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ – ٦٠)

৬. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

৭. শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা আল্লাহকে ভুলে থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

৮. তারা আলস্যভাবে নামাযে দাঁড়ায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى۔

৯. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا۔

১০. তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ۔

১১. তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔

১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔

১৩. তারা কথা বললে মিথ্যা বলে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ۔

১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ ۔ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۔

১৬. তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا۔

খ. হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : হাদীসে রাসূল (স) মুনাফিকদের আলামত উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেন–

اٰيَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

অন্য হাদীসে এসেছে– وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো–

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে।

৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ৪. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে।

উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (স) আরেকটি হাদীসে বলেন–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا ـ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بُخَارِىْ) ـ

অপর এক হাদীসের বর্ণনামতে, নিম্নোক্ত আলামত দুটিও মুনাফিকের। যথা–

১. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে।

২. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়।

حُكْمُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ : ⊃

প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম : اَلْمُنَافِقُ الْخَالِص তথা খাঁটি মুনাফিক দ্বারা দু'ধরনের উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. এটি দ্বারা اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ তথা اَلْمُنَافِقُ ও اَلْاِعْتِقَادُ উদ্দেশ্য।

২. এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসে বর্ণিত রাসূল (স)-এর বাণী–

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ

প্রথম প্রকারের হুকুম : اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىْ اَلْمُنَافِقُ الْخَالِصُ দ্বারা যদি তথা বিশ্বাসগত নেফাকী উদ্দেশ্য হয়, তবে এর হুকুম নিম্নরূপ।

১. **তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে :** কেয়ামত দিবসে এ ধরনের মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

١ـ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ

٢ـ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ـ

٣ـ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুনাফিকদের শাস্তি হবে সবচেয়ে কঠিন; কারণ এরা কাফেরের চেয়ে জঘন্য।

২. **মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয :** আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ থেকে নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয়, তাই এর পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৩. **মুনাফিকদের জন্য কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۔

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

৪. **মুনাফিকদের জানাযা পড়া ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ মুনাফিকদের জানাযা ও কবর যেয়ারত করতে রাসূল (স)-কে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না।

৫. **মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা :** মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً۔

অর্থাৎ, "অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে।" আয়াতের হুকুম সময় ও প্রেক্ষাপটের সাথে নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয় প্রকার হুকুম : اَلْمُنَافِقُ الْخَالِص দ্বারা যদি হাদীসে বর্ণিত রাসূল (স)-এর বাণী– اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقٌ خَالِصًا উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর হুকুম হবে اَلنِّفَاقُ فِى الْعَمَل-এর হুকুমের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র) বলেন– اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا হাদীসে খাঁটি মুনাফিক দ্বারা مُنَافِقُ الْعَمَل উদ্দেশ্য। এখানে مُبَالَغَة বোঝাতে خَالِصًا শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

اَضْرَارُ النِّفَاقِ فِى الْحَيَاةِ الاِجْتِمَاعِيَّة :

সামাজিক জীবনে نِفَاق-এর কুফল : نِفَاق এমন একটি ব্যাধি, যার কুফল গোটা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। সামাজিক জীবনে এর কুফল মারাত্মক এবং মানবতাবিধ্বংসী। নিম্নে কুফরের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো। যেমন–

১. মুনাফিক হলো জঘন্য কাফের। কেননা সে অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে।
২. কুরআনে নেফাকীকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
৩. মুনাফিক মুসলিম উম্মার চিরশত্রু।
৪. সমাজে সে হয় সবচেয়ে ঘৃণিত।

৫. নেফাক সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।
৬. এটা সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে।
৭. এটা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ধ্বংস করে।
৮. নেফাকের ব্যাপকতা কখনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
৯. নেফাক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে বহুদলে বিভক্ত করে দেয়।
১০. এটা সমাজে পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদের বিস্তার ঘটায়।
১১. মুনাফিক সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে সদা তৎপর থাকে।
১২. সে দেশ ও জাতির শত্রু।
১৩. সে দেশ ও জাতির ধ্বংস সাধনে সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সদা তৎপর থাকে।
১৪. বহিঃশত্রু ও কাফেরদের সাথে গোপন আঁতাত গড়ে তোলে।
১৫. মূলত সে দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষতি সাধনে ইবলিসের যোগ্য প্রতিনিধি।

উপসংহার : নেফাক ইসলামের ছদ্মাবরণে তাগুতী শক্তি। যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা ইসলামের জঘন্য দুশমন। তাই এদের অনিষ্টতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বার বার মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٨) : عَرِّفِ الشِّرْكَ لُغَةً وَشَرْعًا- نَتِيْجَةُ الشِّرْكِ مَا هِىَ؟ ثُمَّ بَيِّنْ بَعْضَ الْاَشْرَاكِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ مُدَلَّلًا وَمُفَصَّلًا-

■ প্রশ্ন : ৬৮ ॥ شِرْك-এর আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। শিরকের পরিণতি কী? অতঃপর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু শিরকের বর্ণনা দলীলসহ বিস্তারিত উপস্থাপন কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করাকে শিরক বলে। এটা এমনই এক প্রবৃত্তি প্রসূত গতানুগতিক লোকাচার, যদ্দ্বারা প্রকৃত রবের অবস্থান বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। মুশরিক তার সৃষ্টিকর্তাকে জাগতিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে জঘন্য কাজ করে; যেটা মহামহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অক্ষমার্হ্য। আর তাই মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

⊃ شِرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْكٌ শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- اَلشَّرْكُ শব্দটির ش বর্ণে যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচনে شَرَكٌ বা اَشْرَاكٌ;

আবার اَلشِّرْكُ শব্দের ش বর্ণে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। বহুবচন হবে اَشْرَاكٌ; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-

১. এটা বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- اَشْرَكَ فِىْ اَمْرِهٖ اَىْ اَدْخَلَهٗ فِيْهِ অর্থাৎ, সে এটাকে এ বিষয়ে প্রবেশ করিয়েছে। অথবা اَشْرَكَ بِاللّٰهِ اَىْ جَعَلَ لَهٗ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِهٖ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

২. বাবে مُفَاعَلَة থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়- فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمٍ كَذَا أَىْ لَهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهُ

৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া।

তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ عُرْفًا :

شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো- ১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে- فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

২. جَعْلُ الشَّىْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। যেমন- لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلٰى * اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوَالَ

৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা।

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্সা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শিরক অর্থ হলো- اِعْتِقَادُ تَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ইলাহে বিশ্বাস করা।

مَعْنَى الشِّرْكِ شَرْعًا :

شِرْك-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হলো-

هُوَ اِشْرَاكُ شَىْءٍ بِاللّٰهِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ اللّٰهِ اَوْ بِفِعْلٍ مِّنْ اَفْعَالِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ অথবা কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়।

২. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন-

اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ.

অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

৩. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন-

اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَّدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهٗ اَوْ يَصْرِفَ لَهٗ شَيْئًا مِّنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।

৪. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।

৫. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَلُ গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

প্রথমত : اَلشِّرْكُ الْعَامُ তথা সাধারণ শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رُبُوبِيَّة এবং اُلُوهِيَّة ও اَلْاَسْمَاء وَالصِّفَات-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

দ্বিতীয়ত : اَلشِّرْكُ الْخَاص তথা নির্দিষ্ট শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰه-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

نَتِيْجَةُ الشِّرْك ⊃ :

শিরকের ফলাফল বা পরিণতি : মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম অধঃপতন ও ধ্বংস শিরকের মধ্যে নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ–

১. **শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না :** বান্দাহ গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে খালেছ তওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এছাড়া নেক আমলের মাধ্যমেও গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

২. **শিরক সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে :** আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন আল্লাহর বাণী–

١- وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

٢- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. **শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :** মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির শান্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করেছেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চির শাস্তির স্থান জাহান্নাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ-

اَلْاَشْرَاكُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْقُرْاٰنِ ⊃ :

কুরআনে উল্লিখিত শিরকসমূহ : আল কুরআনে উল্লিখিত শিরকসমূহের বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. **গায়রুল্লাহকে সেজদা করা :** কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা মূর্তি, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির সেজদা করত। কুরআনে আল্লাহ ছাড়া কারো সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়। সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

২. **গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা :** কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত তথা প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত। অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট প্রার্থনা করত। এসব উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত। তারা আশা করত যে, এসব মানতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে। তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এসব উপাস্যের নাম পাঠ করত। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে বলবে– ١- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

٢- فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا -

٣- بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ -

৩. **'শরীকদেরকে' আল্লাহর সন্তান নামে আখ্যায়িত করা :** কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকরা যাদেরকে 'আল্লাহর বিশেষ বান্দা' বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। এজন্য তাদেরকে এরূপ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. **আলেমগণকে 'رَبّ' হিসেবে গ্রহণ করা :** কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মুশরিকরা তাদের আলেমগণ ও নেককার আবেদগণকে রব বা মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করত। এর অর্থ এই যে, তারা এ আকিদা পোষণ করত যে, এ সকল আলেম বা বুযুর্গ যা হালাল বলেন, তা প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ। আর এ সকল আলেম ও বুযুর্গ যা কিছু হারাম করেন, তা প্রকৃতই নিষিদ্ধ, হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যখন কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হলো– "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে رَبّ তথা মালিকরূপে গ্রহণ করেছে", তখন আদী ইবনে হাতিম রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বলেন–

كَانُوْا يُحِلُّوْنَ لَهُمْ اَشْيَاءَ فَيَسْتَحِلُّوْنَهَا، وَيُحَرِّمُوْنَ عَلَيْهِمْ اَشْيَاءَ فَيُحَرِّمُوْنَهَا - اَمَا اَنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ -

অর্থাৎ, এ সকল আলেম দরবেশ তাদের জন্য অনেক বিষয় হালাল করে দিত, তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত। অনুরূপভাবে অনেক বিষয় তারা হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে গ্রহণ করত। অন্য বর্ণনায় এসেছে– তিনি বলেন, ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের ইবাদত করত না বটে; কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের ওপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।

৫. **জবাই উৎসর্গের মাধ্যমে নৈকট্যলাভের চেষ্টা :** মুশরিকদের শিরকের একটি পদ্ধতি হলো জবাই উৎসর্গের মাধ্যমে মূর্তি বা গ্রহ নক্ষত্রের নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা। কুরআনে উল্লিখিত মুশরিকরা মূর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্যলাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত। এজন্য তারা জবাইয়ের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে নিজে পশু জবাই করত। কুরআনে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۔

অর্থাৎ, বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেননি; কিন্তু কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।

৬. **পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করা :** কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকরা বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলো পবিত্র ও সম্মানিত। এ কারণে তারা বিশ্বাস করত যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। এজন্য তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না। আর এ কারণেই তারা মামলা বিবাদে প্রতিপক্ষকে এসব কাল্পনিক শরীক 'উপাস্যের' নামে শপথ করাত। ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ۔

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শিরক করল।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস মত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়; বরং এরূপ করা কঠিন অন্যায় বোঝাতে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ বলেছেন। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের মধ্যে 'পবিত্রতার' বা 'অলৌকিকতার' ও মঙ্গল অমঙ্গলের 'আকিদা' পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা শপথ করে তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে।

৭. **আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ বা 'যেয়ারতের সফর' :** মুশরিকদের এক প্রকার শিরক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ সম্পাদন করা। এর স্বরূপ এই যে, এরূপ মুশরিকরা তাদের 'উপাস্য শরীকদের' স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে বরকতময় বলে বিশ্বাস করে এবং সেসব স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى (مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ)۔

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না। যথা– ক. মাসজিদুল হারাম, খ. মাসজিদুন নববী, গ. মাসজিদুল আকসা (মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা ও আমার মাসজিদ)।

৮. **সন্তানদের 'আবদুল উযযা', 'আবদুশ শামস' ইত্যাদি নাম রাখা :** কুরআন হাদীসের বর্ণনায় মুশরিকদের যেসব শিরকী কর্মের কথা জানা যায় তার একটি হলো, তারা তাদের সন্তানদের নাম রাখত 'আবদুল উযযা' (উযযার বান্দা), আবদুশ শামস (সূর্যের দাস বা বান্দা) ইত্যাদি।

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ। একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٩) : اِشْرَحْ بِالتَّفْصِيْلِ مَظَاهِرَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ الْمُنْتَشِرَةِ فِى الْمُجْتَمَعِ.

■ প্রশ্ন : ৬৯ ॥ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাকের বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শিরক, কুফর ও নেফাক ঈমান বিধ্বংসী মারাত্মক ব্যাধি। সুতরাং আকিদা বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে এসব ব্যাধি থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে– কুরআন, হাদীস ও দীনী সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও সমাজের অনেক মুসলিম বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ও নেফাকের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। নিম্নে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক, কুফর ও নেফাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১ اَلشِّرْكُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত শিরক : আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকী আকিদা ও কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিম্নরূপ–

১. **গায়রুল্লাহকে সেজদা করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ শিরক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ড পীর ফকির ও জ্ঞানপাপী তথাকথিত আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে, আর তারা সন্তুষ্টচিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। অথচ উভয়ই মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ বলেছেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ.

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র) বলেন–

وَالسُّجُوْدُ اَصْلٌ لِاَنَّهٗ شَرَعَ عِبَادَةً بِلَا قِيَامٍ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ. وَالْقِيَامُ لَمْ يُشْرَعْ عِبَادَةً وَحْدَهٗ. حَتّٰى لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُكَفَّرُ بِخِلَافِ الْقِيَامِ.

অর্থাৎ, সেজদা হলো মূল। কারণ সেজদা কেবল ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম তথা দণ্ডায়মান অবস্থা তদ্রূপ নয়। কিয়াম কেবল ইবাদত হিসেবেই নির্ধারিত নয়। এজন্যই কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে কাফের হবে। কিয়ামের কারণে কাফের হবে না।

২. **গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা :** নিজের দুরবস্থার অবসান ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থনা করা শিরক। মুসলিম সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমান। যেমন কোনো পীর ফকিরের নিকট ব্যবসায়ের উন্নতি চাওয়া, সন্তান কামনা করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ করা। অথচ রাসূল (স) বলেছেন–

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ـ

৩. **গায়রুল্লাহর জন্য মানত পেশ করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত পেশ করা শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর তথা মানত পেশ করা। আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার বা কবরের জন্য টাকাপয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করা ও গ্রহণ করা। বর্তমানে বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়।

৪. **গায়রুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো عِلْمُ الْغَيْبِ বা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। এ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেছেন–

إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَعْلَمُوا الْمُغَيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ اَحْيَانًا ـ وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَصْرِيْحًا بِالتَّكْفِيْرِ بِاعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ" ـ

উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরকের নমুনা হচ্ছে–

৫. রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত করা। কেননা রাসূল (স) বলেছেন–

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ ـ

৬. যাদু করা। যেমন রাসূল (স) বলেছেন– مَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ

৭. তাবিজ কবচ গলায় ঝুলানো। কেননা রাসূল (স) বলেছেন–

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

৮. শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

৯. মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

১০. শহীদ মিনারে ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে মূর্তি পূজারিদের ন্যায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।

১১. বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন।

اَلْكُفْرُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিম্নরূপ–

১. **ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা :** গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ, হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফর। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) شَرْحُ فِقْهِ الْاَكْبَر গ্রন্থে বলেছেন–

تَصْدِيْقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ مِنَ الْغَيْبِ كُفْرٌ ـ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক বা জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয়ে যা বলে, তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফরী; কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না।

২. **পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা :** কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে সে পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসিতামাশা করাও কুফর।

মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اِسْتِحْلَالُ الْمَعْصِيَةِ صَغِيْرَةٌ كَانَتْ اَوْ كَبِيْرَةٌ اِذَا ثَبَتَ كَوْنُهَا مَعْصِيَةً بِدَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ وَكَذَا الْاِسْتِهَانَةُ بِهَا كُفْرٌ وَكَذَا الْاِسْتِهْزَاءُ بِالشَّرِيْعَةِ كُفْرٌ ـ

৩. **আল্লাহর বিশেষণ বা নির্দেশের সমালোচনা :** মহান আল্লাহর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তাঁর ওপর আরোপ করা অথবা তাঁর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর।

সমাজে প্রচলিত এসব কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, ইসলামী আইন, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা।

৪. **আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার বৈধতায় বিশ্বাস :** কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম করা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে করে, তাহলে তা কুফর বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা কুফরী। যেমন সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

৫. কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা।

৭. অলীদের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা।

৮. মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

৯. সত্য জানা সত্ত্বেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা। যেমন কুরআনে এসেছে– وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ ـ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা। যেমন– যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা।

اَلنِّفَاقُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত নেফাক : আমাদের সমাজে অনেক নেফাকী কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নমুনা নিম্নরূপ–

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল শিক্ষা ও দাওয়াত বা শিক্ষা এবং দাওয়াতের অংশ বিশেষকে মিথ্যা বলে মনে করা।
২. রাসূল (স)-কে ঘৃণা করা।
৩. তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
৪. তাঁর কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা।
৫. দীন ইসলামের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া।
৬. দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা।
৭. কারো কাছে কোনো কিছু আমানত রাখলে তার খেয়ানত করা।
৮. কথা বলার সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া।
৯. কারো সাথে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, তা ভঙ্গ করা।
১০. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল কথা বলা।

নেফাকের উল্লিখিত কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনায় রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا ـ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

উপসংহার : সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক, কুফর ও নেফাক। এগুলো মুমিনের ঈমান বিধ্বংসী উপাদান। কাজেই এসব ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিহার করে ঈমানকে খাঁটি ও মযবুত করে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়াই মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٠) : مَا مَعْنَى التَّكْفِيْرِ؟ بَيِّنْ مَدٰى خُطُوْرَةِ تَكْفِيْرِ الْمُؤْمِنِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ ثُمَّ وَضِّحْ اُصُوْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ مَسْاَلَةِ التَّكْفِيْرِ وَعَقَائِدِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ فِىْ ذٰلِكَ ـ

■ প্রশ্ন : ৭০ ॥ تَكْفِيْر অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর। অতঃপর তাকফীরের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর আকিদা আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করাকে تَكْفِيْر বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে না জেনে না শুনে কাউকে কাফের বলা মারাত্মক অপরাধ। এ বিষয়ে রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। কাজেই কোনো মুসলমানের পক্ষে অন্য কাউকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা আদৌ উচিত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ تَكْفِيْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى التَّكْفِيْرِ لُغَةً :

تَكْفِيْر-এর আভিধানিক অর্থ : تَكْفِيْرٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। মাদ্দাহ ك - ف - ر জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. কাউকে কাফের বলা।
২. কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা।
৩. অপরকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা ইত্যাদি।

مَعْنَى التَّكْفِيْرِ اِصْطِلَاحًا :

تَكْفِيْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আকাইদের পরিভাষায় تَكْفِيْر-এর সংজ্ঞা হলো– هُوَ مَا اَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করাকে تَكْفِيْر বলা হয়।

২. হাদীসের ভাষায় تَكْفِيْر বলা হয়– هُوَ اَكْفَرَ الرَّجُلَ اَخَاهُ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে কাফের আখ্যায়িত করাকে تَكْفِيْر বলা হয়।

৩. আবার কেউ বলেছেন– هُوَ اَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করাকে تَكْفِيْر বলা হয়।

৪. কতিপয় আলেম বলেন, تَكْفِيْر বলা হয় ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা করাকে।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর প্রথম বিভ্রান্ত ফেরকা খারেজী সম্প্রদায়। এরাই সর্বপ্রথম পাপের কারণে মুসলিমকে 'কাফের বলা' তথা تَكْفِيْر-এর মতবাদ চালু করে। এরপর মুতাযিলা ও অন্যান্য অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাদের কমবেশি অনুসরণ করে। অথচ পাপের কারণে একজন মুসলিম কাফের হয়ে যাবে বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদারগণ জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে মুক্তি পাবেন।

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূল (স)-এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন যে, কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা–

১. কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।
২. আবার কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফেকী আচরণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

১ خُطُوْرَةُ تَكْفِيْرِ الْمُؤْمِنِ :

মুমিনকে কাফের বলার ভয়াবহতা : ঈমানের দাবিদার কোনো মুমিনকে এবং ইসলাম গ্রহণকারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে অভিযুক্ত করা মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন–

١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَكْفَرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَاِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে কাফের বলে, তবে একথা দু'জনের একজনের ওপর প্রযোজ্য হবে। যদি সে তা হয়ে থাকে তাহলে তো হলো, অন্যথা যে তাকে কাফের বলল, তার (বক্তার) ওপরই তা প্রযোজ্য হবে।

٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ـ

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যে কেউ তার ভাইকে বলল, হে কাফের! তবে তাদের দু'জনের একজনের ওপর এ কুফরীর দায়ভার বর্তাবে।

٣ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ, হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে, হে আল্লাহর শত্রু! আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার ওপর বর্তাবে।

٤ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ـ

অর্থাৎ, হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীর সাথে অভিযুক্ত করে, তবে তা তাকে হত্যা করার মতোই অপরাধ হবে।

٥ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا اِلَّا بَاءَ اَحَدُهُمَا بِهَا اِنْ كَانَ كَافِرًا وَاِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيْرِهِ ـ

অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কোনো লোক যদি অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করে, তবে দু'জনের একজনের ওপর তা বর্তাবে। যদি সে কাফের হয় তবে তা হলো, অথবা তাকে কাফের সম্বোধন করার কারণে সম্বোধনকারীই কাফের হয়ে যাবে।

⊃ اُصُوْلُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ مَسْئَلَةِ التَّكْفِيْرِ :

تَكْفِيْر সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি : تَكْفِيْر-এর বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো–

১. মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন।
২. সর্বপ্রকার কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন।
৩. কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির ওপর নির্ভর করবেন।
৪. ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

৫. ভুলবশতঃ কোনো মুমিনকে কাফের বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফের, মুশরিক বা মুনাফিককে মুসলিম মনে করা অনেক ভালো ও নিরাপদ। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এ নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন–

১. যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেছে, তাকে কোনো পাপের কারণে অমুসলিম, কাফের বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না। সে তার পাপ থেকে তওবা করুক, অথবা না-ই করুক। যতক্ষণ না সে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থি কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দেবে।
২. ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম 'পাপী মুসলিম' বলে গণ্য হবে।
৩. কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না।
৪. তবে যদি তার এ পাপ বা অবাধ্যতাকে সে বৈধ মনে করে, কিংবা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা পালন অযোগ্য বলে মনে করে, অথবা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভালো মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করে; তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

এ বিষয়ে মনীষীদের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হলো–

لَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَاِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً اِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، وَلَا نُزِيْلُ عَنْهُ اِسْمَ الْاِيْمَانِ. نُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ.

অর্থাৎ, আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফের বলি না, যদিও সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যতক্ষণ না সে সেই পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের 'ঈমান' এর নাম অপসারণ করি না; বরং আমরা তাকে প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফের না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।

খ. তাহাবীর অভিমত : ইমাম তাহাবী (র)-এর অভিমত হলো–

نُسَمِّيْ اَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ، مَا دَامُوْا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مُعْتَرِفِيْنَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَاَخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ.......

وَلَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. وَلَا نَقُوْلُ : لَا يَضُرُّ مَعَ الْاِيْمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ. نَرْجُوْا لِلْمُحْسِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَاْمَنُ عَلَيْهِمْ. وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. وَنَسْتَغْفِرُ لِمَسِيْئَتِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ.

অর্থাৎ, আমাদের কিবলাপন্থি ব্যক্তিদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন মুসলিম বলে আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহানবী (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন, তা বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে।

আমাদের কিবলাপন্থি কোনো ব্যক্তিকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফের বলে সম্বোধন করি না; যতক্ষণ না সে এই পাপ হালাল মনে করে। তবে আমরা একথাও বলি না যে, ঈমান থাকলে কোনো পাপ পাপীর ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

মুমিনগণের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের সম্পর্কে আশা করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন এবং নিজ রহমতে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভয় নই এবং তাদের জান্নাতী হওয়ার কোনো সাক্ষ্যও প্রদান করি না। আর মুমিনদের মধ্যে যারা গুনাহগার তাদের ভুলক্রটির জন্য আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি এবং তাদের ব্যাপারে আশঙ্কাও প্রকাশ করি। তবে আমরা তাদেরকে নিরাশার শিকারে পরিণত করি না।

৩. عَقَائِدُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ :

বিভ্রান্ত দলগুলোর আকিদা : এ বিষয়ে শিয়া, খারেজী, মুতাযিলা ও অন্যান্য অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকিদা হচ্ছে, পাপের কারণে মুসলিমকে কাফের বলা যাবে।

আহলুস সুন্নাতের জবাব : এর জবাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন, তাদের এ আকিদাটি বাতিল ও বিভ্রান্তিকর। কারণ কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। এছাড়াও অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদার ব্যক্তি জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার : যারা নিশ্চিত কাফের তাদেরকে অবশ্যই কাফের বলতে হবে; কিন্তু পাপের কারণে কিংবা অজ্ঞতাবশত যাচাই বাছাই না করে অথবা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কেউ কাউকে কাফের বলা, কিংবা কাফের বলে সাব্যস্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। কাজেই এরূপ করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। আর এটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা।

■ اَلسُّؤَالُ (٧١) : عَرِّفِ الْبِدْعَةَ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاٰثَارِ الصَّحَابَةِ. ثُمَّ بَيِّنْ نَشْأَةَ الْبِدْعَةِ وَتَطَوُّرَهَا.

■ প্রশ্ন : ৭১ ॥ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে বিদয়াত অন্যতম। দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ضَلَالَة বা ভ্রষ্টতা বলেছেন। বিদয়াতী বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে থাকে এবং এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে বিদয়াতের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো।

৩ بِدْعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً :

بِدْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : بِدْعَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এটা اَلْبَدْعُ মূলশব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِنْشَاءُ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে بَدِيْعٌ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।

২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

৪. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।

৫. اَلْمَوْرِد গ্রন্থকারের মতে এর অর্থ হলো– شَيْءٌ جَدِيْدٌ

৬. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন– اَبْدَعْتُ الشَّيْءَ أَيْ اِخْتَرَعْتُهٗ لَا عَلٰى مِثَالٍ অর্থাৎ, আমি কিছু আবিষ্কার করেছি অর্থাৎ আমি এটাকে উপমাহীন আবিষ্কার করেছি।

৭. আল্লামা ইবনে মানযুর বলেন– بَدَعَ الشَّيْءَ يَبْدَعُهٗ بَدْعًا وَابْتَدَعَهٗ أَنْشَأَهٗ وَبَدَأَهٗ অর্থাৎ, সে নতুন আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ, সে রচনা করেছে এবং সূচনা করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْبِدْعَةُ مَا اسْتَحْدَثَ فِي الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ অর্থাৎ, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হলো বিদয়াত।

مَعْنَى الْبِدْعَةِ شَرْعًا :

بِدْعَة-এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় بِدْعَة হলো দীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত কর্তৃক সমর্থিত নয়।

২. ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায়– اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে بِدْعَة বলা হয়।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ)۔

অর্থাৎ, এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করা, যা রাসূল (স)-এর যুগে ছিলো না।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ هِيَ الَّتِيْ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ۔

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে–

هِيَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ۔

৬. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন– اَلْبِدْعَةُ هِيَ الْاِخْتِرَاعُ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নমুনা ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৭. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلْبِدْعَةُ اِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا اِعْتِدَاءٍ وَاقْتِدَاءٍ অর্থাৎ, কোনোরূপ পূর্বনমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ বা অনুসরণ ছাড়াই কোনো কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা।

৮. ইমাম শাতেবী বলেন– اَلْبِدْعَةُ اِبْتِدَاءُ طَرِيْقَةٍ مَا لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهَا سَابِقٌ অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত।

৯. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ اَصْلٍ مِّنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَعَلٰى غَيْرِ عِيَارِهٖ وَقِيَاسِهٖ۔

১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ اِحْدَاثُ اَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ)۔

১১. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ تُقَالُ لِلْاُمُوْرِ الَّتِىْ لَا تَثْبُتُ اَصْلُهٗ بِالشَّرِيْعَةِ۔

১২. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلَةٍ تُصَادِمُ الشَّرِيْعَةَ بِالْمُخَالَفَةِ۔

১৩. আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ فِعْلٍ اَوْ قَوْلٍ اَوْ عَقِيْدَةٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهٖ اَحَدٌ وَلَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ اَحَدٌ۔

اَلْبِدْعَةُ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ :

কুরআনের আলোকে বিদয়াত : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিদয়াত শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

১۔ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

٢۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ۔

٣۔ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ۔

উল্লিখিত প্রথম দুটি আয়াতে বিদয়াত শব্দটি অভিনবত্ব বা নবসৃষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর শেষ আয়াতে মানবরচিত رَهْبَانِيَّةٌ তথা বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবনের ব্যাপারে বিদয়াত শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ বান্দাদের জন্য যে সম্পর্কে সরাসরি বিধিবিধান দেননি, বান্দারা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা যা রচনা করে ইবাদত হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করে তা বিদয়াত।

اَلْبِدْعَةُ عَلٰى ضَوْءِ الْحَدِيْثِ :

হাদীসের আলোকে বিদয়াত : হাদীসের আলোকে বিদয়াত শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। কারণ হাদীসে যেমন সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, তেমনি বার বার বিদয়াত থেকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে–

١۔ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

٢- فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ (صـ) وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

٣- اِتَّبِعُوْا وَلَا تَبْتَدِعُوْا۔

٤- مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

আলোচ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত বিদয়াত শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আল্লামা আহমাদুল বান্না বলেন– وَهِىَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوْفًا فِىْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا اِجْمَاعٍ وَهِىَ الْبِدْعَةُ অর্থাৎ, যা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা কোনো দিক দিয়েই শরীয়তসম্মত নয়, এমন বিষয়ই বিদয়াত।

اَلْبِدْعَةُ عَلٰى ضَوْءِ اٰثَارِ الصَّحَابَةِ ɔ :

সাহাবীদের দৃষ্টিতে বিদয়াত : সাহাবীদের জীবনী, কর্মনীতি ও ইবাদত পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, তাঁরাও বিদয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সাহাবীদের বর্ণনা নিম্নরূপ–

١- قَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔

٢- قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اِنَّكُمْ سَتُحْدِثُوْنَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ۔

রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব খোলাফায়ে রাশেদীনের ওপর ন্যস্ত ছিল। তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। নতুন নতুন মাসয়ালা যা কুরআন ও সুন্নার মধ্যে পাওয়া যেতো না সেক্ষেত্রে তারা কেয়াসের ভিত্তিতে ফয়সালা দিতেন। যেমন ইমাম শাতেবী (র) বলেন–

وَمِنْهَا مَا سَنَّهَا وُلَاةُ الْاٰخَرِ مِنْ بَعْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ سُنَّةٌ لَا بِدْعَةَ فِيْهِ الْبَتَّةَ وَلَمْ يَعْلَمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلَيْهِ عَلَى الْخُصُوْصِ قَدْ جَاءَ مَا يُوْجَدُ عَلَيْهِ فِى الْجُمْلَةِ۔

অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর পর দায়িত্বশীল লোকেরা (খোলাফায়ে রাশেদীন) যে সুন্নাত তথা বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই অনুসরণীয় সুন্নাতরূপে গ্রহণীয়, তা বিদয়াত হতে পারে না। যদিও কুরআন ও হাদীস থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কারণ নবী করীম (স)-ও বিশেষভাবে এ সুন্নাতের উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন– عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধর।

سَبَبُ نَشْأَةِ الْبِدْعَةِ ɔ :

বিদয়াতের উৎপত্তির কারণ : কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে, বিদয়াতের উৎপত্তি চার কারণে হয়। যথা–

১. বিদয়াতী বিদয়াত নিজের থেকে উদ্ভাবন করে তা সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে স্বাভাবিকভাবে সমাজে তা প্রচলিত হয়ে যায়।
২. কোনো জ্ঞানপাপী মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ আবিষ্কার করে, তা দেখে মূর্খ লোকেরা মনে করতে থাকে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে গোটা সমাজেই বিদয়াতের প্রচলন ঘটে।

৩. যখন মূর্খ লোকেরা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের আলেমগণ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে, তা থেকে নিষেধও করে না এবং তার প্রতিবাদও করে না। তখন সাধারণ মানুষেরা এটাকে সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ মনে করতে থাকে। কারণ বিদয়াত হলে আলেমগণ এর প্রতিবাদ করতেন। যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে কাজটি হয়েছে এবং তারা এর প্রতিবাদ করেনি তাই এটা ইবাদত, বিদয়াত নয়।
৪. কোনো কাজ মূলতই শরীয়তসম্মত এবং ভালো কাজ; কিন্তু বহুকাল যাবৎ তা মানুষের নিকট প্রচার করা হয়নি। তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে নিশ্চয়ই এটা ভালো কাজ নয়। কারণ ভালো কাজ হলে অবশ্যই আলেমগণ তার প্রচার করতেন। এভাবে শরীয়তসম্মত কোনো কাজকে শরীয়ত বিরোধী মনে করাও একটা বড় বিদয়াত।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ : মানুষ স্বভাবতই আরামপ্রিয়, ভীতু ও লোভী প্রকৃতির হয়। স্বভাবজাত এ প্রবণতা, দীন সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা, শয়তানী কুমন্ত্রণা ও রিপুর তাড়না তাকে শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। যার ফলশ্রুতিতে সে বিদয়াতের দিকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। এসব কাজ করলে অনেক বেশি সাওয়াব হবে বলে নিজে নিজে ভাবতে থাকে। আমলগুলো শরীয়তসম্মত কিনা, সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা, তা পরীক্ষানিরীক্ষাও করে না। এমনকি সে পরিমাণ জ্ঞানও তার থাকে না। আর এভাবেই সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে।

تَطَوُّرُ الْبِدْعَةِ :

বিদয়াতের ক্রমবিকাশ : শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, সর্বপ্রথম বিদয়াতের সূচনা হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ দিকে। যে ব্যাপারে রাসূল (স) সংবাদ দিয়েছেন–

مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাত এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা।

এ উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম যাদের মাধ্যমে বিদয়াতের প্রচলন হয়, তাদের আলোচনা নিম্নরূপ–

১. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর শুরু হয় হারুরীদের বিদয়াত।
২. সাহাবায়ে কেরামদের শেষ যুগে শুরু হয় জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
৩. بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ তথা খারেজীদের বিদয়াত।
৪. بِدْعَةُ التَّشَيُّعِ তথা শিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
৫. بِدْعَةُ الْقَدْرِ তথা কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
৬. بِدْعَةُ الْاِرْجَاءِ তথা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।

অতঃপর প্রচলিত হয় بِدْعَةُ الْاِعْتِزَالِ তথা মুতাযিলাদের বিদয়াত।

بِدْعَةُ الْاَهْوَاءِ তথা প্রবৃত্তি অনুসরণের বিদয়াত।

بِدْعَةُ التَّصَوُّفِ তথা তাসাউফের বিদয়াত।

بِدْعَةُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُوْرِ তথা কবরের উপর চাদর নির্মাণের বিদয়াত।

পরবর্তীতে সময়ের অতিক্রান্তে মুসলিম সমাজে বিদয়াত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এসব বিদয়াত কুফা, বসরা, খোরাসান ইত্যাদি দেশেই সবচেয়ে বেশি প্রচলন হয়। পরবর্তীতে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির আনুগত্য, মতামত প্রকাশে গোঁড়ামি, কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিদয়াত সমগ্র মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি। এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে গজীব ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত–

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَالتَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ ـ

অর্থাৎ, যখনই জনগণ কোনো বিদয়াত চালু করে তখনই তারই মতো একটা সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব বিদয়াত প্রচলন না করে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরাই উত্তম। মুসনাদে দারেমীতে এসেছে–

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلاَّ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অতএব বিদয়াত থেকে বিরত থাকা এবং তা উৎখাতের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

■ **اَلسُّؤَالُ (٧٢) : مَا مَعْنَى الْبِدْعَةِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا وَمَا هِىَ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ ـ**

■ **প্রশ্ন : ৭২ ॥ বিদয়াত অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মধ্যে বিদয়াত অন্যতম। দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয় যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি এর কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ضَلاَلَة তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। এ বিদয়াত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। বিদয়াতী বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে থাকে এবং এতে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিম্নে বিদয়াতের পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. بِدْعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً :

بِدْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : بِدْعَةٌ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এটা اَلْبِدْعُ শব্দমূল হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِنْشَاءُ عَلٰى غَيْرِ مِثْلٍ سَابِقٍ তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে بَدِيْعٌ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।

২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

৪. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।

৫. اَلْمَوْرِد গ্রন্থকারের মতে, এর অর্থ হলো– شَيْءٌ جَدِيْدٌ

৬. আল্লামা জাওহারী বলেন– اَبْدَعْتُ الشَّيْءَ اَيْ اِخْتَرَعْتُهُ لَا عَلٰى مِثَالٍ অর্থাৎ, আমি কিছু আবিষ্কার করেছি অর্থাৎ আমি এটাকে উপমাহীন আবিষ্কার করেছি।

৭. আল্লামা ইবনে মানযুর (র) বলেন– بَدَعَ الشَّيْءَ يَبْدَعُهُ بَدْعًا وَابْتَدَعَهُ اَنْشَأَهُ وَبَدَأَهُ অর্থাৎ, সে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ সে রচনা করেছে এবং সূচনা করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْبِدْعَةُ مَا اسْتُحْدِثَ فِى الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ অর্থাৎ, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাই বিদয়াত।

مَعْنَى الْبِدْعَةِ شَرْعًا :

بِدْعَة-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় بِدْعَة হলো দীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত কর্তৃক সমর্থিত নয়।

২. ইমাম নবুবী (র)-এর ভাষায়– اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে بِدْعَة বলা হয়।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ)۔

অর্থাৎ, এমন কিছু উদ্ভাবন করা যা রাসূল (স)-এর যুগে ছিলো না।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ هِىَ الَّتِىْ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ۔

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে–

هِىَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ۔

৬. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন–

اَلْبِدْعَةُ هِىَ الْاِخْتِرَاعُ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ۔

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নমুনা ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৭. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلْبِدْعَةُ اِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلَا اِعْتِدَاءٍ وَاقْتِدَاءٍ অর্থাৎ, কোনোরূপ পূর্বনমুনা না দেখে এবং অন্যকিছুর অনুকরণ বা অনুসরণ ছাড়াই কোনো কাজ নতুনভাবে সৃষ্টি করা।

৮. ইমাম শাতেবী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ اِبْتِدَاءُ طَرِيْقَةٍ مَا لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهَا سَابِقٌ۔

অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত।

৯. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ اَصْلٍ مِّنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَعَلٰى غَيْرِ عِيَارِهٖ وَقِيَاسِهٖ۔

১০. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ إِحْدَاثُ اَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

১১. মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ تُقَالُ لِلْاُمُوْرِ الَّتِيْ لَا تَثْبُتُ اَصْلُهٗ بِالشَّرِيْعَةِ۔

১২. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلَةٍ تُصَادِمُ الشَّرِيْعَةَ بِالْمُخَالَفَةِ۔

১৩. আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ فِعْلٍ اَوْ قَوْلٍ اَوْ عَقِيْدَةٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهٖ اَحَدٌ وَلَمْ يُقِرَّ عَلَيْهِ اَحَدٌ۔

اَقْسَامُ الْبِدْعَة :

بِدْعَة-এর প্রকারভেদ : ১. নেহায়া গ্রন্থকার ইবনুল আসীর, ইমাম শাফেয়ী, বদরুদ্দীন আইনীসহ কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– ক. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَة (উত্তম বিদয়াত) খ. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَة (নিন্দিত বিদয়াত)।

ক. বিদয়াতে হাসানা : بِدْعَةٌ لِلدِّيْنِ তথা اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَة বা দীনের জন্য নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীসবিরোধী না হয়; বরং এর দ্বারা ইসলামী উম্মাহর তথা গোটা মানবজাতির উপকার সাধিত হয়, তবে তাকে বিদয়াতে হাসানা বলে অভিহিত করা হয়।

এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔

খ. বিদয়াতে সায়্যিয়াহ : بِدْعَةٌ فِى الدِّيْنِ তথা اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَة বা দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীস বিরোধী হয়, তবে তাকে বিদয়াতে সায়্যিয়াহ বলে অভিহিত করা হয়। এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

١۔ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔

٢۔ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَىْ كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٌ ضَلَالَةٌ۔

٣۔ قَالَ اِمَامُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : مَا اَحْدَثَ مِمَّا يُخَالِفُ الْكِتَابَ اَوِ السُّنَّةَ اَوِ الْاَثَرَ اَوِ الْاِجْمَاعَ فَهُوَ ضَلَالَةٌ وَمَا اَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِمَذْمُوْمٍ۔

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ ـ

অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদয়াতে হাসানা তথা ভালো বিদয়াত। আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা বিদয়াতে মুস্তাকবিহা তথা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত।

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন– اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةُ هُدًى وَبِدْعَةُ ضَلَالَةٍ অর্থাৎ বিদয়াত দু'প্রকার। যথা–

ক. اَلْبِدْعَةُ الْهُدٰى খ. اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَة.

ক. اَلْبِدْعَةُ الْهُدٰى-এর পরিচিতি : اَلْبِدْعَةُ الْهُدٰى-এর পরিচয়ে বলা হয়–

وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوْمِ مَا نَدَبَ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ اَوْ رَسُوْلُهُ فَهُوَ فِىْ حَيِّزِ الْمَدْحِ ـ

অর্থাৎ, اَلْبِدْعَةُ الْهُدٰى এমন বিষয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) উৎসাহিত করেছেন।

খ. اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةَ-এর পরিচিতি : اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَة-এর পরিচয়ে বলা হয়–

فَمَا كَانَ فِىْ خِلَافِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ وَرَسُوْلُهُ فَهُوَ فِىْ حَيِّزِ الذَّمِّ وَالْاِنْكَارِ ـ

অর্থাৎ, اَلْبِدْعَةُ الضَّلَالَةَ হচ্ছে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নির্দেশের বিপরীত কাজ করা।

৪. আবু নুয়াইম আল ইস্পাহানী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) সর্বপ্রথম বিদয়াতকে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন–

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ مَحْمُوْدَةٌ وَمَذْمُوْمَةٌ ـ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوْمٌ ـ

অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদয়াত তথা নব উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বা সুন্নাতের অনুসরণে হবে, তা প্রশংসনীয়। আর যে বিদয়াত বা নবোদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে তা নিন্দনীয়।

তাঁর মতে, বিদয়াতের ভালোমন্দ হওয়ার মাপকাঠি হলো সুন্নাত। এ মতানুসারে মুসলিম জীবনের কর্ম তিন প্রকারের। যথা– ১. اَلسُّنَّةُ তথা সুন্নাত, ২. اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ তথা উত্তম বিদয়াত, ৩. اَلْبِدْعَةُ السَّيِّئَةُ তথা নিন্দিত বিদয়াত।

৫. قَوَاعِد গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা عِزُّ الدِّيْن বলেন, বিদয়াত সর্বমোট পাঁচ প্রকার। যথা–

ক. ওয়াজিব বিদয়াত। যেমন– কুরআন, হাদীস ও দীন শিক্ষার জন্য নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা।

খ. হারাম বিদয়াত। যেমন– কাদারিয়া ও জাবারিয়াদের ধর্মদর্শন।

গ. মানদুব বিদয়াত। যেমন– মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. মাকরূহ বিদয়াত। যেমন– শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

ঙ. মুবাহ বিদয়াত। যেমন– পানাহারে প্রাচুর্য আনা।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পাঁচটি বিদয়াতের মধ্যে হারাম বিদয়াত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। আর এ ব্যাপারেই রাসূল (স) বলেন– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

৬. كِتَابُ التَّوْحِيْد গ্রন্থপ্রণেতার মতে, بِدْعَة দু'প্রকার। যথা–

ক. بِدْعَة قَوْلِيَّة اِعْتِقَادِيَّة খ. بِدْعَةٌ فِى الْعِبَادَاتِ

ক. بِدْعَةٌ قَوْلِيَّةٌ اِعْتِقَادِيَّةٌ : যেমন– জাহমিয়া, মুতাযিলা, রাফেযী এবং সকল প্রকার ভ্রান্তপন্থিদের মতবাদ ও বিশ্বাস।

খ. بِدْعَةٌ فِى الْعِبَادَاتِ : শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। যেমন– ঈদে মিলাদুন্নবী পালন, নামাযের রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৭. শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম ইমাম আবু হামেদ গাযালী বলেন–

اِنَّمَا الْمَحْذُوْرُ اِرْتِكَابُ بِدْعَةٍ تُرَاغِمُ سُنَّةً مَاثُوْرَةً۔

অর্থাৎ, যে বিদয়াত কোনো প্রবর্তিত সুন্নাতকে ব্যাহত করে সে বিদয়াতই শুধু নিষিদ্ধ। তিনি আরো বলেন–

فَلَيْسَ كُلُّ مَا اُبْدِعَ مَنْهِيًّا بَلِ النَّهْىُ بِدْعَةٌ تُضَادُّ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ وَتَرْفَعُ اَمْرًا مِّنَ الشَّرْعِ مَعَ بَقَاءِ عِلَّتِهِ۔

অর্থাৎ, সকল নতুন কর্ম বা বিষয়ই নিষিদ্ধ নয়; বরং যে বিদয়াত কোনো প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিপরীতে উদ্ভাবিত এবং শরীয়তের কোনো কর্মকে তার কারণ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ব্যাহত করে, শুধু সে বিদয়াতই নিষিদ্ধ।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া দূরে থাক, এমনকি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, দীনের মধ্যে এমন আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়কে রাসূল (স) ضَلَالَة তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। ইসলামে বিদয়াত রচনাকারী পথভ্রষ্ট। কারণ সে বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে থাকে। আর এতে দীন ও সুন্নাহর বিলুপ্তি ঘটে এবং জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি। এর দ্বারা সমাজে নানা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি এ বিদয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমান বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াত পরিহার করে কলুষমুক্ত ইবাদত করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণে সকলের সচেতন থাকা অপরিহার্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٣) : اُكْتُبْ مَا تَعْلَمُ عَلٰى نَشْأَةِ الْبِدْعَةِ وَانْتِشَارِهَا - وَاذْكُرْ بَعْضَ الْبِدْعَةِ الَّتِىْ اِتَّسَعَتْ فِىْ مُجْتَمَعِنَا بِالتَّفْصِيْلِ -

■ **প্রশ্ন : ৭৩ ॥ বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ। আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু বিদয়াতের বিস্তারিত পরিচয় দাও।**

او اُكْتُبْ تَارِيْخَ مَصْدَرِ الْبِدْعَةِ وَانْتِشَارِهَا فِى الْمُجْتَمَعِ - ثُمَّ اذْكُرْ بَعْضَ الْبِدْعَةِ الْمُرَوَّجَةِ فِىْ بَلَدِنَا -

অথবা, সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর। আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথই হচ্ছে হেদায়াত। এছাড়া অন্য যা কিছু দীনের মাঝে নতুন সৃষ্ট তাই বিদয়াত। সকল বিদয়াতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। কাজেই কোনটি হেদায়াত আর কোনটি বিদয়াত এ ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। নিম্নে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো।

১ نَشْأَةُ الْبِدْعَةِ :

বিদয়াতের উৎপত্তি : اَلسُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ গ্রন্থকার আল্লামা আবদুর রহীম (র) বলেন, বিদয়াত উৎপত্তির মূলে চারটি কার্যকারণ লক্ষ্য করা যায়। যথা–

১. বিদয়াতকারী কাজটি নিজ থেকে উদ্ভাবন করে সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

২. কোনো জ্ঞানপাপী মানুষের অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে, তা দেখে মূর্খ লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে গোটা সমাজেই বিদয়াতের প্রচলন ঘটে।

৩. যখন মূর্খ লোকেরা কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের আলেমগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এমতাবস্থায় দায়িত্ব, সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদয়াত বা শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতা না করার ফলে সাধারণ লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, একাজ নিশ্চয়ই নাজায়েয কিংবা বিদয়াত হবে না। হলে কি আর আলেমগণ প্রতিবাদ করতেন না। এভাবে সমাজে বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ শরীয়তসম্মত কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

৪. কোনো কাজ মূলত ভালো, শরীয়তসম্মত কিংবা সুন্নাত; কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত সমাজের লোকদের সামনে তা সম্পাদন হয়নি, প্রচার করা হয়নি। ফলে সে সম্পর্কে ধারণা হয় যে, একাজ নিশ্চয়ই ভালো নয়, ভালো হলে আলেম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না। এভাবে একটি শরীয়তসম্মত কাজকে লোকেরা শরীয়তবিরোধী বলে মনে করতে থাকে। আর এটাও একটি বড় বিদয়াত।

উল্লিখিত চারটি কারণ ছাড়াও বিদয়াত উৎপত্তির মূলে আরো দুটি কারণ আছে বলে আল্লামা আবদুর রহীম (র) মনে করেন। কারণ দুটি হচ্ছে–

৫. মুমিন সহজেই জান্নাত পেতে আগ্রহী। আর এ অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি করে নেক কাজ করতে চায়। দীনের হুকুম আহকাম যথাযথ পালন করা কঠিনবোধ হলেও সহজসাধ্য সাওয়াবের কাজ করার জন্য লালায়িত হয় খুব বেশি। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। এ লোভও শয়তানী ষড়যন্ত্রের কারণে খুব তাড়াহুড়া করে কতক সহজ সাওয়াবের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজ থেকেই মনে করে নেয়, এগুলো সব নেক কাজ, সাওয়াবের কাজ। আর এভাবেই বিদয়াতের সৃষ্টি।

৬. একটি দীনি সমাজে দীনের নামে বিদয়াতি কাজ চালু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তা মানব ইতিহাসে অভিনব কিছু নয়। দীন যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন তার ভিত্তি রচিত হয় ইলমের ওপর। উত্তরকালে সে ইলম যখন সমাজের অধিকাংশ বা প্রভাবশালী লোকেরা হারিয়ে ফেলে তখন দীনের প্রতি জনমনে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকে তার প্রভাবে দীন বহির্ভূত কাজকেই দীনি কাজ মনে করে পালন করতে শুরু করে।

ইন্তিশারুল বিদআহ (৩) — إِنْتِشَارُ الْبِدْعَةِ :

বিদয়াতের ক্রমবিস্তার : شَرْحُ أُصُوْلِ الْاِعْتِقَادِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর গ্রন্থকার আল্লামা হাফেয আবুল কাশেম (র) বিদয়াত ক্রমবিস্তারের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **اَلْغُلُوّ তথা অতিরঞ্জন :** এ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে খারেজী ও শিয়া ফেরকা দুটি জন্ম লাভ করেছে। খারেজী সম্প্রদায় শাস্তিমূলক আয়াতসমূহকে অতিমাত্রায় প্রয়োগ করে তওবা, ক্ষমা, প্রতিশ্রুতি ও আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তারা কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছে। মুতাযিলা সম্প্রদায় এদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে। তাদের মোকাবেলায় আত্মপ্রকাশ করেছে মুরজিয়া সম্প্রদায়। যারা আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহে অতিরঞ্জিত আস্থা স্থাপন করে এ মত পোষণ করেছে যে, ঈমানের সাথে কোনো পাপই ক্ষতিকর নয়। শিয়া সম্প্রদায়টি ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্ররোচনায় নবী করীম (স)-এর পরিবারবর্গ বিশেষ করে হযরত আলী (রা) ও তাঁর পরিবারবর্গের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ভক্তি শ্রদ্ধার বিদয়াত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

২. **বিদয়াতের মোকাবেলায় বিদয়াত :** বিদয়াতকে আরেকটি অনুরূপ বিদয়াত বা আরো বড় বিদয়াত দিয়ে মোকাবেলা করা। এ ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে মুরজিয়া, মুতাযিলা, মুশাব্বিহা ও জাহমিয়া সম্প্রদায়। খারেজী ও মুরজিয়াদের মাঝামাঝি আরেকটি বিদয়াত নিয়ে আবির্ভূত হলো মুতাযিলা সম্প্রদায়। তারা বলল, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন নয়, আবার কাফেরও নয়; বরং এরা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে।

অপরদিকে তাকদীর তথা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পনা, ভাগ্যলিপিকে অস্বীকারকারী কাদারিয়া উপদলটির মোকাবেলায় আবির্ভূত হলো জাবারিয়া নামক আরেকটি উপদল।

উপরিউক্ত দলসমূহের প্রত্যেকটি অপরের বিদয়াতকে খণ্ডন করতে গিয়ে তার সমান বা তার চেয়েও কঠিন আরেকটি বিদয়াত আবিষ্কার করে। যার ফলে ইসলামী সমাজে বিদয়াতের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

৩. **বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব :** বিদয়াত প্রসারের তৃতীয় প্রধান কারণ হলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তথা ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীদের প্রভাব। শিয়া উপদলটির গোড়াপত্তন হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইহুদির হাতে। সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (স)-এর আহলে বাইত তথা পরিবারবর্গ সম্পর্কে এত বাড়াবাড়িমূলক ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শুরু করে যে, একপর্যায়ে সে হযরত আলী (রা)-কে ইলাহ্ বলে ঘোষণা করল।

নবী পরিবারের প্রতি অতি ভালোবাসা প্রকাশ করে মুসলিমদের বিরাট একটি দলকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। খেলাফত বিষয়ে আলী (রা)-এর প্রতি জুলুম করা হয়েছে– এমন একটি কথা ছড়িয়ে দিয়ে সে আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-কে নিন্দা জানাতে থাকে। এভাবেই একের পর এক বিদয়াত ও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে সাধারণ শিয়াদেরকে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

৪. **শরীয়ার বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়া :** ইসলামী শরীয়ার বিষয়াবলিতে আকল তথা মানবিক বিবেক বিবেচনাকে বিচারক ও ফয়সালাকারী হিসেবে নির্ধারণ করা। বিদয়াতপন্থিরা মানুষের সীমিত জ্ঞানকে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেয়ার ফলে মানবিক বিবেকোর্ধ্ব শরয়ী বিষয়সমূহে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তাদের বিবেকপ্রসূত দুর্বল বিবেচনার পরিপন্থি হওয়ায় অনেক বিশুদ্ধ আকিদা সংক্রান্ত বিষয়কে অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা করেছে। তেমনিভাবে অনেক সহীহ হাদীসকে আকলের অনুকূল না হওয়ায় অস্বীকার করেছে।

৫. **গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের আরবি অনুবাদ :** আব্বাসীয় খলিফা মামুনের সময়ে গ্রীক দর্শন ও পৌত্তলিক আকিদা বিশ্বাস সংবলিত বইসমূহের অনুবাদ করা হয়। মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ এসব ভ্রান্ত দার্শনিক ও পৌত্তলিক মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ শিক্ষা নিয়ে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এগুলো থেকে তারা যে মাপকাঠি তৈরি করে নেয়, তা দিয়েই শরীয়ার বাস্তব সত্য তত্ত্বসমূহকে পরিমাপ করতে থাকে। কিতাব ও সুন্নাহর বাণীসমূহকে তাদের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ করে নেয়ার জন্য বিকৃত ব্যাখ্যা করতে থাকে। যার ফলে মুসলিম উম্মাহ বিরাট বিপদ ও বিকৃতির সম্মুখীন হয়।

কালাম শাস্ত্রবিদগণ এসব মূলনীতি গ্রহণ করে তার সাথে আরো ভ্রান্তনীতি যোগ করে তা দিয়ে আল্লাহ সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহের অপব্যাখ্যা করতে থাকে। ফলে তাদের অনেকেই ভ্রান্ত হয়ে যায়। এ সবের অনুবাদের ফলে মুসলিম সমাজে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পাশাপাশি দেখা দেয় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানলাভে অনীহা ও ত্রুটি। যার ফলে মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ বিদয়াত ও কুসংস্কারের দুশ্ছেদ্য শিকলে আবদ্ধ হয়ে যায়।

: اَلْبِدْعَةُ الْمُرَوَّجَةُ فِىْ بَلَدِنَا ⊃

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতসমূহ : আমাদের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ বিদয়াতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা– ক. আকিদাগত বিদয়াত খ. আমলগত বিদয়াত। নিম্নে এ দু'প্রকারের বিদয়াত আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো–

ক. আকিদাগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা।
২. সাহাবীদের সমালোচনা করা।
৩. উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে গমন করা।
৪. কবরে গিয়ে মৃত অলীদের কাছে প্রার্থনা করা।
৫. পীর আউলিয়াদের কবরে মানত করে বিপদাপদ দূর হওয়ার আকিদা পোষণ করা।
৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা।
৭. কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা।
৮. মীলাদ মাহফিলে রাসূল (স)-এর সশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা।
৯. তারকারাজির অবস্থান বা গতিবিধিকে বৃষ্টিবর্ষণের নিয়ামক হিসেবে ধারণা পোষণ করা।
১০. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা।
১১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা। ১২. শিখা চিরন্তন জ্বালানো।

খ. আমলগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের ন্যায় আমলগত বিদয়াতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে–

১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা। ২. মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উরস করা।
৩. খাতনার পর এ উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৪. জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী পালন করা।
৫. নির্দিষ্ট তারিখে মৃত্যুদিবস পালন করা।
৬. আযানের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে দরূদ পড়া।
৭. কবরে বাতি জ্বালানো।
৮. কবরে আতর গোলাপ ছিটানো।
৯. মৃতব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা।
১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান বাজনা করা।
১১. মিলাদ শরীফ পড়া।
১২. আনুষ্ঠানিকভাবে দু'হাত তুলে আযানের মুনাজাত করা ইত্যাদি।

উপসংহার : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিপরীত সকল কথা ও কাজ বিদয়াতরূপে গণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। আর দীনের মধ্যে নব আবিষ্কার তথা বিদয়াত থেকে বিরত থাকার মাঝেই মুমিন জীবনের সফলতা নিহিত। কাজেই আমাদের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াতকে পরিহার করা।

চতুর্থ অধ্যায়
ইফতিরাক

■ اَلسُّؤَالُ (٧٤) : مَا مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَمَا خَلْفِيَّةُ الْاِفْتِرَاقِ؟ هَلِ الْاِفْتِرَاقُ جَائِزٌ فِى الْاِسْلَامِ؟ بَيِّنْ بِالْاَدِلَّةِ مُفَصَّلًا-

■ **প্রশ্ন : ৭৪ ॥ اِفْتِرَاق-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট কী? ইসলামে কি ইফতিরাক জায়েয? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন আকাইদশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ফেরকা তথা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপনপূর্বক নিম্নে এর বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

⊃ اَلْاِفْتِرَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ لُغَةً :

اِفْتِرَاق-এর আভিধানিক অর্থ : اِفْتِرَاقٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। এটি فَرْقٌ শব্দ থেকে গৃহীত। মাদ্দাহ ف ـ ر ـ ق; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْمُفَارَقَةُ তথা বিচ্ছেদ, ২. اَلْاِنْقِطَاعُ তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. اَلتَّفَرُّقُ তথা বিভক্ত হওয়া, ৪. اَلْمُفَاصَلَةُ তথা পৃথক করা, ৫. اَلْاِنْفِصَالُ তথা সম্পর্কহীনতা, ৬. اَلشُّذُوْذُ তথা ব্যতিক্রম, ৭. اَلْمُبَايَنَةُ তথা বিপরীত হওয়া, ৮. اَلْاِنْقِسَامُ তথা বিভাজন, ৯. اَلضَّيَاعُ তথা বিনাশ, ১০. اَلضَّلَالُ তথা ভ্রষ্টতা, ১১. اَلْمُقَاطَعَةُ তথা বয়কট করা, ১২. اَلتَّشَعُّبُ তথা শাখা হওয়া, ১৩. اَلتَّغْيِيْرُ তথা পরিবর্তন, ১৪. اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَادَّةِ وَعَنِ الْاَصْلِ وَعَنِ الْاَكْثَرِ وَعَنِ الْجَمَاعَةِ তথা মূল পন্থা, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া।

اِفْتِرَاقٌ শব্দটি اِجْتِمَاع-এর বিপরীতার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এখানে আল্লাহ তায়ালা جَمَاعَة বা اِجْتِمَاع-এর বিপরীতে تَفَرُّق বা اِفْتِرَاق শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর اِفْتِرَاق-এর বিপরীত শব্দ হলো– اِجْتِمَاع; এর অর্থ হচ্ছে– ঐক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْإِفْتِرَاقِ اِصْطِلَاحًا :

اِفْتِرَاق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন।

১. مَفْهُوْمُ الْاِفْتِرَاق গ্রন্থকারের ভাষায়-

هُوَ الْخُرُوْجُ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ اَىِّ اَصْلٍ مِّنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ الْقَطْعِيَّةِ اَوْ اَكْثَرَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْاُصُوْلُ الْاِعْتِقَادِيَّةُ. اَوِ الْاُصُوْلُ الْعَمَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِيَّاتِ. اَوِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَصَالِحِ الْاُمَّةِ الْعُظْمٰى اَوْ بِهِمَا مَعًا.

অর্থাৎ, اِفْتِرَاق হলো দীনের এক বা একাধিক অকাট্য মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. مَوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَام গ্রন্থে اِفْتِرَاق-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- هُوَ التَّفَرُّقُ فِى الدِّيْنِ وَالْاِخْتِلَافِ فِيْهِ

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে اِفْتِرَاق বলা হয়।

৩. مَوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَام গ্রন্থকার আরো বলেন-

هُوَ الْاِفْتِرَاقُ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ عُمُوْمُ اُمَّةِ الْاِسْلَامِ فِىْ عَهْدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَهُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَمَنْ كَانَ عَلٰى هَدْيِهِمْ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْاِفْتِرَاقِ.

অর্থাৎ, মুসলিম জামায়াত তথা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হলো اِفْتِرَاق; আর মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম জাতি, আর তাঁরা হলেন আহলুস সুন্নাহ উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির পরেও যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন।

خَلْفِيَّةُ الْاِفْتِرَاق :

ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল প্রেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবের লোকেরা বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস করত। রাসূল (স)-ই প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন, ওমর (রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে দ্বন্দ্ব, আলী (রা)-এর শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযিদের মাঝে দ্বন্দ্ববিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের বিভক্তির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে।

আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে। সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

حُكْمُ الْاِفْتِرَاقِ فِى الْاِسْلَامِ ⊃ :

ইসলামে ইফতিরাকের বিধান : কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মতকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। যারা ইতঃপূর্বে দীনকে বিভক্ত করেছেন তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের মতো হতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ. مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা স্বীয় দীনকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বিভক্তি এসেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁর উম্মতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে।

আবু সাঈদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন-

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ؟

অর্থাৎ, তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে পদে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি কোনো গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহুদি খ্রিস্টানরা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?

উল্লিখিত সহীহ হাদীসগুলো সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এ সকল হাদীস থেকে আমরা উম্মতের মধ্যে বিভক্তি ও তার কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন। আবু হোরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ اَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَالنَّصَارٰى مِثْلَ ذٰلِكَ وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً۔

অর্থাৎ, ইহুদিরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খ্রিস্টানরাও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।

অন্য হাদীসে মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اَلَا اِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِفْتَرَقُوْا عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ۔

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী এবং একটি দলই জান্নাতি; এ দলটি হলো জামায়াত।

অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ۔

অর্থাৎ, ইসরাঈল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটিমাত্র দল বাদে সকলেই জাহান্নামী। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার ওপর আছি।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁরা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। সুতরাং দীনের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং মহান আল্লাহকে ভয় করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٥) : مَا مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِخْتِلَافِ؟ ثُمَّ اشْرَحْ اَسْبَابَ الْاِفْتِرَاقِ عَلَى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔

■ **প্রশ্ন : ৭৫ ॥ اِفْتِرَاق অর্থ কী? اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে اِفْتِرَاق-এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন আকাইদশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ফেরকা তথা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ اَلْاِفْتِرَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ لُغَةً :

اِفْتِرَاق-এর আভিধানিক অর্থ : اِفْتِرَاقٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। এটি فَرْقٌ শব্দ থেকে গৃহীত। মাদ্দাহ ف ـ ر ـ ق জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْمُفَارَقَةُ তথা বিচ্ছেদ, ২. اَلْاِنْقِطَاعُ তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. اَلتَّفَرُّقُ তথা বিভক্ত হওয়া, ৪. اَلْمُفَاصَلَةُ তথা পৃথক করা, ৫. اَلْاِنْفِصَالُ তথা সম্পর্কহীনতা, ৬. اَلشُّذُوْذُ তথা ব্যতিক্রম, ৭. اَلْمُبَايَنَةُ তথা বিপরীত হওয়া, ৮. اَلْاِنْقِسَامُ তথা বিভাজন, ৯. اَلضَّيَاعُ তথা বিনাশ, ১০. اَلضَّلَالُ তথা ভ্রষ্টতা, ১১. اَلْمُقَاطَعَةُ তথা বয়কট করা, ১২. اَلتَّشَعُّبُ তথা শাখা হওয়া, ১৩. اَلتَّغْيِيْرُ তথা পরিবর্তন, ১৪. اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَادَّةِ وَعَنِ الْاَصْلِ وَعَنِ الْاَكْثَرِ وَعَنِ الْجَمَاعَةِ তথা মূল পন্থা, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া।

اِفْتِرَاقٌ শব্দটি اِجْتِمَاع-এর বিপরীতার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

এখানে আল্লাহ তায়ালা جَمَاعَة বা اِجْتِمَاع-এর বিপরীতে تَفَرُّق বা اِفْتِرَاق শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর اِفْتِرَاق-এর বিপরীত শব্দ হলো– اِجْتِمَاع; এর অর্থ হচ্ছে– ঐক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ اِصْطِلَاحًا :

اِفْتِرَاق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন।

১. مَفْهُوْمُ الْاِفْتِرَاقِ গ্রন্থকারের ভাষায়–

هُوَ الْخُرُوْجُ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ اَىِّ اَصْلٍ مِّنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ الْقَطْعِيَّةِ اَوْ اَكْثَرَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْاُصُوْلُ الْاِعْتِقَادِيَّةُ، اَوِ الْاُصُوْلُ الْعَمَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِيَّاتِ، اَوِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَصَالِحِ الْاُمَّةِ الْعُظْمٰى اَوْ بِهِمَا مَعًا۔

অর্থাৎ, اِفْتِرَاق হলো দীনের এক বা একাধিক অকাট্য মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. مَوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَامِ গ্রন্থে اِفْتِرَاق-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- هُوَ التَّفَرُّقُ فِى الدِّيْنِ وَالْاِخْتِلَافُ فِيْهِ

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে اِفْتِرَاق বলা হয়।

৩. مَوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَامِ গ্রন্থকার আরো বলেন-

هُوَ الْاِفْتِرَاقُ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ عُمُوْمُ اُمَّةِ الْاِسْلَامِ فِىْ عَهْدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَهُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَمَنْ كَانَ عَلٰى هَدْيِهِمْ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْاِفْتِرَاقِ۔

অর্থাৎ, মুসলিম জামায়াত তথা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হলো اِفْتِرَاق; আর মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম জাতি, আর তাঁরা হলেন আহলুস সুন্নাহ এবং উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির পরেও যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْاِفْتِرَاقِ وَالْاِخْتِلَافِ :

اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার পার্থক্য : اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف শব্দদ্বয় আভিধানিক দিক থেকে প্রায় সমার্থবোধক। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। اِفْتِرَاق অর্থ- বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া। আর اِخْتِلَاف অর্থ- মতভেদ বা মতবিরোধ করা। সুতরাং এখানে اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিম্নে اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার আরো কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

১. اِفْتِرَاق হলো اِخْتِلَاف তথা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।
২. প্রত্যেক ইফতিরাকই ইখতিলাফের অন্তর্ভুক্ত, তবে সব ইখতিলাফ ইফতিরাক নয়। অর্থাৎ ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই। তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।
৩. ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলেমগণের মধ্যে মতভেদ বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না।
৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে সব ইখতিলাফ তথা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়; তবে অনেক সময় তা বিরাট আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক তথা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।
৫. ইখতিলাফকারী নিন্দিত নয়; বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী বিভক্তি সৃষ্টি করায় নিন্দিত ও তিরস্কৃত।
৬. ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলীল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও স্বার্থকামিতা; এতে স্বার্থহীনতা ও ইখলাসের প্রতিফলন ঘটে না।

৭. ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলেমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তিকর ও এর প্রবক্তাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন না; বরং তার দলীলকে দুর্বল গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলেম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্ত গণ্য করেন।

৮. ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে; কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। কেবল এগুলোর অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

৯. ইখতিলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত। তাইতো বলা হয়- اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংসের কারণ।

১০. ইখতিলাফকারী মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তে একটি এবং সঠিক সিদ্ধান্তে দুটি সাওয়াবের অংশীদার। পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী সর্বাবস্থায় গুনাহগার।

৩ : اَسْبَابُ الْاِفْتِرَاقِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে اِفْتِرَاق-এর কারণসমূহ : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমরা দেখতে পাই, পূর্ববর্তী উম্মত এবং এ উম্মতের মধ্যে اِفْتِرَاق তথা বিভক্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ-

১. **অহী ভুলে যাওয়া :** কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত অহী ভুলে গিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ-

অর্থাৎ, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান তাদের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার একটি অংশ তারা ভুলে গেল। ফলে কেয়ামত পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগ্রত রেখেছি। আর তারা যা করে আল্লাহ তা জানিয়ে দেবেন।

২. **اِتِّبَاعُ الْهَوٰى তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা :** কুরআনুল কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে- هَوَى النَّفْس তথা ব্যক্তিমনের পছন্দ অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে اَهْوَاء বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابَيْنِ اِفْتَرَقُوْا فِىْ دِيْنِهِمْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِى الْاَهْوَاءَ كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ-

وَاِنَّهٗ سَيَخْرُجُ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمْ تِلْكَ الْاَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهٖ لَا يَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ اِلَّا دَخَلَهٗ-

৩. **হিংসা বিদ্বেষ :** কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা افتراق তথা বিভক্তির অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের মধ্যে অন্যান্য সব বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে। তবে দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায়। বিষয় দুটি হলো– ক. অহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং খ. পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আর হিংসা বিদ্বেষ এ বিষয় দুটি দূরীভূত করে বিভেদ সৃষ্টি করে।

৪. **সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি :** রাসূল (স)-এর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ। কেননা বিভিন্ন হাদীসে সুন্নাতের অনুসরণ করাকে সফলতা, ঐক্য ও হেদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে সব বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইসলামে সর্বপ্রথম যে বড় ধরনের বিভক্তির সৃষ্টি হয়, তা ছিল খারেজী সম্প্রদায়ের বিভক্তি। সুন্নাত থেকে বিচ্যুতিই যার মূল কারণ।

৫. **যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি তা করা :** হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূল (স) বলেন, যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি তা তারা করবে, অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি, অহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে সেসব কাজকে দীনের অংশ বানিয়ে তা সম্পাদন করা। যেমন অহীর মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে, অন্যায় শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়নি; কিন্তু খারেজীরা অহীর অনুসরণের নামে তা করেছে।

৬. **অন্যান্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া :** মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফেরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য ধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। নওমুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন ও সমাজের পণ্ডিতদের বক্তব্য ইত্যাদি অনুসরণ করার কারণে তারা বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৭. **মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ :** কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়াতে মুহকামের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে আয়াতে মুতাশাবিহ বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতের বক্তব্য গ্রহণ করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ـ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ـ

৮. **অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্ক :** অহীর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করা। আর মুমিনের দায়িত্ব হলো, অহীর নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা করা। কাজেই অহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়; অহী নিয়ে বিতর্ক নয়। কেউ কেউ এমন আছে যারা অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়। অথচ হাদীস শরীফে অহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপসংহার : اِفْتِرَاق তথা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন সৃষ্টি মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার শামিল; যা মারাত্মক অপরাধও বটে। কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন পরিহার করা এবং বিভাজনকারীদেরকে প্রতিহত করে মুসলিম ঐক্য অটুট রাখা।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٦) : كَيْفَ ظَهَرَ الْاِفْتِرَاقُ فِى الْاُمَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ؟ بَيِّنْ خَلْفِيَّةَ ذٰلِكَ مَعَ شَرْحِ الْمَسَائِلِ الْاَسَاسِيَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ مَدَارَ الْاِفْتِرَاقِ۔

■ প্রশ্ন : ৭৬ ॥ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি হয় কিভাবে? এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর এবং যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে, সেগুলোর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : اِفْتِرَاق অর্থ হচ্ছে ফেরকা তথা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ইফতিরাকী বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো।

⊃ نَشْأَةُ الْاِفْتِرَاقِ فِى الْاُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ :

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি : হাদীসের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বিবিধ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজনের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ−

১. **হিংসা বিদ্বেষ :** পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় ও বিভাজন থেকে বাঁচার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেন−

١۔ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرِ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنِ۔

٢۔ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا ۔ اَفَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ! اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

٣۔ فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ۔ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হলো, আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে; কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সব নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত এবং সব বিদয়াতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।

২. মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনা একত্র হয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি করে।

৩. প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। তবে ইফতিরাকের কারণে ইফতিরাকীদের দল উপদল অনেক হলেও তাদের অনুসারীদের সংখ্যা কম।

৪. আকিদার উৎস হিসেবে অহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অহীর সাথে মানবীয় যুক্তিবিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করার কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরূপ ইফতিরাক বা বিভাজন হওয়া স্বাভাবিক। কারণ হাদীস শরীফে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরূপ বিভাজনের ফলে কারা সঠিক পথের অনুসারী আর কারা বাতিলের অনুসারী, তারও দিকনির্দেশনা হাদীসে রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَسَتَـفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا فِرْقَةً وَّاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ-

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। অতিসত্বর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল ছাড়া। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার ওপর আছি।

খ. خَلْفِيَّةُ الْاِفْتِرَاقِ :

ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল প্রেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবের লোকেরা বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস করত। রাসূল (স)-ই প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন, ওমর (রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে দ্বন্দ্ব, আলী (রা)-এর শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযিদের মাঝে দ্বন্দ্ববিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের বিভক্তির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে।

আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে। সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

৩ الْمَسَائِلُ الْاَسَاسِيَّةُ الَّتِىْ كَانَتْ مَدَارُ الْاِفْتِرَاقِ :

যেসব মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে : মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভাজন ঘটে, তা নিম্নরূপ–

১. **রাসূলের বংশধরগণের ভালোবাসা ও মর্যাদা :** কুরআন মাজীদে বংশ, বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে; বংশ বা বর্ণের কারণে নয়।

দীন পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের মানুষেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়তার ভালোবাসা রক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

অর্থাৎ, বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।

ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক একজন ইহুদি ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনে আবি তালিব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলতে থাকে। এসব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকার ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে।

২. **ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান :** কুরআন মাজীদে পাপ, জুলুম, কুফর ইত্যাদি শব্দ কঠিন নিন্দা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে কাফের বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহান্নামবাসের কথা বলা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যেতে পারে যে, পাপ, ফিসক, জুলুম ও কুফরের একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নাম।

পক্ষান্তরে কুরআন মাজীদে বার বার বলা হয়েছে, শিরক ব্যতীত সর্বপ্রকার পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। কঠিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কুরআনে মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে ; কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। খারেজীরা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হলে সে কাফের বা ঈমানহারা হয়ে যায়।

এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা দাবি করে, ঈমান ও ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ঈমান বা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে, তাহলে যত গুনাহই করুক তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক অথবা না মানুক, সকল মুমিনই জান্নাতী হবে।

৩. **রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইমামত :** খারেজীদের মতে, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ইমামত বা নেতৃত্ব একসূত্রে বাঁধা। রাষ্ট্রপ্রধানই সালাতে ইমামতি করেন, ইমাম নির্ধারণ করেন এবং যুদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারে না। এ কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাকে অপসারণ করা এবং সেজন্য যুদ্ধ ও অস্ত্রধারণ করাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে গণ্য করে। এ দায়িত্বে অবহেলা করা বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী বলে গণ্য করে।

শিয়ারাও খারেজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়াসম্পন্ন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের ইমামগণকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকিদার অংশ মনে করে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ সৃষ্টি হয়।

৪. **তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা :** কুরআন মাজীদে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মহান ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না।

আবার কুরআনুল কারীম থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি হলো, মানুষ তার নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী। মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না; বরং প্রত্যেককে তার কর্মের প্রতিদানস্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

কিছু লোক এ বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে তারা বলতে শুরু করে যে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই। তাদের মতে, তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। ক্রমান্বয়ে এ মতটি একটি দল বা ফেরকায় পরিণত হয়। এদের কাদারিয়া বলা হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলারাও অনুরূপ মত গ্রহণ করে।

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। তারা কলের পুতুলের মতো। যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ। এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে জাবরিয়া বলা হয়।

৫. **আল্লাহর সত্তা ও সিফাতে বিশ্বাসের পরিধি ও ব্যাখ্যা :** ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত, কর্ম ও বিশেষণ। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে ইফতিরাক তথা বিভক্তির ভূমিকায় সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

প্রাচীনকাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তাঁর একত্ব বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত। সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি ও অনন্ত সত্তা হিসেবে আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক; কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, তাঁর কর্ম, তাঁর গুণাবলি ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই কাদারিয়া ফেরকার লোকেরা তাকদীর অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিত্ব স্বীকার করে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহম ইবনে সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি ভারতীয়, গ্রিক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সর্বপ্রকার সিফাত তথা বিশেষণ থেকে বিমুক্ত বা 'নির্গুণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মুতাযিলারাও মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁরা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٧) : اُذْكُرِ الْاَسْبَابَ الرَّئِيْسِيَّةَ فِىْ اِفْتِرَاقِ الْعَقَائِدِ الْاِسْلَامِيَّةِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ۔

■ প্রশ্ন : ৭৭ ॥ ইসলামী আকিদার প্রশ্নে ইমামগণের বিভাজনের প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]

او۔ بَيِّنْ سَبَبَ اِخْتِلَافِ الْعَقِيْدَةِ وَخَلْفِيَّتَهَا مُفَصَّلًا۔

অথবা, আকিদা বিভক্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা কর।

او۔ كَيْفَ اِفْتَرَقَ فِىْ اَهْلِ الْعَقِيْدَةِ؟ اُكْتُبْ تَارِيْخَهَا مُوْضِحًا۔

অথবা, আকিদাপন্থিদের মধ্যে কিভাবে বিভাজন হয়েছিল? এর ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইসলামপন্থিদের মধ্যে চিন্তাভাবনার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসের। নিচে আকিদা বিভক্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

⊃ اَسْبَابُ اِفْتِرَاقِ الْعَقَائِدِ :

আকিদা বিভাজনের কারণ : সৃষ্টির সূচনালগ্নে সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তাদের আকিদা বিশ্বাসও অভিন্ন ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মানুষের আকিদার মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আকিদা বিভাজনের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. **ধর্মীয় কারণ :** ইসলামকেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য একমাত্র ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (مَائِدَة : ٣)

অর্থাৎ, আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু মানুষ এ ধর্মমতকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন বাতিল মতবাদ প্রকাশ করেছে। এসব মতবাদ প্রকাশের ফলেই আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে।

২. **সামাজিক কারণ :** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে মানুষ অভ্যস্ত। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানান মানুষের আচার আচরণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সৃষ্টিগতভাবে স্বভাবজাত ইসলাম ধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করলেও স্ব স্ব সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আর এ প্রভাবের ছোঁয়া লাগে তাঁর ধর্মীয় চিন্তা চেতনায়। ফলে আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَلٰكِنْ اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُمَجِّسَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ-

অর্থাৎ, প্রত্যেক মানব শিশুই ইসলামের ফিতরাতের ওপর জন্মলাভ করে; কিন্তু তার পিতামাতা তথা পরিবেশ বা সমাজ তাকে ইহুদি, নাসারা ও মূর্তিপূজক বানায়।

৩. **রাজনৈতিক কারণ :** আকিদা বিভাজনের অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক কারণ। যেমন ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয় সম্প্রদায় হলো খারেজী সম্প্রদায়। সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা)-এর কাছে কুরআন মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য দু'জন মধ্যস্থতাকারী লোকের নাম প্রস্তাব করা হয়। এটি একটি রাজনৈতিক কূটকৌশল। সেখানকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

৪. **স্বভাবগত কারণ :** সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তায়ালা একেক মানুষকে একেক রকম চিন্তাচেতনা বুদ্ধিবিবেক ও স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের ভিন্ন মত হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্যই ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো বিষয় বুঝে না আসলেও মেনে নিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা) বলেন– لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ مَسْحُ الْخُفِّ الخ অর্থাৎ, ধর্ম যদি যুক্তির ওপর চলতো তাহলে মোজার ওপর মাসেহ করার পরিবর্তে মোজার নিচে মাসেহ করতে হতো; কিন্তু কালের বিবর্তনে কিছু মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারেও বুদ্ধি বিবেকের মাপকাঠিতে চলতে শুরু করেছে। ফলে আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে।

⊃ خَلْفِيَّةُ اِخْتِلَافِ الْعَقِيْدَةِ :

আকিদা বিভাজনের প্রেক্ষাপট : আকিদা বিভাজন হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি; বরং তা সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে। নিম্নে আকিদা বিভাজনকারী কয়েকটি দলের আকিদা বিভাজনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো–

১. **খারেজীদের উৎপত্তি :** হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা)-এর নিকট কুরআন মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য দু'জন মধ্যস্থতাকারী লোকের নাম প্রস্তাব করা হয়। সেখান থেকে খারেজী বিভেদের সূত্রপাত হয়। হযরত আলী (রা)-এর অধিকাংশ সৈন্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন; কিন্তু ১২,০০০ সৈন্যের একটি দল বিশেষ করে তামিম গোত্রীয় সৈন্যরা ধর্মীয় বিষয়ের ওপর মানুষের মধ্যস্থতার তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করে। তারা

বলতে লাগল- اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰه অর্থাৎ, "সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহরই।" তারা সেনাবাহিনী ত্যাগ করে কুফার নিকটে হারূরা নামক স্থানে বসবাস করতে লাগল। ইতিহাসে তারাই খারেজী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

২. **মুতাযিলাদের উৎপত্তি :** একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের হবে কিনা? এর উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হয়ে যাবে; কিন্তু তার প্রতিভাবান ছাত্র ওয়াসিল বিন আতা শিক্ষকের এ মন্তব্যটি মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, কবীরা গুনাহকারী ফাসেক হবে না, আবার মুসলিমও থাকবে না; বরং সে দু'য়ের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে।
তার এ বক্তব্য শুনে হাসান বসরী (র) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- قَدِ اعْتَزَلَ عَنَّا অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরপর থেকে ওয়াসিল বিন আতা মসজিদের একপ্রান্তে বসে স্বীয় মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। ইতিহাসে তার দলই مُعْتَزِلَة তথা দলত্যাগী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

৩. **শিয়াদের উৎপত্তি :** প্রিয়নবী (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) খলিফা হওয়ার অধিকতর দাবিদার ছিলেন। তারা হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর খেলাফতের ঘোরবিরোধী। এ মতবাদের ভিত্তিতে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাদের মতে, আহলে বাইয়াত তথা নবী পরিবার অর্থাৎ, আলী ও ফাতেমা (রা)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামতের একমাত্র অধিকারী।

৪. **মুরজিয়াদের উৎপত্তি :** উমাইয়া শাসন বিরোধী খারেজী ও শিয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তির সহনশীল চিন্তাধারা থেকেই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটায় তাকে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

৫. **কাদারিয়াদের উৎপত্তি :** এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটে সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে এবং উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে। 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেছেন- কথিত আছে, কাবা শরীফে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম এ ফেতনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে- اِحْتَرَقَتْ بِقَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় (قَدَر অনুসারে) ঘটেছে। অন্যরা বলল- لَمْ يَقْدِرِ اللّٰهُ هٰذَا অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ পরিকল্পনা নিতে পারেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদারিয়া মতবাদটি বিস্তৃতি লাভ করে।
'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের টীকায় আছে যে, মাবাদ আল জুহানী مَعْبَد الْجُهَنِىْ এ মতবাদ গ্রহণ করে বসরা অধিবাসী আসাভিরা নামক একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ের জনৈক খ্রিস্টানের নিকট থেকে। তার নাম আবু ইউনূস সানসাভিয়াহ বা সুসান (سَنْسَوِيَة/سُوْسَن) মাবাদ ইবনে খালিদ আল জুহানী থেকে গ্রহণ করে গায়লান আদ দামাশকী।

উপসংহার : বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন কারণেই আকিদা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দল, মত ও আকিদাপন্থি মানুষের। এমন পরিস্থিতিতে সত্য ও সঠিক আকিদা খুঁজে পেতে এ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٨) : مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ بَيِّنْ عَقَائِدَهُمْ بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ প্রশ্ন : ৭৮ ॥ 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

او۔ مَنْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ بَيِّنْ عَقَائِدَهُمْ بِالتَّفْصِيْلِ۔

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫]

او۔ مَنْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ بَيِّنْ عَقِيْدَتَهُمْ بِالتَّفْصِيْلِ۔

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১২]

او ۔ مَنْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ اُكْتُبْ نَشْأَةَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَطَوُّرَهَا مُفَصَّلاً۔

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,'১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُغَةً :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর আভিধানিক অর্থ :

اَهْل-এর অর্থ : اَهْلٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَهْلُوْنَ; এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْاَقَارِبُ তথা নিকটাত্মীয়। ২. اَلْعَشِيْرَةُ তথা পরিবার পরিজন। ৩. اَلْاَصْحَابُ তথা সাথি। ৪. اَلسُّكَّانُ তথা অধিবাসী। ৫. اَلْمُسْتَحِقُّ তথা অধিকারী। ৬. اَلتَّابِعُ তথা অনুসারী। ৭. اَخَصُّ النَّاس তথা বিশেষ ব্যক্তি। ৮. عُضْوٌ তথা সদস্য।

اَلسُّنَّة-এর অর্থ : اَلسُّنَّةُ শব্দটি س - ن - ن মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। سُنَّةٌ একবচন, বহুবচনে سُنَنٌ যেমন মহান আল্লাহর বাণী– قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلطَّرِيْقَةُ তথা পদ্ধতি। ২. اَلسِّيْرَةُ তথা আদর্শ।

৩. اَلْقَانُوْن তথা নীতিমালা।

৪. اَلشَّرِيْعَة তথা বিধান। যেমন আল্লাহর বাণী– وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا

৫. اَلْمَوْرِد প্রণেতা বলেন– ক. اَلْخَصْلَةُ তথা স্বভাব, খ. اَلطَّبِيْعَةُ তথা প্রকৃতি।

৬. اَلنَّهْجُ তথা পদ্ধতি।

اَلْجَمَاعَة-এর অর্থ : اَلْجَمَاعَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْجَمَاعَاتُ এটা ج - م - ع মূলধাতু থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ– ১. اَلْجَيْشُ তথা সৈন্যদল। ২. اَلْفِئَةُ তথা ছোট দল। ৩. اَلْحِزْبُ তথা দল। ৪. اَلْقَوْمُ তথা সম্প্রদায়। ৫. اَلْمُعْجَمُ গ্রন্থকার বলেন– اَلْجَمَاعَةُ هِىَ الْعَدَدُ الْكَثِيْرُ مِنَ النَّاسِ الْوَسِيْط

সুতরাং اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর একত্রিত অর্থ হলো– সুন্নাতের অনুসারী দল।

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন–

هِىَ الْجَمَاعَةُ الَّتِىْ قَامَتْ عَلٰى طَرِيْقٍ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهٖ.

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দল, যারা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ اَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন– هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا فِى الْعَقِيْدَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ اٰرَاءِ الْفَلَاسِفَةِ অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَسُنَّةَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন।

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا طَرِيْقَ السُّنَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ (رضـ) قبل بدو البدعة.

অর্থাৎ, اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة হলো যারা বিদয়াত প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই সাহাবীদের অনুকরণীয় সুন্নতী পন্থাকে আবশ্যক করে নিয়েছিল।
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নَشْأَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة : ১

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসনামলে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের এবং আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এসব দল মুসলিমদের কাছে ইসলামের সঠিক রূপরেখা পেশ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী মুতাযিলা দল ত্যাগ করে বসরার এক মসজিদে নিজস্ব চিন্তাচেতনার ভিত্তিতে এক মাযহাবের সূচনা করেন। উক্ত মাযহাবের অনুসারীরাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নামে পরিচিত। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اِثْنَتَىْ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বনি ইসরাঈল সম্প্রদায় ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর অচিরেই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দল কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, যে পথে আমি ও আমার সাহাবীগণ রয়েছেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে– وَهِىَ الْجَمَاعَةُ অর্থাৎ, তা হলো একটি দল। অপর বর্ণনায় রয়েছে– مَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ অর্থাৎ, যারা সুন্নাত ও জামায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা স্বীকৃত।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআনের আয়াত দ্বারা স্বীকৃত। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী– يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ هُمْ اَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ.

অর্থাৎ, اَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ-দ্বারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত উদ্দেশ্য, আর وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ দ্বারা বিদয়াতপন্থি ও ভ্রান্তরা উদ্দেশ্য।

প্রিয়নবী (স)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরই তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী বাস্তবে রূপ লাভ করে। কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালের শেষ দিক হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি ও বিভক্তি শুরু হয়। তারা সবাই নিজ নিজ

স্বার্থসিদ্ধি ও নিজেদের চিন্তাচেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায়। এ কারণে তারা রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, কাদারিয়া, শিয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

ইসলামের এমন ক্রান্তিলগ্নে সত্যপন্থি আলেমগণ মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণের মতাদর্শসমূহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি তাঁরা ভ্রান্তপন্থিদের যুক্তিগুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে খণ্ডন করেন। চার মাযহাবের ইমামগণ, ইমাম তাহাবী, ইমাম শাবী ও ইমাম গাযালীর নাম এ সকল মনীষীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামান্য কিছু মুসলিম ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিমই তাদের সমর্থন করে এবং আজও তাদের অধিকাংশই এ মতের অনুসারী। আর এ সত্যপন্থি আলেমগণই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ মাত্র একটি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটা আমার প্রদত্ত সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ কর, আর অন্য সকল ভ্রান্তপথ অনুসরণ করো না। অন্যথা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে।

অতএব এ সত্যপন্থি আলেমগণই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে।

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের কোনো বিশেষত্ব নেই।

৪. হযরত মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে।

৫. আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে–
اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ۔

৬. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা।

৭. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। রাসূল (স) ইরশাদ করেন–
اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ۔

৮. নবী রাসূলগণ মাসুম। তাঁরা সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে তাঁদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে।

৯. কবীরা গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে ফাসেক বলা যাবে; কিন্তু কাফের বলা যাবে না।

১০. রাসূল (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন।

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর বাণী- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মারা গেলেও চিরকাল দোযখে থাকবে না। কেননা হাদীসে এসেছে- مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

১৩. মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদে ভুল শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন।

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়।

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন।

১৬. সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী।

১৭. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি তাঁর অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তাঁর গুণাবলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক।

১৯. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ কাজের বিনিময় দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

২০. মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং আত্মা প্রশান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য- اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ

২১. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তবে লিখন, পঠন ও উচ্চারণ সৃষ্ট।

২২. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

১- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔

২- فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا۔

২৩. বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবাদের সমর্থক। তাই তাঁরা মনে করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল।

২৪. আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের স্রষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন করার ক্ষমতা আছে।

২৫. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী।

২৬. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করাকে তারা হারাম মনে করেন।

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। আর ৭৩ দলের মধ্যে এ দলটিই সঠিক পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ও ঈমানী দায়িত্ব।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٩) : اِشْرَحْ جُهُوْدَ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ فِىْ شَرْحِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَعَ ذِكْرِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَاُصُوْلِهِمْ وَمَنَاهِجِهِمْ -

■ প্রশ্ন : ৭৯ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান ব্যাখ্যা কর এবং তাঁদের গ্রন্থাবলি, মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : অতীতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলেম ও ইমামগণ তৎকালীন সময়ে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করতে এবং সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার ইমাম বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ جُهُوْدُ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ فِىْ شَرْحِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চারজন ইমাম বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হচ্ছেন−

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)
২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)
৩. ইমাম মালেক (র)
৪. ইমাম শাফেয়ী (র)

উল্লিখিত ইমামগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে নিজেরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন−

১. **অভিন্ন আকিদা :** আকিদার মূলনীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর ফিকহুল আকবার গ্রন্থে যে আকিদা লিখেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর আকিদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) যা লিখেছেন তা চার ইমামের আকিদা। আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু'একটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত তাদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২. **বিদয়াতমুক্ত আকিদা :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সব বিদয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খড়গহস্ত। বিশেষত আকিদাগত বিদয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকিদার বিষয় আলোচনা করেছেন।

৩. **গ্রন্থ রচনা :** চার ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) আকিদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিকহ-এর বিষয়ে নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তাঁর ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পারি; কিন্তু তিনি আকিদার বিষয়ে অনেকগুলো পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে আল ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৪. **ইমাম তাহাবীর অনবদ্য রচনা :** ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও ব্যাপক খেদমত এবং প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াত পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ও পঠিত বই।

৫. **আকিদার উৎস বিষয়ে ঐকমত্য :** আকিদার বিষয়ে চার মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ হলো, আকিদার উৎস ও ভিত্তির বিষয়ে তাঁরা একমত। আমরা দেখেছি, আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকিদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা আকিদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী তাবেয়ীগণের ইজমা বা ঐকমত্যকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে মূলত শাব্দিক বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ব্যতীত কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল উৎস এক এবং তা বহুমুখী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এজন্য চার ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আকিদার উৎস মূলত তিনটি। যথা– ১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ হাদীস এবং ৩. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা বা ঐকমত্য। তাঁরা একমত যে, কুরআন হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকিদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। আর সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সব বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ব্যতীত গ্রহণ করার জন্য সমন্বয়মূলক কিছু কথা বলা যেতে পারে। এরূপ কথা আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেয়া হয়েছে।

ধর্মীয় ব্যাপারে এবং বিশেষত গায়েবী বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং অহীর কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন–

وَلَا نَخُوْضُ فِي اللّٰهِ وَلَا نُمَارِيْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ. وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْاٰنِ.

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হই না।

أُصُوْلُ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ এ নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের আকিদার মূলনীতি। আর তা হলো– اَلسُّنَّةُ এবং اَلْجَمَاعَةُ; অর্থাৎ আকিদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা এবং اَلْجَمَاعَةُ তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের অনুসরণ করাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি।

নিম্নে চার ইমামের বক্তব্য ও ব্যাখ্যার আলোকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

১. **আকিদার উৎস বিষয়ক মূলনীতি :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকিদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যে কোনো বিষয়ে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের সব নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাঁদের মতামতের ওপর নির্ভর করা। কুরআন ও হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গূঢ় অর্থ নির্ণয়ের অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন ও হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, সে বিষয়কে আকিদার অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

اٰخُذُ بِكِتَابِ اللّٰهِ ـ فَمَا لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذا لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَا فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَظَرْتُ اِلٰى اَقَاوِيْلِ اَصْحَابِهٖ ـ وَلَا اَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ اِلٰى قَوْلِ غَيْرِهِمْ ـ

অর্থাৎ, আমি কুরআনের ওপর নির্ভর করি। কুরআনে যা পাই না, তার জন্য সুন্নাতে রাসূল (স)-এর ওপর নির্ভর করি। যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতে না পাই, তাহলে আমি সাহাবীগণের মতামত ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করি, তাঁদের মতামত ও শিক্ষার বাইরে যাই না।

২. **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের মূলনীতি :** এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা পরিহার করা এবং সাথে সাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা বর্জন করা।

৩. **রিসালাতে বিশ্বাসের মূলনীতি :** এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে কোনো ব্যক্তির ইসমাত, কাদাসাত বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তাঁরা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলোকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য কারামত বা মর্যাদা ও নেয়ামত বলে গণ্য করেন; কিন্তু এগুলোকে আকিদার উৎস হিসেবে বা কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং নেককার লোকদের ভক্তি ও ভালোবাসায় তাঁরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নেককার লোকদেরকে ভালোবাসেন; কিন্তু কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না। তাঁরা সকল মুমিনকে আল্লাহর অলী বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন সুন্নাতের আনুগত্য যত বেশি, সে তত বেশি কামেল অলী বলে বিশ্বাস করেন। তবে কুরআনুল কারীমে বা হাদীস শরীফে যাঁদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে সুনিশ্চিত অলী বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না; বরং তাদের বিষয়ে ভালো ধারণা করেন এবং তাদের জান্নাতের আশা করেন।

৪. **পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি :** ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পাপী মুসলিমের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের সুনিশ্চিত জাহান্নামী বা জান্নাতী বলেননি; বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তিপূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَاِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً اِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا ـ وَلَا نُزِيْلُ عَنْهُ اِسْمَ الْاِيْمَانِ ـ وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ ـ

অর্থাৎ, আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফের বলি না, যদিও তা কবীরা গুনাহ হয়। যতক্ষণ না সে পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিম থেকে 'ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না; বরং আমরা তাকে প্রকৃত মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফের না হয়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে।

৫. **রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ক মূলনীতি :** ইসলামের প্রথম দুটি ফেরকা শিয়া ও খারেজী ফেরকার উদ্ভব ও উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে। বিশেষত খারেজীরা এ বিষয়ে দুটি আকিদার উদ্ভাবন করে। যথা– ১. পাপী ব্যক্তির ইমামতের অবৈধতা ২. পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা। তাদের দাবি ছিল, পাপী ব্যক্তি কাফের, আর কাফের সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সব নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে সাহাবী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে, অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফের বলা যায় না, যতক্ষণ না সে সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে নিপতিত হয়। পাপী শাসক প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমনি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– وَالصَّلٰوةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ

অর্থাৎ, আর সকল নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ।

৬. **ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূলনীতি :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম মূলনীতি হলো ঐক্য ও সংহতি। বিভ্রান্ত দলগুলোর সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আকিদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের অভ্যন্তরীণ মতভেদ সীমিত। আর ব্যাখ্যা ও পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলোর আকিদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুব বেশি।

উপসংহার : কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অকপটে, সর্বান্তঃকরণে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, তার অতিরিক্ত কিছু না বলা এবং সর্বপ্রকার বিতর্ক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিত্যাগের বিষয়ে চার মাযহাবের চার ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং বিশুদ্ধ আকিদার বিশ্লেষণে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٠) : مَنْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ اُذْكُرْ خِصَالَهُمْ وَاُصُوْلَ عَقَائِدِهِمْ-

■ প্রশ্ন : ৮০ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাঁদের স্বভাব ও আকিদার মূলনীতি বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর নানাবিধ অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُغَةً :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আভিধানিক অর্থ :

اَهْل-এর অর্থ : اَهْلٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَهْلُوْنَ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاَقَارِبُ তথা নিকটাত্মীয়।
২. اَلْعَشِيْرَةُ তথা পরিবার পরিজন।
৩. اَلْاَصْحَابُ তথা সাথি।
৪. اَلسُّكَّانُ তথা অধিবাসী।
৫. اَلْمُسْتَحِقُّ তথা অধিকারী।
৬. اَلتَّابِعُ তথা অনুসারী।
৭. اَخَصُّ النَّاس তথা বিশেষ ব্যক্তি।
৮. عُضْوٌ তথা সদস্য।

اَلسُّنَّةُ-এর অর্থ : اَلسُّنَّةُ শব্দটি س - ن - ن মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। سُنَّةٌ একবচন, বহুবচনে سُنَنٌ যেমন মহান আল্লাহর বাণী– قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلطَّرِيْقَةُ তথা পদ্ধতি।
২. اَلسِّيْرَةُ তথা আদর্শ।
৩. اَلْقَانُوْنُ তথা নীতিমালা।
৪. اَلشَّرِيْعَةُ তথা বিধান।
৫. اَلْمَوْرِدُ প্রণেতা বলেন– ক. اَلْخَصْلَةُ তথা স্বভাব, খ. اَلطَّبِيْعَةُ তথা প্রকৃতি।
৬. اَلنَّهْجُ তথা পদ্ধতি।

جَمَاعَة-এর অর্থ : اَلْجَمَاعَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْجَمَاعَاتُ; এটা মূলধাতু ج - م - ع থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلْجَيْشُ তথা সৈন্য দল।
২. اَلْفِئَةُ তথা ছোট দল।

৩. اَلْحِزْبُ তথা দল। ৪. اَلْقَوْمُ তথা সম্প্রদায়।

সুতরাং اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর একত্রে অর্থ– সুন্নাতের অনুসারী দল।

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন–

هِىَ الْجَمَاعَةُ اَلَّتِىْ قَامَتْ عَلٰى طَرِيْقٍ ثَبَتَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهٖ۔

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ اَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ۔

অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا فِى الْعَقِيْدَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ اٰرَاءِ الْفَلَاسِفَةِ۔

অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَلْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَسُنَّةَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন।

মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

خِصَالُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য : আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের خِصَال তথা স্বভাব ১০টি। যথা–

১. **দু'শায়খকে সম্মান করা :** হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে মর্যাদা প্রদান। কারণ এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)। যেমন হাদীসের বাণী–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَنُخَيِّرُ اَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ۔

٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نُفَضِّلُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا۔

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَاشِرُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُوْنَ نَقُوْلُ : أَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَسْكُتُ۔

২. **দু'জামাতাকে সম্মান করা :** দু'জামাতা তথা হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা)-কে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁরা উভয়ে রাসূল (স)-এর জামাতা। আর এজন্যই উভয়ের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ধারণা বা সন্দেহ পোষণ না করা।

৩. **দু'কিবলাকে সম্মান করা :** কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্মান করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ উভয় কিবলার কোনোটির প্রতি কোনো প্রকার অসম্মান প্রদর্শন না করাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

৪. **ফাসেক ও মুত্তাকীর জানাযা আদায় :** মুত্তাকী, ফাসেক সকলের মৃত্যুর পর তাদের জানাযা আদায় করতে হবে। একজন লোক ফাসেক বলে তার মৃত্যুর পর তার জানাযা আদায় না করাটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং মুত্তাকী ও ফাসেক সকলের মৃত্যুর পরই তাদের জানাযা আদায় করতে হবে।

৫. **ফাসেক ও মুত্তাকীর পিছনে সালাত আদায় :** ফাসেক ও সৎ উভয় প্রকার ব্যক্তির ইমামতিতে সালাত আদায় করা যাবে। ফাসেকের পিছনে সালাত আদায় করলে হবে না এ রকম বলা যাবে না; বরং উভয়ের পিছনে সালাত আদায় করলে সালাত হয়ে যাবে।

৬. **ন্যায়পরায়ণ ও ফাসেক শাসকের আনুগত্য করা :** ন্যায়পরায়ণ ও ফাসেক উভয় প্রকারের শাসকেরই আনুগত্য করতে হবে; যতক্ষণ না সে খোদাদ্রোহী কোনো নির্দেশ প্রদান করে। আর সকলকে যার যার স্থানে মর্যাদা দিতে হবে।

৭. **দু'মোজার উপর মাসেহ :** দু'মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানতে হবে। কোনোভাবেই এ নীতিকে অস্বীকার করা যাবে না। এ বিধানের পরিপন্থি হওয়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতিবিরোধী কাজ।

৮. **তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস :** ভালো এবং মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাকদীরের এ বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ফয়সালার বাইরে কোনো কাজ হয় না- এটা যথাযথভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

৯. **সত্যায়ন করা হতে বিরত থাকা :** নবীগণ, আশারায়ে মোবাশশারা এবং যাঁদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাঁরা ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালার ব্যাপারে মন্তব্য করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থি কাজ।

১০. **দু'ফরয আদায় করা :** দু'ফরয তথা সালাত ও যাকাত যথার্থভাবে আদায় করা। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অবহেলার অবকাশ নেই; বরং দুটি বিধানই যথাযথভাবে আদায় করা আবশ্যক।

أُصُوْلُ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি : বাস্তবতার নিরিখে এ কথা সুস্পষ্ট যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা অত্যন্ত মযবুত ও শক্তিশালী এবং কুরআন সুন্নাহভিত্তিক। এ আকিদা কতিপয় মূলনীতি ও বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। যেমন–

১. তাদের আকিদার মূল উৎস হলো আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সালাফে সালেহীনের ইজমা তথা ঐকমত্য।

২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত সবটুকুই মুসলমানের জন্য শরীয়ত ও রাসূল (স)-এর সুন্নাত। এগুলো যথাযথ গ্রহণ করা ওয়াজিব। যদিও তা خَبَر وَاحِد দ্বারা সাব্যস্ত।

৩. কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীন এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের থেকে যে কোনো জ্ঞান দলীলভিত্তিক হতে হবে।

৪. দীনের নীতিবিধান সবটাই নবী করীম (স) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দীনের ব্যাপারে মনগড়া এমন ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ নেই, যা দীনের অংশ।

৫. আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর বিধানের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও কেয়াসে কারো ইচ্ছা, কামনা, ধারণাকৃত কাশফ, কল্পনাকৃত শায়খের কথা, ইমামের কথা এবং অন্যান্য কারো বক্তব্যের মাধ্যমে এতে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা যাবে না।

৬. نَقْل صَحِيْح-এর জন্য عَقْل صَرِيْح অনুকূল। অকাট্য দলীল হিসেবে উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না। আর বৈপরীত্য সৃষ্টি হলে نَقْلِى দলীল عَقْلِى দলীলের ওপর প্রাধান্য পাবে।

৭. আকিদার ক্ষেত্রে শরয়ী শব্দগুলো ব্যবহার করা ও বিদয়াতি পরিভাষাগুলো ত্যাগ করা আবশ্যক।

৮. নবী করীম (স) নিষ্পাপ, এ কথার স্বীকৃতি দেয়া। উম্মতের সকলে ভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে, এ বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকা এবং উম্মতের কেউ কাউকে مَعْصُوْم না বলা। আর মুজতাহিদগণের চিন্তাচেতনার পার্থক্যের কারণে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় বৈপরীত্য হতে পারে, এ কথায় বিশ্বাস করা।

৯. সত্যিকার স্বপ্ন সত্য এবং তা নবুয়তের অংশ। মুমিনদের اَلْفِرَاسَةُ الصَّادِقَة এটা সঠিক এবং কারামত ও সুসংবাদস্বরূপ; তবে তা শরীয়তসম্মত হতে হবে।

১০. দীনে লৌকিকতা ঘৃণিত এবং কল্যাণ ও সত্য উদ্‌ঘাটনে মতপার্থক্য করা বিধিসম্মত। তবে যেসব ব্যাপারে আলোচনা বা সমালোচনার অনুমতি নেই, সেসব ব্যাপারে আলোচনা করা জায়েয নেই।

১১. কোনো মত প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে অহীর পথ আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। বিদয়াতকে বিদয়াত দ্বারা ও কোনো উগ্রতাকে উগ্রতা দ্বারা প্রতিরোধ না করা।

১২. দীনের ক্ষেত্রে সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদয়াত আর প্রত্যেক বিদয়াতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম।

১৩. أَسْمَاءُ اللّٰهِ وَصِفَاتُهُ-এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দৃষ্টান্ত ও আকৃতি ছাড়াই আল্লাহ যা তাঁর নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছেন, তা সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে ঐসব বিষয় অস্বীকার করা, যা আল্লাহ নিজের ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ (স) যা আল্লাহর ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন।

১৪. কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই اَلْغَيْبَاتُ তথা আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের নেয়ামত ও শাস্তি, পুলসিরাত ও মীযানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দলীলভিত্তিক। যাতে কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তারা মযবুত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। অতএব এ দলের পথ ও মত আঁকড়ে ধরা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ اَلسُّؤَالُ (٨١) : عَرِّفِ الْفِرَقَ الضَّالَّةَ مَعَ بَيَانٍ اِجْمَالِيٍّ لِخَصَائِصِ عَقَائِدِهِمْ-

■ প্রশ্ন : ৮১ ॥ বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনাসহ তাদের পরিচয় দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলে বিদয়াত উল্লেখ করেছেন। আর জামায়াতের বিপরীতে রয়েছে تَفَرُّق বা اِفْتِرَاق যার অর্থ বিচ্ছিন্নতা। আর এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপরীত দলকে আহলে বিদয়াত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয়।

اَلْفِرَقُ الضَّالَّةُ وَخَصَائِصُ عَقَائِدِهِمْ :

বিভ্রান্ত ফেরকাসমূহ ও তাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ বলেছেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বিভ্রান্ত ফেরকা বা দলের সংখ্যা ছিল ৪টি। অতঃপর হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এসে প্রসিদ্ধ বিভ্রান্ত দলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮টিতে। দলগুলো হচ্ছে– ১. শিয়া, ২. খারেজী, ৩. কাদারিয়া, ৪. জাবারিয়া, ৫. মুরজিয়া, ৬. মুশাব্বিহা, ৭. জাহমিয়া ও ৮. মুতাযিলা।

এদের অধিকাংশ ফেরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো অনেক নতুন ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। এসব প্রাচীন ফেরকার মধ্যে শিয়া ও খারেজী ফেরকা এখনো বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফেরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকিদা বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়। নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. **শিয়াদের পরিচয় :** ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীরা শিয়া নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নীতি বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَقَالُوْا اِنَّهُ هُوَ الْاِمَامُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) وَاعْتَقَدُوْا اَنَّ الْاِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَمِنْ اَوْلَادِهِ۔

অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা, যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং বলে, রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে যে, ইমামতি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থেকে বের হবে না।

২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَيُقَدِّمُوْنَهُ عَلٰى سَائِرِ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়।

শিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

১. তাদের একটি অংশ হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশের বারো জনের ইমামতে বিশ্বাসী। অপর একটি অংশ সপ্ত ইমামে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম হবেন।

২. তারা বিশ্বাস করে, তাদের ইমাম পাপ ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

৩. তারা মনে করে, ইমামগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলমে লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গায়েবী জ্ঞানপ্রাপ্ত।

৪. তারা اَلْغَيْبَةُ তথা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাসী। যেমন তারা মনে করে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

৫. তারা اَلرَّجْعَةُ তথা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যুগে ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন।

৬. তারা اَلتَّقِيَّةُ তথা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাসী।

৭. তাদের বিশ্বাস হলো, প্রচলিত কুরআন বিকৃত। অবিকৃত মূল কুরআন হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের ইমামগণের নিকট তা গোপন রয়েছে।

৮. বারো ইমামপন্থি শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিন খলিফাসহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ, ধর্মবিচ্যুত ও জালেম ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

৯. তারা اَلْبَرَاءَةُ বা সম্পর্ক ছিন্নতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ এ সকল সাহাবীকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া তাদের ঈমানের অংশ।

১০. তারা সুন্নাত তথা হাদীস অস্বীকার করে। ইমামী শিয়ারা সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করে, তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে গণ্য করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

১১. শিয়ারা একমাত্র আলী (রা)-এর খেলাফত ও পরবর্তী যুগের শিয়াদের রাজত্ব ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতি শাসন বলে বিশ্বাস করে।

২. **খারেজীদের পরিচয় :** আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

فِرْقَةٌ مِّنَ الْفِرَقِ الْاِسْلَامِيَّةِ خَرَجُوْا عَلَى الْاِمَامِ عَلِيٍّ (رض) وَخَالَفُوْا رَأْيَهُ.

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন।

নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

১. তারা মুসলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়।

৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন– اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, সকল হুকুমের মালিক আল্লাহ তায়ালা। এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়।

খারেজীদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

১. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের।

২. ওসমান, আলী, উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মুয়াবিয়া (রা), সিফফীনের যুদ্ধের দুই সালিস : আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখের বিচার ফয়সালাকে সঠিক মনে করলেই কাফের।

৩. জালেম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধ করা ফরয।

৩. **কাদারিয়াদের পরিচয় :** কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী।

তাদের ধারণা, আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান।

কাদারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের কর্মের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের নির্মাতা। তারা মানুষকে শক্তি ও স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহর অপরিসীম শক্তি খর্ব করেন। নিজস্ব চরমপন্থি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এ সম্পর্কে ইমাম জাফর আস সাদেক বলেন, কাদারিয়া সম্প্রদায় মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যা মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে। কারণ মানুষকে যদি তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে বাধ্যবাধকতা ও আইনের শাসনের কোনো মূল্য থাকে না।

৪. **জাবারিয়াদের পরিচয় :** মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–
জাবারিয়া ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা ঘটে এর সবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল।
এ সম্প্রদায়ের মতে, মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয়।
জাবারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। তাদের আকিদা হচ্ছে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি নেই কিংবা কোনো কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতাও নেই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

৫. **মুরজিয়াদের পরিচয় :** মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার উপদেশ দেয়।
মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–
১. তাদের মতে, নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোনো উপকারিতা নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই।
২. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান।
৩. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে; বিবাহের প্রয়োজন নেই।
৪. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৬. **মুশাব্বিহাদের পরিচয় :** মুশাব্বিহা (اَلْمُشَبِّهَةُ) শব্দটি তাশবীহ (اَلتَّشْبِيْهُ) মাসদার থেকে উদ্ভূত। তাশবীহ অর্থ– তুলনা করা, উপমা দেয়া, সমান বানানো, To make equal or similar, To compare ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে 'মুশাব্বিহা' তথা তুলনাকারী ফেরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।
মুশাব্বিহাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের আকিদার মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–
১. তারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে।
২. তারা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে।
৩. তারা মহান আল্লাহর কিছু কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মতো বলে মনে করে।

৭. **জাহমিয়াদের পরিচয় :** জাহমিয়া অর্থ- জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনে সাফওয়ান পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। ইমাম আবু যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এ ফেরকাটির جَبْر (মানুষ

মাজবূর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়।

জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয়; যে গুণ কোনো মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে।

২. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি مَخْلُوْق মনে করে।

৩. তারা মনে করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর। অর্থাৎ কোনো শক্তি, কোনো ইচ্ছা, কোনো ক্ষমতা তার নেই।

৪. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে।

৫. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল– এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়।

৬. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (رُؤْيَة بَارِىْ) হবে না।

৭. তারা মালাকুল মওতকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, রূহ সরাসরি আল্লাহ কবজ করেন।

৮. **মুতাযিলাদের পরিচয় :** مُعْتَزِلَة শব্দটি اِعْتِزَال হতে উদ্‌গত। এর শাব্দিক অর্থ– দলত্যাগী। একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করেছিলেন, কবীরা গুনাহ করলে কোনো লোক মুসলিম থাকবে কিনা? উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, সে কাফের; কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা এ মতটি গ্রহণ করলেন না। তিনি ঐ ব্যক্তিকে কাফের ও মুসলমানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছিলেন। অতঃপর সে শিক্ষকের দলত্যাগ করে মসজিদের কোণায় নিজের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। শিষ্যের এ আচরণে হাসান বসরী বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন– هُوَ اِعْتَزَلَ عَنَّا অর্থাৎ, সে আমাদের দলত্যাগ করেছে। এ মন্তব্য করার পর হতে ওয়াসেল ইবনে আতার দলকে মুতাযিলী দল বলা হয়।

মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা। মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়।

২. মহান আল্লাহকে আখেরাতে দেখা যাবে না।

৩. মহান আল্লাহর কালাম তথা কথা তাঁর অনাদি বিশেষণ নয়; বরং তা তাঁর সৃষ্টবস্তু মাত্র।

৪. তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই এবং মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন; মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে।

৫. পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুসলিমও নয়। আখেরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী।
৬. অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরি ও ফরযে আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।

উপসংহার : আল্লাহ ও রাসূল (স) কর্তৃক যে মধ্যমপন্থা ও সঠিক পথের দিশা দেয়া হয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই তার পূর্ণ অনুসরণ করে বলে এ দলকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর বিভ্রান্ত দলগুলো ও তাদের আকিদা বিশ্বাস অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٢) : عَرِّفِ الْخَوَارِجَ مَعَ بَيَانِ نَشْأَتِهِمْ وَ تَطَوُّرِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ بِشَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيْلِ.

■ **প্রশ্ন : ৮২ ॥ খারেজিদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৯]

او. مَنْ هُمُ الْخَوَارِجُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهَا وَتَطَوُّرَهَا وَاَفْكَارَهَا وَاَسْمَاءَ فُرُوْقِهِمْ مَعَ ذِكْرِ مُؤَسِّسِهِمْ؟

অথবা, খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদ এবং প্রতিষ্ঠাতাদেরসহ তাদের দলগুলোর নাম উল্লেখ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : নবী করীম (স)-এর ওফাতের পর মুসলিমদের মাঝে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম। এ সম্প্রদায় শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদের ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– The Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion and damoratic in politics.

➲ خَوَارِج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْخَوَارِجِ لُغَةً :

خَوَارِج-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْخَوَارِجُ শব্দটি خَارِجٌ-এর বহুবচন, যা اَلْخُرُوْجُ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْمُنْفَصِلُ তথা পৃথক।
২. اَلْخُلُوْصُ তথা মুক্ত হওয়া।
৩. اَلْمُنْقَطِعُ তথা বিচ্ছিন্ন।
৪. خُرُوْجٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ তথা দলত্যাগ করা।
৫. বের হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْخَوَارِجِ اِصْطِلَاحًا :

خَوَارِج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

فِرْقَةٌ مِّنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ خَرَجُوْا عَلَى الْإِمَامِ عَلِيٍّ (رضـ) وَخَالَفُوْا رَأْيَهُ.

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করেছে।

২. اَلْاَدْيَانُ وَالْفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْخَوَارِجُ طَائِفَةٌ مَخْصُوْصَةٌ كَانَ اَوَّلُ خُرُوْجِهِمْ عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْخَلِيْفَةِ الرَّابِعِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ).

৩. اَلْمِلَلُ وَالنِّحَل প্রণেতা বলেন–

اَلْخَوَارِجُ كُلُّ مَا خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ الْحَقِّ الَّذِىْ اِتَّفَقَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَيْهِ ـ

নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

১. তারা মুসলিমদের দলত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়।

৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন– اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, সকল হুকুমের মালিক আল্লাহ তায়ালা। এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দলত্যাগ করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়।

نَشْأَةُ الْخَوَارِجِ :

খারেজীদের উৎপত্তি : ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। এরা শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদের ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– The acceptance of the principle of arbitration proved disastrous to Ali in more than one way; it alienated the sympathy of a large body of his own followers. These kharijites as they were called, the earliest sect of Islam.

تَطَوُّرُ الْخَوَارِجِ :

খারেজীদের ক্রমবিকাশ :

১. **আবু যর গিফারীর নির্বাসন :** হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে ক্ষুদ্র মতানৈক্যের কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর স্বেচ্ছানির্বাসন ও নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুনাফিক গোষ্ঠী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত ওসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন জোরদার করে। পরবর্তীতে এদের অনুসারীদের হাতে হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন। মুনাফিকদের এ সম্প্রদায়টিই পরবর্তীতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করে। মূলত ব্যাপারটি ছিল আবু যর গিফারী (রা)-কে ঘিরে মুনাফিকদের একটা ষড়যন্ত্র।

২. **হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ :** ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে সিফফীনে সংঘটিত যুদ্ধের পর দুমাতুল জান্দালে আপস মীমাংসার জন্য সালিসের ব্যবস্থা করা হলে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষীয় কতিপয় লোক তা মেনে নিতে পারেনি। এমতাবস্থায় তারা ১২০০০ সৈন্য হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। পরে কৌশলগত সুবিধা বিবেচনা করে সেখান থেকে সরে গিয়ে নাহরাওয়ানে ঘাঁটি স্থাপন করে।

৩. **হযরত আলী কর্তৃক নাহরাওয়ান অভিযান :** হযরত আলী (রা) খারেজীদের বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য নাহরাওয়ান অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে খারেজীদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বহু অনুচরসহ নিহত হয়।

৪. **হযরত আলীর শাহাদাতবরণ :** নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও খারেজীরা সামাজিকভাবে খুজিস্তান, ফারস, কিরমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। এ সময় খারেজীদের হাতে হযরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

৫. **খারেজীদের পতন :** খারেজী সম্প্রদায় ছিল সর্ববিষয়ে চরমপন্থি। আব্বাসী খেলাফতকালে তারা চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। আব্বাসী খলিফাগণ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা কার্যত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আফ্রিকায় গমন করে। মিসরের ফাতেমীয়দের শাসনামলে তারা একেবারে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তারা এ দল ত্যাগ করাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করত এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সঠিক পথে আছে বলে মনে করত। নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে তারা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিত–

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৩ اَفْكَارُ الْخَوَارِجِ :

খারেজীদের মতবাদ : খারেজীরা বহু দল উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রত্যেক দল উপদলের নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদের মতবাদগুলো নিম্নরূপ–

ক. ধর্মীয় মতবাদ :

১. **নিয়মিত ইসলামী অনুশাসন পালন ঈমানের শর্ত :** খারেজীদের মতে, যে মুসলিম নিয়মিত সালাত, রোযা ও অন্যান্য বুনিয়াদি কর্তব্য পালন করে না, সে কাফের এবং তার পরিবারবর্গসহ তাকে হত্যা করা কর্তব্য।

২. **কবীরা গুনাহকারী জাহান্নামী :** কোনো মুসলিম পাপ করার পর তওবা না করে মারা গেলে তাকে অবশ্যই চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের দলীল হলো– لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

৩. **তওবা কবুলের আশা :** মৃত্যুর পূর্বে কেউ তওবা করলে তা কবুলের আশা করা যায়। পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ভোগের পর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মুক্তি দিতে পারেন।

৪. **ইসলাম থেকে খারিজ :** একটিমাত্র অন্যায়ের কারণে কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে। সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগের ওপরই প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস নির্ভর করে।

৫. **সাম্প্রদায়িক মনোভাব :** যেসব মুসলিম খারেজীদের মত সমর্থন করে না, তারা নাস্তিক এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য।

৬. **বিবেকের পবিত্রতা :** ঈমান ও কর্মের ন্যায় খারেজীরা বিবেকের পবিত্রতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাদের মতে, বিবেকের পবিত্রতা মানুষকে মহৎ কার্যে প্রেরণা দেয়।

৭. **কুরআনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ :** খারেজীদের আরজাকিয়া উপদল কুরআনের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ এবং ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে।

৮. **অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ :** খারেজীরা অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করে। তাদের মতে যদি কোনো অমুসলিম হযরত মুহাম্মাদ

(স)-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে, তবে তাকে মুসলিমদের সমান অধিকার দেয়া যাবে।

৯. **অনারব মুসলিম ও যিম্মীদের প্রতি উদারনীতি :** খারেজীরা মাওয়ালী তথা অনারব মুসলিম ও যিম্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাদের অন্যান্য মুসলিমদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১০. **ধর্মের অনুশাসন :** তারা যদিও বিশটি দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল, তথাপি তারা ধর্মকে কোনো প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

১১. **ইসলাম ও ঈমান :** খারেজীদের মতে, ইসলাম ও ঈমান এক এবং অবিভাজ্য। আর খাঁটি ব্যক্তিই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

১২. **পার্থিব বিলাসিতা :** খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, মুসলিমদের জন্য পার্থিব বিলাসিতা হারাম।

১৩. **মৃত শিশুদের পরকাল :** মৃত শিশুদের ব্যাপারে খারেজীদের আকিদা হচ্ছে, বিধর্মীদের মৃত শিশুরা দোযখে আর মুসলিমদের মৃত শিশুরা বেহেশতে যাবে।

১৪. **সূরা ইউসুফ পরিত্যাগ :** সূরা ইউসুফে প্রেমকাহিনী স্থান লাভ করায় তারা এ সূরা পরিত্যাগ করে। তাদের দাবি হচ্ছে, সূরা ইউসুফ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হলে এ ধরনের প্রেমকাহিনী তাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না।

১৫. **কুরআন হাদীসের প্রতি আনুগত্য :** খারেজীরা কুরআন হাদীসের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করত। তারা একমাত্র কুরআন হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এ থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতিও তারা সহ্য করত না। এজন্য খারেজী সম্প্রদায় ইসলামে বিশুদ্ধবাদী বলে পরিচিত।

১৬. **বিত্তবৈভব বর্জন :** খারেজী সম্প্রদায় বিত্তবৈভব অর্জনে নিরুৎসাহিত করে।

খ. রাজনৈতিক মতবাদ :

১. **গণতন্ত্রপন্থি :** খলিফা নির্বাচনে খারেজীরা চরম গণতন্ত্রপন্থি। তাদের মতে, খলিফাকে সমগ্র মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

২. **খলিফার যোগ্যতা :** তাদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য কোনো গোত্র বা পরিবার নির্ধারিত নেই। মুসলিম সমাজের যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিই খলিফা হতে পারেন। এমনকি নির্বাচিত খলিফা নারী অথবা ক্রীতদাস হলেও তাতে কিছু যায় আসে না।

৩. **জনসমর্থিত ও আস্থাভাজন :** খলিফা যতক্ষণ জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, ততক্ষণই তিনি খলিফা পদে বহাল থাকবেন। তিনি যদি জনগণের কোনো অকল্যাণ করেন অথবা ইসলামের মূলনীতির বিরোধিতা করেন, তাহলে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে, এমনকি হত্যাও করা যেতে পারে।

৪. **খলিফা নিষ্প্রয়োজন :** একদল চরমপন্থি খারেজীর মতে, মুসলিমদের কোনো খলিফা বা ইমাম নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাতই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট।

৫. **প্রথম দু'খলিফার স্বীকৃতি :** চার খলিফার মধ্যে খারেজীরা মাত্র হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে খলিফা বলে স্বীকার করে। তাদের মতে, হযরত ওসমান ও আলী (রা)-এর খেলাফত স্বীকার করা যায় না। কারণ তাঁরা সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থাভাজন ছিলেন না।

৬. **জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী :** খারেজীরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, ইসলামের গণতান্ত্রিক আদল ধ্বংসকারী বলে মনে করত। ঐতিহাসিক খোদা বখশ বলেন, খারেজীরা ছিল ধর্মে গোঁড়া এবং রাজনীতিতে গণতন্ত্রপন্থি।

৭. **অনারবদের আরবজাতির ওপর প্রাধান্য দান :** তারা আরব আভিজাত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে অনারবদের আরবদের ওপর স্থান দিত। কেননা তারা আরবজাতিকে হিংসার চোখে দেখত।

৮. **অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ :** কোনো খলিফা যদি পুরোপুরিভাবে জনগণের উন্নতি সাধন করতে না পারেন, তবে অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ করে যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা পদে নির্বাচিত করতে হবে।

৯. **আইনের বিধান :** لَا حُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম নেই– এটা খারেজীদের অন্যতম রাজনৈতিক মতবাদ।

১০. **অপসারণ নীতি :** খলিফা যতদিন জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, ততদিনই তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। জনস্বার্থবিরোধী বা ইসলামপরিপন্থি কোনো কাজ করলে তাঁকে অপসারিত করে যোগ্যতর ব্যক্তিকে খলিফা পদে বসাতে হবে।

১১. **রাজতন্ত্রবিরোধী :** খারেজী সম্প্রদায় চরম রাজতন্ত্রবিরোধী। তাই তারা উমাইয়া শাসক কর্তৃক বার বার নির্যাতিত হয় এবং আব্বাসীয়দের সাথে মিলে উমাইয়াদের পতন ঘটায়।

أَسْمَاءُ فِرَقِ الْخَوَارِجِ وَمُؤَسِّسِهِمْ :

খারেজীদের বিভিন্ন দল ও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম : আকিদার কিতাবগুলো প্রমাণ করে, খারেজীদের মধ্যে বিভিন্ন ছোট খাট দল রয়েছে। তাদের সংখ্যা ২০-এর ওপরে হলেও ৮টি দল প্রসিদ্ধ। তাদের নাম ও প্রতিষ্ঠাতাদের নাম নিম্নরূপ–

দলের নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম
১. اَلْأَزَارِقَة (আল ইযারাকা)	নাফে ইবনে আযরাক
২. اَلْبَيْهَسِيَّة (আল বাইহাসিয়্যা)	আবু বায়হাস আল হাইসাম ইবনে জাবের
৩. اَلْإِبَاضِيَّة (আল ইবাযিয়্যা)	আবদুল্লাহ ইবনে আবায আল মারিয়্যা
৪. اَلثَّعَالَبَة (আস সায়ালাবা)	সায়ালাব ইবনে আমের
৫. اَلْعَجَارِدَة (আল আজারিদা)	আবদুল করিম
৬. اَلْمُحَكِّمَةُ الْأُوْلٰى (প্রথম আদালত)	এতাব ও আবদুল্লাহ ওহাব
৭. اَلنَّجْدَات (আন নাজদাত)	নাজদাহ ইবনে আতিয়্যা ইবনে আমের আল হানাফী
৮. اَلصَّفْرِيَّة (আস সাফরিয়া)	যিয়াদ ইবনুল আসফার

উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি। তাই এ মতাদর্শ বর্জন করা ঈমানের দাবি।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٣) : عَرِّفِ الشِّيْعَةَ مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ وَاُصُوْلِ عَقَائِدِهِمْ۔

■ প্রশ্ন : ৮৩ ॥ শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহ আলোকপাত কর। [ফা. প. ২০১৮]

او۔ عَرِّفِ الْفِرْقَةَ "الشِّيْعَةَ" ۔ ثُمَّ تَحَدَّثْ عَنْ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ۔

অথবা, শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদা সম্পর্কে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

او۔ عَرِّفِ الشِّيْعَةَ ۔ ثُمَّ اذْكُرْ تَارِيْخَ الشِّيْعَةِ وَاُصُوْلَهَا بِالتَّفْصِيْلِ۔

অথবা, শিয়ার সংজ্ঞা দাও। শিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মৌলিক বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

او۔ مَنْ هُمُ الشِّيْعَةُ؟ اُذْكُرْ اٰرَاءَ هٰذِهِ الْفِرْقَةِ بِالتَّفْصِيْلِ۔

অথবা, শিয়া কারা? এ সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয়। শিয়া সম্প্রদায় এ দলগুলোর অন্যতম। এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় উৎপত্তির ইতিহাস ও এদের আকিদার মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো।

⊃ شِيْعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّيْعَةِ لُغَةً :

شِيْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشِّيْعَةُ শব্দটি اَلشَّيْعُ থেকে গৃহীত। শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَشْيَاعٌ ,شِيَعٌ; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন– اَلْاَتْبَاعُ তথা অনুসারী, اَلْاَنْصَارُ তথা সাহায্যকারী।
২. লুগাতুল ফোকাহা প্রণেতা বলেন– اَلْمُطَاوَعَةُ তথা অনুগত, اَلْمُتَابَعَةُ তথা অনুগামী, اَلْفِرْقَةُ তথা দল, اَلْاَحْزَابُ তথা গোষ্ঠী।
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْفِرْقَةُ তথা দল, اَلْجَمَاعَةُ তথা সমষ্টি, اَلْاَتْبَاعُ তথা অনুগত, اَلْاَنْصَارُ তথা সাহায্যকারী, اَلْاَمْثَالُ তথা অনুরূপ, اَلْاَشْيَاعُ তথা সদৃশ।

مَعْنَى الشِّيْعَةِ اِصْطِلَاحًا :

شِيْعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীরা শিয়া নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নীতি বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَقَالُوْا اِنَّهُ هُوَ الْاِمَامُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَاعْتَقَدُوْا اَنَّ الْاِمَامَةَ لاَ تَخْرُجُ مِنْهُ وَمِنْ اَوْلاَدِهِ-

অর্থাৎ, শিয়া হলো যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং তারা বলে, রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে, ইমামতি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের বাইরে যাবে না।

২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন– اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَيُقَدِّمُوْنَهُ عَلٰى سَائِرِ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়।

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

هِيَ فِرْقَةٌ كَبِيْرَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى حُبِّ عَلِيٍّ وَالِهِ وَحَقِّيَّتِهِمْ بِالْاِمَامَةِ-

অর্থাৎ, শিয়া হচ্ছে মুসলিমদের একটি বড় দল, যারা হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরদের ভালোবাসা এবং ইমামতির দায়িত্বে তাদের অধিকার সম্পর্কে একমত হয়েছে।

৪. আল মিলাল ওয়ান নাহাল গ্রন্থকার বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا عَلَى الْخُصُوْصِ وقَالُوْا بِاِمَامَتِهِ وَخِلاَفَتِهِ نَصًّا وَوَصِيَّةً اِمَّا جَلِيًّا وَاِمَّا خَفِيًّا وَاعْتَقَدُوْا اَنَّ الاِمَامَةَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ اَوْلاَدِهِ-

৫. আল আদয়ান ওয়াল ফিরাক প্রণেতা বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ نَصَرُوْا عَلِيًّا وَاعْتَقَدُوْا بِاِمَامَتِهِ نَصًّا وَاَنَّ خِلاَفَتَهُ قَبْلَهُ كَانَتْ ظُلْمًا لَهُ-

৬. ইবনে হাযেম (র) বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ عَلِيًّا اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ وَمَنْ بَعْدَهُ-

تَارِيْخُ نَشْأَةِ الشِّيْعَةِ :

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস : হঠাৎ করেই শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেনি। তাদের উদ্ভবের পিছনে কতকগুলো ঘটনা বিদ্যমান। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **খলিফা নির্বাচনে অসন্তোষ :** হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। তাদের দাবি, নবীর অবর্তমানে হযরত আলী ও ফাতেমী বংশের লোকেরাই খেলাফতের যোগ্য। হযরত আবু বকর (রা) তার এ অধিকার হরণ করেছিলেন।

২. **ওসমানের শাহাদাত :** হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে আগের তুলনায় তারা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মান্তরিত ইহুদি ইবনে সাবা তাদের সাথে যোগ

দিয়ে ওসমানবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে। এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

৩. **আলী ও মুয়াবিয়ার বিরোধ :** ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত হলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বিরোধ বাঁধে। অতঃপর সিফফীনের যুদ্ধের বিরতির পর দুমাতুল জান্দালের সালিসী বৈঠকে হযরত আলী (রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় এবং পরবর্তীতে খারেজীদের হাতে তাঁর হত্যাকাণ্ড শিয়া আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে।

৪. **গণতন্ত্র বিলোপ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :** শিয়াদের উৎপত্তির পেছনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করার বিষয়টাও প্রবলভাবে দায়ী। মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করায় শিয়ারা ক্ষেপে ওঠে।

৫. **কারবালার হত্যাকাণ্ড :** হযরত আলী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত হাসান (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খেলাফতের দাবি পরিত্যাগ করেন। তবে শর্ত থাকে, মুয়াবিয়া (রা)-এর পর তিনিই মুসলিম জাহানের খলিফা হবেন; কিন্তু হযরত হাসান (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আগেই ইন্তেকাল করেন। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযিদের নাম খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করেন। ফলে ইয়াযিদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। আর খেলাফতের দাবি ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-এর ছোট ভাই হযরত হোসাইন (রা)-এর সাথে ইয়াযিদের চরম বিরোধ বাঁধে। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াযিদ বাহিনী কারবালা প্রান্তরে হযরত হোসাইনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কারবালার এ হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড শিয়াদের প্রতিহিংসার আগুন আরো প্রজ্বলিত করে তোলে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির ভাষায়– The blood of Al-Husain, even more than that of his father, proved to be the seed of the shiison it 'Church'; Shii'sm was born on the tenth of Muharram.

৬. **শিয়াদের সহিংস আন্দোলন :** কারবালার বিষাদময় হত্যাযজ্ঞের পর শিয়ারা প্রকাশ্যভাবে হযরত আলীর পরিবারের পক্ষে সহিংস আন্দোলনের সূচনা করে। এ সময় 'মুখতার' নামক জনৈক শিয়া নেতা হযরত হোসাইনের হত্যাকারী কুফার প্রাদেশিক গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হত্যা করে কারবালার হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

৭. **শিয়াদের ব্যাপক প্রসার লাভ :** প্রথম দিকে কেবল আরবরাই ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পরবর্তীতে আরবের বাইরেও এ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।

৮. **শিয়াদের বিভেদ :** ইমামত প্রশ্নে শিয়াদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। তাদের কেউ কেউ হযরত হোসাইনের পুত্র যয়নুল আবেদীনকে আবার কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে শিয়ারা ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৯. **শিয়াদের উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন :** কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শিয়ারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আব্বাসীয়রা তাদের সাথে যোগ দিয়ে উমাইয়াদের পতন ঘটায়।

১০. **আব্বাসীয়দের দমন নিপীড়ন :** শিয়াদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসলেও খলিফা মামুন ব্যতীত অন্য সব আব্বাসী খলিফা তাদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও দমন নিপীড়ন পরিচালনা করে। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

১১. **শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :** আব্বাসীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু সংখ্যক শিয়া উত্তর আফ্রিকায় চলে যায়। তথায় তারা হাসানের বংশীয় ইদ্রিসের নেতৃত্বে 'তানজিয়া' নামক স্থানে একটি শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

১২. **বর্তমানে শিয়াদের অবস্থান :** বর্তমানে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অনুসারী রয়েছে। তবে ইরানে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

أُصُوْلُ عَقَائِدِ الشِّيْعَةِ :

শিয়াদের আকিদার মূলনীতি : শিয়াদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ায় তাদের আকিদার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। আর তাদের এ সকল আকিদাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো আকিদা নিম্নরূপ–

ক. عَقَائِدُ الْإِمَامَةِ তথা ইমাম নির্বাচনের আকিদা।

খ. عَقَائِدُ فِيْ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের ব্যাপারে আকিদা।

গ. عَقَائِدُ فِيْ تَحْرِيْفِ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনে আকিদা।

ক. ইমামদের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা :

১. ইমাম নির্বাচনে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, ইমামগণ নবীদের ন্যায় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাদের বিশ্বাসে ইমামদের সংখ্যা ১২ জন। যথা–

ক. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা), খ. হযরত হাসান (রা), গ. হযরত হোসাইন (রা), ঘ. হযরত আলী ইবনে হোসাইন, যিনি যাইনুল আবেদীন নামে পরিচিত, ঙ. তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি ইমাম বাকের নামে পরিচিত, চ. তদীয় পুত্র হযরত জাফর সাদেক, ছ. তদীয় পুত্র হযরত মুসা আল কাযেম, জ. হযরত আলী রেজা, ঝ. তদীয় পুত্র হযরত মুহাম্মাদ তাকী, ঞ. তদীয় পুত্র হযরত আলী তাকী, ট. তদীয় পুত্র হোসাইন আসকারী, ঠ. তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী।

২. ইমামগণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে না; বরং ইমামরা যমীন থেকে বের হয়।

৩. ইমামগণ عِلْمُ الْغَيْبِ জানেন। যেমন ইমামদের কথা–

نَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَانَ وَلَمْ يَكُنْ وَاِنَّهٗ لَا يَخْفٰى عَلَيْنَا شَيْئًا.

৪. ইমামদের কথা কুরআনে রয়েছে। যেমন– اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ এখানে اَمَانَة দ্বারা দীন ও শরীয়ত বোঝানো হয়েছে, যা শিয়াদের রয়েছে।

৫. ইমামদের মর্যাদা মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদার ন্যায়, যা অতীতের সকল নবীদের উর্ধ্বে।

৬. ইমামদের নিকট অহী আসে, যেভাবে নবীদের নিকট অহী এসেছে।

৭. ইমামগণ বৃহস্পতি এবং জুমাবার রাতে মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আসতে পারেন।

৮. ইমামগণ নবীদের ন্যায় গুনাহমুক্ত বা মাসুম।

৯. ইমামদের আনুগত্য করা ফরয এবং জান্নাতে প্রবেশের পূর্বশর্ত।

১০. ইমামগণ জাহান্নামবাসীদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার রাখেন।

১১. ইমামগণ বান্দাদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামে পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন।

১২. ইমামত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য যে কোনো ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য।

১৩. প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর খলিফা নির্বাচন অবৈধ ছিল।

১৪. ইমাম মাহদী আগমন করে পৃথিবীতে বিদ্যমান জুলুম, ব্যভিচার, অত্যাচার নির্মূল করে ইসলাম ও ইনসাফ কায়েম করবেন।

১৫. পবিত্র কুরআনুল কারীম নিরন্তর গ্রন্থ নয়।

১৬. কুরআনুল কারীম ছাড়া হাদীস, ইজমা, কেয়াস শরীয়তের দলীল নয়।

১৭. জুমার সালাত একাকি আদায় করা যায়।

১৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের স্থানে তিন ওয়াক্ত পড়লেই চলবে।

১৯. ধর্ম প্রচার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা গোপনীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী।

২০. ইমাম হোসাইনের স্মৃতি রক্ষার্থে ১০ মহররম পর্ব পালন।

২১. নেকাহে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ।

২২. কেয়ামত দিবসে সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং ভালো কাজের জন্য জান্নাত এবং খারাপ কাজের জন্য জাহান্নাম লাভ করবে।

খ. রাসূল (স)-এর সাথিদের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা : সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) কাফের "নাউযুবিল্লাহ"।

দলীল : তাদের দলীল কুরআনের বাণী–

١۔اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا ۔

আলোচ্য আয়াতে তিনবার كُفْرًا শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। অপর দলীল–

٢۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۔

আলোচ্য আয়াতে زَيَّنَهُ-এর ه সর্বনাম দ্বারা হযরত আলী (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। আর كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ আয়াতাংশে اَلْكُفْرَ দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-সহ সকল সাহাবীকে বোঝানো হয়েছে। তারা আরো বলে, নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে যে চারজন সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তারা ব্যতীত সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে গেছে।

গ. **কুরআন মাজীদ পরিবর্তনে শিয়াদের আকিদা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা নিম্নরূপ–

১. হযরত মুসা (আ)-এর জাতি তাওরাত পরিবর্তন করেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর জাতি ইঞ্জিল পরিবর্তন করেছে, অনুরূপ নবী করীম (স)-এর সাহাবীরা কুরআন মাজীদকে পরিবর্তন করেছে।

২. কুরআনুল কারীমে سُوْرَةُ الْوَلَايَةِ নামক একটি সূরাতে হযরত আলী (রা)-এর ইমামতের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল; কিন্তু এ সূরাটিকে সুন্নীরা বাদ দিয়েছে যা তাদের কুরআনে রয়েছে।

৩. কুরআন সম্পর্কে তাদের আরেকটি আকিদা হলো, কুরআন মোট ৯০ পারা ৩০ পারা নবীর কাছে গোপন ছিল; ৩০ পারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর ৩০ পারা আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে ইমামদেরকে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করেন।

৪. سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ এটা অনেক বড় সূরা ছিল। যার মধ্যে কুরাইশদের ৭০ জন ব্যক্তির বংশধারা উল্লেখ ছিল; কিন্তু তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

উপসংহার : শিয়া সম্প্রদায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে তা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে রূপান্তরিত হয়। তবে এরা সবাই হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٤) : مَنْ هُمُ الْجَبَرِيَّةُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهُمْ وَتَطَوُّرَهُمْ- ثُمَّ اكْتُبْ عَقِيْدَتَهُمُ الْاَصْلِيَّةَ مَعَ بَيَانِ طَبَقَاتِهِمْ-

■ প্রশ্ন : ৮৪ ॥ জাবারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর। তাদের মৌলিক আকিদা ও শ্রেণিবিন্যাস লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : Islam is the name of a total way of life. জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, কিন্তু এমন উদার নৈতিক ভাবধারা সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধ বিভেদমুক্ত থাকতে পারেনি। কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবারিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। কুরআনের পরস্পরবিরোধপূর্ণ আয়াতের বিতর্কমূলক আলোচনা পর্যালোচনাই এ সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য।

جَبْرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْجَبْرِيَّةِ لُغَةً :

جَبْرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : جَبْرِيَّةٌ শব্দটির جِيْم ও بَاء বর্ণদ্বয়ে যের হলে এর অর্থ হবে- اَلتَّكَبُّر তথা অহংকার।

جَبْرِيَّةٌ শব্দটিকে اَلْجَبْرُ-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। এর অর্থ- اَلْاِلْزَامُ তথা আবশ্যক করা, বাধ্যবাধকতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ।

مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاء গ্রন্থপ্রণেতা বলেন-

(١) جَبَرَ اَىْ اِنْجَبَرَ وَصَلَحَ

অর্থাৎ, বাধ্য হলো ও সংশোধন হলো। (٢) جَبَرَهُ عَلَى الْاَمْرِ اَىْ اَكْرَهَهُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, কোনো কাজে জবরদস্তি করল তথা সেটা করতে বাধ্য করল।

مَعْنَى الْجَبْرِيَّةِ اِصْطِلَاحًا :

جَبْرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন-

اَلْجَبْرِيَّةُ مَذْهَبُ مَنْ يَرٰى اَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ لِلْاِنْسَانِ قَدْ قُدِّرَ عَلَيْهِ اَزَلًا فَهُوَ مَسِيْرٌ لَا مُخَيَّرٌ وَتُطْلَقُ عَلٰى مُعْتَنِقِىْ هٰذَا الْمَذْهَبِ.

অর্থাৎ, জাবারিয়া ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা ঘটে এ সবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল। যে এর দিকে ধাবিত হবে তার কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। আর যারা এ মত অনুসরণ করে তাদেরকেই জাবারিয়া বলা হয়।

২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রণেতা বলেন-

اَلْجَبْرُ هُوَ نَفْىُ الْعَقْلِ حَقِيْقَةً عَنِ الْعَبْدِ وَاِضَافَتُهُ اِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى.

অর্থাৎ, জাবারিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা বান্দার আমলকে অস্বীকার করে এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে।

৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন-

اَلْجَبْرُ اِسْنَادُ فِعْلِ الْعَبْدِ اِلَى اللّٰهِ الْقَاهِرِ يَخْلُقُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْىٍ-

৪. আল্লামা আবুল হাশেম (র) বলেন-

اَلْجَبْرِيَّةُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اَجْبَرَ اللّٰهُ الْعِبَادَ عَلَى الذُّنُوْبِ وَمَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يُكْرِهَ اَحَدًا عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ.

মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

نَشْأَةُ فِرْقَةِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন তা-ই মানুষ করে। তারা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথে এক গোঁড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, আল্লাহর কাছে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়, অক্ষম। তার কোনো কর্মের স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

❍ تَطَوُّرُ فِرْقَةِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : এ মতবাদ হযরত আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় স্তিমিত থাকলেও হযরত ওসমান (রা) ও আলী (রা)-এর শাসনামলে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উমাইয়া খেলাফত আমলে এ মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ সময়ে জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদের ব্যাপারে একই মতাবলম্বী থাকলেও ছোটখাট ব্যাপারে তারা জাহমিয়া, নাযরিয়া ও জাবারিয়া এ তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইবনে সাফওয়ান বলেন– Man does not really out, it is only meat photically that he is said out in the same way the seles hinem in raid to sheinem and the will wheel to turn.

❍ أُصُوْلُ عَقِيْدَةِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবারিয়াদের মৌলিক আকিদা : ১. তাদের মতে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি কিংবা স্বাধীনতা নেই।

২. মানুষ সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন, মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন।

৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

দলীল : জাবারিয়ারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে। যেমন–

١- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

٢- قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ- اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ, (হে রাসূল স.!) বলুন, হে প্রভু! তুমিই রাজত্বের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও; তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, তোমার হাতেই সব কল্যাণ; নিঃসন্দেহে তুমি সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।

٣- وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا-

অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এদের তাকদীর বা পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৪. يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন।

উপরিউক্ত আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াতকে পুঁজি করে জাবারিয়া মতবাদ গড়ে ওঠে।

জাবারিয়া মতবাদ সম্পর্কে সুন্নী মাযহাবের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, জাবারিয়া সম্প্রদায়ও অন্যান্য বাতিল ফেরকার মতো ভ্রান্ত চিন্তাধারার অধিকারী। কারণ তারা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির স্বীকৃতি সংক্রান্ত আয়াতের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করে না। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী– اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) অশেষ দয়াময়, তিনি (মানুষকে) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করে তিনি তাকে বয়ান তথা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন।

অন্যত্র বলেছেন– وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ, আদম (আ)-কে তিনি (আল্লাহ) সর্ব বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। এ পরম সত্য উপেক্ষা করে জাবরিয়া সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণ অক্ষম গণ্য করে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

⊃ طَبَقَاتُ فِرْقَةِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবারিয়া মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস : শাহরেস্তানী জাবারিয়া সম্প্রদায়কে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা–

১. **গোঁড়া জাবারিয়া :** এ দলের মতবাদ হলো, কোনো অর্থেই মানুষ কাজ করে না অথবা মানুষের কাজের শক্তি আছে বলা যায় না।
২. **মধ্যপন্থি জাবারিয়া :** এ দলের মতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি মানুষের কার্যের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

জাবারিয়াদের উপদল : শাহরেস্তানী জাবারিয়াদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. জাহমিয়া, ২. নাযারিয়া, ৩. জাবারিয়া। এ উপদলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাদের কোনো মতানৈক্য ছিল না। তারা সবাই অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল।

উপসংহার : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেগুলো অস্বীকার করে স্বেচ্ছচারী জীবনযাপনে লিপ্ত হয়। তাই জাবারিয়ারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

■ اَلسُّؤَالُ (৮৫) : مَنْ هُمُ الْقَدَرِيَّةُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهُمْ وَتَطَوُّرَهُمْ وَ نَظَرِيَّاتِهِمْ بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ প্রশ্ন : ৮৫ ॥ কাদারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে ধর্মতত্ত্বভিত্তিক যেসব দলের উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কাদারিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। কাদারিয়া সম্প্রদায় জাবারিয়া সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ির ফসল। বিখ্যাত ইমাম হাসান আল বসরী এ আন্দোলনের বীজ বপন করেন। আর তদীয় শিষ্য মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মানুষের ইচ্ছার যথেচ্ছা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নিম্নে প্রশ্নালোকে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়, তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মতবাদসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

⊃ قَدَرِيَّةٌ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدَرِيَّةِ لُغَةً :

قَدَرِيَّةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْقَدَرِيَّةُ শব্দটিকে قَاف বর্ণে যবর যোগে قَدْرٌ হতে উৎকলিত; যার অর্থ শক্তি, ক্ষমতা, ভাগ্য, পরিমাণ ও সামর্থ্য ইত্যাদি।

১. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْقَدَرِيَّةُ نِسْبَةُ الْقَدْرِ وَهُمْ جَاحِدُوا الْقَدْرَ۔

অর্থাৎ, قَدَرِيَّةٌ শব্দটি قَدْرٌ-এর সাথে সম্পর্কিত, যারা কদরকে অস্বীকার করে।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন– اَلْقَدَرِيَّةُ ضِدُّ الْجَبْرِيَّةِ

مَعْنَى الْقَدَرِيَّةِ اِصْطِلَاحًا :

قَدَرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. قَوَاعِدُ الْفِقْه গ্রন্থকার বলেন–

اَلْقَدَرِيَّةُ هُمْ قَوْمٌ يَجْحَدُوْنَ الْقَدْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ كُلَّ عَبْدٍ خَالِقٌ لِفِعْلِهِ وَلَا يَرَوْنَ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ لِتَقْدِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

অর্থাৎ, قَدَرِيَّة হলো এমন সম্প্রদায় যারা قَدْر-কে অস্বীকার করে এবং বলে যে, প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। তারা আরো বলে যে, বান্দার কুফরী ও অবাধ্যতা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

اَلْقَدَرِيَّةُ قَوْمٌ يُنْكِرُوْنَ الْقَدْرَ، وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ خَالِقٌ لِفِعْلِهِ۔

অর্থাৎ, কাদারিয়া এমন সম্প্রদায় যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা।

মোটকথা, কাদারিয়া মতাবলম্বী হলো তারা যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী।

⊃ نَشْأَةُ الْقَدَرِيَّةِ وَ تَطَوُّرُهُمْ :

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। ফলে খলিফা আবদুল মালেক তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফার অনুগতরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কাদারিয়া মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়াদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা উমাইয়া শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়া চিন্তাবিদ ইউনুস আসওয়ারী ও গাইলান দামেশকী কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। একপর্যায়ে ৭২৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হিশামের নির্দেশে গাইলান দামেশকীকেও হত্যা করা হয়; কিন্তু মানুষের চিন্তার বিপ্লবী পরিবর্তন কোনো কালেই অস্ত্রবলে দমিত হয়নি। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

⊃ نَظْرِيَاتُ الْقَدَرِيَّةِ :

কাদারিয়াদের মতবাদসমূহ : কাদারিয়া সম্প্রদায় বেশকিছু মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতবাদসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. **মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী :** কাদারিয়া চিন্তাবিদদের মতে, মানুষ এক ঐচ্ছিক সত্তা, তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারো দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়; বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ন্তা এবং তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কোনো মানুষের কর্ম তৈরি করে দেন না, তবে তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেন।

খ. **কাদারিয়াদের আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কিত বক্তব্য :** আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ পাপকার্য থেকে পবিত্র– এ বক্তব্য ঘোষণা করে কাদারিয়া সম্প্রদায় মানুষের নৈতিকতাবোধের প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বারোপ করে। কাদারিয়াদের মতে, মানুষ স্বয়ং তার কর্মের কর্তা। সুতরাং সে যদি ভালো কাজ করে তবে পুরস্কার পাবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে। মানুষ তার

নিজ কর্মের নিয়ন্তা, তার ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। যে কোনো মানুষ তার ইচ্ছামতো ভালো কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে। আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষের মধ্যে কার্য উৎপন্ন করেন না; তিনি মানুষকে কর্মক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং এ অর্থে তিনি সর্বশক্তিমান। যদি সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীনে সম্পন্ন হয়, তাহলে মানুষকে তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী করা যায় না।

গ. কাদারিয়া মতবাদের ভিত্তি : কাদারিয়া সম্প্রদায় তাদের মতবাদের সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করে–

١. وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পাপ করে তার নিজের দায়িত্বেই করে থাকে।

٢. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়।

٣. وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ.

অর্থাৎ, যে সমস্ত মুসিবত তোমাদের ওপর আপতিত হয়, তা তোমাদের হাতের উপার্জিত।

٤. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

অর্থাৎ, অনন্তর যে ব্যক্তি অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

٥. جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনই ফল পাবে।

٦. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.

অর্থাৎ, মানুষ যে যা করবে তার দায়িত্ব ভার সে বহন করবে।

٧. وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى.

অর্থাৎ, মানুষের জন্য তাই রয়েছে যার সে চেষ্টা করে।

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত আয়াতার্থ দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, কাদারিয়া চিন্তাবিদরা চরমপন্থি। কারণ জাবারিয়া সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস মতে, যেখানে মানুষের নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতাকে পদদলিত করে আল্লাহকে সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে কাদারিয়ারা মানুষকে শক্তি স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম শক্তিকে খর্ব করে। যদিও উভয় দলই নিজেদের দাবির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছে, তবুও তাদের এদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, বিশেষ ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর অপরিসীম শক্তি স্বীকার করে, তেমনি মানুষের সীমিত ইচ্ছা এবং কর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলেও তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের সার্বভৌম কোনো শক্তি নেই। সে কারণেই মানুষ যা চায় তা পায় না। তাই মানুষ একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক।

উপসংহার : জাবারিয়াদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়া সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। জাবারিয়া মতবাদানুসারে মানুষকে পরাধীন পশুর ন্যায় প্রভু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়; কিন্তু কাদারিয়ারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٦) : عَرِّفِ الْجَبْرِيَةَ وَالْقَدْرِيَةَ - بَيِّنْ سَبَبَ نَشْأَتِهِمَا - وَمَا خِلَافُهُمْ فِيْ بَابِ الْقَدْرِ وَاَفْعَالِ الْعِبَادِ؟ اُذْكُرْ بِالتَّفْصِيْلِ -

■ প্রশ্ন : ৮৬ ॥ জাবারিয়া এবং কাদারিয়ার পরিচয় দাও। তাদের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা কর। বান্দার কর্ম ও ভাগ্য বর্ণনায় তাদের মতবাদ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত; কিন্তু এমন উদার নৈতিক ভাবধারা সত্ত্বেও ইসলাম বিরোধ বিভেদমুক্ত থাকতে পারেনি। কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবারিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নিম্নে প্রশ্নালোকে উভয় দলের পরিচয়, তাদের উদ্ভবের কারণ ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ جَبْرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْجَبْرِيَّةِ لُغَةً :

جَبْرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : جَبْرِيَّةٌ শব্দটির جِيْم ও بَاء বর্ণদ্বয়ে যের হলে এর অর্থ হবে- اَلتَّكَبُّرُ তথা অহংকার।

جَبْرِيَّةٌ শব্দটি اَلْجَبْر-এর দিকে নিসবত হয়েছে। এর অর্থ- আবশ্যক করা, বাধ্যবাধকতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ।

مَعْنَى الْجَبْرِيَّةِ اصْطِلَاحًا :

جَبْرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন-

اَلْجَبْرِيَّةُ مَذْهَبُ مَنْ يَّرٰى اَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ لِلْاِنْسَانِ قَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ اَزَلًا -

অর্থাৎ, জাবারিয়া ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা ঘটে এসবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল।

২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রণেতা বলেন- اَلْجَبْرُ هُوَ نَفْيُ الْعَقْلِ حَقِيْقَةً عَنِ الْعَبْدِ وَاِضَافَتُهُ اِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى অর্থাৎ, জাবারিয়া বলা হয় যারা বান্দার আমলকে অস্বীকার করে এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে।

৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন-

اَلْجَبْرُ اِسْنَادُ فِعْلِ الْعَبْدِ اِلَى اللّٰهِ الْقَاهِرِ يَخْلُقُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ -

৪. আল্লামা আবুল হাশেম (র) বলেন-

اَلْجَبْرِيَّةُ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اَجْبَرَ اللّٰهُ الْعِبَادَ عَلَى الذُّنُوْبِ وَمَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يُّكْرِهَ اَحَدًا عَلٰى مَعْصِيَتِهِ -

⊃ قَدْرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدْرِيَّةِ لُغَةً :

اَلْقَدْرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْقَدْرِيَّةُ শব্দটিকে اَلْقَدْر-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে; اَلْقَدْرُ অর্থ- ১. اَلسُّلْطَانُ তথা ক্ষমতা, ২. اَلْقَضَاءُ তথা ফয়সালা,

৩. اَلْمُقَدَّرَاتُ তথা নির্ধারিত, ৪. اَلْحُكْمُ তথা নির্দেশ, ৫. اَلْخَلْقُ তথা সৃষ্টি, ৬. اَلنِّظَامُ তথা ব্যবস্থা।

مَعْنَى الْقَدَرِيَّةِ اِصْطِلَاحًا :

قَدَرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাদের ধারণা আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– اَلْقَدَرِيَّةُ قَوْمٌ يُنْكِرُوْنَ الْقَدَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ خَالِقٌ لِفِعْلِهِ অর্থাৎ, কাদারিয়া এমন সম্প্রদায় যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা।

⊃ نَشْأَةُ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন তা-ই মানুষ করে। ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা এক গোঁড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, আল্লাহর কাছে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম। তার কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। সে সম্পূর্ণ আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

⊃ نَشْأَةُ الْقَدَرِيَّةِ :

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাবারিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। ফলে খলিফা আবদুল মালেক তার প্রতি রুষ্ট হন এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফার অনুগতরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কাদারিয়া মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়াদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা উমাইয়া শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়া চিন্তাবিদ ইউনুস আসওয়ারী ও খিলান দামেশকী কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। একপর্যায়ে ৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হিশামের নির্দেশে গাইলান দামেশকীকেও হত্যা করা হয়; কিন্তু মানুষের চিন্তার বিপ্লবী পরিবর্তন কোনো কালেই অস্ত্রবলে দমিত হয়নি। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

⊃ اَقْوَالُ الْجَبْرِيَّةِ فِىْ بَابِ الْقَدَرِ وَاَفْعَالِ الْعِبَادِ :

বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবারিয়াদের অভিমত : জাবারিয়াদের মতে বান্দা জড়পদার্থের মতো, আল্লাহ তার সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা। উপার্জনে বান্দার কোনো ক্ষমতা, ইচ্ছা ও এখতিয়ার নেই। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই করতে পারে না। বান্দার নড়াচড়া, হাঁটাচলা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।

দলীল :

ক. নকলী দলীল :

١- وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

٢- اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ -

٣- هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ -

٤- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا -

খ. আকলী দলীল : ১. কর্মে বান্দার ইচ্ছা থাকা একথা মেনে নিলে قُدْرَةُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর শক্তির সাথে قُدْرَةُ الْعَبْدِ তথা বান্দার শক্তির অংশীদার করা হয়।

২. কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর كَاسِبْ তথা কর্মকার যদি বান্দা হয়, তাহলে كَاسِبْ পাপী হলে خَالِقْ-ও পাপী হওয়া আবশ্যক হয়।

⊃ اَقْوَالُ الْقَدْرِيَّةِ فِىْ بَابِ الْقَدْرِ وَاَفْعَالِ الْعِبَادِ :

বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে কাদারিয়াদের অভিমত : কাদারিয়াদের মতে, বান্দা তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। ভালো, মন্দ, সুখ, দুঃখ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সবকিছু বান্দার হাতের কাজ। এখানে তাকদীর তথা আল্লাহ পূর্ব থেকে ভাগ্যে লিখেছেন এমন কোনো বিষয় নেই। বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু হয়। এখানে আল্লাহর শক্তিতে কিছু হয় না।

দলীল :

ক. নকলী দলীল :

١- اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

٢- جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

٣- تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

٤- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ -

٥- فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ -

٦- قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ -

খ. আকলী দলীল : ১. কর্মে বান্দার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা না থাকলে তাকে ইবাদতের আদেশ দেয়া বৈধ হতো না।

২. একজন সুস্থ লোকের হস্ত সঞ্চালন তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে; কিন্তু মৃগী রোগীর নড়াচড়া তার ইচ্ছায় হয় না। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কর্ম সম্পাদনে বান্দার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. বান্দার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা না থাকলে বান্দাকে কর্তা হিসেবে উল্লেখপূর্বক কোনো ক্রিয়াপদ যেমন صَلّٰى - صَامَ ইত্যাদি বলা যেত না।

উপসংহার : জাবারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে। তাই তারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়। আর কাদারিয়ারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে। সুতরাং জাবারিয়া ও কাদারিয়া উভয় মতবাদই চরমপন্থি।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٧) : مَنْ هُمُ الْمُرْجِئَةُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهَا وَتَطَوُّرَهَا مَعَ بَيَانِ نَظَرِيَّاتِهِمْ - ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَارِجِيَّةِ -

■ **প্রশ্ন : ৮৭ ।। মুরজিয়া কারা? উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখপূর্বক তাদের মতবাদসমূহ আলোচনা কর। অতঃপর মুরজিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা কর।**

او- عَرِّفِ الْمُرْجِئَةَ مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ وَاَبْرَزِ فِرَقِهِمْ وَاُصُوْلِ عَقَائِدِهِمْ -

অথবা, উৎপত্তির ইতিহাসসহ মুরজিয়াদের পরিচয় দাও। তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্তি ও তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ শিয়া এবং চরমপন্থি খারেজী সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে ইতিহাসে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে তা ধর্মতাত্ত্বিক দলে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– In general Murjite influence was on the side of tolerance.

⊃ مُرْجِئَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُرْجِئَةِ لُغَةً :

مُرْجِئَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُرْجِئَةٌ শব্দটি আরবি اِرْجَاءٌ শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা। সুতরাং মুরজিয়া শব্দের অর্থ হলো– বিলম্বকারী, মুলতবিকারী।

مَعْنَى الْمُرْجِئَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُرْجِئَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার উপদেশ দেয়।

⊃ نَشْأَةُ فِرْقَةِ الْمُرْجِئَةِ :

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের সহিংস প্রতিবাদ এবং চরম বাড়াবাড়ির মোকাবেলায় সহনশীল উদার চিন্তাধারার স্লোগান ধারণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে। উমাইয়া শাসকদের কেউ কেউ ইসলামী জীবনাচারের প্রতি উদাসীন থাকার কারণে তাদের কাফের, মুশরিক, বিদয়াতী আখ্যা দিয়ে খারেজী ও শিয়ারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুরজিয়াদের অভিমত হলো, উমাইয়াদের মুশরিক, কাফের বলে নিন্দা করা অনুচিত। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, উপরন্তু প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকে। এ কারণে শেষ বিচারের দিন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য সমীচীন নয়।

তَطَوُّرُ فِرْقَةِ الْمُرْجِئَةِ :

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : উমাইয়া শাসনামলে বহু লোক মুরজিয়া মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উমাইয়াদের সমর্থক হিসেবে তারা রাজকীয় অনুগ্রহ আনুকূল্য লাভ করে। মুরজিয়ারা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সীমালঙ্ঘনকারী নেতিবাচক উদার নৈতিকতার ধ্বজাধারী সম্প্রদায়। ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়– In general Murjite influence was on the side of tolerance. অবশ্য মুরজিয়ারা একটি ভ্রষ্ট উপদল হলেও তাদের কোনো কোনো মতবাদ সত্যপন্থি ইসলাম অনুসারীদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য :

১. আলফ্রেড ভনক্রেমারের মতে, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় মুরজিয়ারাও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে দামেশকে তাদের উত্থান ঘটে।
২. আব্রাহাম হালকীন মন্তব্য করেন, যেহেতু তারা উমাইয়া শাসকচক্রের পক্ষে সমর্থন যোগায়, সেহেতু তারা রাজনৈতিক দল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।
৩. ট্রিউন হালকীনও মনে করেন, এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে।
৪. অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের মতে, মুরজিয়াদের উত্থানের পিছনে অন্য একটি কারণ ছিল। পূর্ববর্তী মুসলিমরা এক ধরনের নির্জলা অদৃষ্টবাদের শিকার এবং পাপ সম্পর্কিত এক ভয়ানক চেতনাবোধে বিকারগ্রস্ত ছিল। পার্থিব জীবন ও জগৎকে তারা একটা অশুভ ব্যাপার মনে করত, যা মানুষকে স্বর্গীয় চিন্তা চেতনা থেকে দূরে রাখে। পাপ সম্পর্কিত এরূপ নেতিবাচক চিন্তাচেতনা তাদের মনে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে এক অস্বাভাবিক ভীতি ও নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, সমকালে পরকাল সম্পর্কে বিরাজিত সেই নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা বদলে দেয়ার জন্যই মুরজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

نَظْرِيَاتُ الْمُرْجِئَةِ وَأُصُوْلُ عَقَائِدِهِمْ :

মুরজিয়াদের মতবাদ ও আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুরজিয়া সম্প্রদায় কতিপয় নিজস্ব মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতবাদগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না :** একজন মুসলিম যতই পাপ কাজ করুক না কেন তাকে কাফের বলা যাবে না।
২. **সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত :** মুরজিয়াদের মতে, কী সম্প্রদায় আর কী মাযহাব, সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত। কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে লড়াই করবে না।
৩. **চার খলিফার সমস্বীকৃতি :** মুরজিয়ারাই প্রথম চার খলিফাকে সমভাবে স্বীকারকারী সম্প্রদায়। খারেজীদের মতো তারা হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা)-এর নিন্দা করে না।
৪. **উমাইয়া শাসনের স্বীকৃতি :** মুরজিয়াদের মতে, উমাইয়া শাসন স্বীকার করা মুসলিমদের কর্তব্য। উমাইয়া শাসক আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করলেও

তাদের কাফের বলা উচিত নয়। তাদের মতে, যে কোনো মুসলমানের গুনাহের শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত মুলতবি থাকবে।

৫. **ঈমান অন্তরের ব্যাপার :** মুরজিয়া সম্প্রদায় ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের চরম মতাদর্শ অনুসারে ঈমান অন্তরের ব্যাপার, মৌখিক স্বীকৃতি বা বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠান আবশ্যক নয়।

৬. **কবীরা ও সগীরা গুনাহের পার্থক্য নিরূপণ :** মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ কবীরা ও সগীরা গুনাহের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, তা ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাদের মতে, কবীরা গুনাহ শিরকের পর্যায়ভুক্ত না হলে কোনো মুসলিম চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। সগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও কোনো মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

৭. **আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বেশি :** মুরজিয়াদের মতে, আল্লাহভীতির চেয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা আল্লাহভীতি বান্দাকে তাঁর থেকে দূরে নিয়ে যায়, আর ভালোবাসা বান্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করে। নিজেদের মতের সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতাংশ প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করে– لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

৮. **ঈমান থাকাবস্থায় পাপ কাজ কোনো ক্ষতি করে না :** মুরজিয়া মতবাদের প্রধান দর্শন হলো– لَا يَضُرُّ مَعَ الْاِيْمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا اَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ অর্থাৎ, ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না। যেমন কুফর থাকলে কোনো পুণ্যই কোনো উপকার করে না।

৯. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান।

১০. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে, বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْخَارِجِيَّةِ : ১

খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে পার্থক্য : খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. খারেজী ও মুরজিয়া উভয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হলেও মুরজিয়া সম্প্রদায় পরে নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায় তা হয়নি।

২. সকল দীনি বিষয়ে খারেজীরা ছিল অযৌক্তিক, গোঁড়া ও কট্টরপন্থি। অপরদিকে মুরজিয়ারা ছিল অযৌক্তিক, উদারতা ও সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী।

৩. খারেজীরা ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আর মুরজিয়ারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

৪. খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম ধর্মীয় কর্তব্যাদি নিয়মিত পালন না করলে কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস থাকলে সে কাফের হবে না।

৫. খারেজীরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী আর মুরজিয়ারা উমাইয়া শাসনের সমর্থক।

৬. খারেজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফাকে স্বীকার করে না। অপরদিকে মুরজিয়ারা চার খলিফাকেই নির্দ্বিধায় সমভাবে স্বীকার করে।

৭. খারেজীদের মতে, অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরদিকে মুরজিয়াদের অভিমত হলো, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

৮. খারেজীদের নীতি হলো, যারা তাদের মতবাদ গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শুধু বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য। অপরদিকে মুরজিয়ারা আত্মরক্ষা ছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ অনুচিত বলে মনে করে।

উপসংহার : অযৌক্তিক গোঁড়া মতবাদের কট্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা সাংঘর্ষিক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলও বটে।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٨) : مَنْ هُمْ فِرْقَةُ الْمُعْتَزِلَةِ؟ وَمَنْ هُوَ مُؤَسِّسُهَا - وَلِمَ سُمِّيَتْ هٰذِهِ الْفِرْقَةُ بِالْمُعْتَزِلَةِ؟ اُذْكُرْ اَفْكَارَهُمْ وَ عَقَائِدَهُمْ -

■ প্রশ্ন : ৮৮ । মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা বলা হয় কেন? এদের মতবাদ এবং আকিদাসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলাম উদারতার ধর্ম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। তেমনি কাদারিয়া সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ مُعْتَزِلَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَة لُغَةً :

مُعْتَزِلَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُعْتَزِلَةٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর اِسْم فَاعِل থেকে وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ, যা عَزْلٌ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. اَلْفَصْلُ তথা পৃথক হওয়া।
২. اَلْبُعْدُ তথা দূরে সরে যাওয়া।
৩. اَلطَّرْدُ তথা উৎখাত হওয়া।
৪. اَلْخُرُوْجُ তথা বের হওয়া।
৫. اَلْمُنْفَرِدُ তথা একাকী।
৬. اَلْمُنْقَطِعُ তথা বিচ্ছিন্ন।

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَة اِصْطِلَاحًا :

مُعْتَزِلَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِل بْنِ عَطَاءٍ اَلَّذِيْنَ اعْتَزَلُوْا عَنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ -

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতার অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ يُخَالِفُوْنَ اَهْلَ السُّنَّةِ فِىْ بَعْضِ الْمُعْتَقَدَاتِ عَلٰى رَأْسِهِمْ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ اَلَّذِىْ اِعْتَزَلَ بِاَصْحَابِهٖ حَلْقَةَ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ ـ

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তর্কশাস্ত্রবিদদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন ওয়াসিল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন।

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর মতে–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ فَاِنَّهُمْ فِىْ اَكْثَرِ الْمَسَائِلِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ مُتَّفِقُوْنَ مَعَ الْقَدْرِيَّةِ وَمُخَالِفُوْنَ مَعَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ـ

৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِئَةٌ مِّنَ الْقَدْرِيَّةِ قَالُوْا اِنَّهُمْ اِعْتَزَلُوْا فِئَتَىِ الضَّلَالَةِ فِىْ زَعْمِهِمْ اَىْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْخَوَارِجِ ـ

⊃ مُؤَسِّسُ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা : ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ওয়াসিল ইবনে আতা। তিনি ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত হাসান বসরী (র)-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন।

⊃ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নামকরণের কারণ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নামকরণ ও উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি হলো, একদিন হাসান বসরী (র) তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা সমেত মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল; যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে যাবে? উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি (مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ) ; হাসান বসরী শিষ্যের এ মত গ্রহণ করলেন না। ফলে ওয়াসিল ইবনে আতা তাঁর উস্তাদ ইমাম হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তখন হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন, ইতাযালা আন্না (اِعْتَزَلَ عَنَّا) অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে ওয়াসিল ইবনে আতা এবং তার সমর্থকগণ ইতিহাসে মুতাযিলা তথা দলত্যাগী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দল হিসেবে পরিচিত।

এ বিষয়ে কয়েকজন ঐতিহাসিক মতামত দিয়েছেন। যেমন–

ক. অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। আবার মুরজিয়াদের মতে, উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। মুতাযিলাগণ এ দু'চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করেছে বলে তারা মুতাযিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত।

মুতাযিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক নাল্লিনোর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা মুতাযিলারাই সর্বপ্রথম ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা চর্চার সূচনা করে। তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী করার পক্ষপাতী।

খ. ঐতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গ. সৈয়দ আমীর আলী বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতগণ ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যপন্থি মুতাযিলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তাঁর অদূরবর্তী বংশধরদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো মুতাযিলা চিন্তাবিদরাও ইসলামের শিক্ষা থেকেই প্রেরণা লাভ করেছে।

৩ عَقَائِدُ الْمُعْتَزِلَةِ وَاَفْكَارُهُمْ :

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা ও মতবাদসমূহ : মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশকিছু নবতর মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে উঠেছিল তা নিম্নরূপ–

১. **আল্লাহর একত্ববাদ :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর একত্ববাদ বলতে বোঝায়, আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই নিজেদের তারা اَهْلُ التَّوْحِيْد তথা একত্ববাদী বলে প্রচার করত।

২. **আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে। তাদের মতে, আল্লাহর জাত বা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয় তা সঠিক নয়। কেননা তাঁর সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালার গুণসমূহ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ।

৩. **আল্লাহর দর্শন :** মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার দৈহিক আকৃতি নেই -এ মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ -

৪. **নবীর সুপারিশ :** মুতাযিলারা وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আয়াত সামনে রেখে বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে মন্দ পরিণাম ভোগ করবে। এক্ষেত্রে নবীর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই।

৫. **কুরআনের চিরন্তনতা :** মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা একত্র হয়, যা আল্লাহর একত্ববাদের মূলে আঘাত হানে।

৬. **বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য :** বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে এরিস্টটলের মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। মুতাযিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই। বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন।

৭. **মানুষের কর্মের স্বাধীনতা :** মুতাযিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে মানুষকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া না হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? নিজেদের মতের পক্ষে তারা কুরআনের আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ۔

৮. **শুভ ও অশুভ :** মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা। অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে। নিজেদের পোষিত এ মতবাদের পক্ষেও তারা প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ বলেন–

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ۔

৯. **পুরস্কার ও শাস্তি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে সৎ ব্যক্তিদের জান্নাত এবং অসৎ ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য। এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের খেয়াল খুশির পরিচয় দিলে তাঁর ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেমন কুরআনে এসেছে– وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

১০. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া কালাম পড়ার কোনো দরকার নেই। কেননা পরজগতে মানুষের ভালো কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ করতে বাধ্য। সুতরাং মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিরর্থক।

১১. **কবীরা গুনাহকারীর অবস্থা :** কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়।

১২. **সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ :** মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি অর্জন করতে হবে। কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

১৩. বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ : মুতাযিলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র। তবে যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তা সত্তা পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে অস্তিত্বহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়।

১৪. মিরাজের ঘটনা : মুতাযিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে। তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্নযোগে হয়েছে। তারা তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– وَكَانَ رُؤْيَا صَالِحَةً

১৫. সৎ ও অসৎ কর্ম : মুতাযিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান। যদি মানুষ কোনো অন্যায় অসৎ কাজ করে, সেজন্য সে দায়ী, আল্লাহ্ নয়।

১৬. আল্লাহর কার্যকলাপ : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসংগত, তাঁর কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না।

এ ছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো–

১৭. তারা কবরে মুনকার নাকীরের আগমন অস্বীকার করে।

১৮. বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে।

১৯. কেরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২০. তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব ও বর্তমানে অস্তিত্বশীল সৃষ্ট বেহেশত দোযখের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে।

২২. রাজনৈতিক মতবাদ : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সংগত দাবিদার বলে স্বীকার করে। কিন্তু খলিফাদের যোগ্যতা বিচারে তাদের মত হলো, ক্রমান্বয়ে প্রথম খলিফা দ্বিতীয় খলিফা থেকে, দ্বিতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা থেকে, তৃতীয় খলিফা চতুর্থ খলিফা থেকে অধিকতর যোগ্য; কিন্তু মুতাযিলাদের অন্য দলের মতে, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) চার খলিফার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

উপসংহার : ওয়াসিল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাযিলা মতবাদ ছিল নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে চরম গোঁড়ামির পরিচয় প্রদান করার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٩) : عَرِّفِ الْمُعْتَزِلَةَ ـ ثُمَّ بَيِّنْ نَشْأَتَهُمْ وَاُصُوْلَ عَقَائِدِهِمْ وَسَبَبَ زَوَالِهِمْ ـ

■ প্রশ্ন : ৮৯ ॥ মুতাযিলাদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের উৎপত্তি, আকিদাগত মূলনীতি ও পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায় সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী হিসেবে পরিচিত। গ্রিক দর্শনের প্রভাবে মুসলিম দর্শনে যে সকল যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, তাদের মধ্যে মুতাযিলা সম্প্রদায় অন্যতম। খারেজীদের উগ্র ধর্মীয় মতবাদ এবং মুরজিয়াদের নৈতিক শিথিলতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

مُعْتَزِلَة -এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ لُغَةً :

مُعْتَزِلَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُعْتَزِلَةٌ শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর اِسْم فَاعِل থেকে وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ, যা عَزْلٌ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. اَلْفَصْلُ তথা পৃথক হওয়া। ২. اَلْبُعْدُ তথা দূরে সরে যাওয়া।
৩. اَلطَّرْدُ তথা উৎখাত হওয়া। ৪. اَلْخُرُوْجُ তথা বাহির হওয়া।
৫. اَلْمُنْفَرِدُ তথা একাকী। ৬. اَلْمُنْقَطِعُ তথা বিচ্ছিন্ন।

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْتَزِلَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ اَلَّذِيْنَ اِعْتَزَلُوْا عَنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ۔

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ يُخَالِفُوْنَ اَهْلَ السُّنَّةِ فِيْ بَعْضِ الْمُعْتَقَدَاتِ، عَلٰى رَأْسِهِمْ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ اَلَّذِىْ اِعْتَزَلَ بِاَصْحَابِهٖ حَلْقَةَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ۔

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তর্কশাস্ত্রবিদদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন ওয়াসিল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন।

৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)-এর মতে–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ فَاِنَّهُمْ فِيْ اَكْثَرِ الْمَسَائِلِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ مُتَّفِقُوْنَ مَعَ الْقَدَرِيَّةِ وَمُخَالِفُوْنَ مَعَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔

৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِئَةٌ مِّنَ الْقَدَرِيَّةِ قَالُوْا اِنَّهُمْ اِعْتَزَلُوْا فِئَتَى الضَّلَالَةِ فِىْ زَعْمِهِمْ اَىْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْخَوَارِجِ ۔

نَشْأَةُ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলাদের উৎপত্তি : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি হলো, একদিন হাসান বসরী (র) তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা সমেত মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল; যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে

যাবে? উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি– (مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ); হাসান বসরী শিষ্যের এ মত গ্রহণ করলেন না। ফলে ওয়াসিল ইবনে আতা তার উস্তাদ ইমাম হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তখন হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন, ইতাযালা আন্না (إِعْتَزَلَ عَنَّا) অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে ওয়াসিল ইবনে আতা এবং তার সমর্থকগণ ইতিহাসে মুতাযিলা তথা দলত্যাগী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসিল ইবনে আতার অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দল হিসেবে পরিচিত।

২. এ বিষয়ে কয়েকজন ঐতিহাসিক মতামত দিয়েছেন। যেমন–

ক. অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। আবার মুরজিয়াদের মতে উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। মুতাযিলাগণ এ দু'চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করেছে বলে তারা মুতাযিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত।

মুতাযিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক নাল্লিনোর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা মুতাযিলারাই সর্বপ্রথম ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা চর্চার সূচনা করে। তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী করার পক্ষপাতী।

খ. ঐতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গ. সৈয়দ আমীর আলী বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতগণ ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যপন্থি মুতাযিলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তাঁর অদূরবর্তী বংশধরদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো মুতাযিলা চিন্তাবিদরাও ইসলামের শিক্ষা থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

أُصُوْلُ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ ❍ :

মুতাযিলাদের আকিদাগত মূলনীতি : মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশকিছু নবতর মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে উঠেছিল তা নিম্নরূপ–

১. **আল্লাহর একত্ববাদ :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর একত্ববাদ বলতে বোঝায়, আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তারা নিজেদের আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই নিজেদের তারা اَهْلُ التَّوْحِيْدِ তথা একত্ববাদী বলে প্রচার করত।

২. **আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে। তাদের মতে, আল্লাহর জাত বা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয় তা সঠিক নয়। কেননা তাঁর সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালার গুণসমূহ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ।

৩. **আল্লাহর দর্শন :** মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার দৈহিক আকৃতি নেই -এ মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ ـ

৪. **নবীর সুপারিশ :** মুতাযিলারা وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আয়াত সামনে রেখে বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে মন্দ পরিণাম ভোগ করবে। এক্ষেত্রে নবীর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই।

৫. **কুরআনের চিরন্তনতা :** মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা একত্র হয়, যা আল্লাহর একত্ববাদের মূলে আঘাত হানে।

৬. **বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য :** বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে এরিস্টটলের মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। মুতাযিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই। বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন।

৭. **মানুষের কর্মের স্বাধীনতা :** মুতাযিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে মানুষকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া না হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? নিজেদের মতের পক্ষে তারা কুরআনের আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

৮. **শুভ ও অশুভ :** মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা। অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে। নিজেদের পোষিত এ মতবাদের পক্ষেও তারা প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ বলেন–

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ـ

৯. **পুরস্কার ও শাস্তি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে সৎ ব্যক্তিদের জান্নাত এবং অসৎ ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য। এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের খেয়াল খুশির পরিচয় দিলে তাঁর ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেমন কুরআনে এসেছে– وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

১০. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া কালামের কোনো দরকার নেই। কেননা পরজগতে মানুষের ভালো কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ করতে বাধ্য। সুতরাং মৃতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া নিরর্থক।

১১. **কবীরা গুনাহকারীর অবস্থা :** কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়।

১২. **সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ :** মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি অর্জন করতে হবে। কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

১৩. **বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ :** মুতাযিলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র। তবে যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তা সত্তা পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে অস্তিত্বহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়।

১৪. **মিরাজের ঘটনা :** মুতাযিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে। তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্নযোগে হয়েছে। তারা তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– وَكَانَ رُؤْيَا صَالِحَةً

১৫. **সৎ ও অসৎ কর্ম :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান। যদি মানুষ কোনো অন্যায় অসৎ কাজ করে, সেজন্য সে দায়ী, আল্লাহ নয়।

১৬. **আল্লাহর কার্যকলাপ :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসংগত, তাঁর কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না।

এ ছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো–

১৭. তারা কবরে মুনকার নাকীরের আগমন অস্বীকার করে।

১৮. বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে।

১৯. কেরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২০. তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব ও বর্তমানে অস্তিত্বশীল সৃষ্ট বেহেশত দোযখের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে।

২২. **রাজনৈতিক মতবাদ :** রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সংগত দাবিদার বলে স্বীকার করে; কিন্তু খলিফাদের যোগ্যতা বিচারে তাদের মত হলো, ক্রমান্বয়ে প্রথম খলিফা দ্বিতীয় খলিফা থেকে, দ্বিতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা থেকে, তৃতীয় খলিফা চতুর্থ খলিফা থেকে অধিকতর যোগ্য; কিন্তু মুতাযিলাদের অন্য দলের মতে, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) চার খলিফার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৩. سَبَبُ زَوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলাদের পতনের কারণ : আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা মতবাদ অনুসারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সমকালীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ মতবাদ রাজসিংহাসন থেকে গরিবের ভাঙা কুটির পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত এ মতবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল; কিন্তু তাদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। নিম্নে তাদের পতনের মৌলিক কারণগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. **ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিমদের বিরোধিতা :** প্রথম থেকেই নিরঙ্কুশ ইসলাম ও অহীর শিক্ষানুসারী ধর্মতত্ত্ববিদগণ মুতাযিলা মতবাদ মেনে নিতে পারেননি বিধায় তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণে রাজপথে নেমে পড়েন। বক্তৃতা, বিবৃতি ও ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে সর্বসাধারণ মুসলিমদের তাঁরা নিজেদের মতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এটা ছিল মুতাযিলা মতবাদের দুর্গে চরম আঘাত হানার মতো।

২. **বিরুদ্ধবাদীদের ওপর অত্যাচার :** খলিফা মামুন এবং তার উত্তরাধিকারীরা মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিধায় তারা এর বিরোধীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে তাদের এ নির্যাতনই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পতন ত্বরান্বিত করে।

৩. **রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব :** খলিফা মুতাওয়াক্কিল খেলাফতে আরোহণ করে মুতাযিলাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে খর্ব করেন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকে হাত গুটিয়ে নেন। ফলে মুতাযিলাগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সময় মুতাযিলা মতবাদ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

৪. **ইমাম আহমাদের কারাবরণ :** মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন না করায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) কারারুদ্ধ হন। এ কারণে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে তাদের পতনের দিন ত্বরান্বিত হয়ে আসে।

৫. **ইখওয়ানুস সাফার আবির্ভাব :** মুতাযিলা মতবাদের অবধারিত ফলস্বরূপ সৃষ্ট বিশৃঙ্খল মুহূর্তে একদল যুবক মিলিত হয়ে 'ইখওয়ানুস সাফা নামে একটি জনকল্যাণকামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দল ও মাযহাবের মধ্যে বিভেদ দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ সংগঠনের সদস্যদের সৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ মুসলিমদের দৃষ্টি মুতাযিলা মতবাদ থেকে ফিরিয়ে আনে।

৬. **শিয়াদের বিরোধিতা :** শিয়ারা কস্মিনকালেও মুতাযিলাদের মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া আব্বাসীয় খলিফাদের সহযোগিতায় মুতাযিলারা শিয়াদের বাঁকা চোখে দেখত। তাই পরবর্তীতে শিয়ারা মুতাযিলাদের শত্রু মনে করে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

৭. **অনৈসলামিক মতবাদে বিশ্বাসের বিরূপ প্রভাব :** মুতাযিলাগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস ও কুরআনের নশ্বরতার মতো কয়েকটি অনৈসলামিক মতবাদ সৃষ্টি করে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদের থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

৮. **মুতাযিলাদের অনৈক্য :** যুগপরিক্রমায় মুতাযিলা মতবাদের অনুসারীদের ঐক্যে ফাটল ধরে এবং বাগদাদে বিশর আল মুতাসিমের নেতৃত্বে বিকল্প মুতাযিলা দল গঠিত হয়। এ দু'গ্রুপের অনৈক্যই তাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

৯. **আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ :** মুতাযিলা দলের অন্যতম নেতা আবুল হাসান আল আশয়ারী দল ত্যাগ করে এ মতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মুতাযিলা মতবাদের সুফল ও কুফলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তাছাড়া মুতাযিলা মতবাদের বিরোধিতায় তাঁর প্রবর্তিত আশয়ারী মতবাদ ছিল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই অনেক মুসলিম তাঁর মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে মুতাযিলা মতবাদ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০. **হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসসাধন :** ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসের সাথে সাথেই খেলাফত ও মুতাযিলা মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার : ওয়াসিল ইবনে আতা প্রবর্তিত মুতাযিলা মতবাদ দীর্ঘ তিনশ বছর অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ও খলিফা কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে এ মতবাদ দুর্বল হতে থাকে। সর্বশেষ আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ ও আশয়ারী মতবাদের সম্প্রসারণ তার পূর্ণ যবনিকাপাত ঘটায়।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٠) : مَنْ هُمُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ؟ اُذْكُرْ تَارِيْخَ نَشْأَتِهِمْ وَتَطَوُّرَهُمْ وَنَظَرِيَّاتِهِمْ-

■ প্রশ্ন : ৯০ ॥ আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মতবাদগুলো আলোচনা কর।

او- عَرِّفِ الْاَشْعَرِيَّةِ مَعَ بَيَانِ نَشْأَتِهِمْ وَاُصُوْلِ عَقَائِدِهِمْ- ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ-

অথবা, আশয়ারীদের পরিচয় বর্ণনাপূর্বক তাদের উৎপত্তি ও আকিদাগত মূলনীতি পর্যালোচনা কর। অতঃপর মুতাযিলা ও আশয়ারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দল। কট্টর যুক্তিবাদী ও গোঁড়া মতবাদের ধারক মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিমগণ যখন ইসলামের মৌলিকত্ব ও স্বভাবজাত সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর পথ দেখিয়েছিল তারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায়। নিম্নে তাদের পরিচয় ও মুতাযিলাদের সাথে তাদের পার্থক্য আলোচনা করা হলো।

১. اَشْعَرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاَشْعَرِيَّةِ لُغَةً :

اَشْعَرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاَشْعَرِيَّةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْاَشَاعِرَةُ; অর্থ– মতবাদ তৈরি করা। আবুল হাসান আশয়ারী এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে তার দিকে নিসবত করে এ মতবাদের অনুসারীদের اَلْاَشْعَرِيَّة বলা হয়।

مَعْنَى الْاَشْعَرِيَّةِ اِصْطِلَاحًا :

اَشْعَرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط-এর গ্রন্থকার বলেন–

اَلْاَشْعَرِيَّةُ فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ يَنْتَسِبُوْنَ اِلَى اَبِى الْحَسَنِ الْاَشْعَرِىِّ يُخَالِفُوْنَ الْمُعْتَزِلَةَ فِىْ اٰرَائِهِمْ ـ

অর্থাৎ, আশয়ারিয়া হলো তার্কিকদের একটি সম্প্রদায়, যাদেরকে আবুল হাসান আশয়ারীর প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, আর যারা মতবাদের ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের বিরোধী।

২. ড. রশীদুল আলম বলেন–

اِنَّ الْاَشْعَرِيَّةَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَبَا الْحَسَنِ الْاَشْعَرِىِّ الَّذِيْنَ بَذَلُوْا جُهُوْدَهُمْ فِىْ تَطْبِيْقٍ بَيْنَ الْفَلْسَفَةِ وَالْوَحْىِ ـ

نَشْأَةُ نَظَرِيَّةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ ❍ :

আশয়ারী মতবাদের উৎপত্তি : আশয়ারী মতবাদের উদ্ভাবক ছিলেন আবুল হাসান আল আশয়ারী। প্রথম জীবনে তিনি মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত মুতাযিলা পণ্ডিত আল জুবাঈ। আশয়ারী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুতাযিলাপন্থি ছিলেন বটে; কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মুতাযিলা মতবাদ থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। পরিশেষে আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ সমস্যার ওপর মুতাযিলাদের সিদ্ধান্ত তাঁর নিকট সম্পূর্ণ ক্রটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বহু তর্কের পরও তিনি উস্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করেন এবং বসরার মসজিদে নিজস্ব মতবাদের ঘোষণা করেন। মুতাযিলা মতবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি 'ইলমুল কালাম' নামক এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। আবুল হাসান আশয়ারীর নামানুসারে তাঁর উদ্ভাবিত মতবাদের নামকরণ করা হয় আশয়ারী মতবাদ।

تَطَوُّرُ نَظَرِيَّةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ ❍ :

আশয়ারী মতবাদের ক্রমবিকাশ : ১. আশয়ারী মতবাদ প্রচারে বাধা বিপত্তি : প্রথমদিকে আশয়ারী মতবাদ প্রচার প্রসারে যথেষ্ট বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। কিছু ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিম এবং মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী মিলে এ মতের ঘোর বিরোধিতা করছিলেন। সেলজুক শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল খান এ মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি এ মতবাদের প্রচার প্রসার ও অনুসরণ বেআইনী ঘোষণা করেন এবং কঠোর হস্তে এ মতবাদ অনুসারীদের দমন করেন।

২. **ইখওয়ানুস সাফার সমর্থন :** এদিকে ইখওয়ানুস সাফা নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তার সদস্যরা আশয়ারী মতবাদকে সমর্থন দেয়। তাদের সমর্থন মুতাযিলাদের পতন ও আশয়ারীদের উত্থান ত্বরান্বিত করে।

৩. **আশয়ারী মতবাদের দ্রুত বিস্তার :** প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এ মতবাদ সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ মতবাদ দ্রুত বিস্তার লাভের পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে–

ক. এ মতবাদ অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল।

খ. কুরআন সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সংগতিপূর্ণ ছিল।

গ. ধর্মীয় ইমাম। যেমন– ইমাম গাযালী, আবু বকর বাকেল্লানী প্রমুখের সমর্থন।

৪. **রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি :** সেলজুক সুলতান আলফা আরসালান ও তাঁর মন্ত্রী নিযামুল মুলক আশয়ারী মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেন। এ মতবাদ প্রসারের লক্ষ্যে বাগদাদে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নَظَرِيَّاتُ الْأَشْعَرِيِّيْنَ وَأُصُوْلُ عَقَائِدِهِمْ : ◐

আশয়ারীদের মতবাদ ও আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুতাযিলা মতবাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে আশয়ারীগণ যেসব বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতবাদ উপস্থাপন করেছিলেন তা নিম্নরূপ–

১. **আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি :** আশয়ারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ বহু গুণের অধিকারী এবং তা চিরন্তন। এ গুণাবলি তাঁর সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁর সত্তা একক কিন্তু গুণাবলি বহুমুখী। তাঁর গুণাবলি সৃষ্টজীবের জন্য প্রযোজ্য নয়।

২. **আল্লাহর দর্শন :** পরকালে মুমিনগণ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

৩. **কুরআনের চিরন্তনতা :** আশয়ারীদের মতে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং চিরন্তন। শব্দ ও ধ্বনিতে বিকাশমান; কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে কুরআন অবিনশ্বর, অনন্তকাল থেকে কুরআন আল্লাহর পরম সত্তায় নিত্য বিরাজিত।

৪. **ইচ্ছার স্বাধীনতা :** আশয়ারীদের মতে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কিছুই করতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা না থাকলেও কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে।

৫. **কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে বিসংবাদ :** আশয়ারীরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে অনুযায়ী মানুষ কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকে।

৬. **ঐশীবাণী ও বিবেকের সংঘাত :** আশয়ারীদের মতবাদ হলো, চূড়ান্ত সত্য ও বাস্তবতা নির্ধারণে ঐশীবাণীর স্থান সর্বোচ্চ, যুক্তির কাজ হবে ঐশীবাণী কর্তৃক প্রদত্ত বিধিনিষেধের সহায়তা দান।

৭. **পুরস্কার ও শাস্তি :** আশয়ারীদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী পুণ্যবানকে শাস্তি এবং পাপীকে পুরস্কার দিতে পারেন। এটা একান্তই তাঁর ইচ্ছাধীন বিষয়; কিন্তু এরূপ করতে তিনি বাধ্য নন। যেমন–
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ.

৮. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** আশয়ারীরা মনে করেন, জীবিতদের দোয়া ও দান সদকার কারণে মৃতদের শাস্তি অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। যেমন হাদীসে এসেছে– أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ

৯. **মিরাজের ঘটনা :** আশয়ারীগণ মনে করেন, নবুয়তের দশম বছরে সশরীরে রাসূল (স)-এর মিরাজ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

১০. **নবীর সুপারিশ** : আশয়ারীরা বিশ্বাস করেন, কেয়ামত দিবসে রাসূল (স) গুনাহগার উম্মতের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন হাদীসে এসেছে–
يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

১১. **মৃত অবস্থায় দেহ সংযোজন** : আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মানবাত্মা সৃষ্টি করে যেমন তাকে দেহ দান করতে পারেন, তেমনি কেয়ামত দিবসে মৃতদেহে আত্মার সঞ্চার করবেন, এটাই তাদের বিশ্বাস।

১২. **যুক্তি ও অহী** : মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে অহী।

১৩. **আল্লাহর বিচার** : কেয়ামতের দিবসে বিচার ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার হাতে সীমাবদ্ধ। পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান তাঁর ইচ্ছাধীন। যেমন কুরআনের ঘোষণা– فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ ● :

মুতাযিলা ও আশয়ারীদের মাঝে আকিদাগত পার্থক্য : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো–

১. **আল্লাহর অস্তিত্ব** : মুতাযিলাদের মতে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন হলেও যুক্তিবাদের নিরিখে জটিল, নীরস ও আকর্ষণহীন। অপরদিকে আশয়ারীদের মতে, আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন ও আকর্ষণীয়।

২. **আল্লাহর গুণাবলি** : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর সত্তা চিরন্তন, অনাদি অনন্ত; কিন্তু তাঁর গুণাবলি অনিত্য, চিরপরিবর্তনশীল। আশয়ারীদের মতে, মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি উভয়ই চিরন্তন।

৩. **মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা** : মুতাযিলাদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা আছে। সে তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা নেই। তবে মানুষের কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে।

৪. **কুরআনের চিরন্তনতা** : মুতাযিলাদের মতে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত। অতএব এটা চিরন্তন নয়। আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, কুরআনের অস্তিত্ব অনন্তকাল ধরেই ছিল। কাজেই কুরআন চিরন্তন এবং আল্লাহর চিরন্তনতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

৫. **ভালোমন্দ ও সৎ অসৎ** : মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক, তাই তিনি সৎলোকদের পুরস্কার ও অপরাধীদের শাস্তি দেবেন এবং এরূপ করতে তিনি বাধ্য। অপরদিকে আশয়ারী সম্প্রদায় আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হলেও তারা মনে করেন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে বিপরীতও করতে পারেন।

৬. **আল্লাহর দর্শন লাভ :** মুতাযিলাদের মতে, কেয়ামত দিবসে ঈমানদারদের আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব নয়; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কেয়ামতে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব।

৭. **বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য :** মুতাযিলারা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন এবং এরিস্টটল উভয়ের মতবাদই স্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পূর্ণ নিস্তব্ধতায় বিরাজ করছিল। পরে আল্লাহ তায়ালা এতে গতির সঞ্চার করেন; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, বিশ্বজগৎ পরমাণুর তৈরি, তাই এটা নিয়ত পরিবর্তনশীল। কেননা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ۔

৮. **যুক্তি ও অহী :** মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী।

৯. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মুতাযিলারা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা নিরর্থক মনে করে; কিন্তু আশয়ারীরা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, জীবিতদের দোয়ার ফলে মৃতদের শাস্তি লাঘব হয়।

১০. **মিরাজের ঘটনা :** মুতাযিলাদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেননি, এটা একটা আধ্যাত্মিক ঘটনা মাত্র; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছিলেন।

১১. **মহানবীর সুপারিশ :** বাস্তববাদী মুতাযিলাদের মতে, বান্দা ভালো কাজ করলে বেহেশতে আর মন্দ কাজ করলে দোযখে যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে মহানবী (স)-এর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

১২. **কবীরা গুনাহকারী মুমিন :** মুতাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় কাফেরও নয়; বরং তার অবস্থান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনই থাকবে, তবে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।

১৩. **পুরস্কার ও শাস্তি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রাপ্য অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দিতে বাধ্য; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

উপসংহার : মুতাযিলারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা সবকিছু অহীর আলোকে বিবেচনা করেছে। সুতরাং আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদী মুতাযিলাদের চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও বলা যেতে পারে।

■ اَلسُّؤَالُ (٩١) : عَرِّفِ الْقَادِيَانِيَّةَ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيْفِ مُؤَسِّسِهَا وَ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ وَاُصُوْلِ عَقَائِدِهِمْ۔

■ **প্রশ্ন : ৯১ ॥ উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানী ও এর প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় দাও এবং তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কাদিয়ানী মতবাদ বলতে মিথ্যা নবুয়ত দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম জামায়াত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামায়াত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। তাদের পরিচয় ও আকিদার মূলনীতি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

تَعْرِيْفُ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানী মতবাদের পরিচিতি : ১. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط গ্রন্থকার বলেন–

اَلْقَادِيَانِيَّةُ نِحْلَةٌ دِيْنِيَّةٌ نُسِبَتْ اِلٰى مِرْزَا غُلَام اَحْمَد الْهِنْدِيِّ الْقَادِيَانِيِّ۔

অর্থাৎ, ভারতের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে সম্পর্কিত একটি সুবিধাবাদী দল হচ্ছে কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

২. اَلْمَوْسُوْعَةُ الْمُيَسَّرَة গ্রন্থে বলা হয়েছে–

اَلْقَادِيَانِيَّةُ حَرَكَةٌ نَشَأَتْ سَنَةَ ١٩٠٠ بِتَخْطِيْطٍ مِّنَ الْاِسْتِعْمَارِ الْاِنْجِلِيْزِ فِى الْقَارَّةِ الْهِنْدِيَّةِ بِهَدَفِ اِبْعَادِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ دِيْنِهِمْ وَعَنْ فَرِيْضَةِ الْجِهَادِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ۔

تَعْرِيْفُ مُؤَسِّسِ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানী মতবাদ প্রতিষ্ঠাকারীর পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী ও নিবেদিতপ্রাণ। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের সেবায় আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েকবার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি আরম্ভ করে।

৩ تَارِيْخُ نَشْأَةِ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানীদের উৎপত্তির ইতিহাস : ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ইংরেজরা অমানবিক নির্যাতন ও হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার পরেও যখন এ আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা এক ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তারা ভাবল এত কিছুর পরেও মুসলিমরা কেন বিদ্রোহ করছে। তাই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হলো। এ কমিশন প্রায় এক বছর ভারতবর্ষে বিচরণ করে পর্যবেক্ষণপূর্বক একটি রিপোর্ট তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করে। এতে বলা হয়েছিল মুসলিমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় নেতারা এ দেশকে دَارُ الْحَرْبِ (শত্রুর দেশ) ঘোষণা করে যুদ্ধ ফরয বলে ফতোয়া জারি করেছে। মুসলিমরা যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্মাদের মতো আত্মাহুতি দিতে পারে।

উক্ত রিপোর্টে যেসব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল তন্মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. দারিদ্র্যপীড়িত সর্বহারা মুসলিমদের একটি শ্রেণিকে উপঢৌকন ও উপাধি প্রদানের মাধ্যমে ব্রিটিশের অনুগত করে তুলতে হবে, যাতে তারা এ দেশকে দারুল আমান বলে ঘোষণা দেবে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপ্রয়োজন বলে বর্ণনা করবে।
২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের অধিকাংশ লোক পীর মাশায়েখ ভক্ত। বর্তমানে মুসলিমদের মধ্য থেকে ইংরেজদের আস্থাভাজন এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে পীররূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশপরম্পরায় ইংরেজদের আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত হয়। অতঃপর সে পীর নিজেকে নবী বলে দাবি করে এ বলে ঘোষণা দেবে, আমার নিকট এমর্মে অহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আল্লাহর রহমতস্বরূপ এবং অহীর দ্বারা আল্লাহ যুদ্ধকে হারাম করে দিয়েছেন।
৩. তথাকথিত সে নবী নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করবে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে সহযোগিতা করবে। এক সময় সে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে।

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার মুসলিমদের মধ্য হতে মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য মনোনীত করে।

তাই মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রথমে নিজেকে মুবাল্লিগ বলে পরিচয় দেয়। তারপর ১৮৮৮ সালে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা দেয়; তারপর মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে এ সকল দাবি থেকে একটু সরে এসে নিজেকে যিল্লি তথা ছায়ানবী বলে ঘোষণা দেয়; কিন্তু কুরআনে এমন কোনো ছায়া নবীর প্রমাণ নেই বলে প্রশ্ন উঠলে ১৯০১ সালে সে নিজেকে পূর্ণ নবী বলে ঘোষণা দেয় এবং কুরআনের সূরা আস সফ-এর ৬ নং আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তার দাবি প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। আয়াতটি হলো–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ.

অর্থাৎ, (হযরত ঈসা আ. বলেন) আর আমি সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহমাদ।

যেহেতু ঐ সময়টা ছিল ইংরেজ শাসনামল, তার নবুয়তের দাবি করাটাও ছিল তাদের নির্দেশে, তাই তার এ মতবাদ ভালোভাবে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে। তার ধোঁকায় পড়ে বহু সরলপ্রাণ মুসলিম কাদিয়ানী মতকে চিশতিয়া, কাদারিয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মতো একটি মতাদর্শ মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে।

أُصُوْلُ عَقَائِدِ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানীদের আকিদার মূলনীতিসমূহ : কাদিয়ানী আকিদার মূলনীতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ নবীও নন; বরং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে থাকবে। অতএব মির্জা গোলাম আহমাদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী। যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলিম নয়; কাফের।

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি ভাষায়, কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না।

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম এবং তার ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল।

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পয়গম্বর। খতমে নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদূদ।

৫. যুদ্ধ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা হারাম।

৬. হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। কেয়ামতের পূর্বে আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না।

৭. দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ।

৮. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ।

৯. বুরূজী যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো–
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছি যে, আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিল্লী বা বুরূজী নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১০. স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১১. মির্জা গোলাম আহমাদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি। এসব দাবির অনেকটা পরস্পরবিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন– মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী হওয়ার দাবি, রাসূল হওয়ার দাবি, তার নিকট অহী আসার দাবি, পড়ার মতো কুরআন নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, আহমাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হওয়ার দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর যেমন ৯৯টি নাম আছে তারও তেমন ৯৯টি নাম আছে বলে দাবি।

উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু ঐ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের ছিল, তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু। ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদও নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ বাতিল মতবাদ।

■ اَلسُّوَالُ (٩٢) : مَا هِيَ عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَقَائِدُ الْوَهَّابِيَّةِ وَعَقَائِدُ الْاَحْمَدِيَّةِ؟ بَيِّنْ حَقَّ التَّفْصِيْلِ۔

■ প্রশ্ন : ৯২ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা কী? যথাযথভাবে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]

او، عَرِّفْ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْوَهَّابِيَّةِ وَالْاَحْمَدِيَّةِ ـ ثُمَّ بَيِّنْ عَقَائِدَهُمْ مُفَصَّلاً۔

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের আকিদাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের ওপর অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর 'ওহাবী' ইসলামে বিশেষ কোনো ফেরকা তথা দল নয়। আহলুস সুন্নাতের সাথে ওহাবীদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। অপরদিকে ইসলামের নামে একটি অপদল হলো আহমাদিয়া মুসলিম জামায়াত, যারা কাদিয়ানী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তবে বর্তমানে এ সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম জামায়াত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামায়াত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। নিম্নে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ওহাবী ও কাদিয়ানীদের পরিচয় ও তাদের আকিদার মূলনীতি আলোচনা করা হলো।

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُغَةً :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আভিধানিক অর্থ :

اَهْل-এর অর্থ : اَهْلٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَهْلُوْنَ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاَقَارِبُ তথা নিকটাত্মীয়।
২. اَلْعَشِيْرَةُ তথা পরিবার পরিজন।
৩. اَلْاَصْحَابُ তথা সাথি।
৪. اَلسُّكَّانُ তথা অধিবাসী।
৫. اَلْمُسْتَحِقُّ তথা অধিকারী।
৬. اَلتَّابِعُ তথা অনুসারী।
৭. اَخَصُّ النَّاسِ তথা বিশেষ ব্যক্তি।
৮. عُضْوٌ তথা সদস্য।

سُنَّةٌ-এর অর্থ : اَلسُّنَّةُ শব্দটি س - ن - ن থেকে গৃহীত। سُنَّةٌ একবচন, বহুবচনে سُنَنٌ ; যেমন মহান আল্লাহর বাণী– قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلطَّرِيْقَةُ তথা পদ্ধতি।
২. اَلسِّيْرَةُ তথা আদর্শ।
৩. اَلْقَانُوْنُ তথা নীতিমালা।
৪. اَلشَّرِيْعَةُ তথা বিধান।
৫. اَلْمَوْرِدُ প্রণেতা বলেন– اَلْخَصْلَةُ তথা স্বভাব, اَلطَّبِيْعَةُ তথা প্রকৃতি।
৬. اَلنَّهْجُ তথা পদ্ধতি।

جَمَاعَة-এর অর্থ : اَلْجَمَاعَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْجَمَاعَاتُ এটা মূলধাতু ج - م - ع থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلْجَيْشُ তথা সৈন্যদল।
২. اَلْفِئَةُ তথা ছোট দল।
৩. اَلْحِزْبُ তথা দল।
৪. اَلْقَوْمُ তথা সম্প্রদায়।

সুতরাং اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর একত্রে অর্থ– সুন্নাতের অনুসারী দল।

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচয় সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আকীদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন–

هِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِيْ قَامَتْ عَلٰى طَرِيْقٍ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهٖ۔

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ اَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ۔

অর্থাৎ, চার মাযহাব ও তারা ব্যতীত তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا فِى الْعَقِيْدَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ اٰرَاءِ الْفَلَاسِفَةِ۔

অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে, তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন–

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَلْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَسُنَّةَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন।

মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যারা সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

⊃ عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

১. মুহাম্মাদ (স) শেষনবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে।

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের কোনো বিশেষত্ব নেই।

৪. হযরত মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন। তিনি ফাতেমা ও আলী (রা)-এর বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে।

৫. আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে– اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ۔

৬. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা।

৭. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

৮. নবী রাসূলগণ মাসুম। তাঁরা সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে তাঁদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে।

৯. কবীরা গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে ফাসেক বলা যাবে; কিন্তু কাফের নয়।

১০. রাসূল (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন।

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর বাণী– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মারা গেলেও চিরকাল দোযখে থাকবে না। কেননা হাদীসে এসেছে– مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

১৩. মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদে ভুল শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন।

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়।

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন।

১৬. সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী।

১৭. আল্লাহর গুণাবলি তাঁর অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তাঁর গুণাবলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক।

১৯. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ কাজের বিনিময় দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন– فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

২০. মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং আত্মা প্রশান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য– اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ

২১. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তবে লিখন, পঠন ও উচ্চারণ সৃষ্ট।

২২. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

১. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

২. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا.

২৩. বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ পরমাণুবাদের সমর্থক। তাই তাঁরা মনে করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল।

২৪. আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের স্রষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন করার ক্ষমতা আছে।

২৫. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী।

২৬. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করাকে তারা হারাম মনে করেন।

⊃ تَعْرِيْفُ الْوَهَّابِيَّةِ :

ওহাবীদের পরিচয় : 'ওহাবী' মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম। ওহাবীদের আকিদা সম্পর্কে জানার পূর্বে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদী (র) এবং 'ওহাবী আন্দোলন' সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা অত্যাবশ্যক। নিম্নে আবদুল ওহাব নজদী (র)-এর পরিচয় প্রদান করে ওহাবীদের আকিদা সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

আবদুল ওহাব নজদীর পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী : আবদুল ওহাব (র) ১৭০৭ মতান্তরে ১৭০৩ সালে আরবের নজদ প্রদেশের অন্তর্গত ওয়ায়না অঞ্চলের তামীম গোত্রের বনি সিনান শাখা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বসরা, বাগদাদ ও কুর্দিস্তানে বহু বছর বসবাস করেন। নাদির শাহের শাসনামলে (১১৪৮/১৭৩৬) তিনি ইস্পাহানে গমন করেন এবং এরিস্টোটলীয় দর্শন, ইশরাকিয়া মতবাদ ও সুফীতত্ত্ব

চর্চা করেন। সেখান থেকে তিনি কুম গমন করেন। এখানে তিনি হাম্বলী মাযহাবের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন। এখান থেকে তিনি তাঁর জন্মস্থান ওয়ায়নায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ'-এ লিপিবদ্ধ কট্টর তাওহীদ আশ্রিত মতবাদ প্রচার শুরু করেন। সেখানে তিনি নানা বাধার সম্মুখীন হলে পরিবার পরিজনসহ আরবের দারিয়ায় গমন করেন। দারিয়ার সর্দার মুহাম্মাদ ইবনে সউদ তাঁর চিন্তাধারা গ্রহণ করেন এবং তা সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এভাবে উক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তৃত্ব ইবনে সউদের হাতে থাকলেও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী (র) ধর্মীয় ব্যাপারে মূল নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসেন। ১৭৬৫ সালে ইবনে সউদের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র আবদুল আযীযও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব (র)-কে ধর্মীয় নেতারূপে বহাল রাখেন। একসময় ওহাবীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে অনেক উত্থান পতনের পর ১৯০৪ সালে ওহাবী নেতা আবদুল আযীয পুনরায় নজদে আধিপত্য অর্জন করতে সক্ষম হন এবং তারই বংশ অদ্যাবধি সৌদি আরব শাসন করে চলেছে। এই রাজকীয় পরিবার কর্তৃক মদদপুষ্ট ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়ে ওহাবী মতবাদ অগ্রসর হয়ে চলেছে। ১৭৮৭ সালে এই মহান সংস্কারক ইন্তেকাল করেন।

উল্লেখ্য, মিসর, ইরাক, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কিছু আলেমও তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। মুহাম্মাদ আবদুহু মিসরী, জামাল উদ্দীন আফগানী, খায়রুদ্দীন তিউনিসী, সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (ভারত), আমীর আলী (কলিকাতা) প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ঃ عَقَائِدُ الْوَهَّابِيَّةِ :

ওহাবীদের আকিদা : মূলত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও ওহাবীদের মধ্যে আকিদাগত মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে ওহাবী ও সুন্নী প্রশ্ন নিয়ে যে মতবিরোধ বা কোন্দল পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত রাজনৈতিক। এর কোনো আকিদাগত ভিত্তি নেই। ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল ওহাব নজদী (র) ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেম ও সংগ্রামী নেতা। তিনি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক, বিদয়াত প্রভৃতি নানা কুসংস্কার ও সর্বপ্রকার শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর এ অর্জিত সাফল্যের কারণে তদানীন্তন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদেরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের সূচনা করে। তাঁকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার নাম মুহাম্মাদ হওয়া সত্ত্বেও ওহাবী শব্দের আবিষ্কার করে এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, সাধারণ মানুষ ওহাবী বলতে ধর্মদ্রোহী বলে মনে করতে লাগল। বর্তমানে ইংরেজদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ এক শ্রেণির ধর্ম ব্যবসায়ী হকপন্থি আলেমগণকে হেয় করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ওহাবী শব্দটিকে মোক্ষম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে চলেছে। দেওবন্দী আলেমগণ এবং কিছু কিছু ইসলামী দল যেহেতু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং বিদয়াত ও সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাই ইংরেজদের ভাড়াটিয়া তথাকথিত আলেম, পীর ও কিছু সংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ওলামায়ে দেওবন্দ

এবং হকপন্থি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দলকে ওহাবী অনুসারী ও কাফের বলে প্রচার করে। অথচ ওলামায়ে দেওবন্দ ও হকপন্থি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী (র)-এর বিতর্কিত উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। ওহাবীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ :

ওহাবী আদর্শে বিশ্বাসী আলেমগণের সাথে অন্যান্য হকপন্থি আলেমদের যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. তাকলীদ বা অনুসরণ প্রসঙ্গ
২. তাসাওউফ প্রসঙ্গ
৩. দোয়ার মধ্যে অসীলা প্রসঙ্গ
৪. তাবিজ কবচ প্রসঙ্গ
৫. বুযুর্গানে দীন ও অলী আউলিয়াদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ
৬. রওযায়ে আতহার যেয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ।

তাঁদের মতে, ১. পীর মুরিদী নাজায়েয।
২. মহানবী (স)-এর রওযা যেয়ারত করার জন্য সফর করা নাজায়েয।
৩. ঝাড় ফুঁক ও তাবিজ কবচ দেয়া এবং তা ব্যবহার করা নাজায়েয।

একটি পর্যালোচনা : 'ওহাবী' শব্দটি মূলত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের উদ্ভাবিত একটি শব্দ। এ শব্দটি দ্বারা তারা মূলত আঠারো শতকের মধ্যভাগে জাযীরাতুল আরবে সৃষ্ট একটি আন্দোলনের অনুসারীদেরকে বুঝিয়ে থাকে। যে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (র)। আর এ আবদুল ওহাবের আন্দোলন ছিল মূলত শিরক, বিদয়াত এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের জুলুমের বিরুদ্ধে। আরব উপদ্বীপের যে অঞ্চলে নানা ধরনের কুসংস্কার, শিরক, বিদয়াত, বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামিক রুসুমাত তথা প্রথা, কবর পূজা, পীরকে সেজদা করা, কবর ও মাযারের নামে মানত করা ইত্যাদি ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল, সে অঞ্চলে তিনি এসব দূর করার জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাই ওহাবী আন্দোলন। তাঁর এ সংস্কারমূলক কর্মসূচিতে মুগ্ধ হয়ে দারিয়া অঞ্চলের এক প্রভাবশালী গোত্রপতি ও জমিদার মুহাম্মাদ ইবনে সউদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সূত্র ধরেই সউদ পরিবারের সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।

সউদ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর তার সংস্কার আন্দোলন আরো বেগবান হয়; কিন্তু ইংরেজ ও বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তার এ আন্দোলনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে। এমনকি এক শ্রেণির আলেমকে ক্রয় করে তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে তাকে কাফের বলে আখ্যা দেয়। এক্ষেত্রে ইংরেজদের পাশাপাশি ঐ আলেমরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আর সে ষড়যন্ত্র আজও অব্যাহত আছে। আজকের যুগে আমরা দেখছি, যারা ইসলামের খাঁটি আমলকারী, সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী জীবনবিধান সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করছে এবং পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে পথের দিশা দেয়ার জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তাদেরকেই ওহাবী ফতোয়া দিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদেরকে রাসূল বিদ্বেষী ও কাফের আখ্যা দিয়ে নিজেদেরকে রাসূলপ্রেমিক ও ইসলাম দরদি প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

تَعْرِيْفُ الْأَحْمَدِيَّةِ ১ :

আহমাদিয়াদের পরিচয় : আহমাদিয়া বা কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করেন। কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়।

عَقَائِدُ الْأَحْمَدِيَّةِ ১ :

আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা : কাদিয়ানী তথা আহমাদিয়া আকিদার মূলনীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ নবীও নন; বরং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তারপরও চলতে থাকবে। অতএব মির্জা গোলাম আহমাদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী। যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলিম নয়; বরং কাফের।

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি ভাষায়, কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না।

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম এবং তার ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল।

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পয়গাম্বর। খতমে নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদূদ।

৫. যুদ্ধ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা হারাম।

৬. হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। কেয়ামতের পূর্বে আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না।

৭. দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ।

৮. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ।

৯. বুরূজী যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো–
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছি যে, আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিল্লী বা বুরূজী নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১০. স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১১. মির্জা গোলাম আহমাদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি। এসব দাবির অনেকটা পরস্পরবিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন– মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী হওয়ার দাবি, রাসূল হওয়ার দাবি, তার নিকট অহী আসার দাবি, পড়ার মতো কুরআন নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, আহমাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ হওয়ার দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর যেমন ৯৯টি নাম আছে তারও তেমন ৯৯টি নাম আছে বলে দাবি।

উপসংহার : বিশ্বের হকপন্থি আলেমগণের মতে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও ওহাবী সত্যনিষ্ঠ ইসলামী দল। আর কাদিয়ানী একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, সেহেতু ঐ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। সুতরাং সকল মুসলমানের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দলভুক্ত হওয়া এবং আহমাদিয়া আকিদা বিশ্বাস ও তাদের দল হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

[মানবণ্টন : ৯টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ৬টির উত্তর লিখতে হবে– ১০ × ৬ = ৬০]

প্রথম অধ্যায়

আকিদা : পরিভাষা ও পরিচিতি

■ اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الْعَقَائِدِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ -

■ প্রশ্ন : ১ ॥ عَقَائِد-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আকাইদ ইসলামের মৌলিক একটি শাস্ত্র। ঈমানের প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে এ শাস্ত্র। পাশাপাশি অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও সীমালঙ্ঘন থেকে ঈমানকে সুরক্ষা দিতে আকাইদশাস্ত্র সাহায্য করে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

➲ عَقَائِد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْعَقَائِدِ لُغَةً :

عَقَائِد-এর আভিধানিক অর্থ : عَقَائِدُ শব্দটি عَقِيْدَةٌ-এর বহুবচন। এটা عَقْدٌ শব্দমূল থেকে গৃহীত। অভিধানবেত্তাদের নিকট عَقِيْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلْمَوْرِد অভিধানে এসেছে– বিশ্বাস, আস্থা, মতাদর্শ ইত্যাদি।

২. কারো মতে, عَقِيْدَةٌ অর্থ– قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– عَقَدَ الْبِنَاءَ তথা
اَلصَقَ بَعْضَ حِجَارَتِهِ بِبَعْضٍ بِمَا يُمْسِكُهَا فَاَحْكَمَ الصَاقَهَا -
অর্থাৎ, ইট পাথরের পারস্পরিক গাঁথুনির মাধ্যমে মজবুত ইমারত নির্মিত হয়েছে।

৪. এছাড়াও এর অর্থ হলো– পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ
অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩)

৫. ইংরেজিতে বলা হয়– Believe, Faith, Ideology ইত্যাদি।

مَعْنَى الْعَقَائِدِ شَرْعًا :

عَقَائِد-এর শরয়ী অর্থ : ১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلْعَقَائِدُ مَا يَقْصِدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ -

অর্থাৎ, আকাইদ এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার লিখেছেন–

هُوَ عِلْمٌ يَقْتَدِرُ بِهٖ عَلٰى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا۔

অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হয়।

৩. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর মতে–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِىْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ۔

অর্থাৎ, এটা মূলত মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে।

৪. প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইউমী বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنَ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِّنَ الشَّكِّ۔

অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। (বলা হয়) তার ভালো আকিদা আছে অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ اَلْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهٖ۔

অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি আরো বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ كَعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে হয়। যেমন– আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. ইবনে খালদুন (র)-এর মতে, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদ বলা হয়।

৭. আল ফারাবী (র) বলেছেন, এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে।

৮. মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, এটা এমন ইলম, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক।

৯. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ গ্রন্থকারের মতে, عَقِيْدَة অর্থ–

مَا يُصَدِّقُهُ الْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ۔

১০. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِىَ الَّتِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهٖ اَلْجِنِّ وَالْاِنْسِ۔

১১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–

اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِىْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে।

১২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়।

১৩. বস্তুত আকাইদ দীনি বিশ্বাসের ঐ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়।

উপসংহার : ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতাবহির্ভূত হয়ে পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায়। এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং এর সংরক্ষণ সকলের একান্ত কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٢) : مَا هُوَ غَرَضُ عِلْمِ الْعَقَائِدِ وَمَا مَوْضُوْعُهُ؟ بَيِّنْ بِالْإِيْجَازِ۔

■ প্রশ্ন : ২ ॥ আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আকাইদ ইসলামের মৌলিক একটি শাস্ত্র। ঈমান তথা বিশ্বাস বিষয়ক এ শাস্ত্রটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ঈমানের প্রকৃতি কোন কোন বিষয়ে, কিভাবে এবং কতটুকু ঈমান জরুরি, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দান করে এ শাস্ত্র। পাশাপাশি অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও সীমালঙ্ঘন থেকে ঈমানকে সুরক্ষা দিতে আকাইদশাস্ত্র সাহায্য করে। নিম্নে প্রশ্নালোকে আকাইদের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো।

❍ غَرَضُ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের উদ্দেশ্য : আকাইদশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবনে শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত থাকা এবং পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা। এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি আকাইদশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) আকাইদশাস্ত্রের পাঁচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন :** ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় আকাইদের উদ্দেশ্য হলো– اَلتَّرَقِّىْ مِنْ عُقْدَةِ التَّقْلِيْدِ اِلٰى ذَرْوَةِ الْاِيْقَانِ অর্থাৎ, অনুকরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া।

২. **বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন :** ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার মাধ্যমে ইসলামী আকিদাকে ত্রুটিমুক্ত রাখা।

৩. **বাতিলপন্থিদের মোকাবেলা :** বাতিলপন্থিদের সন্দেহ সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদাসমূহকে রক্ষা করা। তাঁর মতে–

حِفْظُ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ وَهِىَ عَقَائِدُهُ عَنْ تَزَلْزُلِهَا شُبَهِ الْمُبْطِلِيْنَ ـ

৪. **নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন :** কর্মসম্পাদনে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম বা আমল গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন তাঁর বক্তব্য–

وَهُوَ حُجَّةُ النِّيَّةِ بِاِخْلَاصِهِمْ فِى الْاَعْمَالِ وَحُجَّةُ الْاِعْتِقَادِ بِقُوَّتِهِ فِى الْاَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْاَفْعَالِ اَنَّ بِهَا يُرْجٰى قَبُوْلُ الْعَمَلِ ـ

৫. **শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভাবন :** তাঁর মতে– وَهُوَ اَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ অর্থাৎ, এ শাস্ত্রের ভিত্তিতে শরয়ী বিষয়সমূহ রচিত হবে।

বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে আমলের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকাইদের মূল উদ্দেশ্য।

مَوْضُوْعُ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের বিষয়বস্তু : আল্লামা কাযী আবদুদ্দীন আবদুর রহমান اَلْمُوَافِق গ্রন্থে আকাইদশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **অধিকাংশ মুসলিম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য :** তাঁদের মতে আকাইদের বিষয়বস্তু হলো– اَلْمَعْلُوْمُ مِنْ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ تَعَلُّقًا قَرِيْبًا اَوْ بَعِيْدًا অর্থাৎ, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দীনি আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে।

২. **কাযী আরমুভীর বক্তব্য :** কাযী আরমুভী (র) বলেন–

ذَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَغْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ اَعْنِىْ عَنْ صِفَاتِهِ الثُّبُوْتِيَّةِ وَالسَّلْبِيَّةِ ـ

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সত্তা। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত গুণাবলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ আকাইদশাস্ত্রে মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণের আলোচনা করা হয়।

৩. **ইমাম গাযালীর বক্তব্য :** তাঁর মতে– اَلْمَوْجُوْدُ عَلَى الْاِطْلَاقِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিত্বশীল বস্তুই হলো এর আলোচ্য বিষয়। কারণ ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিত্বশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

উপসংহার : ইসলামে আকিদা তথা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতাবহির্ভূত হয়ে পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায়।

■ اَلسُّؤَالُ (٣) : بَيِّنْ تَارِيْخَ تَدْوِيْنِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ مُخْتَصَرًا ـ

■ প্রশ্ন : ৩ ॥ আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যেমন– আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর গুণাবলি, রিসালাত ইত্যাদি বিষয়ে যারা ভ্রান্তি ছড়াতে চায়, তাদের গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত যুক্তির মোকাবেলায় তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মুসলিম উম্মাহর নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ আকিদা সংরক্ষণপূর্বক ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করার নিমিত্ত উদ্ভব হয়েছিল আকাইদশাস্ত্রের। নিম্নে আকাইদ সংকলনের ইতিহাস আলোচনা করা হলো।

تَارِيْخُ تَدْوِيْنِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস : নিম্নে আকাইদশাস্ত্র সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হলো–

১. **খেলাফতের অবসান :** ইসলামী খেলাফতের অবসানের ফলশ্রুতিতে মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যথার্থভাবে খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল মতবিরোধের শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্রে আদৌ বর্তমান ছিলো না।

২. **রক্তক্ষয়ী সংঘাত :** হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের শেষদিকে কতিপয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগের সূত্র ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে হক এবং কে বাতিলের পথে আছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তী সময়ে কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ লাভে সহায়তা করে।

৩. **অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব :** উপরিউক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় ঐক্যে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও মতবিরোধের ফলে অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে থাকে। ইরাকের কুফা এসব ফেরকাবাজের একটি বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ বনি উমাইয়া এবং পরে আব্বাসীয়রা তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে। অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, এসবের মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা। যথা– শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাযিলা।

৪. **বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ :** উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সাথে মিলিত হলে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে। ফলে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটান।

৫. **আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা :** আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। তাদের অবাধ শিক্ষানীতির ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহুদি খ্রিস্টানসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী পণ্ডিতরা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে দ্বন্দ্ব বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর 'বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রিক, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।
খলিফা মামুন ছিলেন গ্রিক দর্শন এবং যুক্তিবাদে প্রভাবান্বিত। তিনি মুতাযিলা ধর্ম দর্শনের সহযোগিতা শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা মুতাসিম এবং ওয়াসিক মুতাযিলা ধর্মমত গ্রহণ করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। তাদের প্রকাশ্য সহযোগিতায় মুতাযিলা সম্প্রদায় গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ, কুরআনসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে অবাঞ্ছিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে।

৬. **আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :** উপরিউক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে চরম বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে মানুষ যখন বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী একদল সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেম উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রসর হন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'আল ফিকহুল আকবার'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান করেন।

ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সাল্যাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত।

তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক শাস্ত্র আকাইদ তথা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়।

উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

■ اَلسُّؤَال (٤) : اُكْتُبْ اُصُوْلَ الْعَقِيْدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالْإِيْجَازِ۔

■ **প্রশ্ন : ৪ ॥ ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ।** [ফা. প. ২০১৬]

اَوْ اُكْتُبْ اُصُوْلَ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ بِالْاِيْجَازِ۔

অথবা, সহীহ আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১৪]

اَوْ مَا هِيَ الْاُمُوْرُ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَعْتَقِدَ بِهَا؟ اُكْتُبْ بِاَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

অথবা, মুসলিমদের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আন্তরিক বিশ্বাস করার নাম ইসলামী আকিদা। নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মধ্যেই রয়েছে ইহ-পরকালীন সাফল্য। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

اُصُوْلُ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ :

সহীহ আকিদার মূল উৎসসমূহ : সহীহ তথা ইসলামী আকিদার মূল বিষয় বা উৎস মোট ছয়টি। যথা–

১. **اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস :** মহান আল্লাহর সত্তা গুণাবলির প্রতি যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করা আকিদার মূল বিষয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ الخ۔

٢۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ الخ۔

٣۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الخ۔

২. **اَلْاِيْمَانُ بِالْمَلٰئِكَةِ তথা ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস :** কুরআন ও হাদীসে ফেরেশতাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাঁরা নূরের তৈরি, আল্লাহর হুকুম পালনে সদা প্রস্তুত। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস আকিদার মূল বিষয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ۔

٢۔ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ۔

৩. **اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস :** আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে নবী রাসূলদের মনোনীত করে তাদের ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করা আকিদার মূল বিষয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى۔

٢۔ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ۔

৪. **اَلْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ তথা রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস :** ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান একটি অপরিহার্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔

٢۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ۔

৫. اَلْاِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ **তথা আখেরাতের ওপর বিশ্বাস :** পরকালীন জীবনই আসল জীবন। এর শুরু আছে, শেষ নেই; হাশর নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, মীযান, সিরাত, হাউজ ইত্যাদি এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

١. مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ. ٢. وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

৬. اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ **তথা তাকদীরের ওপর বিশ্বাস :** মুমিন বিশ্বাস করবে যে, এ বিশ্বের ভালোমন্দ, আনন্দ কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ.

আল কুরআন ও হাদীসে এসব উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। যেমন–

١. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ.

٢. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

ঈমানের পরিচয়ে সর্বশেষ শর্ত হিসেবে তাকদীরের ভালো বা মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা উল্লিখিত হয়েছে।

ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই ইসলামী আকিদার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হিসেবে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যথা–

৭. اَلْاِيْمَانُ بِمُعْجِزَةٍ তথা মুজিযাসমূহের ওপর বিশ্বাস।

৮. اَلْاِيْمَانُ بِالْمِعْرَاجِ তথা মিরাজের ওপর বিশ্বাস।

উপসংহার : ইসলামী আকিদার উৎসমূল হলো আল কুরআন ও হাদীসে বিবৃত বিষয়াবলি। এর মধ্যে উপরোল্লিখিত আটটি বিষয় ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাসের মূলভিত্তি। এসব মূলভিত্তির ওপর ইসলামের সুবিশাল ইমারত নির্মিত হয়। ইসলামের এসব মৌলিক বিষয়ের ওপর দৃঢ় ঈমান রাখা প্রতিটি মুমিনের মুখ্য ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এসব বিষয়ে সংশয়, সন্দেহ বা অবিশ্বাস মুমিনকে কুফরীতে নিপতিত করে।

■ **اَلسُّؤَالُ (٥) : اُذْكُرْ اَهَمِّيَّةَ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ مُخْتَصَرًا.**

■ **প্রশ্ন : ৫ ॥ সংক্ষেপে ইসলামী আকিদার গুরুত্ব আলোচনা কর।**

اَوْ. بَيِّنْ اَهَمِّيَّةَ الْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ بِالْاِيْجَازِ.

অথবা, বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা। নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার মধ্যেই রয়েছে ইহ ও পরকালীন সফলতা। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

➲ **اَهَمِّيَّةُ الْعَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ :**

ইসলামী আকিদার গুরুত্ব : ইসলামী আকিদার গুরুত্ব নিম্নরূপ–

১. **নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদত :** ইসলামী আকিদা প্রতিটি মুসলিমকে নিরঙ্কুশভাবে এবং শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায়। মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যও তাই। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে ইরশাদ করেন–

১- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنِ -

২- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ -

৩- وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ -

২. **দৃঢ় ঈমান অর্জন :** ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন মুসলিমদেরকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا -

বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৩. **মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড ঐক্য অর্জন :** নির্ভেজাল ইসলামী আকিদার ফলে মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর চিন্তার পারস্পরিক অবধারণগত বৈসাদৃশ্য, দ্বন্দ্ব, দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, বিতর্ক ও হানাহানি দূর হতে পারে। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট সম্মান্য হয়ে উঠতে পারে। রাসূল (স) এ বিষয়ে বলেন–

১- اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا -

২- مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৪. **পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ :** বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের নির্দেশনা প্রদান করে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) قَالَ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -

বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে শিরক থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً -

৫. **একত্ববাদের যথার্থ শিক্ষা :** আকাইদশাস্ত্র একত্ববাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে সাহায্য করে। এর দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে। মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয়। আল কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

উপসংহার : বিশুদ্ধ আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আকিদাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন অতীব জরুরি। মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক ঐক্য অর্জনে এর বিকল্প নেই। পৃথিবীতে শান্তি ও সাফল্য এবং পরকালে আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য আকিদার বিশুদ্ধতা অত্যন্ত জরুরি।

■ اَلسُّؤَالُ (٦) : مَا مَعْنَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ ـ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ بَيِّنْ ـ

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ اِيْمَان ও اِسْلَام-এর অর্থ কী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : একত্ববাদী জীবনবিধান ইসলামে ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শব্দদ্বয় আভিধানিকভাবে ভিন্ন হলেও পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক। ঈমান ব্যতীত যেমন ইসলাম হয় না তেমনি ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। এক বিচারে এ শব্দদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْإِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْأَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা সত্যায়ন করা।
২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া।
৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা।
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া।
৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

مَعْنَى الْإِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামার মতে–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهِ ـ

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ

অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَان বলা হয়।

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهِ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ ـ

৪. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ بِهِ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا ـ

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ ـ

اِسْلَام-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْلَامِ لُغَةً :

اِسْلَام-এর আভিধানিক অর্থ اِسْلَام শব্দটি سَلْم শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– وَاِذْ قَالَ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে– اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা।

৬. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৭. اَلْقُبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

مَعْنَى الْاِسْلَامِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْلَام-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ۔

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى۔

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

اَلْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ)۔

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে–

هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقُبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ)۔

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقُبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ۔

৭. فَيْضُ الْبَارِىْ গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا۔

৩ الْفَرْق بَيْنَ الْاِيْمَان وَالْاِسْلَام :

ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য :

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার আভিধানিক পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. ঈমান অর্থ হলো– অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ইসলাম অর্থ হলো– বিনয়াবনত হওয়া।

২. اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ الْبَاطِنِىُّ وَالْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষাগত পার্থক্য বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– اِيْمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে তিন রকম নিসবত রয়েছে। যথা–

১. تَرَادُفٌ : অর্থাৎ اِيْمَان ও اِسْلَام এক ও অভিন্ন। এ দিক থেকে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন। এর দলীল হচ্ছে–

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

এখানে মুমিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারকে বোঝানো হয়েছে।

২. تَبَايُنٌ : কতিপয় আলেমের মতে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে।

দলীল : তাঁদের দলীল হলো–

١۔ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۔ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ۔

٢۔ اَلْاِيْمَانُ فِعْلُ الْقَلْبِ وَالْاِسْلَامُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ۔

৩. কেউ কেউ বলেন, ঈমান ও ইসলামের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق-এর সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান হলো عَامّ আর ইসলাম হলো خَاصّ; অতএব كُلُّ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়, তবে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন–

اِنَّهُمَا كَالْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ ۔ اِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا ۔

ঈমান ও ইসলাম ফকির ও মিসকিন সদৃশ। অর্থাৎ ফকির ও মিসকিন শব্দদ্বয় যদি একত্রে ব্যবহার হয়, তখন দুটি অর্থ হয়ে থাকে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হয়, তখন উভয়ের একটি অর্থ হয়ে থাকে। ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কও তদ্রূপ।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–

هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ ۔ فَالْاِيْمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ۔

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে।

■ السؤال (٧) : هل الايمان يزيد وينقص؟ وما رأيك؟ بين اختصارا ـ

■ **প্রশ্ন : ৭ ॥ ঈমান কি হ্রাস বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৫]

او۔ هل الايمان يزيد وينقص؟ وما الاختلاف فيه بين العلماء؟

অথবা, ঈমান কি হ্রাসবৃদ্ধি পায়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?

او۔ اثبت بالادلة ان الايمان لا يزيد ولا ينقص مع الرد على المخالفين ـ

অথবা, বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে দলীল দ্বারা প্রমাণ কর, ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি পায় না।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানব জীবনে ঈমান হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোনো আমলই মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়ার বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। তবে এটি শাখামূলক মাসয়ালা। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

⊃ هل الايمان يزيد وينقص ام لا :

ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যথা–

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে العقائد النسفية প্রণেতা আল্লামা ওমর আন নাসাফী (র) বলেন– الايمان لا يزيد ولا ينقص অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি দেখান যে, যেহেতু ايمان হলো শুধু تصديق بالقلب; সেহেতু ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা قلب হলো بسيط জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করবে না। পবিত্র কুরআনেও ايمان এবং عمل-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন–

১. কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ـ

এখানে عمل-কে ايمان-এর ওপর عطف করা হয়েছে। আর عطف-এর মধ্যে معطوف ও معطوف عليه দুটি ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে।

২. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে–

من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن ـ

অত্র আয়াতেও عمل বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে شرط করা হয়েছে। আর شرط এবং مشروط ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৩. মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ـ

৪. নবী করীম (স) وفد ثقيف-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন–

زيادته كفر ونقصانه شرك ـ

সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

খ. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, الايمان يزيد وينقص। অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

দলীল : ইমামত্রয়ের দলীল নিম্নরূপ–

১. তাঁদের মতে, عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

১ـ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا ـ

٢ـ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ ٣ـ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ـ

২. রাসূল (স) বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

এখানে عَمَل-কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই।

আলোচ্য আয়াতগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

গ. মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে।

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়, উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং كَمَال তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান হলো যা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এতে হ্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ঘ. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি হয়, তবে ঘাটতি হয় না।

رَائِىْ عَلٰى هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ : এ মাসয়ালার ব্যাপারে আমার অভিমত : ঈমানের মূল অংশে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না; বরং ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

উপসংহার : মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত দীনে হকের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনই হলো ঈমান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি কাজে ঈমানের প্রতিফলন ঘটানো আমাদের একান্ত কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٨) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ؟

■ প্রশ্ন : ৮ ॥ ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়? [ফা. প. ২০১২]

اَوْ ـ مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

অথবা, ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাকি? বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ বিশ্বজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ওপর অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। মূলত ঈমানই হলো মুমিনের মূলধন। মুমিন দাবিদার ব্যক্তির অন্তরে এর মর্যাদা উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, মুমিন ব্যক্তির অন্তরে বিদ্যমান ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

اِيْمَان-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اِيْمَان শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার; اَمْن মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা বিশ্বাস করা। ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।

৩. اَلْوُثُوقُ তথা নির্ভর করা। ৪. الاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া।
৫. رَائِدُ الطُّلاَّبِ অভিধান প্রণেতার মতে- الاِيْمَانُ اِعْتِقَادٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

مَعْنَى الْاِيْمَانِ اِصْطِلاحًا :

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

১. ইমাম গাযালী (র) বলেছেন- اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ, মহানবী (স) যা নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর সত্যতা জ্ঞাপন করতঃ তাকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

২. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهٖ جَمِيْعًا অর্থাৎ, নবী করীম (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

৩. ইমাম রাযী (র) বলেন-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا جَاءَ بِهٖ.

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَهٗ

৫. ইমামত্রয়ের মতে- هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ

৬. কাররামিয়াদের মতে- اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْاِقْرَارُ بِكَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ

৭. মুতাযিলাদের মতে- اَلْاِيْمَانُ هُوَ مُرَكَّبٌ بِالْاِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ وَالْاِقْرَارِ

اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَمْ لاَ ؟

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মত বর্ণনা করে عَقَائِدُ النَّسَفِىِّ প্রণেতা আল্লামা লোকমান নাসাফী (র) বলেন- اَلْاِيْمَانُ لاَ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রকম থাকে।

দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু اِيْمَان হলো শুধু تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ সেহেতু عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ ঈমানের মধ্যে গণ্য নয়। তাই ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। কেননা قَلْب হলো بَسِيْط জিনিস। যার মধ্যে কোনো অংশ নেই। অতএব আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনেও اِيْمَان এবং عَمَل-কে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন-

ক. আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

এখানে عمل-কে ايمان-এর ওপর عطف করা হয়েছে। আর عطف উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে।

খ. অনুরূপ অন্য আয়াতে এসেছে-

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

অত্র আয়াতেও আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্তারোপ করা হয়েছে। আর شرط ও مَشْرُوْط ভিন্ন ভিন্ন হয়।

গ. মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

انْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ ـ

ঘ. নবী করীম (স) وَفْد ثَقِيْف-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন–

زِيَادَتُهُ كُفْرٌ وَنُقْصَانُهُ شِرْكٌ ـ

ঙ. ঈমান قَلْب-এর মধ্যে থাকে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ ـ

যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক। সুতরাং উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

২. **ইমামত্রয়ের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

দলীল : তাঁদের মতে, عَمَلٌ بِالْاَرْكَان ঈমানের মধ্যে গণ্য। সুতরাং আমলের হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। যেমন–

ক. মহান আল্লাহ বলেন–

১. هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا ـ

২. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ ٣ـ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ـ

খ. রাসূল (স) বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

এখানে عمل-কে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে আমরা দেখতে পাই।

গ. রাসূল (স) আরো বলেন– الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসগুলো দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমলের হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে ঈমানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

৩. **মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত :** মুতাযিলা ও খারেজীদের মতেও ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তারাও উল্লিখিত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে।

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়–

ক. উল্লিখিত প্রমাণাদিতে বৃদ্ধি ও কমতি দ্বারা ঈমানের মূল অংশকে বোঝানো হয়নি; বরং كمال তথা পূর্ণতার ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এটা বোঝানো হয়েছে। কেননা মূলত ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, আর দৃঢ়বিশ্বাসই ঈমান। এতে হ্রাসবৃদ্ধির অবকাশ নেই, যা প্রথমোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

খ. زيادة ও نقصان দ্বারা زيادة نُور ও نقصان نُور উদ্দেশ্য।

গ. زيادة ও نقصان দ্বারা ঈমানের قُوَّة ও ضُعْف উদ্দেশ্য; হ্রাসবৃদ্ধি নয়।

উপসংহার : ঈমানের মধ্যে কোনো প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। তবে عمل-এর মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٩) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ؟

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। কেননা আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান এবং সে অনুপাতে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। মূলত এতদুভয়ের একটি অপরটির পরিপূরক। নিম্নে ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ :

ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য :

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার আভিধানিক পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. ঈমান অর্থ হলো, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ইসলাম অর্থ হলো, বিনয়াবনত হওয়া।

২. اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ الْبَاطِنِىُّ وَالْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ.

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষাগত পার্থক্য বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো– اِيْمَان ও اِسْلَام-এর মাঝে তিন রকম নিসবত রয়েছে। যথা–

১. تَرَادُف : অর্থাৎ اِيْمَان ও اِسْلَام এক ও অভিন্ন। এ দিক থেকে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম মুমিন। এর দলীল হচ্ছে–

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

এখানে মুমিন ও মুসলিম বলতে একই পরিবারকে বোঝানো হয়েছে।

২. تَبَايُن : কতিপয় আলেমের মতে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে।

দলীল : তাঁদের দলীল হলো–

١ـ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ـ

٢ـ اَلْاِيْمَانُ فِعْلُ الْقَلْبِ وَالْاِسْلَامُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ ـ

৩. কেউ কেউ বলেন, ঈমান ও ইসলামের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق-এর সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান হলো عَامّ আর ইসলাম হলো خَاص; অতএব كُلُّ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়, তবে প্রত্যেক মুমিন মুসলিম।

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন–

اِنَّهُمَا كَالْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ ـ اِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا ـ

اِيْمَان ও اِسْلَام শব্দ مِسْكِيْن ও فَقِيْر শব্দদ্বয়ের ন্যায়। অর্থাৎ ফকির ও মিসকিন শব্দদ্বয় যদি একত্রে ব্যবহার হয়, তখন দুটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। আর যদি পৃথক পৃথক স্থানে ব্যবহার হয়, তখন উভয়ের একটি অর্থ হয়ে থাকে। ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কও তদ্রূপ।

৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে–

هُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَا يَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ. فَالْاِيْمَانُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْاِسْلَامُ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْاِيْمَانِ.

অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম পিঠ ও পেটের ন্যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে অন্যটি হতে আলাদা করা যায় না। অতএব ঈমানকে যেমন ইসলাম থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ইসলামকেও ঈমান থেকে পৃথক করা অসম্ভব।

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে।

■ **السُّؤَالُ (١٠) : هَلِ الْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ مُتَّحِدَانِ اَمْ مُخْتَلِفَانِ؟ بَيِّنْ بِالْاَدِلَّةِ.**

■ **প্রশ্ন : ১০ ॥ ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলিলসহ বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৮]

اَوْ هَلِ الْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ مُتَغَايِرَانِ اَمْ مُتَّحِدَانِ؟ هَلْ يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ؟

অথবা, ঈমান ও ইসলাম কি ভিন্ন জিনিস না এক? কারো জন্য 'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' বলা বৈধ কিনা?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। কেননা আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান এবং সে অনুসারে জীবন গঠন করাকে ইসলাম বলা হয়। প্রশ্নালোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

هَلِ الْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ مُتَّحِدَانِ اَمْ لَا :

اِيْمَان ও اِسْلَام এক জিনিস না ভিন্ন জিনিস : ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস না ভিন্ন জিনিস, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম বুখারী ও নাসাফী (র)-এর মতে– اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَّحِدَانِ

অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। সুতরাং তাদের মতে, প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন।

দলীল : তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন–

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মুমিন ও মুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস।

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও মুহাক্কিকীনের মতে–

اَلْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ.

অর্থাৎ, ঈমান ও ইসলাম উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, তবে একটি অপরটির পরিপূরক।

দলীল : তাঁরা দলীল হিসেবে বলেন–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا ـ

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ঈমান ও ইসলামের মধ্যে عَامّ خَاص-এর সম্পর্ক রয়েছে একথা বলার পর বলেন, ঈমান হচ্ছে عَامّ আর مُطْلَق ইসলাম হচ্ছে خَاص। যেমন– فَكُلّ مُؤْمِنٍ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَكُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ

حُكْمُ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ :

'ইনশাআল্লাহ আমি মুমিন' একথা বলার বিধান : কোনো ব্যক্তি تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ তথা অন্তরের বিশ্বাস এবং اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ তথা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যদি সে বলে, আমি নিঃসন্দেহে মুমিন, তবে একথা বলা তার পক্ষে যথার্থ হবে; কিন্তু সে যদি বলে– اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আমি ইনশাআল্লাহ মুমিন, তবে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা–

ক. এরূপ বলার অর্থ হলো ঈমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। এরূপ ঈমান গ্রহণ কখনো শুদ্ধ হতে পারে না।

খ. এতে ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ পায় না।

গ. ঈমান প্রকাশের জন্য দৃঢ়তার প্রয়োজন; اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বললে ব্যক্তিগতভাবে বক্তার اِيْمَان-এর পরিচয় প্রকাশ পায় না। তাই اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া অনুচিত।

উপসংহার : ঈমান ও ইসলাম পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অবস্থার নাম। আন্তরিকভাবে গৃহীত ইসলামকে ঈমান বলে, আর ইকরার ও আমল সহকারে ঈমানকে ইসলাম বলে। সুতরাং বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয় সাধনের পর اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে দুর্বলতা প্রকাশ করা অনুচিত।

■ اَلسُّؤَالُ (١١) : هَلِ الْاِيْمَانُ مُرَكَّبٌ اَمْ بَسِيْطٌ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؟

■ প্রশ্ন : ১১ ॥ ঈমান যৌগিক নাকি মৌলিক বিষয়? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ইসলামের একক ভিত্তিসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। এটি বিশ্বাস ও আস্থাগত বিষয়। ঈমান যৌগিক তথা সমষ্টিগত বিষয়, না মৌলিক বা একক বিষয়, তা নির্ণয়ে ইমামদের একাধিক অভিমত রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

اَلْاِيْمَانُ مُرَكَّبٌ اَمْ بَسِيْطٌ :

ঈমান যৌগিক না একক বিষয় : ১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, ঈমান بَسِيْط তথা মৌলিক বিষয়। কারণ তাঁর মতে, শুধু تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ-কে ঈমান বলা হয়। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হলো, অন্তর হচ্ছে بَسِيْط; সুতরাং অন্তরে যা থাকবে তাও بَسِيْط হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, মালেক ও ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, ঈমান اُمُوْر ثَلٰثَة তথা تَصْدِيْق ,اِقْرَار ও عَمَل-এর সমষ্টিগত বিষয়। তবে তারা বলেন– تَارِكُ الْعَمَلِ কাফের হবে না এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি فَاسِق তথা মহাপাপী হয়; কিন্তু ঈমানহারা হয় না। তওবা করার পর আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

৩. খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন– اِيْمَان হচ্ছে مُرَكَّبٌ তথা সমষ্টিগত বিষয়। আর তা হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করা। তাঁদের মতে, ফরয আমল বর্জনকারী ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে।
৪. মুরজিয়াদের মতে, اِيْمَان হচ্ছে– تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ ও اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ-এর সমষ্টির নাম।
৫. জাহমিয়াদের মতে, اِيْمَان হলো بَسِيْطٌ তথা অবিমিশ্র বিষয়। আর তা হচ্ছে শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। এজন্য কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে; সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না।
৬. কেউ কেউ বলেন– اِيْمَان হলো আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং যাবতীয় ফরয ও সুন্নাত আমলের সমষ্টি। যার আমলে যতটুকু ত্রুটি থাকবে তার ঈমান ততটুকু অপূর্ণাঙ্গ হবে।

উপসংহার : ঈমান হলো বিশ্বাসগত বিষয়, যা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। আর মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমানের শর্ত। এ আমল হলো ঈমানের পূর্ণতা দানকারী।

■ السؤال (١٢) : اُكْتُبْ تَارِيْخَ نَشْأَةِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ مُخْتَصَرًا.

■ প্রশ্ন : ১২ ॥ সংক্ষেপে আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে নির্ভেজাল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বাসগত সমস্যা হলে পরকালীন মুক্তিও সংশয়পূর্ণ থেকে যায়। এমনকি ঈমানও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে নির্ভেজাল বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমলের ব্যাখ্যা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিকভাবে। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো।

تَارِيْخُ نَشْأَةِ عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস : বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও তার মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এ পর্যায়ে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) রচনা করেন 'আল ফিকহুল আকবার'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিকের নির্যাতনের শিকার হন। এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে এগিয়ে আসেন একদল ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, মূলভিত্তি সেটিই যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত।

তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক কালে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মা-ওয়ারাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)-এ আরেক চিন্তাবিদ

শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদ (আল কালাম) শাস্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক শাস্ত্র আকাইদ বা কালামশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়।

উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٣) : اُكْتُبْ عَشَرَةَ كُتُبٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيْدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَعَ ذِكْرِ مُؤَلِّفِيْهَا۔

■ প্রশ্ন : ১৩ ॥ লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের নাম লেখ। [ফা. প. ২০১৯]

اَوْ هَاتِ عَشَرَةَ كُتُبٍ الَّتِىْ اُلِّفَتْ عَلَى الْعَقَائِدِ مَعَ ذِكْرِ اَسْمَاءِ مُؤَلِّفِيْهَا۔

অথবা, আকিদাবিষয়ক দশটি গ্রন্থ গ্রন্থকারের নামসহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]

اَوْ۔ اُذْكُرِ الْكُتُبَ الْمُهِمَّةَ لِعِلْمِ الْعَقَائِدِ۔

অথবা, আকিদাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আকিদার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব এবং যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে ব্যাপক কলমযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। এসব বিষয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

⊃ اَلْكُتُبُ الْمُهِمَّةُ لِاَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عِلْمِ الْعَقَائِدِ :

আকাইদশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাতের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ : বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের আকিদা সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ইমাম আযম আবু হানীফা (র) কলম ধারণ করেন। তিনি اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে আকিদাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তিনি ১০টি বিষয়ে ইসলামের আকিদা উপস্থাপনের পাশাপাশি ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। এরপর 'ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা' নামে তাঁর আরেকটি গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থটিতে ২৭ দফাসংবলিত আকিদা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় 'আল ফিকহুল আকবার' নামে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ আকাইদ গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থে প্রধানত আল্লাহর স্বরূপ বা যাত ও তাঁর চিরন্তন গুণরাজি সম্বন্ধে মুতাযিলীদের মতবাদের জবাব প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আকাইদের আলোচনায় দার্শনিক রীতির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। আকাইদের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ব্যাপারে এরিস্টটলের ত্রয়ী মতবাদ (Triad) তথা ওয়াজিব, মুমকিন বা জায়েয এবং মুসতাহিল (অসম্ভব) তর্ক, এ তিনটি শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করা হয়। এ সময় মূলসত্তা (جَوْهَر বা Essence) এবং আকস্মিক সংযোজনী عَرْض (Accident) এ সকল দার্শনিক পরিভাষাও ব্যবহার হয়। এর ফলে দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারীদের সমক্ষে দার্শনিক আঙ্গিকে

আকাইদের উপস্থাপন সুবিধাজনক হয়। আকাইদের এ পর্যায়ে যাঁদের যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনিতে আকাইদশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে তারা হলেন– আল বাগদাদী (মৃ. ৪১৮ হি.), ইবনে হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.), আল গাযালী (মৃ. ৫৩৫ হি.), আল ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.), ইবনে সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.) প্রমুখ। এ পর্যায়ে রচিত হয় আবু হাফস ওমর আন নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭ হি.) اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ; ইমাম শাফেয়ী (র)-এর প্রতি আরোপিত তৃতীয় ফিকহে আকবার, আস সানুনীর (৮৯৫ হি.) উম্মুল বারাহীন, আল ঈজীর (মৃ. ৭৫৬ হি.) মাওয়াকিফ প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ। আকাইদশাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এক অনবদ্য গ্রন্থকার ইমাম আবুল হাসান আলী আল আশয়ারী (র) (মৃ. ৩২৪ হি.)। ইবনে ফুরাকের মতে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় ৩০০। তাঁর বিখ্যাত আকাইদগ্রন্থ 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন' যা তিন খণ্ডবিশিষ্ট বিশদ আকাইদগ্রন্থ। এছাড়াও আল ইবানা আন লিউসুদ দিয়ানা, রিসালা ফী ইসতিহসানিল খাওফি ফিল কালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

اَلْكُتُبُ الْمُهِمَّةُ عَلَى الْعَقَائِدِ ◌ :

আকিদাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি : আকাইদশাস্ত্রের ওপর অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। নিম্নে কিছু গ্রন্থ লেখকের নামসহ উল্লেখ করা হলো–

১. আল ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফা (র) [১৫০ হিজরী]।
২. আস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) [২৪১ হিজরী]।
৩. আল ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী (র) [২৪৩ হিজরী]।
৪. আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হানি আল আসরাম (র) [২৭৩ হিজরী]।
৫. আস সুন্নাহ, হাম্বল ইবনে ইসহাক ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (র) [২৭৩ হিজরী]।
৬. আস সুন্নাহ, আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুশ শায়বানী (র) [২৭৫ হিজরী]।
৭. আস সুন্নাহ, আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবী আসিম আদ দাহহাক আশ শায়বানী (র) [২৮৭ হিজরী]।
৮. আস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল মারওয়ারযী (র) [২৯৪ হিজরী]।
৯. সারীহুস সুন্নাহ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আততাবারী (র) [৩১০ হিজরী]।
১০. আস সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (র) [৩১১ হিজরী]।
১১. আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবু জাফর তাহাবী (র) [৩২৪ হিজরী]।
১২. আল ইবানাতু আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আল আশয়ারী (র) [৩২৪ হিজরী]।
১৩. আস সুন্নাহ, আর আসসাল (র) [৩৪৯ হিজরী]।
১৪. আস সুন্নাহ, সোলায়মান ইবনে আহমাদ তাবরানী (র) [৩৬০ হিজরী]।
১৫. আশ শরীয়াহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হোসাইন আল আজুরী (র) [৩৬০ হিজরী]।
১৬. আস সুন্নাহ, আবুশ শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে হাইয়ান আল আসফাহানী (র) [৩৬৯ হিজরী]।
১৭. আস সুন্নাহ, ইবনে শাহীন আবু হাফস ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে ওসমান আল বাগদাদী (র) [৩৮৫ হিজরী]।
১৮. আর রিসালা আল কাইকরোয়নিয়া, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবী যাইদ আল কাইরোয়া মালিক আস সাগীর (র) [৩৮৬ হিজরী]।
১৯. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মানদাহ আল ইস্পাহানী (র) [৪১৮ হিজরী]।

২০. "আল ঈমান" ইবনে মানদা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) [৩৯৫ হিজরী]।

২১. ইতিকাদু আহলিল সুন্নাতি ওয়াল জামায়াহ, আবুল কাসিম লালকাঈ হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (র) [৪১৮ হিজরী]।

২২. আকিদাতুস সালাফি আহলিল হাদীস, আবু ওসমান ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস সাবুনী (র) [৪৪৯ হিজরী]।

২৩. আদদুরাতু ফীমা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু, আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম আয যাহিরী (র) [৪৫৬ হিজরী]।

২৪. আল ইতিকাদ, বায়হাকী (র) [৪৮০ হিজরী]।

২৫. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামিদ গাযালী (র) [৫০৫ হিজরী]।

২৬. "আল ইকতিসাদ আন নাসাফিয়া" ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন নাসাফী (র) [৫৩৭ হিজরী]।

২৭. "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়া" সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র) [৭৯১ হিজরী]।

২৮. "শারহুল আকিদা আত তাহাবীয়া" ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফী (র) [৭৯২ হিজরী]।

২ اَلْكُتُبُ لِاَهْلِ الْبَاطِلِ :

বাতিলপন্থিদের কিতাবসমূহ : ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আকিদাগত বিভক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদার অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে খারেজী, রাফেযী, মুরজিয়া, কাদারিয়্যা, শিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মীয় সম্প্রদায় ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এসব সম্প্রদায় তাদের আকিদার পক্ষে বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং গ্রন্থাদি রচনা করে তাদের মতবাদ প্রচার করে। তবে তাদের কতিপয় ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ব্যাপকহারে গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইবনে আতা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের মতবাদভিত্তিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিল। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১. আল কাফী, ২. মান লা ইয়াহদুরুল ফকীহ, ৩. আল ইসতিবসার ফী মাখতুলিফা মিনাল আখবার, ৪. মাজালিস, ৫. উয়ূন, ৬. ইলাউশ শরায়ী, ৭. মাজমাউল বায়ান, ৮. জামিউল জাওয়ামি, ৯. আল মুজতানা মিনাদ দুআ, ১০. শারায়েল ইসলাম, ১১. নাহজুল মুসতারশিদীন, ১২. কাশফুল ফাওয়াইদ, ১৩. কাওয়াইদুল আকাইদ, ১৪. মুখতালাফুশ শিয়া, ১৫. ইমাদুল ইসলাম, ১৬. বিহারুল আনওয়ার, ১৭. আওসাফুল আশরাফ, ১৮. আল কাবাসাত, ১৯. মীযানুল হক, ২০. নাহজুল বালাগা প্রভৃতি।

উপসংহার : ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে হয়েছে। তন্মধ্যে কলম তথা লিখনির মাধ্যমেও এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পেতে সাহাবায়ে কেরাম ও মুহাক্কিক সালাফদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

■ اَلسُّؤَالُ (١٤) : عَرِّفِ الْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ لُغَةً وَشَرْعًا ـ

■ **প্রশ্ন : ১৪ ॥ ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় আভিধানিকভাবে ভিন্ন হলেও পারিভাষিকভাবে প্রায় সমার্থক। ঈমান ব্যতীত যেমন ইসলাম হয় না, তেমনি ইসলামের মৌলিক আকিদাগত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে নির্ভেজাল মুমিন হওয়া যায় না। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

⊃ اَلْاِيْمَانُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً :

اِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاِيْمَانُ শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি اَلْاَمْنُ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা اَلْخَوْفُ-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা সত্যায়ন করা। ২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা।
৩. اَلْاِذْعَانُ তথা স্বীকৃতি দেয়া। ৪. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা।
৫. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া। ৬. اَلْاِطْمِيْنَانُ তথা প্রশান্তি।

مَعْنَى الْاِيْمَانِ شَرْعًا :

اِيْمَان-এর শরয়ী অর্থ : ১. জমহুর ওলামার মতে–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهِ ـ

অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে اِيْمَان বলা হয়।

২. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ তা বিশ্বাস করাকে اِيْمَان বলা হয়।

৩. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

هُوَ تَصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ جَمِيْعًا ـ

অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তার বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলে।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

৫. ইমামত্রয়ের মতে– هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ

⊃ اَلْاِسْلَامُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْلَامِ لُغَةً :

اِسْلَام-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْلَام শব্দটি سَلْم শব্দমূল থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلتَّسْلِيْمُ তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে কুরআনে এসেছে– وَاِذْ قَالَ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

২. اَلْاِنْقِيَادُ তথা মেনে নেয়া।

৩. اَلْاِطَاعَةُ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে- اَسْلِمْ تَسْلَمْ

৪. اَلْاِخْلَاصُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

৫. اَلْخُضُوْعُ তথা বশ্যতা স্বীকার করা।

৬. اَلْاِذْعَانُ তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।

৭. اَلْقَبُوْلُ তথা গ্রহণ করা।

৮. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ তথা শান্তির মাঝে প্রবেশ করা।

৯. اَلدُّخُوْلُ فِىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।

১০. اَلدِّيْنُ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ) তথা মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

مَعْنَى الْاِسْلَامِ شَرْعًا :

اِسْلَام-এর শরয়ী অর্থ : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন-

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ-

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা।

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা।

৩. আদদুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন-

اَلْاِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (صـ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى-

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে-

اَلْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ)-

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে-

هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ (صـ)-

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-

هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ-

৭. فَيْضُ الْبَارِىْ গ্রন্থকার বলেন-

هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىُّ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا-

উপসংহার : ঈমানই হলো মুসলিম জাতির মূলধন। এর সংজ্ঞায় কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মৌলিক ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অতএব এ ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কারো পক্ষে উচিত নয়।

■ السُّؤَال (١٥) : مَا هِىَ مُصْطَلَحَاتُ الْعَقِيْدَةِ؟ بَيِّنِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْاُخْرٰى الدَّالَّةَ عَلٰى مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ۔

■ প্রশ্ন : ১৫ ॥ আকিদার পরিভাষাসমূহ কী? আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের যুগে ইসলামী বিশ্বাস বোঝাতে 'ঈমান' ছাড়া অন্য কোনো পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে এ বিষয়ে অন্যান্য পরিভাষার উৎপত্তি হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদত্ত হলো।

⊃ تَعْرِيْفُ مُصْطَلَحَاتِ الْعَقِيْدَةِ :

মুসতালাহাতুল আকিদা-এর পরিচয় : ইসলামের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের ব্যাপক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের বিতর্কিত বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য 'ঈমান' ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসব পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস সুন্নাহ', 'আশ শরীয়াহ' ও 'আল আকিদাহ' প্রভৃতি।

⊃ الْمُصْطَلَحَاتُ الْاُخْرٰى عَلٰى مَعْنَى الْعَقِيْدَةِ :

আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষা : ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে আকিদা অর্থের অন্যান্য পরিভাষাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. **اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র) আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে এর নাম রেখেছেন 'আল ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকিদা' বোঝাতে এটিই ছিল প্রাচীনতম পরিভাষা।

২. **عِلْمُ التَّوْحِيْدِ :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 'ইলমুল আকিদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদই ঈমান বা আকিদার মূলভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (র) ইলমুল আকিদা বোঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

৩. **اَلسُّنَّةُ :** তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্মবিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ বোঝাতে 'আস সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলিম। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরামের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরামের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলেম 'আস সুন্নাহ' নামে 'আকিদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

৪. اَلشَّرِيْعَةُ : শরীয়ত বা শরীয়াহ অর্থ– নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান বা পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়াহ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি অর্থ 'ধর্মবিশ্বাস' বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ। তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম 'আশ শারীয়াহ' নামে আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

৫. اُصُوْلُ الدِّيْنِ اَوِ الدِّيَانَةِ : উসূলুদ্দীন (اُصُوْلُ الدِّيْنِ) বা উসূলুদ্দিয়ানাহ (اُصُوْلُ الدِّيَانَةِ)-এর অর্থ– দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলেম 'ঈমান' বা আকিদা বোঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

৬. عِلْمُ الْكَلَامِ : ইসলামী আকিদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' (عِلْمُ الْكَلَامِ) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক আলোচনা বোঝানো হয়।

'আল কালাম' (اَلْكَلَامُ) শব্দের অর্থ– কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (Talk, Sentence Speech, Conversation, Debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, কালামুল্লাহ (كَلَامُ اللّٰهِ) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটি উদ্ভূত। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উপসংহার : আকিদা তথা আকাইদ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাস বা ঈমান বিষয়ক শাস্ত্র। কালামশাস্ত্র নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও শাস্ত্রটি মূলত ইসলামের আকিদা বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর নির্ভেজাল, নিষ্কলুষ ঈমান এবং আমলের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের জন্য আকাইদশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

■ اَلسُّؤَالُ (١٦) : اُكْتُبْ نُبْذَةً عَنْ حَيَاةِ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

■ প্রশ্ন : ১৬ ॥ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৯]

اَوْ اُكْتُبْ تَرْجَمَةَ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِاِيْجَازٍ ـ

অথবা, সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ। [ফা. প. ২০১৬]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারে যাঁরা মুসলিম ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছেন, আবু হানীফা নামটি তাঁদের সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন ফিকহ জগতের প্রদীপ্ত সূর্য, ইমামুল আইম্মা। যুগের ক্রান্তিলগ্নে যাঁর জন্ম ও জীবনকর্ম ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ রহমতস্বরূপ। আইম্মায়ে ফোকাহার পথিকৃৎ, মুসলিম উম্মাহর আশীর্বাদ ও ইমামগণের নেতা আবু হানীফা (র) কঠোর ত্যাগ, সাধনা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য ফিকহশাস্ত্রের ইতিহাসে নন্দিত, আলোচিত ও সমাদৃত হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর ফিকহের বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপন করা হলো।

➲ ইমাম আবু হানীফার জীবনী : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ–

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম নোমান, উপনাম আবু হানীফা, কারো মতে আবু নোমান উপাধি, পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম যাওতা আল কুফী। তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর বংশধর ছিলেন।

২. **জন্ম :** ইমাম আবু হানীফা (র) হিজরী ৮০ সন মোতাবেক ৬৯৯ মতান্তরে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বিখ্যাত কুফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, তাঁর পিতা সাবেত ছোটবেলায় হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তাঁর ও তাঁর বংশধরের জন্য দোয়া করেন। তারই ফসল হলো ইমাম আবু হানীফা (র)।

৩. **শৈশবকাল :** শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যান। সন্তানের লালনপালন ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁর মা হযরত ইমাম জাফর আস সাদেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ফলে সেখানেই ইমামের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

৪. **জ্ঞানার্জন :** ইমাম আযম বাল্যকালে ও কৈশোরে যথেষ্ট জ্ঞানচর্চা করেন। যৌবনে তিনি বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে ব্যবসায়ের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করতেন। একদিন ইমাম শাবী (র) বললেন, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, তুমি ওলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা কর। এ উপদেশের পর তিনি বিদ্যানুরাগী হন এবং জ্ঞানসিন্ধুর অমূল্য রত্ন অর্জন করেন।

৫. **জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ফিকহশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র ছাড়াও ইলমে হাদীস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

৬. **ইমামের শিক্ষকমণ্ডলী :** ইমাম আবু হানীফা (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। আবু হাকাম কবীর তাঁর উস্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলেছেন। তিনি যেসব মুহাদ্দিস হতে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের সংখ্যাই ছিল তিন শতাধিক।

৭. **তাঁর শিষ্যবৃন্দ :** তাঁর থেকে যাঁরা ইলমে ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

ক. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক খ. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ
গ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন ঘ. কাযী আবু ইউসুফ
ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (র) প্রমুখ।

৮. **সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ :** ইমামের বয়স যখন ১২/১৩ বছর তখন তিনি হযরত আনাস (রা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর থেকে ইলমে দীনের শিক্ষা লাভ করেন। হযরত আনাস (রা) তাঁর ধীশক্তি ও মেধার পরিচয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়াও করেন।

ইমাম আযম মহানবী (স)-এর মোট তিনজন সাহাবী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবনে খালকান বলেছেন যে, তিনি চারজন সাহাবীর যুগ পেয়েছেন: কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি। এ চারজন সাহাবী হলেন–

ক. বসরার শাসনকর্তা হযরত আনাস (রা),
খ. কুফার শাসনকর্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা),
গ. মদিনার শাসনকর্তা হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা),
ঘ. মক্কার শাসনকর্তা হযরত আবু তোফায়েল (রা)।

৯. **কর্মজীবন :** পিতার কাপড়ের ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। নগরে-বন্দরে বিভিন্ন স্থানে তিনি ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেকালে তাঁর সমপর্যায়ের ধনী খুব কমই ছিল। নিজস্ব এ অর্থানুকূল্যের দরুন তিনি সে সময়ে সামাজিক ও কল্যাণমূলক এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

১০. **শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন :** ১২০ হিজরীতে তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ (র) ইন্তেকাল করলে ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, উস্তাদের অপূর্ণ কাজ তাকেই সমাপ্ত করতে হবে। আর তাই শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবনের আসল ঠিকানা তিনি এ পেশার মাধ্যমেই পেয়ে যান।

১১. **ফিকহ সংকলন :** ইমাম আবু হানীফা (র) মাসয়ালার সমাধানকল্পে তাঁর প্রধান চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে مَجْلِسُ تَدْوِيْنِ الْفِقْهِ তথা ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড

গঠন করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছরের অক্লান্ত সাধনাবলে ৮৩ হাজার মাসয়ালা সংবলিত كُتُبِ حَنَفِيَّة নামে একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করেন।

১২. **বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান ও কারাবরণ :** উমাইয়া খলিফা আল মানসুর তাঁকে কুফার প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা আল মানসুর তাঁকে কারাগারে বন্দি করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন।

১৩. **শিক্ষামজলিস প্রতিষ্ঠা :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সুদক্ষ শিষ্যবর্গ ছিলেন। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুফার প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাত।

১৪. **হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা :** ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলনের মাধ্যমে এবং তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে স্থাপন করায় দলে দলে লোকজন তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে। তাঁর মাযহাবের নাম হয় হানাফী মাযহাব। উল্লেখ্য, এ মাযহাব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত বলেই বিশ্বের তিনচতুর্থাংশ মুসলমান এ মাযহাবের অনুসারী।

১৫. **ইসলামী উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম আইনজ্ঞ :** ইমাম আবু হানীফা (র) তীক্ষ্ণ মেধা, অনন্য প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, দীনের গভীর জ্ঞান, অতুলনীয় বাগ্মিতা ও বিরল গুণাবলির জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৬. **ধার্মিকতা :** ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন একাধারে আলেম, মুজতাহিদ, আবেদ, ইমাম এবং মুত্তাকী। ইমাম আবু হামেদ গাযালী (র) বলেন, "তিনি অর্ধরাত জেগে মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন।" কুফার বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭. **গঠন অবয়ব :** তিনি ছিলেন সুঠামদেহী অথচ মধ্যম গড়নের। উত্তম চেহারার অধিকারী ও মিষ্টভাষী। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়।

১৮. **যুক্তির প্রাবল্য :** ইমাম আবু হানীফা (র) সকল বিষয়কে যুক্তির আলোকে যাচাই করতেন। এজন্য তাঁর মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর আনুকূল্যের পাশাপাশি যুক্তিনির্ভর বলে বেশি দৃঢ়তা বহন করে।

১৯. **রচিত গ্রন্থ :** তিনি তেমন কোনো গ্রন্থ লিখে যাননি; তবে اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ নামে ফিকহশাস্ত্রের একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখে যান। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা এ গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে প্রায় দশহাজার মাসয়ালা প্রণয়ন করেন।

২০. **ইন্তেকাল :** এ মহামানব সত্যের জয়গান গেয়ে অবশেষে লৌহ শলাকার চারদেয়ালে নির্জন সেলে নির্মম কারাবরণকারী সৈনিক হিসেবে জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করেন। ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মানসুর কর্তৃক বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে। বাগদাদের খাইযরান নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

উপসংহার : জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যার সোনালি আভায় পরিপূর্ণ, মুসলিম জাতির জন্য যিনি ছিলেন মহান আল্লাহর রহমত, যাঁর কল্যাণকর কর্ম আজ কোটি মানবের জীবন চলার পথকে করেছে আলোকিত, সেই মহান মনীষীই ইমাম আবু হানীফা (র)। যার সাধনার ফল আমাদের জীবন চলার পাথেয়।

■ اَلسُّؤَالُ (١٧) : اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ الْإِمَامِ أَبِيْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ۔

■ প্রশ্ন : ১৭ ॥ ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

[ফা. প. ২০১৭]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশাস্ত্রবিদ ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) হাদীস, ফিকহ ও আকাইদশাস্ত্রে খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদার মূলনীতির জন্য তাঁর রচিত 'আকীদাতুত তাহাবী' গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ। নিম্নে তাঁর জীবনী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি আলোচিত হলো।

১ : حَيَاةُ الْإِمَامِ اَبِيْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ (رحـ)

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র)-এর জীবনী : ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নরূপ–

১. **নাম :** তাঁর নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ। ডাক নাম আবু জাফর, উপাধি তাহাবী।

২. **জন্ম ও মৃত্যু :** তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে আসাকিরের মতে, তিনি ২৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি ২৩৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম সিময়ানী, হাফেয ইবনে কাসীর ও হাফেয বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, তিনি ২২৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ তিনটি মতের মধ্যে সর্বশেষ মতটিই সর্বাধিক সঠিক মত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তিনি ৩২১ হিজরীতে ইহজীবনের মায়া ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

৩. **শিক্ষাজীবন :** তিনি ইলমে দীন শিক্ষা করার নিমিত্ত তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন শহরে গমন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাসস্থান, নিজ এলাকা ছেড়ে সুদূর মিসরে গমন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর মামা ইমাম মুযানী যিনি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ছাত্র ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। সে হিসেবে প্রারম্ভে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন মিসরে কাযী আহমাদ ইবনে ইমরান হানাফী (র)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন, তখন হানাফী মাসলাকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। তাঁকে এ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার মামা হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি অনেক পড়াশুনা করতেন এবং তা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শক্তি সঞ্চয় করতেন, সে সুবাদে আমিও তা অধ্যয়ন করার প্রতি মনোযোগী হই। আর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হানাফী মাসলাক গ্রহণ করি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, একদা কাযী বাক্কার ইবনে ওতবা আল হানাফী ইমাম মুযানী (র)-এর সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তিনি হানাফী মাযহাবের কিতাব দেখে স্বীয় বক্তব্য পেশ করেন। বিষয়টি ইমাম তাহাবী (র) জানতে পেরে প্রভাবিত হন এবং মাসলাক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি তাঁর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে গণ্য হয়। তাঁর মাসলাক পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, কোনো একটি মাসয়ালা তাঁর মামা কর্তৃক তাঁকে বারংবার বোঝানোর পরেও তিনি তা অনুধাবন করতে না পারায় মামা তাঁকে ভর্ৎসনা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নাকি মাসলাক পরিবর্তন করেছিলেন। এ জাতীয় বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। কেননা ইমাম তাহাবী একজন ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। কোনো বিষয় বারংবার বলার পরেও তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার বিষয়টি বোধগম্য নয়। তা ছাড়া মামা শিক্ষক হিসেবে তাঁকে এমনভাবে ধমক দেবেন, তাও সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। কেননা ছাত্রদের সাথে এমন আচরণ তাঁদের মতো শিক্ষকদের পক্ষে চিন্তাও করা যায় না।

তিনি সিহাহ সিত্তাহ-এর ইমামগণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যেমন তাঁর সময়ে প্রসিদ্ধ ইমামদের একজন ছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একাধারে হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম ছিলেন। বহুসংখ্যক মাশায়েখ, মুহাদ্দিস ও ফকীহের বর্ণনা মতে, তিনি একজন মুজতাহিদ ও সংস্কারক ছিলেন। ইমাম বায়হাকী, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর কিছু সমালোচনা করে থাকলেও যারা তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁদের প্রশংসার মোকাবেলায় তাঁদের সমালোচনা ধোপে টেকে না।

৪. **তাঁর রচনাবলি :** ইমাম তাহাবী (র)-এর রচনা অনেক। মোল্লা আলী কারী হানাফী (র)-এর বর্ণনা মতে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে 'মায়ানী আল আসার'। হাফেয বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে এ গ্রন্থটি মর্যাদাগত দিক থেকে জামে তিরমিযী, সুনানে আবী দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ-এর ওপরে। ইমাম ইবনে হাযম আয যাহিরী (র)-এর মতে, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (র)-এর ওপরে এর স্থান। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, ২. মুশকিলুল আসার, ৩. কিতাবু আহকামিল কুরআন, ৪. কিতাবুশ শুরূতিল কবীর, ৫. আশ শুরূতুল ওয়াসীত, ৬. আশ শুরূতুস সগীর, ৭. কিতাবুন ফিন নিহালি ওয়া আহকামিহা, ৮. শরহুল মুগনী, ৯. নাকযু কিতাবিল মুদাল্লিসীন, ১০. ইখতিলাফুল ওলামা, ১১. আর রাদ্দু আলা ঈসা ইবনে আবান, ১২. কিতাবু সহীহিল আসার, ১৩. শরহুল জামিয়িস সগীর লিল ইমাম আহমাদ , ১৪. মুখতাসারুল ইমামিত তাহাবী, ১৫. আকীদাতুত তাহাবী ইত্যাদি ছাড়াও মোট ত্রিশের মতো গ্রন্থ রয়েছে।

উপসংহার : ইসলাম আমাদের জীবনবিধান। আমাদেরকে ইসলামের অনুসারী হিসেবে মুমিন বা মুসলিম হতে হলে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম বা ঈমানের মূল বিষয়বস্তুকে ঈমানের রোকন তথা স্তম্ভ বলা হয়। এর সংখ্যা ছয়টি। প্রতিটি মুসলিমকে এগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী সেগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٨) : اُذْكُرْ اُصُولَ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

■ প্রশ্ন : ১৮ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত ফকীহ ও আকাইদশাস্ত্রবিদ ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) হাদীস, ফিকহ ও আকাইদশাস্ত্রে খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদার মূলনীতির জন্য তাঁর রচিত আকীদাতুত তাহাবী গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ। নিম্নে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

اُصُوْلُ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতিসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ–

১. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ : এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে তথা রুবুবিয়াতের কোনো বিষয় অস্বীকার কিংবা অবিশ্বাস করলে তাকে কাফের বলে গণ্য করা হয়।

২. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ اَوِ الْعُبُوْدِيَّةِ : কেউ আল্লাহর ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে

কাফের বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়। তাকে বিভ্রান্ত মুসলিম ফেরকা বলে গণ্য করা হবে না; বরং অমুসলিম কাফের ফেরকা বলে গণ্য করা হবে।

৩. اَلْاِيْمَانُ بِالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ : এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। মূলত মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভক্তি ও ফেরকাবাজি এ বিষয়টি নিয়েই। আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেযামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শাস্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই কাদারিয়্যা, জাবারিয়্যা, খারেজী, মুতাযিলী, জাহমিয়া প্রভৃতি ফেরকার উদ্ভব। তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ বিষয়কেন্দ্রিক।

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি হলো, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা পরিহার করা এবং সাথে সাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা বর্জন করা।

৪. اَلْاِيْمَانُ بِالرِّسَالَةِ : এ বিষয়ে তেমন কোনো মতভেদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দেখা যায়নি। তবে কোনো কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু মুজিযা তাবীলের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে। কোনো কোনো সীমালঙ্ঘনকারী শিয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের সর্বজনীনতা ও তাঁর আদর্শের অলঙ্ঘনীয়তা, তাঁর খতমে নবুয়ত ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করা হয়েছে। তবে রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, সাহাবীগণ ও নবীবংশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে।

৫. اَلْاِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ও কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয়নি। তবে কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি দিক আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহর কালাম তথা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে।

৬. اَلْاِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ : আখেরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে, তার অন্যতম আখেরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফায়াত ও জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে। এগুলোর মধ্যে শাফায়াত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক।

৭. اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ : তাকদীরের বিষয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে। এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত কেন্দ্রিক।

চার ইমামের বক্তব্য, বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর লিখিত পুস্তকাদি এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর লিখিত পুস্তকের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সবই তাঁরা সহজ সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তাঁরা কল্পনা করেননি। এগুলোর মধ্যে যেটুকু বৈপরীত্য মানবীয় বুদ্ধিতে অনুভব হয়, তা মানবীয় বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে; আল্লাহর বিশেষণের বৈপরীত্যের কারণে নয়।

উপসংহার : ইসলাম আমাদের জীবনবিধান। ইসলামের অনুসারী হিসেবে মুমিন বা মুসলিম হতে হলে আমাদেরকে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরকানুল ঈমান

■ السُّؤَالُ (١٩) : أَرْكَانُ الْإِيمَانِ مَا هِيَ وَكَمْ هِيَ؟ أُكْتُبْ كُلَّهَا بِالتَّفْصِيلِ ـ

■ **প্রশ্ন : ১৯ ॥ আরকানুল ঈমান কী ও তা কত প্রকার? প্রত্যেকটি বিস্তারিত লেখ।**
[ফা. প. ২০১০]

او- أَرْكَانُ الْإِيمَانِ كَمْ هِيَ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

অথবা, أَرْكَانُ الْإِيمَانِ কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান ইসলামের মূলভিত্তিসমূহের প্রধান সোপান। প্রতিটি মানুষকে মুমিন বলে গণ্য হতে হলে যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, সেগুলোকেই ইসলামের পরিভাষায় আরকানুল ঈমান বলা হয়। আর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা।

⊃ مَعْرِفَةُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ :

أَرْكَانُ الْإِيمَانِ-এর পরিচিতি : সংজ্ঞাগত দিক থেকে أَرْكَانُ الْإِيمَانِ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- ক. حَدّ اِضَافِى তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা। খ. حَدّ لَقَبِى তথা উপাধিগত সংজ্ঞা।

ক. حَدّ اِضَافِى তথা সম্বন্ধবাচক সংজ্ঞা : مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف-এর সংজ্ঞা পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে حَدّ اِضَافِى বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে أَرْكَانُ الْإِيمَانِ একটি যৌগিক শব্দ। আর এ কারণেই أَرْكَان ও اَلْإِيمَانُ-এর সংজ্ঞা পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

أَرْكَان-এর আভিধানিক অর্থ : أَرْكَان শব্দটি رُكْن শব্দের বহুবচন। অভিধানে رُكْن শব্দটি اَلْبِنَاءُ তথা ভিত্তি, স্তম্ভ, খুঁটি, কোণ, মূল অংশ, শক্তি, যার ওপর নির্ভর করা হয়, Foundation ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

أَرْكَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. اَصْلُ الشَّيْءِ তথা কোনো কিছুর মূল বোঝায়।

২. مَا يَقُوْمُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ অর্থাৎ, যার ওপর কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন বলা হয়– رُكْنُ الشَّيْءِ دَاخِلُ الشَّيْءِ অর্থাৎ, কোনো কিছুর رُكْن হলো তার ভিতরের অংশ তথা মৌলিক বিষয়

إِيْمَان-এর আভিধানিক অর্থ : إِيْمَان শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার; যা أ ـ م ـ ن মূলধাতু হতে উৎকলিত। যেমন বলা হয়– صَارَ الشَّخْصُ ذَا أَمْنٍ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِنْقِيَادُ তথা আনুগত্য করা, ২. اَلْخُضُوْعُ তথা অবনত হওয়া, ৩. اَلْوُثُوْقُ তথা নির্ভর করা, ৪. اَلْاِذْعَانُ তথা আস্থা স্থাপন করা, ৫. اَلتَّصْدِيْقُ তথা স্বীকৃতি দেয়া, ৬. নিরাপত্তা প্রদান করা, ৭. বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

اِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীগণ اِيْمَان-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ (صـ) بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, তার সবকিছুর সত্যতা স্বীকারপূর্বক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।

২. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন–
تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ (صـ) بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِىِّ (صـ).

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন– اَلتَّصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِىِّ (صـ) بِهٖ اِجْمَالًا اَوْ تَفْصِيْلًا. অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতভাবে যা আনীত বিধান হিসেবে জানা গিয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ.

৫. জমহুর ওলামার মতে–
اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ.

তাই اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর অর্থ হলো, ঈমানের অভ্যন্তরীণ মূলনীতিসমূহ তথা ঈমানের রোকনসমূহ; যার ওপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. حَدٌّ لَقَبِى তথা উপাধিগত সংজ্ঞা : مُضَاف اِلَيْهِ ও مُضَاف-এর সংজ্ঞা সম্মিলিতভাবে প্রদান করাকে حَدٌّ لَقَبِى তথা উপাধিগত সংজ্ঞা বলে। মূলত اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর একক সংজ্ঞাই حَدٌّ لَقَبِى-এর অন্তর্গত। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা মুসা আল আসওয়াদ (র) বলেন–
هِىَ الْعُمُوْدُ الَّتِىْ تَجْرِىْ عَلَيْهَا اُمُوْرُ الْاِيْمَانِ.

অর্থাৎ, اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ হলো ঐসব খুঁটি বা স্তম্ভ, যার ওপর ভিত্তি করে ঈমানের কার্যাবলি আবর্তিত হয়।

২. কতিপয় আলেম বলেন– اَلْقَضَايَا الَّتِىْ تَبْتَنِى عَلَيْهَا عَقِيْدَةُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ, আরকানুল ঈমান এমন কিছু বিষয়, যার ওপর মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

اَرْكَانُ الْاِيْمَانِ ⊃ :

ঈমানের মূলনীতিসমূহ : ঈমানের আরকান তথা মূলনীতিসমূহের বর্ণনা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফে বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়, আরকানুল ঈমান তথা ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ ছয়টি। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. **আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস :** আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা। যেমন রাসূল (স) বলেন–
شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

তবে শুধু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট নয়; বরং এর ওপর দৃঢ় থাকা অত্যাবশ্যক। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন– فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ;

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে। যথা–

১. اَلْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ তথা মৌখিক স্বীকৃতি।

২. اَلتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ তথা অন্তরের বিশ্বাস।

৩. اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ তথা আরকানসমূহ কর্মে বাস্তবায়ন।

এছাড়া তিনটি পর্যায় ব্যতীত ঈমানে পূর্ণতা আসে না। সেগুলো হলো–

১. اَلتَّوْحِيْدُ بِالرُّبُوْبِيَّةِ তথা আল্লাহর প্রভুত্বের একত্বে বিশ্বাস।

২. اَلتَّوْحِيْدُ بِالْاُلُوْهِيَّةِ তথা আল্লাহর উপাস্যের একত্বে বিশ্বাস।

৩. اَلتَّوْحِيْدُ بِاَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا তথা আল্লাহর নাম ও তাঁর সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যের একত্বে বিশ্বাস।

২. **ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস :** اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটি مَلَكٌ-এর বহুবচন, কখনো এর বহুবচনে مَلَكٌ আসে। যেমন কুরআনে এসেছে– وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا مَلَكٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– পত্র, দূত, বাণী। এর ব্যবহারিক অর্থ– আল্লাহর দূত (Angel)।

ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। আর তা হলো–

ক. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, খ. তাঁদের নামে বিশ্বাস, গ. তাঁদের আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস ও ঘ. তাঁদের কর্মে বিশ্বাস।

৩. **আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস :** আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা প্রতিটি মুমিনের ওপর ফরয। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলদের নিকট অহীর মাধ্যমে এসব কিতাব প্রেরণ করেছেন। এ গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ প্রদানপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ ...... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ-

৪. **রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন :** ঈমানের অন্যতম রোকন হলো, এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশাদানের জন্য অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানুষকে মনোনীত করে তাঁর বাণী দান করেন। তারা সবাই মহৎ চরিত্রের অধিকারী, সৎ ও কল্যাণকর মানুষ ছিলেন। যাদের নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে এবং যাদের নাম পবিত্র কুরআনে নেই, তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে নবী রাসূল বলে বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা করা এবং ভালোবাসা আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করা এবং তাঁর শরীয়ত মতো জীবন পরিচালনা করা ঈমানের অন্যতম মূলভিত্তি।

৫. **আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস :** আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো– মৃত্যুর পর কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন।

৬. **তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস :** তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। তাকদীর অর্থ- নির্ধারণ, নিয়তি, ভাগ্য। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়। এ বিশ্বের ভালোমন্দ, আনন্দ উল্লাস ও দুঃখ কষ্টের যা কিছু ঘটে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। আর এসবের প্রতি বিশ্বাস করা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার শামিল।

উপসংহার : উল্লিখিত রোকন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য আবশ্যক। কারণ এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কল্পনা করা যায় না।

■ السُّؤَال (٢٠) : مَا مَعْنَى التَّوْحِيْدِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ.

■ প্রশ্ন : ২০ ॥ তাওহীদের অর্থ কী? এবং তা কত প্রকার? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯]

أَوْ مَا مَعْنَى التَّوْحِيْدِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ .

অথবা, تَوْحِيْد-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রকারগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : তাওহীদ হলো আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মূলভিত্তি। ইসলামের সকল শিক্ষা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা মুসলিমজাতির প্রাণশক্তির মূল আধার হিসেবে বিবেচিত। তাওহীদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা।

➲ تَوْحِيْد-এর পরিচিতি :

مَعْنَى التَّوْحِيْدِ لُغَةً :

تَوْحِيْد-এর আভিধানিক অর্থ : تَوْحِيْد শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে إِسْم مَصْدَر; এটি و - ح - د মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- একত্ববাদ, কাউকে একক বলে স্বীকার করা। এটা শিরকের বিপরীত। অভিধানবেত্তাগণ تَوْحِيْد শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- جَعْلُ الشَّيْءِ وَاحِدًا অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা।
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- التَّوْحِيْدُ هُوَ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ওপর এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ যে, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি একক।
৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- الْحُكْمُ بِأَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ
৪. দর্শনশাস্ত্রে তাওহীদ হলো- الْقَوْلُ بِالْهِ وَاحِدٍ তথা এক উপাসকের কথা বলা।
৫. আহলুস সুন্নাহগণের মতে- نَفْيُ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ
৬. কেউ কেউ বলেন- اِفْرَادُ الْقَدِيْمِ عَنِ الْمُحْدِثِ
৭. কারো কারো মতে, শব্দটি অতুলনীয় হওয়া, একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া, একত্ববাদে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।
৮. ইংরেজিতে বলা হয় Unique, Singular, Equal, Incomparable ইত্যাদি।

তাওহীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

مَعْنَى التَّوْحِيْد شَرْعًا :

تَوْحِيْد-এর শরয়ী অর্থ : তাওহীদের শরয়ী অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন–

১. আবু বকর আল জাযায়েরী (র) বলেন–

نَفْيُ الْكُفْءِ وَالْمِثْلِ عَنْ ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ وَاَفْعَالِهٖ وَنَفْيُ الشَّرِيْكِ فِيْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَعِبَادَتِهٖ عَزَّ وَجَلَّ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রভুত্ব ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারী থেকে বিরত থাকাকে তাওহীদ বলা হয়।

২. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ (র) বলেন–

هُوَ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَاِفْرَادُهٗ بِمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالْاُلُوْهِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর একক হওয়া যা তাঁর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই তাওহীদ।

৩. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। যথা–

ক. مَعْرِفَةُ اللّٰهِ بِالرُّبُوْبِيَّةِ তথা আল্লাহর প্রভুত্ব অনুধাবন করা।

খ. وَالْاِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ তথা আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা।

গ. وَنَفْيُ الْاَنْدَادِ عَنْ جُمْلَةٍ তথা আল্লাহর সমকক্ষতা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করা।

৪. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ সালমান (র) বলেন–

عِلْمُ الْعَبْدِ وَاعْتِرَافُهٗ وَاعْتِقَادُهٗ وَاِيْمَانُهٗ بِتَفَرُّدِ الرَّبِّ بِكُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ وَاعْتِقَادُهٗ اَنَّهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْ كَمَالِهٖ ۔ وَاَنَّهٗ ذُو الْاُلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُوْدِيَّةِ عَلٰى خَلْقِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

➲ اَقْسَامُ التَّوْحِيْد :

تَوْحِيْد-এর প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের একাধিক স্তর রয়েছে। আর একাধিক মনীষী এ স্তরগুলো উপস্থাপন করেছেন। যেমন– হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় 'শারহুল আকীদাহ আত তাহাবী' গ্রন্থে তাওহীদকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. تَوْحِيْدُ الْاِثْبَاتِ وَالْمَعْرِفَةِ তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ।

২. تَوْحِيْدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ তথা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

ইবনে আবুল ইযয হানাফী (র) অন্যত্র প্রথম পর্যায়ের তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদকে দু'পর্যায়ে বিভক্ত করে তাওহীদকে মোট তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ ২. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ ৩. تَوْحِيْدُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

উপসংহার : মহান আল্লাহর একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই তাওহীদ। তাওহীদ ছাড়া সকল ইবাদতই অনর্থক। সকল নবী রাসূল এ তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীরও একই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মানুষকে আল্লাহর ইবাদত তথা তাওহীদের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٢١) : مَا هُوَ الْمِعْرَاجُ؟ هَلْ هُوَ كَانَ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ؟ بَيِّنْ مَعَ الْاِخْتِلَافِ-

■ **প্রশ্ন : ২১ ॥ مِعْرَاج কী? তা কি জাগ্রত অবস্থায় নাকি স্বপ্নযোগে হয়েছিল? মতপার্থক্যসহ আলোচনা কর।** [ফা. প. '০৭,'০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : হাজার বছর পর হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য। এটা ছিল তাঁর জীবনে সংঘটিত অন্যতম প্রধান মুজিযা, যা স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন।

➲ مِعْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ لُغَةً :

مِعْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : مِعْرَاج শব্দটি عُرُوْج মাসদার থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- উর্ধ্বগমন, উপরে উঠা ইত্যাদি। এটি اٰلَة اِسْم-এর وَاحِد كُبْرٰى-এর সীগাহ। সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে। যেমন- ১. উর্ধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. উর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা যানবাহন।

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ اِصْطِلَاحًا :

مِعْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জমহুর ওলামা বলেন- هُوَ عُرُوْجُ الرَّسُوْلِ اِلَى السَّمَاءِ حَيْثُمَا شَاءَ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ অর্থাৎ, মিরাজ বলতে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সান্নিধ্যে রাসূল (স)-এর উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণকে বোঝায়।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

اَلْمِعْرَاجُ هُوَ عُرُوْجُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعُلٰى-

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন-

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَاَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحٰى اِلَيْهِ مَا اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى-

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্ব জগতের যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল তা দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন ও তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল তা প্রদান করেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে।

➲ هَلِ الْمِعْرَاجُ كَانَ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ :

মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় না নিদ্রাবস্থায় : রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে নাকি নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) وَعُرِجَ بِشَخْصِهٖ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى ـ

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। নবীকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উর্ধ্বলোকে গমন করেছেন।

২. একইভাবে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْعُلٰى حَقٌّ ـ

দলীল : মিরাজ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

১. মহান আল্লাহর বাণী–

١ـ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

٢ـ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ـ

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরোল্লিখিত দুটি আয়াতে বান্দা বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবি (র) বলেন, আল্লাহর বাণী اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ অংশটি দ্বারা সশরীরে মিরাজ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কারণ عَبْدٌ হলো দেহ ও রূহ এর সমষ্টি।

২. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١ـ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ

٢ـ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ـ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ

৩. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– فَرَكِبْتُ فَسَارَ بِىْ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ

এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল।

উপসংহার : اَلْاِسْرَاءُ তথা মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত একটি অনন্য মুজিযা, যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলের যুগে ঘটেনি। আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা। আমাদের এ ইসরা ও মিরাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

■ السؤال (٢٢) : ما المراد بالايمان برسالة محمد (صـ) بين وجوه الايمان بها ـ

■ প্রশ্ন : ২২ ॥ মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য কী? তাঁর ওপর ঈমান গ্রহণের বিভিন্ন দিক বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন ফরয তেমনি তার নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করাও ঈমানের পূর্বশর্ত। আমরা সকল নবীর মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী। আর মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদায় ও নবুয়তে বিশ্বাসী এবং তাঁরই অনুসারী। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করার জন্যই এ প্রশ্নের অবতারণা।

➲ المراد بالايمان برسالة محمد (صـ) :

মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য : মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতে বিশ্বাস করা। কারণ মহানবী (স) ও তাঁর আনীত বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আবশ্যক। মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতে ঈমান আনয়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে الاستقامة على الايمان গ্রন্থ প্রণেতা বলেন–

يؤمن المكلف ان اخر الانبياء وخاتم الرسالات هو سيدنا ونبينا محمد (صـ) حيث ان الله قد ختم به سلسلة النبوة والرسالة ـ

অর্থাৎ, শরীয়তের বিধান অর্পিত ব্যক্তি এ মর্মে বিশ্বাস করবে যে, সর্বশেষ নবী এবং রিসালাতের সমাপ্তি হচ্ছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), যার দ্বারা আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়েছেন।

➲ وجوه الايمان على محمد (صـ) :

মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনার বিভিন্ন দিক :

১. **নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা :** ইসলামের প্রথম রোকন হচ্ছে, আল্লাহর একত্বে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া। মুমিনকে এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
   দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে– شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله অর্থাৎ, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁরই বান্দা ও রাসূল।

২. **মর্যাদা ও সম্মান :** তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল জিন ও ইনসানের সর্দার, সকল নবী রাসূলের সর্দার। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
   ١ـ وكان فضل الله عليك عظيما ـ
   ٢ـ وما ارسلنك الا رحمة للعالمين ـ

৩. **সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী :** এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
   يايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ـ

৪. **ইসরা ও মিরাজ :** রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার আরেকটি বড় দিক হচ্ছে, তাঁর সশরীরে ইসরা ও মিরাজ; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–
سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الخ۔

৫. خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ **তথা নবুয়তের সমাপ্তি :** তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ۔

উপসংহার : রাসূল (স) চির অনুসরণীয় অনুপম আদর্শ। তাঁর রিসালাতের ওপর ঈমান আনয়ন ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ নেই।

■ **السؤال (٢٣) : عرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم۔**

■ প্রশ্ন : ২৩ ॥ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও নবী রাসূলগণের নেতা এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন; তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যাঁর আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। নিম্নে তাঁর পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কীয় আলোচনা পেশ করা হলো।

➲ تعريف نبينا محمد (صـ) :

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচয় : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত ও সঠিক পথের দিশারি। মানুষের পক্ষে তাঁর যথাযথ পরিচয় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবীগণের সর্দার এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। নিম্নে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করা হলো–

১. **দেশ ও বংশ :** আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী মুহাম্মাদ (স) আরব দেশের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরীতে মা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম ছিলেন কুরাইশ বংশের, যাঁরা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। কুরাইশদের মধ্যে হাশেমের পরিবার ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আবদুল্লাহ কুরাইশ বংশের অপর শাখা বনি যুহরার নেতা ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরার কন্যা আমেনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

২. **জন্ম :** আবদুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পর মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (স) عام الفيل তথা হস্তীর বছর জন্মগ্রহণ করেন।
হাদীসে নববী ও সাহাবীগণের নিকট থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, হস্তী বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল। সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত প্রকাশ করেছেন।

৩. **শৈশব ও কৈশোর :** জন্মের পর তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ। আর তাঁর দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। জন্মের কিছুদিন পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদুইন গোত্র বনি সাদের হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব নামক এক মহিলা একাধারে পাঁচ বছরের জন্য শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এরপর মক্কায় তাঁর মাতার নিকট প্রত্যাবর্তনের প্রায় এক বছর পর তাঁর মাতা মৃত্যুবরণ করেন। তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২ বছর পর ৮ বছর বয়সে দাদাকে হারিয়ে পরবর্তীতে প্রায় ১৭ বছর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি মাঝে মাঝে স্বীয় চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের বণিক কাফেলার সাথে যোগ দিয়ে সিরিয়া গমন করেছেন। কখনো চাচার ছাগল ভেড়া চরিয়েছেন। তবে সাধারণ যুবকদের মতো গল্পগুজব, মূর্তিপূজা, কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি সবসময় ঘৃণা করতেন। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিছু সাহসী যুবককে সাথে নিয়ে অন্যায়ের মূলোৎপাটনের জন্য 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. **বিবাহ ও নবুয়তপূর্ব জীবন :** ২৫ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ৪০ বছর বয়স্ক মহিলা খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর খাদীজা (রা) তাঁর সকল সম্পদ স্বামীর হাতে সমর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর সমাজসেবা, সততা, চিত্তাকর্ষক অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই প্রসিদ্ধ হন যে, সবাই তাঁকে আল আমীন ও আস সাদিক ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত।

৫. **নবুয়ত ও মাক্কী জীবন :** ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (আগস্ট মাসে) ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আসেন। এখানে সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। এরপর আল্লাহর নির্দেশে চতুর্থ বছর থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

১০ বছরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজা (রা) কিছুদিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বছরটি ছিল খুবই বেদনাদায়ক। এমতাবস্থায় অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহান আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

৬. **মদিনায় হিজরত ও মাদানী জীবন :** আল্লাহর নির্দেশে কুরাইশদের হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে নবুয়তের চতুর্দশ বছরে রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর (রা)-কে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন।

মক্কার কাফেররা তাঁর সাফল্য দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে মদিনার মুসলিমদের ধ্বংসের নিমিত্তে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তী আট বছর উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮ম হিজরী সালের রমযান মাসে রাসূল (স) মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের দশ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এ বছর রাসূলুল্লাহ (স) লক্ষাধিক সাহাবী নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

৭. **ওফাত :** হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ১১ হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি কত তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাবেয়ী এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি অভিমত রয়েছে। যথা– ক. ১ রবিউল আউয়াল, খ. ২ রবিউল আউয়াল, গ. ১২ রবিউল আউয়াল, ঘ. ১৩ রবিউল আউয়াল।

১২ রবিউল আউয়াল দিবসের প্রথম দিকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকাবস্থায় মিসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে বলতে থাকেন, اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى তথা "হে আল্লাহ! সুমহান সঙ্গীর সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন।" এরপর তিনি ওফাত পান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওফাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

উপসংহার : যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো, তাঁর জীবনচরিত যথাযথভাবে জানা এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ, অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করে তাঁর প্রকৃত উম্মত হিসেবে নিজেকে তৈরি করা।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٤) : بَيِّنْ مَكَانَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاِيْجَازِ.

■ প্রশ্ন : ২৪ ॥ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

اَوْ بَيِّنْ بَيَانًا شَافِيًا فَضْلَ الرَّسُوْلِ (صـ) وَشَرَفَهُ مَعَ اَهَمِّ مُعْجِزَاتِهِ بِالْاِخْتِصَارِ.

অথবা, রাসূল (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান সংক্ষেপে বর্ণনাপূর্বক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও নবী রাসূলগণের নেতা এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যাঁর আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। নিম্নে তাঁর মর্যাদা ও মুজিযা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো।

➲ فَضْلُ الرَّسُوْلِ (صـ) وَشَرَفُهُ :

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদা ও সম্মান : মুহাম্মাদ (স)-কে সম্মান করা রিসালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও নবী রাসূলদের নেতা। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাঁকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি এগুলোর ওপর আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর মর্যাদা দুটি দিক থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা–

১. **পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদা :** পবিত্র কুরআনে তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে তাঁর প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

١. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك ـ

٢. وما ارسلناك الا رحمة للعلمين ـ

٣. ورفعنا لك ذكرك ـ

তাঁকে সকল মানুষের উর্ধ্বে সম্মান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ... ـ

তাঁর বিশেষ মর্যাদার অংশ হিসেবে তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনোভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়া মুমিনদের জন্য নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ـ ان ذلكم كان عند الله عظيما ـ

অন্যান্য সকল মানুষ থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাঁকে ডাকতে হবে এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ـ

তাঁর সাথে আদব রক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ... الاية ـ

২. **হাদীসে নববীর আলোকে তাঁর মর্যাদা :** হাদীসে নববীতেও তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন– ক. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন– ١. انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر ـ

٢. انا اكرم ولد ادم على ربى ولا فخر ـ

খ. আবু উমামা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

ان الله فضلنى على الانبياء ـ

৩. **তাঁর মর্যাদার বিষয়ে অহীর অনুসরণ :** নবী রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদের ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালঙ্ঘন। এজন্য রাসূল (স) অহীর জ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করতঃ স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ـ

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ياهل الكتب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ـ

৩ اهم معجزات الرسول (صـ) :

রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক মুজিযা দান করেছিলেন। নিম্নে তাঁর প্রধান মুজিযাসমূহ উপস্থাপন করা হলো–

১. **পবিত্র কুরআন :** অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকদেরকে এর অনুকরণে ছোট্ট একটি সূরা তৈরি করতে আহ্বান করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِه وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

অন্যত্র আল্লাহ কাফেরদের উক্তিকে এভাবে তুলে ধরেন– তারা তাতে অক্ষম হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّه اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى۔

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি।

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা :** পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিযার মধ্যে দুটি মুজিযা গুরুত্বপূর্ণ। যথা–

ক. ইসরা তথা মিরাজ : মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِه لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَه مِنْ اٰيٰتِنَا ۔ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর জন্য এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ সম্ভব।

খ. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ : মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্র হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ অযু, গোসল ও পানি পান করতে পারে। তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া তাঁর

দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। বাকশক্তিহীন কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মুজিযা। আর তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٥) : اُذْكُرْ اَسْمَاءَ الْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ ذُكِرَتْ اَسْمَاءُهُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ -

■ প্রশ্ন : ২৫ ॥ যে সকল নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে যুগে যুগে অগণিত নবী ও রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ -

কুরআন কারীমে তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র ২৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কুরআনে বর্ণিত নবী রাসূলগণের নাম উল্লেখ করা হলো।

اَسْمَاءُ الْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ ذُكِرَتْ فِى الْقُرْاٰنِ ○ :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী রাসূলগণের নাম : পবিত্র কুরআনে নবী রাসূলগণের মধ্যকার মোট ২৫ জনের নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে আঠারো জনের নাম সূরা আনয়ামে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَنْ نَشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ - وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

এ আয়াতসমূহে যাঁদের নাম বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন–

১. হযরত ইবরাহীম (আ)
২. হযরত ইসহাক (আ)
৩. হযরত ইয়াকুব (আ)
৪. হযরত নূহ (আ)
৫. হযরত দাউদ (আ)
৬. হযরত সোলায়মান (আ)
৭. হযরত আইয়ুব (আ)
৮. হযরত ইউসুফ (আ)
৯. হযরত মুসা (আ)
১০. হযরত হারুন (আ)
১১. হযরত যাকারিয়া (আ)
১২. হযরত ইয়াহইয়া (আ)
১৩. হযরত ঈসা (আ)
১৪. হযরত ইসমাঈল (আ)
১৫. হযরত আল ইসায়া (আ)
১৬. হযরত ইউনুস (আ)
১৭. হযরত ইলিয়াস (আ)
১৮. হযরত লুত (আ)

অবশিষ্ট সাতজন নবী হলেন–

১৯. হযরত আদম (আ)।

যেমন সূরা আলে ইমরানের ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۔

২০. হযরত ইদরীস (আ)। সূরা মারইয়ামের ৫৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا۔

২১. হযরত হুদ (আ)। সূরা আল আরাফে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

২২. হযরত সালেহ (আ)। যেমন সূরা আরাফে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا۔

২৩. হযরত শোয়াইব (আ)। যেমন সূরা আরাফে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔

২৪. হযরত যুলকিফল (আ)। যেমন সূরা সাদ এর ৪৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْاَخْيَارِ۔

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (স)। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যেমন সূরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔

উপসংহার : মুসনাদে আহমদের একটি হাদীসে নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রাসূলের সংখ্যা ৩১৫ জন বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল ও কুরআনের বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়।

■ اَلسُّؤَالُ (٢٦) : اِبْحَثْ عَنْ اَهَمِّ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ (صـ) وَخَتْمِ النُّبُوَّةِ بِهٖ۔

■ প্রশ্ন : ২৬ ॥ মহানবী (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ এবং তাঁর দ্বারা নবুয়তের সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স) ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সকল নবী রাসূলের সর্দার এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব, যাঁর আলোতে আলোকিত হয়েছে সমগ্র মানবজাতি। নিম্নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ ও তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

١ اَهَمُّ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ (صـ) :

মহানবীর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ : মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে অনেক মুজিযা দান করেছিলেন। নিম্নে তাঁর প্রধান মুজিযাসমূহ উপস্থাপন করা হলো–

১. **পবিত্র কুরআন :** অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন একটি চিরস্থায়ী মুজিযা, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে এর একটি ছোট সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে ব্যর্থ হয়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّهٖ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى۔

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের নিকট হতে একটি নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্বতন গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি?

কুরআনের শব্দ গ্রন্থনার ন্যায় এর অন্তর্নিহিত অর্থও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পারছে। আর তখন কুরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করে একথা স্বীকার করে নিচ্ছে যে– ليس هذا كلام البشر অর্থাৎ, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **কুরআনে উল্লিখিত অন্যতম দুটি মুজিযা :** পবিত্র কুরআনের অসংখ্য মুজিযার মধ্যে দুটি মুজিযা গুরুত্বপূর্ণ। যথা–

ক. **ইসরা তথা মিরাজ :** মহানবী (স)-এর ইসরা তথা মিরাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মহানবী (স)-এর জন্য এরূপ মিরাজ তথা অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ সম্ভব।

খ. **চন্দ্র খণ্ডিতকরণ :** মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। রাসূল (স) তাদের দাবি অনুযায়ী স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলে আল্লাহর হুকুমে পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্র হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ..... الاية

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া, যাতে মানুষ অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে, তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানি সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া, তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হওয়া, মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর আরোগ্য লাভ, বাকশক্তিহীনের কথা বলা এবং পাগলের সুস্থ হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ختم النبوة :

নবুয়তের সমাপ্তি : ইসলামী আকিদা হলো মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পর আর কোনো অহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল আসবে না। কুরআন ও অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দলীল : ১. যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

২. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে নবীগণের ওপর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠটি হলো, আমার দ্বারা নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

৩. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেন–

وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ نَبِيٌّ۔

৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ إِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلَا نَبِيَّ۔

উপসংহার : নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ কুরাইশ বংশে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে মহামানব, সর্বোত্তম চরিত্র ও আদর্শ ইত্যাদি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, সেহেতু তিনিই কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ।

■ **السُّؤَالُ (٢٧) : اُكْتُبْ مَا تَعْلَمُ بِمَكَانَةِ الصَّحَابَةِ ـ ثُمَّ أَثْبِتْ بِالْأَدِلَّةِ "أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ"۔**

■ **প্রশ্ন : ২৭ ॥ সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লেখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, 'সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।** [ফা. প. ২০১৭]

او عَيِّنْ مَكَانَةَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১৫]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর সম্মান ও ভালোবাসার অংশ হলো, তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালোবাসা। রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, সম্মান ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আবার সাহাবীদের মাঝে নবীর পরিবার ও বংশধরদের মর্যাদা ও সম্মান সর্বাধিক। কুরআন ও হাদীসে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১ : مَكَانَةُ الصَّحَابَةِ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **শ্রেষ্ঠ যুগ :** রাসূল (স)-এর যুগের পর শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে সাহাবীদের যুগ। কেননা এ যুগের মানুষেরা তথা সাহাবীরাও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্বের সনদ রাসূল (স) নিজেই দিয়েছেন– خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

২. **আকাশের ধ্রুবতারা :** মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারার ন্যায়। তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষ খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ। যেমন মহানবী (স) বলেন– اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

৩. **মহানবীর প্রিয়পাত্র :** সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। মহানবীও সাহাবীগণকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔

৪. **জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত :** মহান আল্লাহ রাসূল (স)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু সাহাবীকে ইহজগতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারাহ তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন খুবই প্রসিদ্ধ।

রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ ابْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ۔

৫. **উম্মতের আমানত :** মহানবী (স) স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের আমানত এবং তাঁদেরকে রেখে গেছেন সমগ্র উম্মতের আমানতস্বরূপ। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী– اَصْحَابِىْ اَمَانَةٌ لِأُمَّتِىْ

৬. **বাইয়াতে রিদওয়ান :** হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী প্রায় চৌদ্দশত সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ঘোষণা আল কুরআনে এভাবে এসেছে–

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الخ۔

৭. **ঈমানের দৃঢ়তা :** মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তা ছিল পাহাড়ের চেয়েও মযবুত ও অবিচল। হযরত কাতাদা (র) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

اَلْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ۔

৮. **আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য :** সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔

৯. **মহানবী (স)-এর অনুসরণ :** সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (স)-এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তাঁরা সর্বদা মহানবী (স)-এর নির্দেশ পালনের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় প্রস্তুত থাকতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

এরই নমুনাস্বরূপ বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সাদ ইবনে ওবাদা (রা) বলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ أَمَرْتَنَا اَنْ نَخِيْضَ الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا۔

অর্থাৎ, ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদেরকে মহাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

১০. **হাদীসের আমানতদার :** সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এজন্যই তাঁরা মহানবী (স)-এর হাদীসের পূর্ণ আমানতদার ছিলেন। এ ব্যাপারে মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

١۔ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

٢۔ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ۔

১১. আল্লাহ কর্তৃক সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত : সাহাবীগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত। আর এ মর্মে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) তাদের সত্যায়ন করেন। যেমন–

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব হলো, সকল সাহাবীর জন্য দোয়া করা এবং তাঁদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা।

খ. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন–

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ۔

এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেম বলেছেন– اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ; অতএব কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ধারণা করা বা সমালোচনা করা কুরআন ও সুন্নাহ অমান্য করা এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে ঘৃণা করার সমতুল্য।

➲ عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ :

সাহাবীগণের عَدَالَة তথা ন্যায়পরায়ণতা : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, عَدَالَة তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর عَدَالَة তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ وَذٰلِكَ لِتَعْدِيْلِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَهُمْ وَلِشَهَادَةِ الْوَاقِعِ التَّارِيْخِ لَهُمْ۔

অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও এর সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের عَدَالَة প্রমাণিত হয়। যেমন–

١۔ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

٢۔ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

٣۔ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

٤۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ۔

৫. لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ـ

২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মিলেনি। সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ عدالة الصحابة প্রমাণ করে। তাঁদের সমাজের মানুষ এমনকি কাফেররাও তাঁদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে তাবেয়ীগণও তাঁদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন। এরপর আমরাও কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মুজিযা। আর তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অতীব জরুরি এবং তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

■ **السُّؤَالُ (٢٨) : عَيِّنْ مَكَانَةَ الصَّحَابَةِ وَاَهْلِ الْبَيْتِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ عَلٰى ضَوْءِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ ـ**

■ **প্রশ্ন : ২৮ ॥ হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণের (রা) ও আহলে বাইতের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর।** [ফা. প. ২০১৩]

او عَيِّنْ مَكَانَةَ الصَّحَابَةِ (رضـ) عَلٰى ضَوْءِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ ـ

অথবা, হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের (রা) মর্যাদা নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০১১]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রাখতে নবী রাসূলগণের পর যারা অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর তাঁদের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পর হাদীসে নবী করীম (স) নিজেই বর্ণনা করেছেন।

مَكَانَةُ الصَّحَابَةِ عَلٰى ضَوْءِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ :

হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবীগণের মর্যাদা : অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. **সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত :** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ (فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ) ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁদের পরে তাদের পরবর্তীগণ এরপর তাঁদের পরবর্তীগণ অতঃপর মিথ্যা বিকাশ লাভ করবে।

২. **আমানতদার :** রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট রেখে গেছেন দীনের আমানত। তাঁরা তাঁদের আমানত যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। যেমন হাদীসে এসেছে– اَصْحَابِىْ اَمَانَةٌ لِاُمَّتِىْ

৩. **মুজতাবা তথা নির্বাচিত :** তাঁদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন স্বীয় দীন ও রাসূল (স)-কে সাহায্য করার জন্য। যেমন ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

فَاخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَنُصْرَةِ دِيْنِهٖ ـ

৪. **জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী :** অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দশ জন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানপূর্বক ঘোষণা করেছেন–

اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ اِبْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زُبَيْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

৫. **রাসূল (স)-এর ভালোবাসার মানুষ :** সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দীনের সাহায্যকারী ও তাঁর অতিপ্রিয় পাত্র। তাই তাঁদের ভালোবাসা, সম্মান করা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। যেমন আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন–

١ـ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ ـ

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) অথবা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।

٢ـ اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ـ

৬. **অনুসরণীয় আদর্শ :** সাহাবীগণ মহান আল্লাহ ও স্বীয় রাসূল (স)-এর প্রতিটি বিধানকে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে থেকে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন– وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

এজন্য তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে নবী করীম (স) বলেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ـ

কুরআন সুন্নাহর বর্ণনা থেকে সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত হয়, তার সারকথা হলো–

১. মানবজাতির মধ্যে নবী রাসূলগণের পরেই সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে خُلَفَاءِ رَاشِدِيْن-এর শ্রেষ্ঠত্ব।

২. অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে না, কারণ তা ঈমানের পরিপন্থি হবে।

৭. **হাদীসের আমানতদার :** রাসূল (স)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পূর্ণ আমানতদার। তাঁরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

١ـ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

٢ـ مَنْ يَقُلْ مَا لَمْ اَقُلْ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِى النَّارِ ـ

فَضْلُ اَهْلِ الْبَيْتِ :

আহলে বাইতের মর্যাদা : আহলে বাইত তথা মহানবী (স)-এর পরিবার পরিজনের মর্যাদা সাহাবীগণের মর্যাদা থেকে কোনো অংশে কম নয়। কারণ তাঁরাও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণ উম্মতের জন্য মাতাস্বরূপ। মহানবী (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁকে ভালোবাসা ও সাহায্য করার ক্ষেত্রে اَهْل بَيْت তথা তাঁর বংশ ও পরিবার পরিজনগণ অগ্রণী ছিলেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর আত্মীয়গণকে ভালোবাসার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ لَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ـ

উপসংহার : সাহাবীগণের দীনের জন্য ত্যাগের প্রতিফলস্বরূপ আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং মহানবী (স)-ও হাদীসে তাদের মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। অতএব কোনো কারণে তাঁদের মন্দ বলা ও সমালোচনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে অবশ্যই সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

■ **اَلسُّؤَالُ (٢٩) : تَحَدَّثْ عَنْ خَتْمِ النُّبُوَّةِ بِاَدِلَّةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ**

■ **প্রশ্ন : ২৯ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৯]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বিশ্বাস করা ফরয। তাঁর পরে কেউ নবুয়তের দাবি করলে সে নিজেও কাফের আর যারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করবে তারাও মুরতাদ ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে কুরআন সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

اَلْاَدِلَّةُ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ :

খতমে নবুয়তের পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল : خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহুবিধ দলীল রয়েছে। যেমন–

ক. কুরআনের দলীল :

১. আল্লাহ তায়ালা খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করার ঘোষণা করে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

৩. অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের প্রতিবাদ করে বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে দাবি করে আমিও অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছি যেরূপ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।

খ. সুন্নাহ তথা হাদীসের দলীল : মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খতমে নবুয়ত তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন, ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে সকল নবীর ওপর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো– وَخُتِمَ بِيَ النَّبُوَّةُ অর্থাৎ, আমার দ্বারা নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে অন্যত্র বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী ওফাত লাভ করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই; কিন্তু খলিফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন।

৩. রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন– اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ, মুসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল, আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোনো নবী নেই।

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেন–

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ ـ

অর্থাৎ, রিসালাত ও নবুয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আমার পর আর কোনো রাসূল এবং নবী নেই।

৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ

لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔

অর্থাৎ, আমার ও অন্যান্য নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন; কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। অতঃপর লোকজন এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হয়ে বলতে লাগল, এ ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণাঙ্গ না থাকত! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের স্থান। কারণ আমি এসেই নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে আমিই এ সর্বশেষ ইট এবং আমিই সর্বশেষ নবী।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন−

اِنَّ لِىْ خَمْسَةَ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفَّارَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ۔

অর্থাৎ, আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আমি আহমাদ এবং আমি মাহী তথা উচ্ছেদকারী। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফর উচ্ছেদ করবেন এবং আমি حَاشِر তথা একত্রকারী, আমার পদদ্বয়ের নিকটেই কেয়ামত দিবসে মানুষ একত্রিত হবে এবং আমি عَاقِب তথা সর্বশেষ, যার পর আর কোনো নবী নেই।

উপসংহার : মানবতার মহান আদর্শ মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তাঁর পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী ও রাসূল পৃথিবীতে প্রেরিত হবে না। সুতরাং খতমুন নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। আর খতমুন নবুয়ত অস্বীকারকারীরা মুরতাদ ও কাফের।

■ **اَلسُّؤَالُ (٣٠) : اُذْكُرْ نَشْأَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارَهَا مَعَ ذِكْرِ اٰثَارِهَا فِىْ بَنْغَلَادِيْشَ۔**

■ **প্রশ্ন : ৩০ ॥ বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।** [ফা. প. ২০০৯]

او ـ مَاذَا تَعْلَمُ عَنْ خَتْمِ النُّبُوَّةِ؟ اُذْكُرْ نَشْأَةَ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارَهَا مَعَ ذِكْرِ اٰثَارِهَا فِىْ بَنْغَلَادِيْشَ۔

অথবা, খতমে নবুয়ত সম্পর্কে তুমি কী জান? বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উদ্ভব, প্রসার এবং ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম শর্ত। তাঁর পরে আর অহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূলের আগমনও ঘটবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন− مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ নিম্নে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রশ্নালোকে সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى خَتْمِ النُّبُوَّةِ لُغَةً :

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর আভিধানিক অর্থ : خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. বিখ্যাত আরবি অভিধান لِسَانُ الْعَرَبِ-এ বলা হয়েছে– خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ অর্থাৎ, জাতির শেষ ব্যক্তিই হচ্ছে খাতামুল কাওম।

২. আল্লামা জাওহারী বলেন, কোনো বস্তুর খাতেম বলতে তার শেষকে বোঝায়। আর মুহাম্মাদ (স) নবীগণের সর্বশেষ।

৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, খাতামুন নাবিয়্যীন নবুয়তকে শেষ করে দিয়েছে।

৪. আল্লামা ইবনুল ফারিস (র) বলেন, خَتْم অর্থ– বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা। নবী করীম (স) হলেন خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ; সেহেতু তিনিই তাঁদের শেষে এসেছেন।

৫. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, খাযেন, সাহেবুল মাজমা মইজউদ্দিন ফিরোজাবাদী, ইমাম জুবাইদী (র) প্রমুখ خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর অর্থ করেছেন, নবীদের সর্বশেষ তথা নবুয়তের পরিসমাপ্তি।

مَعْنَى خَتْمِ النُّبُوَّةِ اصْطِلَاحًا :

خَتْمُ النُّبُوَّةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় 'খতমুন নবুয়তের' মর্ম হলো ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে আর কোনো ব্যক্তির অভ্রান্ততা পবিত্রতা বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই এ কথা স্বীকার করা।

মোদ্দাকথা, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি করেছেন, তাকেই ইসলামের পরিভাষায় خَتْمُ النُّبُوَّةِ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

نَشْأَةُ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارُهَا :

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

وَاِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ.

অর্থাৎ, আর জেনে রেখ, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদী আগমন করবে। এদের প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করবে; অথচ আমিই সর্বশেষ নবী! আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মুজিযা ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়া। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। কারণ তাঁর ওফাতের পরপরই আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের সময় ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মুসায়লামাতুল কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা ও সাজাহ। এরাই خَتْمُ النُّبُوَّةِ-কে অস্বীকারপূর্বক নিজেদের নবী বলে দাবি করে। সাথে সাথে বিভিন্ন ভূখণ্ডে আরো কিছু ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন। এরপরও সময়ের আবর্তনে বিভিন্ন ভূখণ্ডে خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের অন্যতম হলো বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায়।

কাদিয়ানীদের পরিচিতি : দাজ্জাল কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমাদ পাকিস্তানস্থ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। সে ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলাম বহির্ভূত একটি নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে, এটাই কাদিয়ানী ধর্মমত এবং তার অনুসারীরা কাদিয়ানী নামে পরিচিত। এ নেতাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে خَتْمُ النُّبُوَّةِ অস্বীকারপূর্বক নিজেকে নবী বলে দাবি করে, নাউযুবিল্লাহ! বর্তমানে এর বেশকিছু অনুসারীও রয়েছে, এদেরকে ভারতীয় মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজরা সমর্থন এবং অর্থ দিয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করার ফলে এ বিভ্রান্ত, মুরতাদ দলটি কিছুটা প্রসারিত হয়। এ দলটির নাম হলো– আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত।

⊃ نَشْأَةُ الْمُنْكِرِيْنَ لِخَتْمِ النُّبُوَّةِ وَانْتِشَارُهَا فِيْ بَنْغَلَادِيْش :

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের মনমস্তিষ্ক থেকে জেহাদের স্পৃহা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা লক্ষ্য করল যে, প্রথমে মুসলিমদের ঈমান ও বিশ্বাস নষ্ট করতে হবে। এ লক্ষ্যে ১৮ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিমদের মধ্য থেকেই একজন ভণ্ড নবী ও একজন ভণ্ড পীর মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ভণ্ড নবীর জন্য মির্জা গোলাম মোর্তুজার পুত্র গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে মনোনীত করে এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজরা তাদের পক্ষে গণসমর্থন ও মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে শিকার করে নেয়। মির্জা গোলাম আহমাদ ক্রমান্বয়ে তিনধাপে নবী হওয়ার দাবি করে। প্রথমে ১৮৮০ সনে সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর একজন মুবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারক বলে ঘোষণা করে। ১০ বছর পর্যন্ত ধর্মপ্রচারকের নামে কাজ করতে থাকে। এরপর ১৮৯১ সনে মুবাল্লিগ পদ ত্যাগ করে সে নিজেকে মুজাদ্দিদ এবং প্রতিশ্রুত মরইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে ও কাজ করতে থাকে। ১০ বছর পর ১৯০১ সনে আরো একটু এগিয়ে সে নবুয়তের দাবি করে। প্রথমে সে বুরুজী নবী, অতঃপর জিল্লী নবী, এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ নবী ও শেষ নবী হওয়ার দাবি করে। এরপর থেকে তারা বাংলাদেশে তাদের ধর্মমত প্রচার করতে থাকে। দেশের বিভিন্ন শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে কেন্দ্র কায়েম করে নানা ধরনের পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। ঢাকার বখশিবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। তারা মুসলিমদের মুরতাদ বানানোর জন্য পাঁচটি পৃথক সংগঠনের নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেগুলো হলো–

১. মজলিসে আনসারুল্লাহ, ২. মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়া, ৩. মজলিসে আতফালুল আহমদিয়া, ৪. লাজনা এমাইল্লা ও ৫. নাসেরাত। ঢাকাতে তাদের ৬টি কেন্দ্র এবং সারাদেশে তাদের ১২৩টির বেশি কেন্দ্র এ ধর্মমত প্রচার করছে।

বিভিন্ন দেশে এদের তৎপরতা : কাদিয়ানী সম্প্রদায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। তবে তারা মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরান এদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের অবস্থান : পথহারা এ দলটি নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত নামে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এরা خَتْمُ النُّبُوَّةِ অবিশ্বাস করে এবং ঢাকার বখশিবাজারে এদের কেন্দ্রীয় অফিস রয়েছে। এমনকি তাদের সংরক্ষিত পৃথক মসজিদও রয়েছে। প্রকাশ্যে বা গোপনে

তারা বিভিন্ন স্থানে বামপন্থি সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় তৎপরতা চালিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। মুসলিমদের প্রবল বিরোধিতার কারণে তাদের মিশন সফল হচ্ছে না এবং কখনো হবে না ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমেই خَتْمُ النُّبُوَّةِ তথা নবুয়তের সমাপ্তি হয়েছে। তারপর আর কোনো নবী এ বিশ্বভুবনে আগমন করবেন না। যেহেতু খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, সেহেতু একে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ মুসলমানের নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٣١) : مَا هِيَ الْمُعْجِزَةُ؟ وَلِمَنْ هٰذِهِ خَاصَّةٌ؟ بَيِّنْ.

■ প্রশ্ন : ৩১ ॥ মুজিযা কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট? বর্ণনা কর।

اَوْ. مَا مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ؟ وَلِمَنْ تَخْتَصُّ بِهٖ؟

অথবা, মুজিযা অর্থ কী? এটা কার জন্য নির্দিষ্ট?

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত তথা নিদর্শন ও চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলোকে মুজিযা বলা হয়। নিম্নে মুজিযা সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো।

⊃ مُعْجِزَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি اِعْجَازٌ শব্দ থেকে গৃহীত। এটা اِسْم فَاعِل বাবে اِفْعَال-এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ। যা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ১. অক্ষমকারী, ২. অলৌকিক বিষয়, ৩. অসাধারণ কর্ম, ৪. অস্বাভাবিক কর্ম, ৫. ইংরেজি প্রতিশব্দ Miracle, Wonder, ৬. অলৌকিক নিদর্শন, ৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِهٖ

মূলত মুজিযা শব্দটি اٰيَة তথা চিহ্ন অর্থে ব্যবহার হতো। যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে দেয়া মুজিযার ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ পরবর্তী যুগে তৃতীয় হিজরী শতকের দিকে আলেমগণ মুজিযা পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুজিযার পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

وَالْاٰيَاتُ اَيْ خَوَارِقُ الْعَادَاتِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُعْجِزَاتِ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

অর্থাৎ, নবীগণ তাঁদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دَاعِيَةً اِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ مَقْرُوْنَةً بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ ـ

অর্থাৎ, মুজিযা হলো এমন একটি অস্বাভাবিক কাজ, যা উত্তম কাজের দিকে আহ্বানকারী এবং নবুয়তের দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. ইলমুল কালামের পরিভাষায়–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ ظَهَرَ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ـ

অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী রাসূল হতে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তাকে মুজিযা বলা হয়।

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতার মতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللّٰهُ عَلَى يَدِ نَبِيٍّ تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهِ ـ

মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে সত্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত নিদর্শনই হলো মুজিযা। যেমন আল্লাহর বাণী–

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

মুজিযার দৃষ্টান্ত : সকল নবী রাসূলই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। যেমন– ১. মুসা (আ)-এর লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, ২. ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা, ৩. ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিরাপদে থাকা, ৪. اَصْحَابُ الْكَهْفِ-এর ঘটনা, ৫. কুরআনুল কারীম হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর একটি চিরন্তন মুজিযা ইত্যাদি।

⊃ لِمَنْ تَخْتَصُّ بِهِ الْمُعْجِزَةُ :

মুজিযা যাদের জন্য নির্দিষ্ট : মুজিযা কাদের জন্য নির্দিষ্ট, এ ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন– اَلْمُعْجِزَةُ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ

অর্থাৎ, মুজিযা নবী রাসূলগণ থেকে প্রকাশিত হয়; অন্য কারো থেকে নয়।

এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসির একমত যে, মুজিযা নবী রাসূলগণের জন্যই খাস। কেননা এগুলো তাঁদের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অসাধারণ ঘটনা তথা নিদর্শনকে মুজিযা বলা যায় না; বরং কারামত, ইসতিদরাজ ইত্যাদি বলা হয়। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন– وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চিরন্তন ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে।

■ اَلسُّؤَالُ (٣٢) : اُذْكُرْ بَعْضَ مُعْجِزَاتِ الرَّسُوْلِ (صـ) الَّتِىْ وَقَعَتْ فِىْ حَيَاتِه۔

■ **প্রশ্ন : ৩২ ॥ রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত কতিপয় মুজিযার বিবরণ দাও।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-কে আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াত তথা মুজিযা দান করেছেন। যা ছিল সর্বজনীন ও চিরন্তন এবং অন্যান্য নবী রাসূলের মুজিযা থেকে ব্যতিক্রম। এসবে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছিলো না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ۔

بَعْضُ مُعْجِزَاتِ الرَّسُوْلِ (صـ) :

রাসূল (স)-এর কতিপয় মুজিযা : নিম্নে রাসূল (স)-এর জীবনে সংঘটিত কয়েকটি মুজিযা উল্লেখ করা হলো–

১. **আল কুরআন :** যেহেতু মুহাম্মাদ (স) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন। আর তা হলো মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহ্বান করেন। তারা তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَقَالُوْا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّه اَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى۔

অর্থাৎ, তারা বলে, মুহাম্মাদ তাঁর রবের নিকট হতে একটি আয়াত তথা মুজিযা নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সকল শিক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি?

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিকদের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানবজাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পারছে। অবশেষে তারা স্বীকার করেছে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

২. **ইসরা ও মিরাজ :** অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রধান মুজিযা। কারণ عَامُ الْحُزْنِ তথা চিন্তার বছর মহানবী (স)-এর জীবনে এ মহান মুজিযা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ যে বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইন্তেকাল করেন, তখন কাফেরদের শত্রুতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য তায়েফে হিজরত করেন। সেখানেই তিনি প্রথম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তখনো তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীনের দায়িত্ব পালন করেন। সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে অলৌকিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ ও ঊর্ধ্বগমন করান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِه لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَه مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম তথা মক্কার মসজিদ থেকে মাসজিদুল আকসা তথা জেরুযালেমের মসজিদ পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। কেননা তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ اُسْرِى بِالنَّبِىِّ (صـ) مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى۔

বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল (স) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। সেখানে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নামসহ আল্লাহর বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বাহন ছিল বোরাক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মিরাজের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, হিজরতের এক বছর পূর্বে রজবের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন।

৩. **চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ :** মক্কার কাফেররা রাসূল (স)-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি করে। তখন রাত্রিবেলায় তাঁর ইশারায় পূর্ণিমার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার তা একত্রিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ..... الاية۔

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া আরো অগণিত আয়াত ও হাদীসে তাঁর মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর দোয়ায় খাদ্যে অলৌকিক বরকত, সামান্য পানিতে হাত রাখলে ঝরনা বের হওয়া যাতে মানুষ অযু গোসল ও পানি পান করতে পারে। তাঁর দোয়ায় মৃত ঝরনায় পানির সঞ্চার হওয়া, মাত্র দু'পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়া, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া তাঁর দোয়ায় অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করে। বাকশক্তিহীন ব্যক্তি কথা বলে এবং পাগল সুস্থ হয় ইত্যাদি।

উপসংহার : মুজিযা হচ্ছে নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর চিরন্তন ও সর্বজনীন মুজিযার মাধ্যমে নবী রাসূলগণের মুজিযার সমাপ্তি ঘটে।

■ **اَلسُّؤَالُ (٣٣) : مَتٰى اُسْرِىَ النَّبِىُّ (صـ)؟ بَيِّنْ وَاقِعَةَ الْمِعْرَاجِ مُخْتَصَرًا۔ هَلِ الْمِعْرَاجُ فِى الْيَقْظَةِ اَمْ فِى الْمَنَامِ؟**

■ **প্রশ্ন : ৩৩ ॥ মহানবী (স)-এর মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল? মিরাজের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। মিরাজ কি সশরীরে সজাগ অবস্থায় নাকি স্বপ্নে হয়েছিল?**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : হাজার বছর পর হলেও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য। এটা ছিল তাঁর জীবনে সংঘটিত অন্যতম প্রধান মুজিযা। যা স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (স) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ আরো অনেক নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়াস্বরূপ পেয়েছিলেন। নিম্নে প্রশ্নের আলোকে اِسْرَاء ও مِعْرَاج সম্পর্কে একটি চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

وَقْتُ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

মহানবী (স)-এর মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় : মিরাজ সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আল্লামা তাবারী (র) বলেন, যে বছর নবী করীম (স)-কে নবুয়ত দান করা হয়, সে বছরই মিরাজ সংঘটিত হয়।

২. নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নবুবী ও কুরতুবী (র) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. নবুয়তের দশম বছর ২৭ রজব সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা মনসুরপুরী (র) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

৪. হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে, নবুয়তের দ্বাদশ বছর রমযান মাসে মিরাজ অনুষ্ঠিত হয়। তবে অধিকাংশ আলেম দশম বছর ২৮ রজব বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَاقِعَةُ الْمِعْرَاجِ مُخْتَصَرًا :

ইসরা ও মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. পবিত্র কুরআনের আলোকে : পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো–

১. মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের অলৌকিক নিদর্শন اِسْرَاء ও مِعْرَاج তথা রাত্রি ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন সম্পর্কে সূরা বনি ইসরাঈলে বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। যার চতুর্দিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী, মহাদর্শী।

২. অন্যত্র তিনি বলেন–

اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ـ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ـ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ـ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ـ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ـ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ـ

অর্থাৎ, সে (মুহাম্মাদ স.) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাঁকে (হযরত জিবরাঈল আ. কে) আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া তথা অবস্থানের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তার দৃষ্টি বিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।

খ. হাদীসের আলোকে : মিরাজের ঘটনা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বিশজনের অধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে রাসূলুল্লাহ (স)-এর اِسْرَاء তথা মিরাজ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা নিম্নরূপ–

১. রাসূল (স) মক্কার مَسْجِد حَرَام থেকে বোরাকযোগে بَيْتُ الْمَقْدِس পৌঁছেন। এখানে নবী রাসূলগণের সাথে সালাত আদায় করেন।

২. بَيْتُ الْمَقْدِس থেকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর সহযোগিতায় بَيْتُ الْمَعْمُوْر পৌঁছেন। এ পর্যায়ে তাঁর নবী রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং সাত আসমান অতিক্রম করেন।

৩. সেখান থেকে তিনি سِدْرَةُ الْمُنْتَهى পর্যন্ত পৌঁছেন। এখানে তিনি আল্লাহর মহানিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণপূর্বক জান্নাত জাহান্নামও প্রত্যক্ষ করেন। এরপর মহান আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে সালাতসহ অনেক উপহার লাভ করেন।

هل الْمِعْرَاجُ فِى الْيَقْظَةِ أم فِى الْمَنَام ؟

মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয় নাকি স্বপ্নযোগে : মিরাজ রাসূল (স) সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সম্পন্ন করেন নাকি স্বপ্নযোগে, এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

الْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) وَعرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى.

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। নবীকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এরপর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা ছিল ততদূর উর্ধ্বালোকে গমন করেছেন।

২. **কতিপয় আলেমের অভিমত :** কতিপয় আলেমের মতে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় হয়েছিল। তাঁদের দলীল–

ক. আল্লাহর বাণী– وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

খ. মুয়াবিয়া (রা) বলেন– كَانَتْ رُؤْيَا صَالِحَةً

গ. আয়েশা (রা) বলেন– مَا فَقَدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ (صـ) لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মিরাজ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে হয়েছে।

তাঁদের দলীলের জবাব : ক. আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে رُؤْيَا দ্বারা رُؤْيَا بِالْعَيْنِ তথা চাক্ষুষ দর্শন উদ্দেশ্য।

খ. মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসের উত্তর হলো, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ১০ বছর পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল।

গ. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের অর্থ হলো, তাঁর দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল।

৩. **দার্শনিকদের অভিমত :** দার্শনিকরা মিরাজকে কাল্পনিক ব্যাপার ও মিথ্যা বলেছেন। তাদের মতে, সশরীরে কোনো মানুষের পক্ষে উর্ধ্বগমন সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের যুক্তি তথা দলীল : দার্শনিকগণ নিজেদের মতের সমর্থনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যথা–

১. আকাশে আরোহণের জন্য যে দ্রুতযানের প্রয়োজন ছিল সেযুগে এরূপ কোনো যানবাহন ছিলো না। অতএব মিরাজ আকাশপানে হওয়া অসম্ভব।

২. উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হলে আকাশ ফেটে যাওয়া ও পুনরায় জোড়া লাগা আবশ্যক, অথচ এটা অসম্ভব।

দার্শনিকদের দলীলের জবাব : ১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের যুক্তির জবাবে বলেন, সে যুগে দ্রুত যানবাহন ছিলো না; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত বোরাক ছিল বিদ্যুতের চেয়েও অধিক গতিসম্পন্ন।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ مَنْ رَدَّهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ

অর্থাৎ, মিরাজের সংবাদ সত্য। যে তা প্রত্যাখ্যান করবে সে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত।

২. দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলা যায়, আকাশ ফেটে যাওয়া আবার মিলিত হওয়া আল্লাহর মহান কুদরতে সম্ভব।

দলীল :

١- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-

٢- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

উপসংহার : মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত অনন্য মুজিযা। যা পূর্ববর্তী কোনো নবী রাসূলগণের যুগে ঘটেনি। আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমণ ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবলির মধ্যে আরো অনেক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা। আমাদের এ ইসরা ও মিরাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

■ السُّؤَالُ (٣٤) : مَا مَعْنَى الْمِعْرَاجِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاءِ؟

■ প্রশ্ন : ৩৪ ॥ মিরাজ অর্থ কী? মিরাজ ও ইসরার মাঝে পার্থক্য কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ সত্য। এটা ছিল তাঁর জীবনে সংঘটিত প্রধান মুজিযা, যা স্বপ্নযোগে নয়; বরং বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ শরীয়তের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান, আল্লাহর দীদার লাভ ও অসংখ্য নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন।

১ مِعْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ لُغَةً :

مِعْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : مِعْرَاج শব্দটি عُرُوْج মাসদার থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ- ঊর্ধ্বগমন, উপরে ওঠা ইত্যাদি। এটি اِسْم اٰلَة-এর واحد كُبْرٰى-এর সীগাহ, সুতরাং এর অর্থ দু'ধরনের হবে। যেমন- ১. ঊর্ধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র, ২. ঊর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা যানবাহন।

مَعْنَى الْمِعْرَاجِ اِصْطِلَاحًا :

مِعْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. জমহুর আলেমগণ বলেন- هُوَ عُرُوْجُ الرَّسُوْلِ اِلَى السَّمَاءِ حَيْثُمَا شَاءَ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ অর্থাৎ, মিরাজ হলো মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সান্নিধ্যে রাসূল (স)-এর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

اَلْمِعْرَاجُ صُعُوْدُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ اِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ فِى الْيَقْظَةِ-

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ (صـ) وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَاَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحٰى اِلَيْهِ مَا اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى۔

অর্থাৎ, মিরাজের ঘটনা সত্য। মহানবী (স)-কে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে। তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে ওঠানো হয়, অতঃপর উর্ধ্বজগতের যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সেখানে নেয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল তা প্রদান করেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِعْرَاجِ وَالْاِسْرَاءِ : ◌

মিরাজ ও ইসরার মধ্যকার পার্থক্য :

১. **আভিধানিক পার্থক্য :** مِعْرَاجٌ শব্দটি مِفْعَالٌ ওযনে اِسْمُ اٰلَةٍ-এর وَاحِد : نَصَرَ/ضَرَبَ বাবে عُرُوْجٌ মাসদার ع ـ ر ـ ج মাদ্দাহ مَادَّةٌ হচ্ছে। كُبْرٰى-এর সীগাহ। অর্থ– সিঁড়ি, ধাপ, উপরে উঠার যন্ত্রবিশেষ ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে–

ثُمَّ عُرِجَ بِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اِلَى السَّمَاءِ۔

আর اِسْرَاءٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার, মাদ্দাহ س ـ ر ـ ى জিনসে نَاقِصْ يَائِى অর্থ– রাতে ভ্রমণ করা। আল কুরআনে এসেছে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الخ۔

২. **পারিভাষিক পার্থক্য :**

১. مِعْرَاجٌ-এর সংজ্ঞায় শরহে আকাইদ আন নাসাফী প্রণেতা বলেন–

اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ۔

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন– مَا اُعْرِجَ الرَّسُوْلُ (صـ) فِىْ لَيْلَةِ الْاِسْرَاءِ

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন–

وَالْمِعْرَاجُ مَا عُرِجَ عَلَيْهِ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ۔

৪. কারো কারো মতে–

هُوَ اِسْرَاءُ النَّبِىِّ (ص) مِنْ مَكَّةَ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ الْعُرُوْجُ اِلَى السَّمَاءِ۔

পক্ষান্তরে اِسْرَاءٌ হলো–

اَلْاِسْرَاءُ سَفَرُ النَّبِىِّ (صـ) لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِبَرَكَةٍ خَاصَّةٍ مِنَ اللّٰهِ لِاَنْ يَحْصُلَ عِلْمُ عَيْنِ الْيَقِيْنِ بِرُؤْيَةِ اٰيٰتِ اللّٰهِ۔

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا۔

৩. **স্থানগত পার্থক্য :** মিরাজের সূচনা হলো মসজিদে আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্ত আকাশ, অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আরশে আযীম পর্যন্ত। পক্ষান্তরে اِسْرَاء-এর সূচনা হলো রাসূল (স)-এর হুজরা থেকে বায়তুল্লাহ অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।
সুতরাং মিরাজ হলো উর্ধ্বজগতের সফর আর اِسْرَاء হলো ভূপৃষ্ঠের সফর।

৪. **কার্যগত পার্থক্য :** مِعْرَاج-এ রাসূল (স) ঈমানের বিষয় যেমন– মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। তিনি বায়তুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহাসহ আল্লাহর অপার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিরাজি অবলোকন করেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালার মহান দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।
পক্ষান্তরে اِسْرَاء-তে রাসূল (স) মসজিদে আকসায় সকল নবী রাসূলের ইমাম হয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন এবং তাঁদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

৫. **আকিদাগত পার্থক্য :** اِسْرَاء কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আর مِعْرَاج সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এতদুভয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

উপসংহার : মূলত اِسْرَاء ও مِعْرَاج আলাদা কোনো বিষয় নয়; বরং اِسْرَاء হলো مِعْرَاج-এরই সূচনাপর্ব। আর এটা রাসূল (স)-এর বিশেষ মুজিযা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ নিদর্শন।

■ السُّؤَالُ (٣٥) : عَرِّفِ الصَّحَابَةَ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُوْدِ.

■ **প্রশ্ন : ৩৫ ॥ সাহাবীগণের সংজ্ঞা فَوَائِد قُيُوْد-সহ বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাঁদের মাধ্যমেই দিগ্‌দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। এমনকি তাঁদের মর্যাদা ও সফলতা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে সাহাবীর পরিচয় ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ صَحَابَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الصَّحَابَةِ لُغَةً :

صَحَابَة-এর আভিধানিক অর্থ : صَحَابَة শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি। মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে صَحَابَة শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَحَابِى;

مَعْنَى الصَّحَابَةِ اِصْطِلَاحًا :

صَحَابَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের ওপর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরাই সাহাবী।
২. ইমাম বুখারী (র) বলেন– مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ (صـ) اَوْ رَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ অর্থাৎ, যাঁরা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাই সাহাবী।
৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী (র) বলেন–
مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ اَوْ رَاٰهُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ.

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–
كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً اَوْ رَاٰهُ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِه۔

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে– الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِىَ النَّبِيَّ (صـ) مُؤْمِنًا بِه وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ইসলামের ওপর ইন্তেকাল করেছেন।

فَوَائِدُ الْقُيُوْدِ :

قُيُوْد-এর উপকারিতাসমূহ : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) সাহাবীর সংজ্ঞায় বলেন– الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِىَ النَّبِيَّ (صـ) مُؤْمِنًا بِه وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ এ সংজ্ঞার মাধ্যমে সাহাবীগণের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। যেমন উক্ত সংজ্ঞায় مَنْ لَقِىَ বাক্যটি দ্বারা সেসব লোক সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যারা তাঁর মজলিসে বেশি বা অল্প সময় সাক্ষাৎ করেছেন, চাই তাঁর থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করুক বা না করুক, তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক। আর যিনি তাঁকে একবার দেখেছেন অথচ মজলিসে বসতে পারেননি আর যিনি ওজরবশত তাঁকে দেখেননি তিনিও সাহাবী। যেমন– অন্ধ ব্যক্তি। তবে যে কাফের অবস্থায় তাঁকে দেখেছে; কিন্তু পরে মুসলিম হলেও দ্বিতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি সে সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাহাবীর সংজ্ঞায় مُؤْمِنًا بِه দ্বারা সেসব লোক সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে; অথচ তার প্রতি ঈমান আনেনি। যেমন– اَهْلِ كِتَاب;
وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ এ বক্তব্য দ্বারা সে ব্যক্তিও সাহাবী থেকে বের হয়ে যায়, যে মুমিন অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছে এরপর ঈমান থেকে বিমুখ হয়েছে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা মুরতাদ। এ পরিসরে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও ইবনে খাতন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। কারণ তাঁরা মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে ফিরে এসেছেন, রাসূল (স)-এর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হোক বা না হোক এ ব্যাপারে উভয়ই সমান। এটাই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা।

উপসংহার : অহীর ধারক মানবতার মুক্তির দিশারি মুহাম্মাদ (স)-এর পরশে ও দর্শনে যেসব মুমিন ধন্য হয়েছেন, আর মৃত্যু অবধি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরাই সাহাবী। পরন্তু ঈমানসহ রাসূলের দর্শনের পর ইন্তেকালের পূর্বে সামান্য সময়ের জন্য ঈমানচ্যুত হলেও ইন্তেকাল ঈমানের ওপর হলে তিনিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন।

■ السُّؤَالُ (٣٦) : اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ اَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ۔

■ **প্রশ্ন : ৩৬ ॥ দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।** [ফা. প. '০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রেরিত প্রত্যেক নবী রাসূলের কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সহচর ও অনুসারী ছিলেন। তাঁরা হতেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। নবী রাসূলগণের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাঁদের মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে দিগ্‌দিগন্তে; যা اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ দ্বারা প্রমাণিত, তাঁরা ছিলেন عُدُوْلٌ তথা উম্মতের আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। নিম্নে প্রশ্নালোকে সাহাবায়ে কেরামের عَدَالَة সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

৩ عدالة الصحابة :

সাহাবীগণের عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন–

الصحابة كلهم عدول وذلك لتعديل الله ورسوله لهم ولشهادة الواقع التاريخ لهم۔

অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও এর সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের عدالة প্রমাণিত হয়। যেমন–

١۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه۔

٢۔ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة۔

٣۔ لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرت واولئك هم المفلحون۔

٤۔ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الرشدون۔

٥۔ لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔

২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মিলেনি। সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ عدالة الصحابة প্রমাণ করে। তাঁদের সমাজের মানুষ এমনকি কাফেররাও তাঁদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে তাবেয়ীগণও তাঁদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন। এরপর আমরাও

কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম ও আলেমের সর্বসম্মত মতানুসারে কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামান্যতম খারাপ ধারণা করা, সমালোচনা করা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

■ السُّؤَالُ (٣٧) : عَرِّفِ الصَّحَابَةَ - ثُمَّ اَثْبِتْ عَدَالَتَهُمْ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ - وَمَا حُكْمُ تَنْقِيْدِهِمْ؟

■ প্রশ্ন : ৩৭ ॥ সাহাবীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের ন্যায়পরায়ণতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত কর। তাঁদের সমালোচনা করার বিধান কী?

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ ও দীনের অকুতোভয় সৈনিক। তাঁদের মাধ্যমেই দিগদিগন্তে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। এমনকি তাঁদের মর্যাদা, সফলতা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। তাঁরা ছিলেন عُدُوْلٌ তথা উম্মতের আমানতদার এবং অনুকরণীয় আদর্শ।

⊃ اَلصَّحَابَةُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الصَّحَابَةِ لُغَةً :

اَلصَّحَابَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : صَحَابَةٌ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, অনুসারী, সহচর ইত্যাদি।

مَعْنَى الصَّحَابَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَلصَّحَابَةُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম সাহাবীর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী সাথিগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরাই সাহাবী।

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন–

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ (صـ) اَوْ رَاٰهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ -

অর্থাৎ, যাঁরা নবী করীম (স)-কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলিম হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁরাই সাহাবী।

৩. ইমাম আলী ইবনে মাদিনী বলেন–

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ اَوْ رَاٰهُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ -

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً اَوْ رَاٰهُ فَهُوَ مِنْ اَصْحَابِهِ -

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে–

الصحابى من لقى النبى (صـ) مؤمنا به ومات على الاسلام ـ

অর্থাৎ, সাহাবী হলেন যিনি ঈমানের সাথে নবী করীম (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩ عدالة الصحابة :

সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতা : মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পর প্রত্যেক রাবীর মুখস্থশক্তি, عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; কিন্তু কোনো সাহাবীর عدالة তথা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি; বরং ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণপূর্বক বলেছেন–

الصحابة كلهم عدول وذلك لتعديل الله ورسوله لهم ولشهادة الواقع التاريخ لهم ـ

অন্যদিকে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা সাহাবীগণের শিক্ষাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করতঃ এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা প্রচার করে। এর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙে ফেলা। কেননা সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততা প্রমাণে দলীলসমূহ : সাহাবায়ে কেরামের সততা প্রমাণের দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. আল কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের عدالة প্রমাণিত হয়। যেমন–

١ـ والسبقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ـ

٢ـ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ـ

٣ـ لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرت واولئك هم المفلحون ـ

٤ـ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ـ

٥ـ لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ـ

২. গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সমস্ত মানবসমাজ ও জ্ঞানীগণের নিকট প্রমাণের ভিত্তিতেই মানুষের সততা প্রকাশ পায়। আর একজন সাহাবীর ব্যাপারেও হাদীস বলার ক্ষেত্রে মিথ্যার কোনো প্রমাণ মেলেনি। সাহাবীগণ পরস্পর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন পন্থা অবলম্বন করেছেন।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ عدالة الصحابة প্রমাণ করে। তাঁদের সমাজের মানুষ এমনকি কাফেররাও তাঁদের সততা স্বীকার করত। বিশেষত সে যুগে তাবেয়ীগণও তাদের সততার বিষয়ে কঠিনভাবে তাহকীক করেছেন, এরপর আমরা কোনো হাদীসের বর্ণনায় একটি মিথ্যাও পাইনি। কারণ তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

حكم تنقيد الصحابة ৩ :

সাহাবীদের সমালোচনা করার বিধান :

১. সাহাবীদের সমালোচনা করা নিষেধ। কুরআন হাদীসের আলোকে আহলে হকের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এটা নিষিদ্ধ। সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী করীম (স) ইরশাদ করেন-

١. الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم الخ (ترمذى).

অর্থাৎ, সাবধান! সাবধান! আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর আমার সাহাবীগণকে তোমরা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করো না। বস্তুত যে আমার সাহাবীগণকে ভালোবাসল, সে আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসল, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।

٢. قال رسول الله (صـ) لا تسبوا اصحابي.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না।

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) الفقه الأكبر গ্রন্থে বলেছেন-

لا نذكر احدا من اصحاب رسول الله (صـ) إلا بخير.

অর্থাৎ, আমরা সাহাবীগণের গুণ চর্চা করব, দোষ চর্চা করবো না।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-

ان سب الصحابة حرام ومن اكبر الفواحش.

অর্থাৎ, সাহাবীগণকে গালি দেয়া হারাম এবং বড় অপরাধ।

৪. العقائد النسفية গ্রন্থকার বলেন-

ويكون عن ذكر الصحابة (رضـ) الا الخير.

অর্থাৎ, সাহাবীগণের আলোচনা করার সময় তাদের প্রশংসা ছাড়া অন্য আলোচনা হতে বিরত থাকবে।

৫. ইমাম আবু যুরয়া (র) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, সে কোনো সাহাবীর সমালোচনা করছে, তাহলে নির্ঘাত মনে করবে সে যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে রাসূল (স) হক ও কুরআন হক। এ কুরআন ও হাদীস সাহাবায়ে কেরামই আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন। তারা চায় আমাদের এ সূত্রপরম্পরাকে বিক্ষত করতে, যাতে পরিণামে পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ-ই বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরাই সমালোচনার অধিক উপযুক্ত। কারণ এরা যিনদীক তথা ধর্মত্যাগী।

৬. মোল্লা আলী কারী (র) মিরকাতে লিখেছেন, আমাদের কোনো কোনো আলেম স্পষ্টই বলেছেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-কে মন্দ বলবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

- **হাদীসের অনুবাদ :** হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সকল মুমিনের কাছে নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনো সম্পদ রেখে যায়নি, সে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা গেল, সে সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যে কোনো ঋণ অথবা এতিম সন্তান রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে। আমিই তার অভিভাবক। অন্য একটি সূত্রে রয়েছে, যে সম্পদ রেখে গেল, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে কোনো সন্তান নিঃস্ব অবস্থায় রেখে গেল, তারা যেন আমার নিকট আসে। (বুখারী ও মুসলিম)
- **সমাপনী :** কোনো ব্যক্তি ঋণী হয়ে মৃত্যুবরণ করলে ঋণের বোঝা পরিশোধ করা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

◀◀ اَلسُّؤَالُ (١) : مَا مَعْنَى الْفَرَائِضِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا مَوْضُوْعُهُ وَغَرْضُهُ؟ بَيِّنْ.

▶▶ প্রশ্ন : ১। اَلْفَرَائِضُ-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।

উত্তর।। اَلْفَرَائِضُ-এর আভিধানিক অর্থ : فَرَائِضُ শব্দটি فَرِيْضَةٌ-এর বহুবচন; যেমন عَجَائِبُ শব্দটি عَجِيْبَةٌ-এর বহুবচন। এর মূল অক্ষর হচ্ছে فَرْض; আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِلَا عِوَضٍ তথা বিনা প্রতিদানে কাউকে কোনো কিছু দান করা। একে فَرَائِض এজন্যই বলা হয়, তাতে ওয়ারিশদেরকে বিনা প্রতিদানে সম্পদ দেয়া হয়।

২. اَلتَّقْدِيْرُ তথা নির্ধারণ করা। যেহেতু এতে ওয়ারিশদের হক আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. اَلْحِصَّةُ তথা অংশ অর্থে। যেমন– فَرِيْضًا مَفْرُوْضًا اَىْ حِصَّةٌ مُعَيَّنَةٌ

৪. شَرْحُ السُّنَّةِ গ্রন্থকার বলেন, فَرْض-এর অর্থ হচ্ছে قَطْع তথা কর্তন করা।

اَلْفَرَائِضُ-এর শরয়ী সংজ্ঞা : পরিভাষায় ফারায়েয বলা হয়–

هِىَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ وَجُزْئِيَاتٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهَا كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهٖ.

عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর আলোচ্য বিষয় : ইলমে ফারায়েযের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে–
১. اَلتَّرِكَةُ তথা মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ। ২. اَلْوَرَثَةُ তথা ওয়ারিশগণ।

عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর উদ্দেশ্য : প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে নিশ্চিতকরণ এবং সকলের সঠিক প্রাপ্য প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٢) : هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ؟ بَيِّنْ مَعَ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ.

▶▶ প্রশ্ন : ২। মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে কি? ওলামায়ে কেরামের মতামতসহ বর্ণনা কর।

উত্তর।। কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে কিনা : সকল ফকীহ এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কাফের মুসলমানদের ওয়ারিশ হতে পারবে না। এ ব্যাপারে দলীল হচ্ছে–

١. لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

٢. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হওয়ার বিধান : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকার হবে কিনা এ বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. **জমহুর আলেমগণের অভিমত :** জমহুর ওলামার মতে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না। কেননা রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

২. **কতিপয় আলেমের অভিমত :** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত মাসরূক প্রমুখ বলেছেন, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে। তাঁদের দলীল হচ্ছে–

اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ.

জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর আলেমগণ হযরত মুয়ায ও মাসরূকের হাদীসের জবাবে বলেছেন, এ হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মীরাস সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। অতএব সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতঃ বলতে হবে যে, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না।

◄◄ اَلسُّؤَالُ (٣) : مَوَانِعُ الْاِرْثِ كَمْ هِيَ؟ وَمَا هِيَ؟

►► **প্রশ্ন : ৩। مَوَانِعُ الْاِرْثِ কয়টি ও কী কী?** ►►

উত্তর।। مَوَانِعُ الْاِرْثِ-এর বিবরণ : مَوَانِع শব্দটি مَانِع-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ– প্রতিবন্ধকসমূহ। আর اِرْث-এর অর্থ– উত্তরাধিকার। অতএব مَوَانِعُ الْاِرْثِ-এর সমষ্টিগত অর্থ– উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধকসমূহ। এটা মোট ৪টি। যথা–

১. اَلرِّقُّ তথা দাসত্ব। দাসদাসী স্বাধীন ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না।

২. اَلْقَتْلُ الَّذِيْ يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ اَوِ الْكَفَّارَةُ অর্থাৎ, এমন হত্যা যাতে কেসাস বা কাফফারা ওয়াজিব হয়। অতএব বোঝা গেল, سَبَب قَتْل-এর কারণে حِرْمَان عَنِ الْاِرْثِ হবে না। কারণ এ ধরনের হত্যায় قِصَاص ও كَفَّارَة কোনোটাই ওয়াজিব হয় না।

৩. اِخْتِلَافُ الدِّيْنَيْنِ তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া। যেমন– একজন কাফের অন্যজন মুসলমান হওয়া। যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (صـ) قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

৪. اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ তথা ভিন্নদেশি হওয়া। যেমন– دَارُ الْحَرْبِ-এর কাফের ও دَارُ الْاِسْلَام-এর কাফের, অথবা حَرْبِى ও ذِمِّى; এরা কেউ সম্পদের ওয়ারিশ হবে না।

◄◄ اَلسُّؤَالُ (٤) : بَيِّنْ مَعْنَى الْعَصَبَةِ مَعَ بَيَانِ اَقْسَامِهِ وَحُكْمِهِ.

►► **প্রশ্ন : ৪। প্রকারভেদ ও হুকুমসহ عَصَبَة-এর অর্থ বর্ণনা কর।**

উত্তর।। عَصَبَة-এর আভিধানিক অর্থ : عَصَبَةٌ শব্দটি عَاصِبٌ-এর বহুবচন। এটা عَصُوْبَة মাসদার থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. রগ, ২. জোড়া, ৩. বেষ্টন করা, ৪. আবৃত করা, ৫. মেরুদণ্ড, ৬. মাংসপেশী, ৭. টুকরা, ৮. নেতা।

عَصَبَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, পিতার দিকের আত্মীয়তাকে عَصَبَة বলা হয়। বহুবচনে عَصَبَات ব্যবহার হয়।

২. ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলা হয় ঐ সকল ওয়ারিশকে যাদের সাথে মৃতব্যক্তির রক্ত মাংসের সম্পর্ক থাকে। ذَوِى الْفُرُوْضِ-কে সম্পদ দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে এরা সবগুলোর মালিক হবে।

৩. সিরাজী গ্রন্থকারের মতে–

اَلْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَاْخُذُ مَا اَبْقَتْهُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْاِنْفِرَادِ يَحْرُزُ جَمِيْعَ الْمَالِ.

অর্থাৎ, আসাবা সে সকল উত্তরাধিকারীকে বলা হয় যারা ذَوِى الْفُرُوْض দের অংশগ্রহণের পর অবশিষ্ট সম্পদের অংশীদার হয়। আর ذَوِى الْفُرُوْضِ-এর অবর্তমানে তারা সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়।

৪. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে-
اَلْعَصَبَةُ كَذٰلِكَ هُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَحِقُّوْنَ التَّرِكَةَ كُلَّهَا اِذَا لَمْ يُوْجَدْ مِنْ اَصْحَابِ الْفُرُوْضِ اَحَدٌ.

মোটকথা, ذَوِى الْفُرُوْضِ-এর মাঝে সম্পদ বন্টনের পর বাকি সম্পদ যাদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তাদেরকে আসাবা বলা হয়।

عَصَبَة-এর প্রকারভেদ : عَصَبَة প্রথমত দু'প্রকার। যথা-

১. عَصَبَة نَسَبِى ২. عَصَبَة سَبَبِى

عَصَبَة نَسَبِى তিন প্রকার। যথা-

১. عَصَبَة بِنَفْسِهٖ তথা আসাবা বিনাফসিহী হচ্ছে-
كُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِى نِسْبَتِهٖ اِلَى الْمَيْتِ اُنْثٰى.
ঐ সকল পুরুষ ওয়ারিশ যাদের সাথে মৃতব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা লাগে না। তারা চার শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-
ক. جَزْءُ الْمَيِّتِ; যেমন- পুত্র। খ. اَصْلُ الْمَيِّتِ; যেমন- পিতা।
গ. جُزْءُ اَبٍ; যেমন- ভাই। ঘ. جُزْءُ جَدٍّ; যেমন- চাচা।

২. عَصَبَة بِغَيْرِهٖ তথা যারা অন্যের কারণে আসাবা হয়। তারা হচ্ছে চার প্রকার মহিলা। যথা- মৃতব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন। এরা عَصَبَة তখনই হবে যখন এদের ভাই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এদের ভাই না থাকে তাহলে তারা ذَوِى الْفُرُوْضِ হিসেবে অংশ পাবে।

৩. اَلْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ তথা আসাবা মায়া গাইরিহী। এর পরিচয়ে আল্লামা সিরাজী (র) বলেছেন- فَكُلُّ اُنْثٰى تَصِيْرُ عَصَبَةً مَعَ اُنْثٰى اُخْرٰى كَالْاُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ

কারণ হাদীসে এসেছে- اِجْعَلُوا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিন প্রকার আসাবাকে ফারায়েযের পরিভাষায় عَصَبَة نَسَبِى বলা হয়। এছাড়া আরেক প্রকার আসাবা রয়েছে যাকে عَصَبَة سَبَبِى বলা হয়। তা হচ্ছে مَوْلَى الْعَتَاقَةِ কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

আসাবার বিধান : আসাবার বিধান হলো, যাবিল ফুরুয না থাকলে আসাবাগণ মৃতের সাকুল্য সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং যাবিল ফুরুয থাকলে তাদের অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা আসাবাগণ তাদের শ্রেণিমতো পেয়ে যায়।

◄◄ اَلسُّؤَالُ (৫) : مَا هُوَ اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ مَالِ تَرِكَةِ الْمُرْتَدِّ وَمَاتَ عَلٰى اِرْتِدَادِهٖ؟

►► প্রশ্ন : ৫। যে ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগ অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কী মতভেদ রয়েছে?

উত্তর।। ধর্মত্যাগীর পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত : ধর্মত্যাগীর পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-

১. **শাফেয়ী, মালেক, রবিয়া ও ইবনে আবী লায়লার অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, মালেক, রবিয়া ও ইবনে আবী লায়লা (র)-এর মতে, মুসলমান মুরতাদের মালের মালিক হবে না; বরং তার সম্পদগুলো مَالُ فِىْءٍ হিসেবে বিবেচ্য হবে। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (র) বলেছেন-
اَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَرَبِيْعَةَ وَابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَغَيْرِهِمْ بَلْ يَكُوْنُ مَالُهٗ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِيْنَ.

২. **আবু হানীফা ও আওযায়ীর অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা ও আওযায়ী (র)-এর মতে, মুরতাদের সম্পদের মালিক তার মুসলমান ওয়ারিশগণ হবে। হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

৩. **আবু হানীফার অন্য একটি অভিমত :** ইমাম আবু হানীফা (র) অন্যত্র বলেছেন, মুরতাদ اِرْتِدَاد-এর সময় যে সম্পদ রুজি করবে তা মুসলমানরা পাবে। এছাড়া অন্যগুলো ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। ইমাম নববীর ভাষায়–
قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مَا كَسَبَهٗ فِىْ رِدَّتِهٖ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ الْجَمِيْعُ لِوَرَثَتِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٦) : اِشْرَحْ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ".

▶▶ **প্রশ্ন : ৬। মহানবী (স)-এর বাণী اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-এর ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর।। اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী (স) বলেছেন, اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, তিনি মুমিনদের নিজ নিজ জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। এ হাদীসের اَوْلٰى শব্দটির অর্থ– বন্ধু হিসেবে অধিক প্রিয়, অভিভাবক হিসেবে অধিক উপযুক্ত, অধিক আস্থাভাজন ও প্রাধান্যযুক্ত ইত্যাদি। মূলত কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের হুবহু শব্দ ও অর্থ ধারণ করে মহানবী (স) এ কথাটি ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ অর্থাৎ, নবী করীম (স) মুমিনদের জীবন থেকেও বেশি প্রিয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতাস্বরূপ। মহানবী (স)-এর স্ত্রী যদি কুরআন মাজীদের ভাষায় মুমিনদের মাতা হন, তাহলে রাসূল (স) হন পিতা। কিন্তু কুরআনে 'পিতা' শব্দটি তাঁর শানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি পিতার চেয়েও বেশি উপযুক্ত ও দরদী। এ কারণেই তাঁকে حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি অতি দয়ালু। মহানবী (স) মুমিনদের সুখে দুঃখে, দীন দুনিয়া সর্বক্ষেত্রেই অভিভাবক। এ কারণেই তিনি ঋণগ্রস্ত মৃতব্যক্তির ঋণের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এটা মহানবী (স)-এর একটি বিশেষত্ব।

আলোচ্য হাদীস অনুসারে রাসূল (স)-কে জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। এটা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং পালন করতে ব্যর্থ হলে পূর্ণাঙ্গরূপে মুমিন হতে পারবে না। হযরত ওমর (রা) এ হাদীস এবং সমর্থিত আয়াত শুনে বলে বসলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ জীবনের ওপর প্রাধান্য দিতে পারছি না। তখন রাসূল (স) তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তিনি বলে ওঠলেন, জি! এখন আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় মনে হয়। সুবহানাল্লাহ! এটা ছিল রাসূল (স)-এর তাওয়াজ্জুহ বা দৃষ্টির মহিমা।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٧) : حَقِّقِ الْكَلِمَاتِ : ضَيَاعٌ . كَلًّا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

▶▶ **প্রশ্ন : ৭। ضَيَاع, كَلًّا ও مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর।। ضَيَاع ও كَلًّا-এর বিশ্লেষণ : ضَيَاع শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। ض-এর ওপর فَتْحَة দিয়ে পাঠ করলে এটি হবে مَصْدَر বাবে ضَرَبَ অর্থ– هَلَاك তথা ধ্বংস করা, ক্ষয় করা। এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেছেন, ضَيَاع শব্দের অর্থ– عِيَالٌ عِلَّةٌ তথা নিঃস্ব সন্তান। তাঁর মতে, এটি মাসদার, যা اِسْمِ فَاعِلٍ مُبَالَغَة-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– صَوْم বা عَدْل; এরূপ মাসদার কখনো اِسْمِ فَاعِلٍ مُبَالَغَة-এর অর্থে ব্যবহার হয়।

২. شَرْحُ السُّنَّةِ গ্রন্থে এটিকে كَسْرَة দিয়ে ضِيَاع পড়তে বলা হয়েছে। তখন এটি হবে ضَائِع-এর বহুবচন। যেমন- جَائِع-এর বহুবচন جِيَاع

তাঁর মতে, ضِيَاع-এর অর্থ- الذُّرِّيَّةُ الصِّغَارُ الَّذِيْنَ لَا يَقُوْمُوْنَ بِاَمْرِ اَنْفُسِهِمْ তথা ছোট সন্তান, যারা নিজেরা নিজেদের জীবন পরিচালনায় সক্ষম হয়নি।

كَلًّا শব্দটি بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ অর্থাৎ ك-এর ওপর যবর এবং ل-এর ওপর তাশদীদ দিয়ে পাঠ করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে- ثِقْل তথা বোঝা। কুরআন মাজীদে كَلَالَة শব্দের ব্যবহার আছে। এখানে كَلًّا দ্বারা كَلٌّ عَلٰى مَوْلَاهُ অর্থাৎ, অভিভাবকের ওপর নির্ভরশীল বোঝানো হয়েছে। মিরকাত প্রণেতা আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- وَهُوَ يَشْمُلُ الدَّيْنَ وَالْعِيَالَ অর্থাৎ, এখানে كَلٌّ দ্বারা মৃতব্যক্তির ঋণ এবং নিঃস্ব সন্তান উভয়ই উদ্দেশ্য।

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-এর বিশ্লেষণ : مُتَّفَقٌ শব্দটি اِتِّفَاق মাসদার থেকে বাবে اِفْتِعَال-এর اِسْم مَفْعُوْل এর-وَاحِد مُذَكَّر-এর সীগাহ। এটা وَفْق থেকে নির্গত। যার অর্থ ঐকমত্য। এটা হাদীসের সূত্র বর্ণনার একটি পরিভাষা, যা مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْحِ গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বোঝায় مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ অর্থাৎ, যে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়েই যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় : অসিয়ত

■ প্রশ্ন : ৮৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। [মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৩৯]

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَعُوْدُنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلَّا اِبْنَتِىْ اَفَاُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهٖ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

اَلْاَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ

١- مَا مَعْنَى الْوَصِيَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا-
٢- هَلْ تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ؟ وَهَلْ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؟ فَصِّلِ الْاَحْكَامَ-
٣- مَا الْاِعْرَابُ لِقَوْلِهٖ (ع) اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ؟
٤- مَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ "اِنَّكَ اِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنَ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً"؟
٥- كَيْفَ اِضْطَرَبَ سَعْدٌ مِنَ الْمَرَضِ؟ وَهُوَ مِنَ اللّٰهِ- وَمَتٰى وَقَعَتْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةُ؟
٦- هَلْ يَجُوْزُ لِلْمَرِيْضِ فِىْ مَرَضِ الْمَوْتِ اَنْ يُوْصِىَ بِكُلِّ مَالِهٖ اَوْ يَتَصَدَّقَ بِهٖ؟

ـصٰى لَهٗ وَالْمُوْصٰى بِهٖ -

ـعْدِ بْـنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) -

৮৯নং প্রশ্নের উত্তর

হাদীসের অনুবাদ

- **সংকলন তথ্য :** প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবি খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনবদ্য স হাদীসগ্রন্থের بَابُ الْوَصَايَا كِتَابُ الْبُيُوْعِ-এর অন্তর্গত
- **হাদীস প্রসঙ্গ :** সন্তানদের বঞ্চিত করে কিংবা দারিদ্র্যের ইসলামী নীতি নয়। তবে তাদের অধিকার ঠিক রেখে জায়েয আছে। এ ব্যাপারেই আলোচ্য হাদীসের অবতারণা
- **হাদীসের অনুবাদ :** হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (মক্কা বিজয়ের বছর আমি এমন রোগাক্রান্ত হই যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বল একমাত্র কন্যা ব্যতীত (ঔরসজাত) কোনো ওয়ারিশ নেই (অন্যদের জন্য) অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন না, ভাগের দু'ভাগ? তিনি বললেন না, আমি বললাম তবে আমি বললাম তবে কি একতৃতীয়াংশ? তিনি বললেন এ বেশি। তুমি তোমার (অপর) ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল রেখে তাদেরকে ভিক্ষুক রেখে যাওয়া অপেক্ষা, যাতে তারা অ যে আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারের তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে। এমনকি তুমি যে (আদর উঠিয়ে দাও তাতেও সাওয়াব দেয়া হবে।
- **সমাপনী :** পরকালীন জীবনের সঞ্চয়স্বরূপ কিছু সম্পদ মুমিনের পরিচায়ক।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

ـوَصِيَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَمَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

প্রশ্ন : ১। وَصِيَّة-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকু

উত্তর।। وَصِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : وَصِيَّة শব্দটি ইস এখান থেকে اَوْصٰى يُوْصِىْ اِيْصَاءً; এর আভিধানিক অর্থ

১. الْمَوْعِظَةُ তথা উপদেশ। যেমন– ـصِيَّةُ لُقْمَانَ لِابْنِهٖ

২. الْاَمْرُ তথা নির্দেশ। যেমন– ـوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ

৩. اَلْوَصْلُ وَالضَّمُّ তথা মিলানো ও সংযুক্তকরণ। যেমন–

৪. অন্তিম উপদেশ। যিনি অসিয়ত করেন তাকে مُوْصِىْ লَهٗ আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে مُوْصٰى بِهٖ

শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন

بِهَا اَوْ دَيْنٍ - (الاية)

تَتَّقُوْنَ - (الاية)

ـشَىْءٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتُهٗ

(ـ

وَصِيَّةٌ-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় অসিয়ত হচ্ছে–

عَهْدٌ خَاصٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থাৎ, কাউকে নিজের মালের নির্দিষ্ট এক অংশের মালিক করে দেয়া যা مُوْصِيْ-এর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়।

২. ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায়–

هِيَ عَهْدٌ يُوْجِبُ حَقًّا فِيْ ثُلُثِ مَالِ عَاقِدَهُ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ اَوْ نِيَابَةً عَنْهُ بَعْدَهُ.

وَصِيَّةٌ-এর বিধান : مُوْصَى لَهُ-এর مُوْصِيْ-এর মৃত্যুর পর অসিয়তকৃত সম্পদের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। অসিয়ত করা ফরয না মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম ইসহাক, আতা ও দাউদ যাহেরীর মতে, ধনী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা ফরয। তাঁদের দলীল হচ্ছে–

۱. كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنِ.

۲. مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ اَنْ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

২. জমহুর ফোকাহার মতে, একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয। এর চেয়ে কম করা মুস্তাহাব। তবে ওয়ারিশগণ গরিব হলে অসিয়ত না করা মুস্তাহাব। কেননা অসিয়ত হচ্ছে সদকা।

فَلَمَّا كَانَ التَّبَرُّعُ فِيْ حَالِ الْحَيَاةِ مُسْتَحَبًّا كَذٰلِكَ الْوَصِيَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَهُوَ اَيْضًا مُسْتَحَبٌّ.

৩. কেউ কেউ বলেন, যাদের মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয় আছে তাদের জন্য وَصِيَّةٌ করা ফরয। যেমন– اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব :

১. তাঁদের পেশকৃত আয়াত اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অন্যত্র রাসূল (স) বলেন– اِنَّ اللّٰه قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

২. হাদীসটি اِحْتِيَاط-এর ওপর مَحْمُوْل উজুবের ওপর مَحْمُوْل নয়।

উল্লেখ্য, কারো ওপর আবশ্যকীয় হক; যেমন দিয়ত, ঋণ, আমানত ইত্যাদি থাকলে তার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٢) : هَلْ تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ؟ وَهَلْ تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؟ فَصِّلِ الْاَحْكَامَ.

▶▶ প্রশ্ন : ২। ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয আছে কিনা? একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর।। ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয কিনা : ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. **জমহুরের অভিমত :** জমহুর আলেমগণের মতে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই।

দলীল : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

۱. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

۲. وَقَالَ النَّبِيُّ (صـ) لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدِ.

২. **আহনাফের অভিমত :** ওলামায়ে আহনাফের মতে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা সাধারণত বৈধ নয়, তবে যদি কেউ অসিয়ত করে আর অন্যান্য ওয়ারিশ যদি অনুমতি দেয় এবং কেউ যদি কোনো আপত্তি না তোলে তাহলে পছন্দনীয় ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয হবে।

দলীল : যেমন দারে কুতনীতে আছে– لَا تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

৩. **একদল ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত :** একদল ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয। যেমন– নিকটাত্মীয় ও পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা। তাঁদের দলীল হচ্ছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ

জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব : জমহুর ওলামা এ আয়াতের জবাবে বলেছেন, এ আয়াতটি اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এর বিধান বর্তমানে কার্যকর নেই।

একতৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক অসিয়তের বিধান : কেয়াস অসিয়তের স্বীকৃতি দেয় না। কারণ এতে ওয়ারিশদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতৎসত্ত্বেও শরীয়ত اِسْتِحْسَان-এর দৃষ্টিতে সম্পদের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয রেখেছে। কারণ মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন– اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

অর্ধাংশের বেশি অসিয়ত জায়েয না হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি অসিয়ত করে বসে তাহলে তা ওয়ারিশদের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। তারা অনুমোদন করলে একতৃতীয়াংশের অসিয়ত কার্যকর হবে। নতুবা কার্যকর হবে না। (হেদায়া)

১. **নবুবীর অভিমত :** ইমাম নবুবী (র) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–

اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِىْ هٰذِهِ الْاَعْصَارِ عَلٰى اَنَّ مَنْ لَهٗ وَارِثٌ لَاتَنْفُذُ وَصِيَّتُهٗ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ اِلَّا بِاِجَازَتِهٖ، وَاَجْمَعُوْا عَلٰى نُفُوْذِهَا بِاِجَازَتِهٖ فِىْ جَمِيْعِ الْمَالِ ـ

২. **শাফেয়ীর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যার কোনো ওয়ারিশ নেই তার জন্যও একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা জায়েয হবে না।

৩. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, যার ওয়ারিশ নেই, তার জন্য সমস্ত মাল অসিয়ত করা জায়েয।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٣) : مَا الْاِعْرَابُ لِقَوْلِهٖ (ع) اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ؟

▶▶ **প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর বাণী اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ-এর ইরাব কী?**

উত্তর।। اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ-এর ইরাব : اَلثُّلُثُ-এর মধ্যে رَفْع এবং نَصْب উভয়টি জায়েয।

১. اَلثُّلُثُ-এর মধ্যে فَاعِل ও مُبْتَدَا হিসেবে رَفْع হবে।

অতএব মূল বাক্য হবে– ক. يَكْفِيْكَ الثُّلُثُ - فَاعِل হিসেবে।

খ. اَلثُّلُثُ كَاف - مُبْتَدَا হিসেবে।

২. مَفْعُوْلُ بِهٖ হিসেবে نَصْب হতে পারে। যেমন– اَعْطِ الثُّلُثَ

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٤) : مَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ "اَنَّكَ اِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً"؟

▶▶ **প্রশ্ন : ৪। রাসূল (স)-এর বাণী اِنَّكَ اِنْ تَذَرَ الخ-এর অর্থ কী?**

উত্তর।। اِنَّكَ اِنْ تَذَرَ الخ-এর অর্থ : রাসূল (স)-এর এ বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে, নিশ্চয় তোমার পরিবার পরিজনকে সচ্ছল রেখে যাওয়া ভালো, অসহায় করে রাখার চেয়ে।

এতে প্রতীয়মান হয়, ছেলে সন্তান ও স্বীয় ওয়ারিশদেরকে অভাবী রেখে যাওয়া ভালো কাজ নয়। তার মৃত্যুর পর তারা যেন সচ্ছল অবস্থায় চলতে পারে, সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে। নিজের উপার্জিত সকল অর্থ খরচ না করে তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হবে। কেননা দারিদ্র্য এমন এক অভিশাপ, যা মানুষকে অন্যায়, জুলুম ও অবিচারপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করে। এমনকি অনেককে কুফরীর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন হাদীসে এসেছে–

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا ـ

আবার নিজে ব্যয় না করে বা যাকাত সদকা না দিয়ে সব মাল ছেলেসন্তানদের জন্য জমা করে রাখা ইসলামী নীতি নয়।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٥) : كَيْفَ اِضْطَرَبَ سَعْدٌ مِنَ الْمَرَضِ؟ وَهُوَ مِنَ اللّٰهِ. وَمَتٰى وَقَعَتْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةُ؟

▶▶ প্রশ্ন : ৫। হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে কেন অস্থির হয়ে পড়লেন? অথচ এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হয়েছিল। আর এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর।। সাদ (রা)-এর অসুস্থতায় অস্থির হওয়ার কারণ : হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে অস্থির হয়ে পড়লেন অথচ ব্যথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর তিনি عَشَرَةٌ مُبَشَّرَةٌ-এর একজন। এ ধরনের বিপদে তাঁর অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত ছিল। এর জবাবে ইমাম নববী (র) বলেন–

১. আসলে হযরত সাদ (রা) অসুস্থতার কারণে অস্থির হননি; বরং তিনি অস্থির হয়েছেন এজন্য যে, না জানি মক্কায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। কারণ সাহাবীগণ হিজরতের পর মদিনায় ইন্তেকাল করা পছন্দ করতেন।
২. তিনি আশঙ্কা করেছেন, মক্কায় মারা গেলে হিজরতের সাওয়াব কমে যাবে কিনা, তাই তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অস্থির হননি।
৩. কতিপয় আলেম বলেন– اِضْطَرَبَ سَعْدٌ (رض) عَنِ الضُّعْفِ الْبَشَرِيِّ অর্থাৎ, মানবীয় দুর্বলতার কারণে হযরত সাদ অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন।
৪. তিনি অসুস্থ হওয়ার কারণে রাসূল (স)-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে পিছনে পড়ার আশঙ্কা করেছেন। এটা তাঁর কাছে খুব অসহ্যকর ছিল। অতএব বোঝা গেল তিনি ব্যথাবেদনার কারণে অস্থির হননি।

বলা বাহুল্য, রোগযন্ত্রণার কারণে অস্থির হওয়া মানবীয় স্বভাব।

উল্লিখিত ঘটনার সময়কাল : হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে প্রধানত দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের বছর।
২. কতিপয় আলেম বলেন, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর।

◀◀ اَلسُّؤَالُ (٦) : هَلْ يَجُوْزُ لِلْمَرِيْضِ فِىْ مَرَضِ الْمَوْتِ اَنْ يُوْصِىَ بِكُلِّ مَالِهٖ اَوْ يَتَصَدَّقَ بِهٖ؟

▶▶ প্রশ্ন : ৬। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রুগ্ণ ব্যক্তি কর্তৃক তার সকল সম্পদ অসিয়ত করা বা সদকা করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর।। রুগ্ণ ব্যক্তি কর্তৃক সকল সম্পদ অসিয়ত করার বিধান : রুগ্ণ ব্যক্তির যদি কোনো ওয়ারিশ থাকে, তাহলে তার সকল মাল অসিয়ত করা জায়েয নেই; বরং একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা জায়েয। কেননা রাসূল (স) হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করতে নিষেধ করেছেন।

তবে রুগ্ণ ব্যক্তি যদি সব মাল বা একতৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি অসিয়ত করে তা ওয়ারিশদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। তারা অনুমোদন করলে কার্যকর হবে নতুবা زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ। কার্যকর হবে না।

যে রুগ্ণ ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই, তার জন্য ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও ইসহাকের মতে, সম্পদ সদকা করা বা অসিয়ত করা জায়েয।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার জন্যও زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ অসিয়ত করা জায়েয নেই।

◄◄ اَلسُّؤَالُ (٧) : عَرِّفِ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بِهِ.

►► **প্রশ্ন : ৭। مُوْصِىْ, مُوْصٰى لَهٗ ও مُوْصٰى بِهٖ-এর পরিচয় দাও।**

উত্তর।। مُوْصِىْ-এর অর্থ : مُوْصِىْ শব্দটি ইসমে ফায়েলের পদ। আর اِيْصَاء মাসদার থেকে নির্গত। যে ব্যক্তি কারো জন্য স্থায়ী পরিত্যক্ত সম্পদ অসিয়ত করে, তাকে مُوْصِىْ বলা হয়।

مُوْصٰى لَهٗ-এর অর্থ : যে ব্যক্তির জন্য وَصِيَّة করা হয় তাকে اَلْمُوْصٰى لَهٗ বলা হয়।

مُوْصٰى بِهٖ-এর অর্থ : যে সম্পদ প্রদানের অসিয়ত করা হয় তাকে اَلْمُوْصٰى بِهٖ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ করিম রহিমের জন্য ৫ শতাংশ যমীনের অসিয়ত করে। তাই করিম হচ্ছে مُوْصِىْ রহিম হচ্ছে اَلْمُوْصٰى لَهٗ আর ৫ শতাংশ যমীন হচ্ছে اَلْمُوْصٰى بِهٖ

◄◄ اَلسُّؤَالُ (٨) : أُذْكُرْ نُبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رض).

►► **প্রশ্ন : ৮। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ কর।**

উত্তর।। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জীবনচরিত : মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১. **নাম ও পরিচয় :** তাঁর নাম সাদ, উপনাম আবু ইসহাক, পিতার নাম মালেক ইবনে ওহাব, মাতার নাম হামনাহ বিনতে আবি সুফিয়ান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম।

২. **ইসলামগ্রহণ :** আল্লামা আইনী (র)-এর মতে, ১৪ বছর বয়সে নবুয়তের ছয় বছর পরে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। আর صَاحِبُ الْاِكْمَالِ বলেন, তিনি ১৭ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে তৃতীয় মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন–
كُنْتُ ثَالِثَ الْاِسْلَامِ.

৩. **মদিনায় হিজরত :** মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা মদিনায় প্রথম হিজরত করেছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁদের অন্যতম।

৪. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করি এবং সর্বপ্রথম রক্ত প্রবাহিত করি।" তিনি রাসূল (স)-এর সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে فَارِسُ الْاِسْلَامِ বলা হয়। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

৫. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** তিনি হযরত ওমর (রা)-এর ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর নেতৃত্বে পারস্যের বিভিন্ন শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়।

৬. **হাদীস বর্ণনা :** আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, তিনি সর্বমোট ২৭০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদীস ১৫টি। এককভাবে ইমাম বুখারী ৫টি এবং ইমাম মুসলিম (র) ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭. **ইন্তেকাল ও দাফন :** মদিনা হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আকিক নামক স্থানে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

كِتَابُ النِّكَاحِ
বিবাহ পর্ব

■ **প্রশ্ন : ৯০ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।** [মূল কিতাব হাদীস নং ২৯৪৬]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[ফা. প. ১৯৮৯, '৯১, '৯৩, '৯৭, '০১, '০৩, '০৬, '১৬]

اَلْاَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ

١- مَا مَعْنَى النِّكَاحِ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا؟ بَيِّنْ -

٢- مَا مَعْنَى الْبَاءَةِ؟ وَكَمْ لُغَةً فِيْهَا؟ اَوْضِحْ - [ফা. প. ২০১৬]

٣- بَيِّنْ حُكْمَ النِّكَاحِ مَعَ ذِكْرِ بَعْضِ فَوَائِدِهِ فِىْ ضَوْءِ الْحَدِيْثِ - [ফা. প. ২০১৬]

٤- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ؟

٥- بَيِّنْ اَرْكَانَ النِّكَاحِ وَشَرَائِطَهُ -

٦- بَيِّنْ دَوْرَ الصَّوْمِ فِى الْاِحْتِفَاظِ بِالْعِفَّةِ فِىْ ضَوْءِ قَوْلِهِ "فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" - [ফা. প. ২০১৬]

٧- اُكْتُبْ نُبْذَةً مِنْ سِيْرَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) -

উ ৯০নং প্রশ্নের উত্তর

১ হাদীসের অনুবাদ

- **সংকলন তথ্য :** আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ শায়খ ওয়ালিউদ্দীন আল খতীব (র) সংকলিত দ্বাদশ শতাব্দীর অনন্য সংকলন 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসগ্রন্থের كِتَابُ النِّكَاحِ থেকে সংগৃহীত।
- **হাদীস প্রসঙ্গ :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী (স) বিবাহের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনাপূর্বক যুবসমাজকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।
- **হাদীসের অনুবাদ :** প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে (অবৈধ যৌনাচার থেকে) অধিকতর সংরক্ষণ করে। আর সে যদি বিবাহ করার সামর্থ্য না রাখে, তবে সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌনস্পৃহা প্রশমনকারী। (বুখারী ও মুসলিম)
- **সমাপনী :** পাশবিকতা দমন ও নৈতিকতা সংরক্ষণে সামর্থ্যবান মুসলিম যুবকের বিবাহ করা ঈমানী দায়িত্ব। অসামর্থ্য যুবকের জন্য রোযাই একমাত্র মহৌষধ।

৪. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- هو من اوحى اليه بالرسالة وبتنزيل الكتاب من الله تعالى অর্থাৎ, যাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব সহকারে রিসালাতের অহী প্রদান করা হয়েছে তিনিই রাসূল।

৫. ইমাম তাহাবী (র) বলেন-
الرسول ان يجعل الله من عباده المخلصين الصالحين نبيا ثم نباه بخبر السماء ثم امره ان يبلغ غيره۔

৬. معجم لغة الفقهاء গ্রন্থকার বলেন-
الرسول انسان اوحى الله تعالى اليه بشريعة وامره بتبليغها للناس۔

الحكمة فى ارسال الرسل :

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূল প্রেরণের মধ্যে নানাবিধ حكمة তথা রহস্য রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

১. মানুষকে তাদের কর্মের পরিণাম তথা জান্নাতের শুভ সংবাদ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل۔

২. আল্লাহর দীনকে বাতিল ও মানবচরিত্র বিধ্বংসী মতবাদের ওপর পরিপূর্ণভাবে জয়ী করার মানসে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী-
هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔

৩. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন নবী রাসূলগণ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله۔

৪. হেদায়াতের বাণী সংবলিত আল্লাহর আয়াতগুলো মানবজাতির নিকট পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে জ্ঞান, হেকমত ও كتاب الله শিক্ষাদান করতঃ তাদের সার্বিক পরিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-
كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔

৫. আল্লাহর বাণী পড়ে শুনানো এবং এর আলোকে حكمة-এর জ্ঞান দানের মহান দায়িত্ব রাসূলগণের ওপর অর্পিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتب۔

৬. সৎকর্মের সুসংবাদ এবং দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-
يايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔

৭. পুরস্কার ও তিরস্কার সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সালা উপলব্ধি করার ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সার্বিক কল্যাণ প্রদর্শনের জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- وما ارسلناك الا رحمة للعلمين

৮. মানবজাতির যাবতীয় চারিত্রিক কলুষতা দূর করে তাদেরকে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ এসেছেন। যেমন নবী করীম (স) বলেন– بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

৯. মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

১০. মানুষের নিকট আল্লাহর গুণাবলি ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

৩ وجه تائيد الرسل بالمعجزات :

معجزات দ্বারা রাসূলগণের পৃষ্ঠপোষকতার কারণ : মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন। অনেক অলৌকিক বিষয় দ্বারা প্রদান করেছেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা। নবী রাসূলগণকে মুজিযা দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণ নিম্নরূপ–

১. বিশ্বমানবতার হেদায়াতকল্পে এ ধরাধামে যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূল। দাওয়াতী কাজে সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে معجزة দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون

২. নবুয়ত ও রিসালাতের দাবিকে সত্যায়ন করার জন্য রাসূলগণকে معجزة প্রদান করা হয়েছে। যেমন– কুরাইশদের নিকট রাসূল (স) স্বীয় নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেন।

৩. মানুষকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রাসূলদের معجزة দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে–
ما من الانبياء نبى الا اعطى ما مثله امن عليه البشر.

৪. মিথ্যা নবুয়তের দাবি থেকে বিরত রাখার মানসে রাসূলগণকে معجزة দেয়া হয়েছে।

৫. অবিশ্বাসী সমাজের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর রাসূলগণের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত রাসূলদের মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন– ফিরাউনের যাদুর ওপর হযরত মুসা (আ)-এর معجزة প্রদর্শন।

৬. সাধারণ মানুষের জন্য যা অসম্ভব তা রাসূলগণের পক্ষে সম্ভব, এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নবুয়তের বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাসূলগণকে মুজিযা দেয়া হয়েছে। যেমন– হযরত ঈসা (আ)-এর কুষ্ঠরোগ ও জন্মান্ধ ভালো করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজিযা।

৭. দাওয়াতী কাজে সংকট মোকাবেলায় নবী রাসূলগণ মুজিযাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উপসংহার : বিশ্বমানবতাকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শের পথপ্রদর্শন করার জন্যই নবী রাসূলগণের আগমন ঘটে। এ গুরুদায়িত্ব পালনে সহজতার জন্য মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা তাদের আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন এবং দীন প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছেন।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٢) : مَا هُوَ حُبُّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِكَمَالِ الْاِيْمَانِ؟ بَيِّنْ-

■ প্রশ্ন : ৪২ ॥ রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬]

اَوْ حُبُّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ؟ هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِتَكْمِيْلِ الْاِيْمَانِ؟ بَيِّنْ-

অথবা, রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য উপর্যুক্ত ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রাসূল প্রেমের অর্থই হলো রাসূলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, আদর্শচ্যুত হয়ে তাঁর ভালোবাসা প্রমাণ করা যাবে না। এমনকি পরিপূর্ণ ঈমানও অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই নিম্নে حُبُّ الرَّسُوْلِ তথা রাসূলকে ভালোবাসার অর্থ এবং তা পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য অপরিহার্য হওয়ার বিষয় প্রদত্ত হলো।

⊃ تَعْرِيْفُ حُبِّ الرَّسُوْلِ (صـ) :

রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসার পরিচয় : রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে তাঁকে মনেপ্রাণে ভালোবাসা। এখন প্রশ্ন হলো রাসূল আমাদের মাঝে নেই, তাহলে আমরা তাঁকে কিভাবে ভালোবাসব? মুখে মুখে তাঁকে ভালোবাসার কথা বললেই কি ভালোবাসা হয়ে যাবে?

আসলে এমনটা নয়। রাসূলের ভালোবাসা কেমন হবে, তা স্বয়ং রাসূল (স) বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর আদর্শকে ভালোবাসবে, তাঁর আদর্শ মোতাবেক যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করবে, সেই প্রকৃত অর্থে রাসূল প্রেমিক। যেমন রাসূল (স) বলেন–

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ- (ترمذى)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত ও আদর্শকে ভালোবাসবে, সে আমাকেই ভালোবাসবে, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।

অপরদিকে কেউ যদি তাঁর সুন্নাত ও আদর্শের অনুসরণ ও আনুগত্য না করে, অন্য কারো সুন্নাত তথা আদর্শের অনুসরণ বা আনুগত্য করে, তাহলে সে ব্যক্তি তাঁর উম্মতের মধ্যে গণ্য হতে পারবে না। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী– مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত তথা আমার রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে অপছন্দ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অতএব বোঝা গেল, রাসূল প্রেমিক হতে হলে রাসূলের আদর্শকে ভালোবাসতে হবে, সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে। রাসূলের আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাসূলের ভালোবাসার প্রমাণ করা যাবে না।

⊃ حُبُّ الرَّسُوْلِ شَرْطٌ لِتَكْمِيْلِ الْاِيْمَانِ :

পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য রাসূলের ভালোবাসা শর্ত : পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে রাসূল (স)-এর প্রতি নিখুঁত ভালোবাসা থাকতে হবে। রাসূল প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। সকল অবৈধ মনোবাঞ্ছা ও মোহ ত্যাগ করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনে নিজের পিতামাতা, সন্তানাদি ও অন্যান্য মানুষের প্রতি পার্থিব ভালোবাসাকে পরিহার করতে হবে। নিতান্ত নিজের প্রাণকেও বিসর্জন দিতে হবে, তবেই পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে। যেমন রাসূল (স) বলেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তানসন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসবে।

একদা ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তখন রাসূল (স) বলেন– لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

অর্থাৎ, হলো না ওমর, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক ভালোবাসতে হবে।

সুতরাং বোঝা গেল, পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স)-এর আদর্শকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তাঁকে ভালোবাসতে হবে এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٣) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ؟ اَثْبِتْ اَنَّ الْكَرَامَةَ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ ـ

■ প্রশ্ন : ৪৩ ॥ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রমাণ কর যে, 'আওলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য'। [ফা. প. ২০১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাঁদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন। এগুলোকে মুজিযা বলে। মূলত নবীগণের অলৌকিক ঘটনা মুজিযা, অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ড শয়তানদের মুজিযা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। আর كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এবং اِسْتِدْرَاج শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال থেকে ব্যবহৃত মাসদার।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে আর কারামত মুমিন মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে প্রকাশ পায়।

গ. **অন্যান্য পার্থক্য :**

১. مُعْجِزَةٌ শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু كَرَامَةٌ অলীদের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর كَرَامَةٌ ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২. مُعْجِزَة আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে। كَرَامَة প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর اِسْتِدْرَاج শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

৩. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট مُعْجِزَة প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ كَرَامَة প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর اِسْتِدْرَاج প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে।

৪. مُعْجِزَة ও كَرَامَة শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শরীয়তে বৈধ নয়।

৫. مُعْجِزَة অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর كَرَامَة অস্বীকারকারী কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ।

৬. مُعْجِزَة ও كَرَامَة আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ।

৭. مُعْجِزَة ও كَرَامَة দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং اِسْتِدْرَاج দ্বারা শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়।

৮. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

৯. মুজিযা ও কারামতের تَعْلِيْم তথা শিক্ষা প্রদান ও تَعَلُّم তথা শিক্ষাগ্রহণ নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে।

حَقِيَّةُ كَرَامَةِ الْاَوْلِيَاءِ :

অলীগণের কারামতের সত্যতা : অলীগণের কারামতের সত্যতা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে উভয়পক্ষের মতামত উপস্থাপন করা হলো-

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্য হতে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন- وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা নদভী (র) বলেন- كَرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে স্বীয় মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

১. মহান আল্লাহর বাণী-

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا - قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কারামত উপস্থাপন করা হয়েছে। সাহাবী ও পুণ্যবান লোকগণের কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো ছিল মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও মর্জিমতো। মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কখনো কোনো অলী তথা বুযুর্গ কারামত প্রকাশ করতে পারেননি।

২. ওমর (রা)-এর বাণী- يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ দ্বারা তিনি মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে হাজার মাইল দূর থেকে যুদ্ধের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন।

৩. ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদীতে পানি প্রবাহিত হওয়া।

খ. মুতাযিলা ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকিদা : মুতাযিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় কারামতকে অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের মতে অলীগণের কারামত সত্য নয়।

দলীল : তারা যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করে বলে, যদি অলীদের থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তাহলে নবী রাসূলগণের বিশেষ কোনো মর্যাদা থাকে না। কারণ এতে অলী এবং নবীগণের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

দলীলের জবাব : মুতাযিলা ও বিভ্রান্তদের যুক্তি খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন–

১. তাদের নিকট পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর نَقْلِى কোনো দলীল নেই।

২. তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীলটি অবাস্তব। কারণ রাসূল (স)-এর নবুয়ত অস্বীকারকারী কখনো অলী হতে পারে না; বরং অলীগণের কারামতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অলীগণ রাসূল (স)-এর প্রকৃত উম্মত। এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

لَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ ـ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ ـ

অর্থাৎ, আমরা কোনো অলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না; বরং আমরা বলি, একজন নবী সকল অলী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আমরা তাঁদের কারামত বিশ্বাস করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণের মাধ্যমে তাঁদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণের মর্যাদা ও অবস্থানে তাঁদের রাখা এবং তাঁদের স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٤) : عَرِّفِ الْمُعْجِزَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْاِسْتِدْرَاجَ ـ**

■ **প্রশ্ন : ৪৪ ॥ اَلْمُعْجِزَةُ ـ اَلْكَرَامَةُ এবং اَلْاِسْتِدْرَاجُ-এর সংজ্ঞা দাও।**

[ফা. প. ২০০৭]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোঁকা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো।

⊃ মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

⊃ مُعْجِزَةٌ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ-এর সীগাহ, যা اِعْجَازٌ শব্দ থেকে গৃহীত। এটা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. অক্ষম করা, ২. অলৌকিক ঘটনা, ৩. অসম্ভব নিদর্শন, ৪. অসাধারণ ঘটনা,

৫. স্বাভাবিকতার বিপরীত। ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِهٖ তথা যা অনুরূপ কোনো কিছু উপস্থাপন করতে মানুষকে অক্ষম করে দেয়।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ভাষাতত্ত্ববিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. জমহুর আলেমগণ বলেন, নবীগণ তাঁদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম তথা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهُرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ نَبِيٍّ تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهٖ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকৃতিবিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তা-ই মুজিযা।

৩. ইলমুল কালাম-এর পরিভাষায়–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهُرُ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ-

অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী হতে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে مُعْجِزَة বলা হয়।

৪. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে–

اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَأَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلٰى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنُبُوَّتِهٖ-

কুরআন ও হাদীসে মুজিযা শব্দটি ব্যবহার হয়নি; বরং মুজিযা বলতে الاية তথা চিহ্নকে বুঝানো হয়েছে।

দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ-

٢- وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ-

٣- لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ-

٤- اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنَزِّلَ اٰيَةً-

٥- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنْ رَبِّهٖ-

মুজিযার উদাহরণ : নবী করীম (স) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ও জড়পদার্থ তাঁকে সালাম দেয়া ইত্যাদি।

❸ كَرَامَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَرَامَةِ لُغَةً :

كَرَامَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْكَرَامَةُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, যা ك - ر - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি। আর ইংরেজিতে বলা হয়– Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি।

مَعْنَى الْكَرَامَةِ اِصْطِلَاحًا :

كَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : كَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমগণের মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলে।

২. عِلْمُ الْكَلَامِ-এর দৃষ্টিতে–

هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرَ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হতে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তা-ই কারামত। তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না।

৩. রায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِيْ بِهِ شَخْصٌ

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে।

দলীল : কারামত সত্য হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলীল উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন–

ক. মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا. قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ.

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

اَلْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ, অলীগণের কারামত সত্য।

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন।

২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে।

৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন– يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ

৪. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর প্রতি প্রয়োগকৃত বিষের প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়নি।

৫. কোনো কোনো অলীর পানির উপর দিয়ে চলাফেরার কথাও বলা যেতে পারে।

৬. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র) একবার শত্রুর প্রতি এক মুষ্ঠি বালি নিক্ষেপ করলে শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

لَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ.

৩ اسْتِدْرَاج-এর পরিচিতি :

معنى الاسْتِدْرَاج لغة :

اسْتِدْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : اسْتِدْرَاج শব্দটি د - ر - ج মাদ্দাহ থেকে নির্গত বাবে اسْتِفْعَال-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ– চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া। আর اسْتِدْرَاج শব্দের অর্থ– ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের দিকে নামানো। ইংরেজিতে বলা হয়– To make advance gradually, To entice or To lure into destruction.

معنى الاسْتِدْرَاج اصْطِلاحًا :

اسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমের মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়–

هو امرٌ خارق للعادة يخرج من الكافر او المشرك حسب دعوته.

অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলে।

৩. কারো মতে, যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৪. ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالآيات ثابتة للانبياء عليهم الصلاة والسلام والكرامات للاولياء حق واما التى تكون لاعدائه مثل ابليس وفرعون والدجال لا نسميها ايات ولا كرامات. ولكن نسميها قضاء حاجات لهم. وذلك لان الله تعالى يقضى حاجات اعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم.

অর্থাৎ, আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা কাযায়ে হাজত বলে থাকি। কারণ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।

৫. কতিপয় আলেমের মতে–

ما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا.

অর্থাৎ, যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তা-ই ইসতিদরাজ।

উপসংহার : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত অলীগণের পক্ষ থেকে এবং ইসতিদরাজ পাপী ও শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٥) : عَرِّفِ الْمُعْجِزَةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْاِسْتِدْرَاجَ ـ ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمْ بِالْاِيْجَازِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৪৫ ॥ مُعْجِزَة ـ كَرَامَة ও اِسْتِدْرَاج-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোঁকা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো।

➲ **মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের পরিচয় :** মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

➲ **مُعْجِزَة-এর পরিচিতি :**

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ لُغَةً :

مُعْجِزَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعْجِزَةُ শব্দটি بَابُ اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ, যা اِعْجَاز শব্দ থেকে গৃহীত। এটা ع - ج - ز মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. অক্ষম করা, ২. অলৌকিক ঘটনা, ৩. অসম্ভব নিদর্শন, ৪. অসাধারণ ঘটনা, ৫. স্বাভাবিকতার বিপরীত, ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِهٖ তথা যা অনুরূপ কোনো কিছু উপস্থাপন করতে মানুষকে অক্ষম করে দেয়।

مَعْنَى الْمُعْجِزَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مُعْجِزَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ভাষাতত্ত্ববিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. জমহুর আলেমগণ বলেন, নবীগণ তাঁদের নবুয়তের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম তথা নিদর্শন প্রদর্শন করেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়।
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ نَبِيٍّ تَأْيِيْدًا لِنُبُوَّتِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকৃতিবিরোধী কোনো কাজ নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া যা তাদের নবুয়তের সাহায্যার্থে প্রকাশ পায়, তা-ই মুজিযা।
৩. ইলমুল কালামের পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী হতে যে সকল অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে مُعْجِزَة বলা হয়।
৪. জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদের মতে–

اَلْمُعْجِزَةُ مَا نَشَأَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى دَلِيْلًا عَلٰى رِسَالَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنُبُوَّتِهٖ ـ

কুরআন ও হাদীসে মুজিযা শব্দটি ব্যবহার হয়নি; বরং মুজিযা বুঝাতে اَلْاٰيَة তথা চিহ্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

মুজিযার উদাহরণ : নবী করীম (স) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং জড়পদার্থ তাঁকে সালাম দেয়া ইত্যাদি।

⊃ كَرَامَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكَرَامَةِ لُغَةً :

كَرَامَة-এর আভিধানিক অর্থ : كَرَامَة শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, যা ك - ر - م মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ভদ্রতা, সম্মান, মাহাত্ম্য, বদান্যতা, দান করা ইত্যাদি।
আর ইংরেজিতে বলা হয়– Nobility, Respect, Mark of honour ইত্যাদি।

مَعْنَى الْكَرَامَةِ اِصْطِلَاحًا :

كَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : كَرَامَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমের মতে, ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয এবং নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলে।
২. عِلْمُ الْكَلَامِ-এর দৃষ্টিতে– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرَ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হতে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তা-ই কারামত। তবে শর্ত হলো, ঐ ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করতে পারবে না।
৩. রায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِيْ بِهِ شَخْصٌ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অতিপ্রাকৃত সংঘটিত ঘটনাকে কারামত বলে।

কারামতের উদাহরণ : কারামতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রী আসিফ রানী বিলকিসের সিংহাসন চোখের পলকে কারামতরূপে এনে উপস্থিত করেন।
২. হযরত ওমর (রা)-এর চিঠিতে নীল নদ প্রবাহিত হয়েছে।
৩. হযরত ওমর (রা) মসজিদে নববীতে খোতবারত অবস্থায় নাহওয়ান্দে যুদ্ধরত সেনাপতিকে যুদ্ধের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন।

⊃ اِسْتِدْرَاج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِسْتِدْرَاجِ لُغَةً :

اِسْتِدْرَاج-এর আভিধানিক অর্থ : اِسْتِدْرَاج শব্দটি د - ر - ج মাদ্দাহ থেকে নির্গত বাবে اِسْتِفْعَال-এর মাসদার। যার আভিধানিক অর্থ– চলা, হাঁটা, অগ্রসর হওয়া। আর اِسْتِدْرَاج অর্থ– ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে তোলা বা নিচের দিকে নামানো। ইংরেজিতে বলা হয়– To make advance gradually, To entice or To lure into destruction.

مَعْنَى الْاِسْتِدْرَاجِ اِصْطِلَاحًا :

اِسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اِسْتِدْرَاج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমগণের মতে, কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অতিপ্রাকৃত কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

২. ইলমুল কালামের পরিভাষায়– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْكَافِرِ اَوِ الْمُشْرِكِ حَسَبَ دَعْوَتِهِ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের দাবির সমর্থনে যে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, তাকে ইসতিদরাজ বলে।

৩. কারো মতে, যে অলৌকিক ঘটনা ঈমান ও আমলের বিপরীত, তাকে ইসতিদরাজ বলা হয়।

৪. ইসতিদরাজের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন– وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَاَمَّا الَّتِىْ تَكُوْنُ لِاَعْدَائِهِ مِثْلَ اِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالَ لَا نُسَمِّيْهَا اٰيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ. وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ. وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْضِىْ حَاجَاتِ اَعْدَائِهِ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوْبَةً لَهُمْ.

অর্থাৎ, নবীদের আয়াতসমূহ তথা মুজিযা প্রমাণিত। আর অলীদের কারামত সত্য। আর ইবলিস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মতো আল্লাহর শত্রুদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না; বরং এগুলোকে আমরা কাযায়ে হাজত বলে থাকি। কারণ আল্লাহ তাঁর শত্রুদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে।

৫. কতিপয় আলেমের মতে– مَا لَا يَكُوْنُ مَقْرُوْنًا بِالْاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَكُوْنُ اِسْتِدْرَاجًا অর্থাৎ, যে অলৌকিক বিষয়গুলো ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তা-ই ইসতিদরাজ।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. আভিধানিক পার্থক্য : مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। আর كَرَامَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এবং اِسْتِدْرَاج শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال থেকে ব্যবহৃত মাসদার।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত মুমিন মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে প্রকাশ পায়।

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. مُعْجِزَةٌ শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু كَرَامَةٌ অলীদের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর اِسْتِدْرَاج ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২. مُعْجِزَةٌ আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে। كَرَامَةٌ প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর اِسْتِدْرَاج শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

৩. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট مُعْجِزَة প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ كَرَامَة প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর اِسْتِدْرَاج প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে।

৪. مُعْجِزَة ও كَرَامَة শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শরীয়তে বৈধ নয়।

৫. مُعْجِزَة অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর كَرَامَة অস্বীকারকারী কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ।

৬. مُعْجِزَة ও كَرَامَة আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ।

৭. مُعْجِزَة ও كَرَامَة দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং اِسْتِدْرَاج দ্বারা শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়।

৮. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

৯. মুজিযা ও কারামতের تَعْلِيْم তথা শিক্ষাপ্রদান ও تَعَلُّم তথা শিক্ষাগ্রহণ নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে।

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণের মাকামে তাঁদের স্থান দেয়া এবং তাঁদের স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেক সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٤٦) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ؟ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا۔**

■ **প্রশ্ন : ৪৬ ॥ কারামত ও ইসতিদরাজ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০০৯]

اَوْ۔ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ؟ وَمَا حُكْمُهَا؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا۔

অথবা, মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে পার্থক্য কী? এদের হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যা মুজিযা নামে খ্যাত। আর অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত এবং ভণ্ডদের ধোঁকা ইসতিদরাজ নামে খ্যাত। নিম্নে প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. আভিধানিক পার্থক্য : مُعْجِزَة শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। আর كَرَامَة শব্দটি বাবে ضَرَبَ এবং اِسْتِدْرَاج শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال থেকে ব্যবহৃত মাসদার।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** মুজিযা নবী রাসূলগণের পক্ষ থেকে, কারামত মুমিন মুসলিম থেকে এবং ইসতিদরাজ অমুসলিম পাপী থেকে প্রকাশ পায়।

গ. **অন্যান্য পার্থক্য :** ১. مُعْجِزَة শুধু নবী রাসূলগণের দ্বারাই সম্ভব; কিন্তু كَرَامَة অলীদের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। তবে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর اِسْتِدْرَاج ফাসেক ও পাপীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২. مُعْجِزَة আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এর দ্বারা নবীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে; كَرَامَة প্রকাশের জন্য অলীর ইচ্ছা আবশ্যক নয়। আর اِسْتِدْرَاج শয়তানের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

৩. নবী রাসূলগণ আল্লাহর নিকট مُعْجِزَة প্রকাশের দাবি ও দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে অলীগণ كَرَامَة প্রকাশের জন্য দাবি করতে পারে না। আর اِسْتِدْرَاج প্রকাশকারী শয়তানী ইলমের মাধ্যমে অবগত হয়ে থাকে।

৪. مُعْجِزَة ও كَرَامَة শরীয়তসিদ্ধ; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শরীয়তে বৈধ নয়।

৫. مُعْجِزَة অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায় আর كَرَامَة অস্বীকারকারী কাফের হয় না। পক্ষান্তরে ইসতিদরাজ স্বীকার করা গুনাহের কাজ।

৬. مُعْجِزَة ও كَرَامَة আল্লাহর সাহায্যের প্রতিফলন; কিন্তু اِسْتِدْرَاج শয়তানের সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ।

৭. مُعْجِزَة ও كَرَامَة দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় এবং اِسْتِدْرَاج দ্বারা শয়তানের চক্রান্ত প্রদর্শিত হয়, যাতে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়।

৮. মুজিযা ও কারামত সত্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর ইসতিদরাজ শয়তানের সমর্থনে বাতিলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

৯. মুজিযা ও কারামতের تَعْلِيْم তথা শিক্ষাপ্রদান ও تَعَلُّم তথা শিক্ষাগ্রহণ নেই, তবে ইসতিদরাজের মধ্যে তা রয়েছে।

ↄ حُكْمُ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْاِسْتِدْرَاجِ :

কারামত ও ইসতিদরাজ-এর বিধান : مُعْجِزَة আল্লাহর ইচ্ছায় নবী রাসূলদের মাধ্যমে প্রকাশ হয়। নবী রাসূলদের দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হলে তাকে মুজিযা বলে। মুজিযা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটা মুজিযা বিশ্বাস করা ফরয এবং এর অস্বীকারকারী কাফের। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, অলীগণের কারামত সত্য। তাঁর মতে, যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায়, তাহলে বুঝতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা বা কারামতস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপ যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধসূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

আর কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় ইসতিদরাজ বলে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ইসতিদরাজ বৈধ ও সম্ভব। তবে একে সত্য বলে বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়। এটা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য করে থাকে। এটা ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

উপসংহার : এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হয়ে থাকে। এজন্য কোনো মানুষ বা অলীকে নবীগণের পর্যায়ভুক্ত মনে করার সুযোগ নেই।

■ السُّؤَال (٤٧) : عَرِّفِ الْوَلِيَّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ـ ثُمَّ اكْتُبْ مَا تَعْرِفُ عَنْ حَقِيْقَةِ الْاَوْلِيَاءِ وَكَرَامَاتِهِمْ مُوْضِحًا ـ

■ প্রশ্ন : ৪৭ ॥ اَلْوَلِيّ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত ও কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ। [ফা. প. ২০১৮]

اَوْ ـ عَرِّفِ الْوَلِيَّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ـ وَمَاذَا تَعْلَمُ عَنْ حَقِيْقَةِ الْوَلِيِّ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا ـ

অথবা, اَلْوَلِيّ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে কী জান? স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪, '১৬]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এবং তাঁদের অবর্তমানে বহুসংখ্যক দীনদার ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের জন্য নবীর মাধ্যমে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন; যেগুলোকে মুজিযা বলে। মূলত নবীগণের অলৌকিক ঘটনা মুজিযা এবং অলীগণের অলৌকিক ঘটনা কারামত নামে খ্যাত। অলীর পরিচয় প্রদানপূর্বক প্রশ্নালোকে উপরিউক্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ ولى-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْوَلِيِّ لُغَةً :

ولى-এর আভিধানিক অর্থ : ولى শব্দটি আরবি। এটি اَلْوَلَاءُ বা اَلْوَلَايَةُ শব্দ থেকে গৃহীত। এর বহুবচন হলো اَوْلِيَاء; শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ক. নৈকট্য, বন্ধু, অভিভাবক, সাহায্যকারী, কর্তা, মালিক ইত্যাদি।

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতানুসারে এর অর্থ হলো– ১. اَلصَّدِيْقُ তথা বন্ধু, ২. اَلنَّصِيْرُ তথা সাহায্যকারী, ৩. اَلْمُحِبُّ তথা প্রিয়, ৪. اَلْجَارُ তথা প্রতিবেশী, ৫. اَلْمُطِيْعُ তথা অনুগত।

গ. ইংরেজিতে বলা হয়– ১. Closeness, Friendship, Guardianship ইত্যাদি।

مَعْنَى الْوَلِيِّ اِصْطِلَاحًا :

ولى-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : অলী শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমের মতে, কুরআন সুন্নাহভিত্তিক وِلَايَة তথা শাসনক্ষমতা অর্জনকারীকে অলী বলা হয়।
২. কারো মতে, উত্তরাধিকার আইন ও রাজনৈতিক পরিভাষায় অলী ও মাওলা শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়।
৩. শরীয়তের পরিভাষায় বেলায়াত বা অলী শব্দদ্বয় وِلَايَةُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর বন্ধুত্ব ও وَلِيُّ اللّٰهِ তথা আল্লাহর বন্ধু অর্থে সর্বাধিক ব্যবহৃত। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অলী তথা বন্ধুদের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলেন–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও তাকওয়ার পথ অনুসরণ করছে।

৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) ফকীহগণের দৃষ্টিকোণ থেকে ولى-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেন–

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ حَسْبَ مَا يُمْكِنُ الْمُوَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِى الْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِى اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ـ

অর্থাৎ, ولى বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর গুণাবলির পরিচয় লাভ করেছে, সাধ্যমতো আনুগত্য প্রদর্শন করে, পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং প্রকৃতিগত বিষয়াদি ও প্রবৃত্তি অনুসরণ থেকে বিরত থাকে।

মোটকথা, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামের দৃষ্টিতে অলী নামে খ্যাত।

⊃ حَقِيْقَةُ الْوَلِيِّ :

অলীর হাকীকত : পবিত্র কুরআনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, দুটি গুণের মধ্যে অলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। আর সে দুটি হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ দুটি গুণ যার মধ্যে যত বেশি এবং যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াত তথা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি অলী তথা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর অলী। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম তাহাবী, ইমাম আযম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ (র), আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বর্ণনাপূর্বক বলেন–

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ، وَاَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَطْوَعُهُمْ وَاَتْبَعُهُمْ بِالْقُرْاٰنِ ـ

অর্থাৎ, সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর অলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও পবিত্র কুরআনের অনুসরণকারী সে তত বেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত তথা তত বেশি বেলায়াতের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (স) অলীর পথের কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পর অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ ـ

উপসংহার : প্রত্যেক মুমিনের উচিত নবীগণকে তাঁদের স্তরে রাখা এবং তাঁদের স্থানে অজ্ঞতাবশত কোনো অলীকে স্থান না দেয়া। আর এসব অলৌকিক বিষয় তথা কারামত ও মুজিযা মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই সংঘটিত হওয়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

■ اَلسُّؤَالُ (٤٨) : بَيِّنْ اَهَمِّيَةَ الْاِيْمَانِ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ -

■ **প্রশ্ন : ৪৮ ॥ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।**

[ফা. প. ২০০৮, '১১]

اَوْ- بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْاِيْمَانِ بِالْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ وَالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ -

অথবা, কুরআনুল কারীম ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের স্বরূপ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমানের তৃতীয় রোকন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে اَلْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ তথা আল্লাহর গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব এবং মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের ধরন নিম্নে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জ جِهَاتُ الْاِيْمَانِ عَلَى الْكُتُبِ وَاَهَمِّيَتُهُ :

কিতাবসমূহে ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব : মহান আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন–

১. **আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন :** জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করে হেদায়াতের আলোকবর্তীকাস্বরূপ তাদের ওপর নাযিল করেছেন ঐশীগ্রন্থ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ -

এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না। তবে এ সকল কিতাবের ওপর বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ ... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ -

২. **জানা ও অজানা কিতাব :** আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের ওপর অসংখ্য কিতাব নাযিল করলেও আমরা সেগুলোর অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। হাদীস শরীফে দুর্বল সনদ দ্বারা একশত চারখানা কিতাব ও সহীফার বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব কিতাবের সংখ্যা ও বিধান যাই হোক না কেন সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক।

৩. **ইবরাহীম ও মুসা (আ)-এর সহীফা :** সহীফা অর্থ লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ 'পুস্তিকা' তথা গ্রন্থ। অর্থাৎ এ বিশ্বাস করা যে, ইবরাহীম ও মুসা (আ)-কেও সহীফা প্রদান করা হয়েছিল।

দলীল : যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى -

৪. **প্রসিদ্ধ তিন কিতাব :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে তিনটি কিতাবের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– ১. তাওরাত ২. যাবুর ৩. ইঞ্জিল। এ তিনটি গ্রন্থ আল্লাহ প্রসিদ্ধ তিনজন নবীকে প্রদান করেছিলেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

ক. তাওরাত : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুসা (আ)-এর নিকট এ গ্রন্থ অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যেমন তাওরাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী–

١- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ -

٢- اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ -

খ. যাবুর : এ গ্রন্থ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী দাউদ (আ)-কে প্রদান করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا -

গ. ইঞ্জিল : ইঞ্জিল আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ঈসা (আ)-কে প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ -

৫. **মহাগ্রন্থ আল কুরআন :** প্রতিটি মুমিনই বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যা নবী মুহাম্মাদ (স)-এর চূড়ান্ত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। পবিত্র কুরআন মানবজাতির সকল কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতার উৎস। এ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা পূর্ব গ্রন্থসমূহে দেননি। সংক্ষেপে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক. অলৌকিকত্ব : পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। নবী মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ চিরন্তন মুজিযা আল কুরআন প্রদান করেছেন। যার অলৌকিকত্ব তাঁর সমকালীন মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন।

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিকগুলো হলো, এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ। এটা তৎকালীন আরববাসীর জন্য ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ; কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জটির জবাব দিতে পারেনি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١- وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

٢- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

খ. সংরক্ষণ : কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক হলো, এর চিরস্থায়ী সংরক্ষণ। আল্লাহ নিজেই একে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং যে কোনো রূপের বিলুপ্তি কিংবা বিকৃতি থেকে সংরক্ষণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ -

গ. **সর্বজনীনতা :** মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে কোনো নবী রাসূল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি। কারণ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষের কাছে তাঁদের কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়ত ও কিতাবের নির্দেশনা মানবজাতির জন্য সর্বজনীন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- هُدى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ

٢- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

ঘ. **একমাত্র মুক্তির দিশারি :** আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেও বর্তমান থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পবিত্র কুরআনই তাদের মুক্তির দিশারি। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

١- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

٢- اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ -

ঙ. **পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ :** কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাগুলোর সমর্থক ও নিশ্চয়তাদানকারী এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। কুরআনের শিক্ষার বাইরে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তার সবগুলোই রহিত হয়েছে। যেমন–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا .... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ -

উপসংহার : মহান আল্লাহপ্রদত্ত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস রেখে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞান অনুধাবন করে এর বিধিবিধানসমূহ আমলে বাস্তবায়ন করাই ঈমানের দাবি ও মুক্তির একমাত্র মাধ্যম।

■ **السُّؤَالُ (٤٩) : بَيِّنْ مَا تَعْلَمُ عَنِ التَّحْرِيْفِ الَّذِىْ حَصَلَ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ حَسْبَ مَا بَيَّنَ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ -**

■ **প্রশ্ন : ৪৯ ॥ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে তুমি যা জান বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ)-এর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করেন, যার ধারক ও বাহক ছিল ইহুদি জাতি। আর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করলেন ইঞ্জিল কিতাব। এ কিতাবের ধারক ও বাহক ছিল নাসারা তথা খ্রিস্টান জাতি; কিন্তু নবীর অবর্তমান সময়ের ব্যবধানে এ উভয় সম্প্রদায় তাদের কিতাবের ব্যাপক রদবদল ও বিকৃতি সাধন করে। নিম্নে আল কুরআনের আলোকে তা বর্ণনা করা হলো।

⊃ بَيَانُ الْقُرْاٰنِ عَلٰى تَحْرِيْفِ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ :

তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতির ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনা : ১. আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি, তারা শব্দগুলোকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে। আপনি সর্বদা

তাদের কোনো না কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প ক'জন ছাড়া। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৩)

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন–

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ۔

অর্থাৎ, তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। আর তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।

৩. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

افَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ, তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের অবস্থা হলো, তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং বোঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত। (সূরা বাকারা : আয়াত ৭৫)

৪. মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وما هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ويَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ۔

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে'; কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও' তা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ ওয়ালা) হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৮-৭৯)

কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাস বা কর্মের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন; কারণ অনেক বিকৃতি তারা তাওরাত, যাবুর বা ইঞ্জিলের মূল পাঠে সংযোগ করেছিল এবং কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলো অর্থ ও তাফসীরের নামে বিকৃত হলেও মূল পাঠের মধ্যে তা ছিলো না।

৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ - فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ - يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ, যারা বলে আমরা খ্রিস্টান তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি। তারা যা করত, আল্লাহ তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন। তোমরা কিতাবের মধ্যে যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেন এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট থেকে এক নূর (আলো) ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ১৪-১৫)

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এবং তাদের ইবাদত করে। বিশেষত খ্রিস্টানরা বলে যে, ঈসা (আ) নিজেকে 'আল্লাহ' বলে দাবি করেছেন। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, এসব বক্তব্য যা কিছু তাদের কিতাবে রয়েছে, তার সবই বিকৃতি ও সংযোজন। কোনো নবী কখনোই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নির্দেশ দিতে পারেন না।

৬. মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ -

অর্থাৎ, ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই আর খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই; অথচ তারা সকলেই কিতাব পাঠ করে! এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন। (সূরা বাকারা : আয়াত ১১৩)

অর্থাৎ তাদের গ্রন্থাবলি বিকৃত করার পরও যা তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে, তাও সুস্পষ্ট বা আক্ষরিকভাবে তাদের এ দাবি প্রমাণ করে না; বরং তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাব প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি আছে এবং উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত। যাদের কোনো কিতাবই নেই, তারা যেমন অনুমানভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বলে, এরাও তেমনি কথা বলে।

৭. ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিব্রত করার জন্য তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, তারা কিভাবে তোমার ওপর বিচারের ভার ন্যস্ত করবে, যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ বিদ্যমান? তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৩)

অর্থাৎ যে বিষয়ে তারা বিচার প্রার্থনা করছে, সে বিষয়ক বিধান তাওরাতেই বিদ্যমান। অথচ সে অনুসারে বিচার না করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করার অর্থই হলো, তারা বিশ্বাস ও প্রতারণার জন্যই এরূপ করেছে।

৮. ইহুদিরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম। বিষয়টি তাদের বানোয়াট ব্যাখ্যা মাত্র, তাওরাতে তা ছিলো না। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়াকুব) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন, তা ব্যতীত বনি ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। আপনি বলে দিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আনয়ন কর এবং পাঠ কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৩)

৯. অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থাৎ, ইঞ্জিল অনুসারীগণের উচিত আল্লাহ তাতে (ইঞ্জিলে) যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে ফয়সালা করা। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা ফয়সালা করে দেয় না তারা ফাসেক (সত্যত্যাগী)। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৭)

উপসংহার : আহলে কিতাবের অনুসারীদের বিভ্রান্তি ও পদস্খলনের মূল কারণই ছিল আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের বিকৃতিসাধন। আর এ বিকৃতিসাধন ও সীমালঙ্ঘনে ইহুদিরাই ছিল অগ্রগামী। ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছে আল্লাহর আযাব ও গযব। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণীকে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের কারণে কেয়ামত পর্যন্ত তারা আল্লাহর লানতে পতিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٠) : اُذْكُرْ تَحَدِّى الْقُرْاٰنِ بِالْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ.

■ প্রশ্ন : ৫০ ॥ আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা উল্লেখ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে মানবজাতি ছিল চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবতা, আদল ও ইনসাফ বলতে কিছুই ছিলো না তাদের মাঝে। মহান আল্লাহ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ জাতিকে হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য প্রিয় নবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করলেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন; কিন্তু আরবজাতি সহজে এ কিতাবকে বিশ্বাস না করায় আল্লাহ তায়ালা এ কুরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রশ্নের চাহিদার আলোকে নিম্নে আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব।

تَحَدِّى الْقُرْآن ◌ :

আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ : আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্যের মূল্যায়নে ছিল অতি পারঙ্গম তথা দক্ষ। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। নিম্নে এর পর্যায়সমূহ উপস্থাপন করা হলো–

১. **একটি কিতাবের চ্যালেঞ্জ :** সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের মোকাবেলায় কোনো একটি কিতাব আনতে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়; তবে তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথপ্রদর্শনকারী কোনো কিতাব আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে আস। আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করব।

সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থাৎ, আপনি বলে দিন! যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।

২. **দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ :** এ পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা হূদে ইরশাদ করেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা কি বলছে যে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছ? তুমি বল, তোমরা এর মতো দশটি সূরা রচনা করে দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ ব্যতীত যদি কেউ ক্ষমতা রাখে, তাকেও তোমরা ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩. **একটি সূরার চ্যালেঞ্জ :** প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার চ্যালেঞ্জ করে মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার আর কখনোই তোমরা তা করতে পারবে না। অতএব তোমরা সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত مِثْلِه শব্দের ه যমীরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলেমগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এ যমীর দ্বারা পবিত্র কুরআনুল কারীমকে বোঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, কুরআনের সূরার মতো কোনো সূরা রচনা করে দেখাও।
২. ইমাম ইবনে জারীর, তাবারী, যামাখশারী ও ইমাম রাযী (র) বলেন, আলোচ্য যমীর দ্বারা মহানবী (স)-কে বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়, মুহাম্মদের মতো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে যদি এরূপ সূরা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তোমরাও করে দেখাও।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থতা : কাফেররা মুহাম্মাদ (স)-কে প্রতিহত করতে তাদের জানমাল কুরবানি করেছে; কিন্তু এ সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। পবিত্র কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণে অবাক হয়ে কখনো তারা একে যাদু আবার কখনো পূর্ববর্তী যুগের গল্প কাহিনী এবং বানোয়াট কথা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি তারা বলত, মুহাম্মাদ (স) তা বানিয়েছেন। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথিদেরকে বলেছে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।

কাফেরদের ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত : পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কাফের মুশরিকরা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কিছু ব্যর্থ মনোরথ প্রচেষ্টার উপমা উল্লেখযোগ্য।

তারা আল্লাহ এবং তাঁর গ্রন্থের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি আয়াত রচনা করেছিল। তা হলো– اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحُبْلٰى অর্থাৎ, তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু গর্ভবতী মহিলার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে? (নাউযুবিল্লাহ)

সর্বশেষ তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বলেছে– لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়।

উপসংহার : কুরআন হলো মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং এর চ্যালেঞ্জ ছিলো বিশ্বব্যাপী। কুরআন নাযিলের উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কেউ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেনি এবং কখনো পারবে না। অতএব এর মোকাবেলার অর্থ হবে ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ।

■ اَلسُّؤَالُ (٥١) : مَا مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ؟ اِشْرَحِ الْعَقِيْدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ فِى الْمَلَائِكَةِ.

■ প্রশ্ন : ৫১ ॥ ملائكة অর্থ কী? ফেরেশতাগণের বিষয়ে সংক্ষেপে ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তারা আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত ও তাঁর অনুগত। তাদের একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করা। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা মহান আল্লাহ তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই। তাদের আহার নিদ্রারও প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাদের নেই; কিন্তু কিছু

কিছু কাফের তাদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাদের পরিচয়, তাদের প্রতি আকিদা ও কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. مَلَائِكَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ لُغَةً :

مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটি مَلَك বা مَلَاك-এর বহুবচন। শব্দটি মূলত اَلَك ধাতুমূল থেকে গৃহীত। এতে মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত, মূল শব্দটি ছিল مَأْلَك (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে লামের পরে এনে একে مَلَاك (মালআক) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে হামযা অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে مَلَك বলা হয়।

আরবি مَلَك শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– পত্র, চিঠি তথা দূত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত (angel) , স্বর্গীয় দূত বলা হয়।

আরবি ভাষায় مَلَك শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। ফারসি ভাষা হতে গৃহীত বাংলায় এ ফারসি শব্দই অধিক প্রচলিত। কখনো বহুবচনে مَلَك আসে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ اِصْطِلَاحًا :

مَلَائِكَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مَلَائِكَة তথা ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়–

১. জমহুর আলেমের মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত।

২. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ مُبَرَّءَةٌ عَنْ مَبَادِى الشُّرُوْرِ وَالْاٰفَاتِ وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ قَوِيَّةٌ عَلَى الْاَفْعَالِ الْعَجِيْبَةِ عَالِمَةٌ بِالْكَوَائِنِ -

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যাঁরা পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী।

৩. ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন–

اَلْمَلَائِكَةُ حَيَوَانٌ نُوْرِىٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يُؤَنَّثُ وَلَا يُذَكَّرُ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরি একপ্রকার জীব, যাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে; তাঁরা খায়ও না, পানও করে না এবং তাঁরা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়।

৪. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন–

وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ وَلَا يُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তাঁর আদেশ পালনে তাঁরা রত আছে, তাঁরা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণান্বিত নয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা ফেরেশতা, যাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তাঁরা নারী পুরুষ নন।

সাধারণ অর্থ : আল্লাহ তায়ালা অনেক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাঁদের নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা এবং তাঁর নির্দেশে সৃষ্টিকুলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করাই তাঁদের কর্ম।

اَلْعَقِيْدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِى الْمَلَائِكَةِ :

ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : ফেরেশতাগণের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা তথা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে চারটি মূলনীতি রয়েছে। যথা– ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস খ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস, গ. নামে বিশ্বাস, ঘ. কর্মে বিশ্বাস।

ক. অস্তিত্বে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণ সম্পর্কে কাফেরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। অদৃশ্য জগতের অংশ, যা কিছু পবিত্র কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা সবই ঈমানদার ব্যক্তি আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا۔

খ. নামে বিশ্বাস : আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাগণের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

গ. আকৃতি প্রকৃতিতে বিশ্বাস : ফেরেশতাগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

১. **ফেরেশতাগণকে আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন :** আল্লাহ মানবসৃষ্টির পূর্বে তাঁদের সৃষ্টি করেছেন, মানবসৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদের জানিয়েছেন এবং আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা আদমকে সেজদা করেন।

২. **ফেরেশতাগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা :** মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা সন্তান বলে গণ্য করত, তাঁদের ইবাদত করত এবং তাঁদেরকে সুপারিশকারী মনে করত। এসব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۔ سُبْحَانَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۔ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ۔

৩. **ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি :** ফেরেশতা সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআনে কোনো কিছুই বলা হয়নি। হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁদেরকে নূর থেকে তৈরি করা হয়েছে।

৪. **ফেরেশতাগণের আকৃতি :** তাঁদের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু জানানো হয়নি। তবে আমরা জানি, তাদের কমবেশি বিভিন্ন সংখ্যক পাখা রয়েছে।

৫. **আকৃতি পরিবর্তন ও ধরন :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

ঘ. **ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস :** ফেরেশতাগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন–

১. **আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ :** ফেরেশতাগণ মানবীয় জৈবিক চাহিদা; যেমন– দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা, বাসনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। কারণ তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন।

২. **কর্মনির্বাহ ও কর্মবন্টন :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন।

৩. **অহী পৌছানো :** ফেরেশতাগণের মধ্য হতে কারো কারো মৌলিক দায়িত্ব হলো, নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর অহী পৌছানো। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ -

৪. **মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা :** মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, তাঁর সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরআন কারীমে তাঁদেরকে কিরামান কাতেবীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ;

৫. **মৃত্যুর সময় আত্ম গ্রহণ :** পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য একদল ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

৬. **আরশ বহন করা :** ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো মহান আল্লাহর আরশ বহন করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ -

৭. **অন্যান্য কর্ম :** এছাড়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির ফেরেশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যেমন– চাঁদ সূর্যের জন্য, বৃষ্টির জন্য, পাহাড় পর্বতের জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের জন্য, জাহান্নাম জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মের জন্য।

উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার একান্ত অনুগত। ফেরেশতাগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত পালনে সদা তৎপর। তাঁদের প্রতি যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ السُّؤَالُ (٥٢) : تَكَلَّمْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ ـ ثُمَّ اذْكُرْ صِفَاتِهِمْ بِالْاَدِلَّةِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৫২ ॥ ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে দালিলিক প্রমান দাও।** [ফা. প. ২০১২]

اَوْ مَا مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ اُذْكُرْ مَعَ بَيَانِ صِفَاتِ الْمَلَائِكَةِ بِالْاِيْجَازِ ـ

অথবা, مَلَائِكَة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সংক্ষেপে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মালাইকা তথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর বান্দা এবং অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত ও তাঁর অনুগত। তাঁদের একমাত্র কাজ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করা। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। নূরের তৈরি এ ফেরেশতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বলতে কিছুই নেই। তাঁদের আহার নিদ্রারও প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই; কিন্তু কিছু কিছু কাফের তাঁদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, যা কোনোভাবে সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

⊃ مَلَائِكَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ لُغَةً :

مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে اَلْمَلَائِكَة শব্দটি مَلَك বা مَلَاك-এর বহুবচন। শব্দটি মূলত اَلَك ধাতুমূল থেকে গৃহীত। এতে মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত, মূল শব্দটি ছিল مَأْلَك (মাআলাক)। পরবর্তীকালে হামযা অক্ষরটি স্থানান্তরিত করে লামের পরে এনে একে مَلْأَك (মালআক) বলা হয়। বহুল ব্যবহারে হামযা অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে مَلَك বলা হয়।

আরবি مَلَك শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– পত্র, চিঠি তথা দূত। বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হলেও অর্থগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূত (angel), স্বর্গীয় দূত বলা হয়।

আরবি ভাষায় مَلَك শব্দকে বাংলা ভাষায় ফেরেশতা বলা হয়। বাংলায় এ ফারসি শব্দই অধিক প্রচলিত। কখনো বহুবচনে مَلَك আসে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ـ

مَعْنَى الْمَلَائِكَةِ اِصْطِلَاحًا :

مَلَائِكَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : مَلَائِكَة তথা ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়–

১. জমহুর আলেমের মতে, মহান আল্লাহ কর্তৃক নূর দ্বারা সৃষ্ট নিষ্পাপ সৃষ্টিকে ফেরেশতা বলে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে নিয়োজিত।

২. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন–

اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ مُبَرَّءَةٌ عَنْ مَبَادِى الشُّرُوْرِ وَالْاٰفَاتِ وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ قَوِيَّةٌ عَلَى الْاَفْعَالِ الْعَجِيْبَةِ عَالِمَةٌ بِالْكَوَائِنِ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যাঁরা পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী।

৩. ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফেরেশতার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন–

اَلْمَلَائِكَةُ حَيَوَانٌ نُوْرِىٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يُؤَنَّثُ وَلَا يُذَكَّرُ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতা হলো নূরের তৈরি একপ্রকার জীব, যাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে; তাঁরা খায়ও না, পানও করে না এবং তাঁরা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়।

৪. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন–

وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ وَلَا يُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ۔

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা বা দাস, সর্বক্ষণ তাঁর আদেশ পালনে রত, তাঁরা পুরুষ ও নারী কোনো গুণে গুণান্বিত নয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি হলো মালাইকা তথা ফেরেশতা, যাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে রত থাকেন এবং তাঁরা নারী পুরুষ নন।

صِفَاتُ الْمَلَائِكَةِ :

ফেরেশতার বৈশিষ্ট্যাবলি : আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি হলো ফেরেশতা জাতি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

১. **আহার গ্রহণ করে না :** ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম হলো, তাঁরা কখনো আহার গ্রহণ করেন না। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, তাঁদের খাবার ও কামনা বাসনার প্রয়োজন হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلَمَّا رَاٰى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ۔

২. **নারী পুরুষে গুণান্বিত নয় :** ফেরেশতাদের সম্পর্কে মুশরিকদের নারী পুরুষ হওয়ার ধারণা অমূলক। কেননা তাঁরা নারী জাতিও নয় এবং পুরুষ জাতিও নয়; বরং তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْاَلُوْنَ۔

৩. **কষ্ট ও ক্লেশহীন :** আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করে না। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, তাঁরা রাতদিন কর্মে ব্যস্ত থাকেন। সর্বদা অনুগত ও সামর্থ্যবান থাকেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ.

৪. **সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট সারিবদ্ধভাবে নির্দেশ পালনে দণ্ডায়মান থাকেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا

৫. **দুর্গন্ধ থেকে কষ্ট অনুভব করে :** ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ; যেমন– পিয়াজ, রসুন ইত্যাদির গন্ধে কষ্ট অনুভব করেন। যেমন রাসূল (স) বলেন–

مَنْ اَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ بَنُوْ اٰدَمَ.

৬. **সদা অনুগত ও কর্মসম্পাদনকারী :** ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ তায়ালার অনুগত। ফলে তারা কখনো তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না এবং কর্মসম্পাদনেও কোনো ত্রুটি করে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

৭. **ছবিযুক্ত ও কুকুর আশ্রিত গৃহে প্রবেশ করে না :** ফেরেশতারা আসমান ও যমীনের সকল স্থানে আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত থাকেন। তবে যেসব গৃহে প্রাণীর ছবি বিদ্যমান আছে বা যেসব গৃহে কুকুর থাকে সেসব গৃহে প্রবেশ করে না। যেমন রাসূল (স) বলেন– اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ

উপসংহার : ফেরেশতাগণ আল্লাহর একান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যম ও তাঁর বিশেষ বাহিনী। তাঁদের ব্যাপারে যথার্থ এবং আন্তরিক বিশ্বাস রাখাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٣) : صِفِ الْمَلٰئِكَةَ كَمَا وَصَفَ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامُ.

■ প্রশ্ন : ৫৩ ॥ প্রাজ্ঞ গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ফেরেশতা নূর দ্বারা সৃষ্ট আল্লাহ তায়ালার বিশেষ বাহিনী, যারা সদাসর্বদা আল্লাহর ইবাদতে তথা নির্দেশ পালনে প্রস্তুত রয়েছে। প্রাজ্ঞ গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

➲ تَعْرِيْفُ الْمَلٰئِكَةِ :

ফেরেশতাদের পরিচয় : প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার ফেরেশতাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ اَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ كَامِلَةٌ بِالْعَقْلِ مُبَرَّءَةٌ عَنْ مَبَادِى الشُّرُوْرِ وَالْاٰفَاتِ وَعَنْ ظُلُمَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ قَوِيَّةٌ عَلَى الْاَفْعَالِ الْعَجِيْبَةِ عَالِمَةٌ بِالْكَوَائِنِ.

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ পবিত্র আত্মার অধিকারী এক জ্যোতির্ময় জাতি, যারা পরিপূর্ণ জ্ঞানে বলীয়ান, সকল প্রকার মন্দ ও পাপকার্য থেকে পবিত্র, দৈহিক অবয়ব মুক্ত, দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত।

মুসান্নিফ (র)-এর উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর সারসংক্ষেপ-

١- لا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

٢- لا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ -

٣- لا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلا يَسْتَحْسِرُوْنَ -

এ আয়াতগুলোতে ফেরেশতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিধৃত হয়েছে। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাঁদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

জমহুর আলেমগণ ফেরেশতার সংজ্ঞায় বলেছেন-

اَلْمَلَكُ جِسْمٌ نُوْرِىٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لا يُذَكَّرُ وَلا يُؤَنَّثُ وَلا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ -

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ জ্যোতির্ময় অবয়ববিশিষ্ট, তাদেরকে বিবিধ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, তারা পুরুষও নয়, নারীও নয়, তারা খায় না, পানও করে না।

ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা : গ্রন্থকার (র) মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করে বলেন-

رُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلاَئِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلاَئِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلاَئِكَةِ -

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে থেকে নবী রাসূলগণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের তুলনায় উত্তম। আর বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ সাধারণ মানুষের তুলনায় উত্তম এবং সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম।

দলীল : আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

١- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

٢- اَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ اِلَّا قَلِيْلاً -

٣- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -

٤- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ -

অত্র আয়াতসমূহে ফেরেশতাদের তুলনায় মানুষের অধিক ফযিলতের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত; কিন্তু মুতাযিলা সম্প্রদায়, দার্শনিক গোষ্ঠী এবং কিছুসংখ্যক আশয়ারী মনে করেন, সামগ্রিকভাবে ফেরেশতাদের মর্যাদা মানুষের তুলনায় অধিক।

দলীল : উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলো কুরআনের আয়াত দ্বারা তাদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করে। আয়াতগুলো হলো-

١- عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى -

٢- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ -

٣- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ -

এ আয়াতগুলোতে ফেরেশতাগণ যে নবী রাসূলগণকে তালিম দেন তা স্পষ্ট হয় এবং ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য তাও স্পষ্ট হয়। এতে প্রমাণিত হয় ফেরেশতা মানুষ থেকে উত্তম। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে তাদের উপরিউক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা মানুষের ওপর ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়নি; বরং তাদের দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে।

উপসংহার : ফেরেশতাকুলের সৃষ্টি এবং মানব চক্ষুর অন্তরালে তাদের অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা সদা মহান প্রভুর অনুগত এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে তৎপর।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٤) : اَثْبِتْ بِالْاَدِلَّةِ اَنَّ الْبَشَرَ اَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৫৪ ॥ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, মানুষ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম।

উত্তর ॥ **উপস্থাপনা :** মানুষ ও ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট দুটি ভিন্ন জাতি। উভয় জাতিই আল্লাহর হুকুম আহকাম দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা মর্যাদা। তবে আল্লাহর সৃষ্টি এ দুটি জাতির মধ্যে কে মর্যাদায় উত্তম– এ নিয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

هَلِ الْبَشَرُ اَفْضَلُ اَمِ الْمَلَائِكَةُ :

মানুষ উত্তম না ফেরেশতা উত্তম : আলোচ্য মাসয়ালা সম্পর্কে মতপার্থক্যপূর্ণ পর্যালোচনা নিম্নরূপ–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, মর্যাদার দিক থেকে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ বক্তব্য সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট কালামশাস্ত্রবিদ আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী তিনটি সূত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন–

ক. **প্রথম সূত্র :** رُسُلُ الْمَلَائِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, ফেরেশতাদের দূতগণ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। যেমন– হযরত জিবরাঈল (আ), মিকাঈল (আ), হযরত আযরাঈল (আ)। এ কথার ওপর আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে।

খ. **দ্বিতীয় সূত্র :** رُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যকার নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের মধ্যকার দূতগণের চেয়ে উত্তম। যেমন– হযরত মুহাম্মাদ (স), হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ সকল নবী প্রধান ফেরেশতা তথা জিবরাঈল, আযরাঈল (আ) প্রমুখ হতে অধিক সম্মানিত।

গ. **তৃতীয় সূত্র :** عَامَّةُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা থেকে মর্যাদায় উত্তম।

আহলুস সুন্নাতের দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের সমর্থনে নকলী ও আকলী দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন–

ক. নকলী দলীল : ১. সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ ـ

অত্র আয়াতে দেখা যায়, হযরত আদম (আ)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর যার মর্যাদা বেশি সে-ই মূলত সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা মর্যাদার দিক থেকে প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

২. অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–
وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الخ۔
এ আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন, ফেরেশতাদের তুলনায় হযরত আদম (আ)-এর মর্যাদাই বেশি।

৩. অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদেরকে এবং ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।" এখানে عَالَمِيْنَ তথা সৃষ্টজগতের মধ্যে ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ আয়াতও প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম।

খ. আকলী দলীল : যুক্তি দ্বারাও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রমাণ করেন যে, মানুষ সাধারণ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম। যেমন–

১. ফেরেশতা সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। সুতরাং সেবকের চেয়ে যাকে সেবা করা হয়, তার মর্যাদা সবসময় উর্ধ্বেই থাকে।

২. আল্লাহ তায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মানবজাতি থেকেই নির্বাচিত করেছেন; ফেরেশতা থেকে নয়। উপরন্তু ফেরেশতা থেকে নিকৃষ্টতম শয়তান ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে; কিন্তু ফেরেশতাদেরকে এরূপ কোনো কামনা বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে আল্লাহর ইবাদত করতে তাদের কোনো অন্তরায় নেই। এতে বুঝা যায়, মানুষ ফেরেশতার ওপর মর্যাদাবান।

২. মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের অভিমত : মুতাযিলা, আশায়েরা ও দার্শনিকদের অভিমত হচ্ছে, সার্বিক দিক থেকে মানবজাতি অপেক্ষা ফেরেশতাগণ মর্যাদাবান।

দলীল : তারা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে। যেমন–

১. ফেরেশতাদের দেহ কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ আত্মা ও মন্দ উপাদান থেকে মুক্ত। অর্থাৎ মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি ফেরেশতাদের মধ্যে নেই। এজন্য তারা মানুষ অপেক্ষা মর্যাদাবান।

২. নবী রাসূলগণ ফেরেশতাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স)-কে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং শিক্ষাদানকারী শিক্ষার্থীদের চেয়ে মর্যাদাবান।

৩. কুরআন ও হাদীসে নবীদের নাম সাধারণত ফেরেশতাদের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

৪. কুরআনের আয়াত– لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ; এ আয়াতে تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ) থেকে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি।

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও দলীলের খণ্ডনে বলেন–

১. তাদের উত্থাপিত প্রথম যুক্তিটি ইসলামী নীতিমালায় উপস্থাপিত নয়; বরং দার্শনিক মতবাদের ওপর উপস্থাপিত। কুরআন হাদীসের মোকাবেলায় কোনো দার্শনিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণ শিক্ষক নয়; বরং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষাদান করে থাকেন। আল্লাহ নিজেই শিক্ষক, ফেরেশতাগণ আল্লাহর বাণীবাহক মাত্র।

৩. ফেরেশতাগণকে মানবসৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনে তাঁদের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে; তাঁদের মর্যাদার জন্য নয়।

৪. শেষোক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে বিভিন্ন কারণে আল্লাহর পুত্র মনে করত। আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে অপনোদনের নিমিত্ত এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা ও যুক্তিতর্কের প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্ট যে, মানবজাতিই হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। মানবজাতি ফেরেশতা জাতির চেয়েও উত্তম। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

■ **اَلسُّؤَالُ (٥٥) : اُكْتُبْ اَشْرَاطَ السَّاعَةِ الْكُبْرٰى بِالْاِيْضَاحِ.**

■ **প্রশ্ন : ৫৫ ॥ কেয়ামতের বড় আলামতগুলো বিশদভাবে লেখ।** [ফা. প. ২০১৯]

اَوِ الْاَشْرَاطُ الْكُبْرٰى لِلسَّاعَةِ مَا هِىَ؟ بَيِّنْ.

অথবা, কেয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কী কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭,'০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণ্যের হিসাব দিতে হবে। কেয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

اَلْاَشْرَاطُ الْكُبْرٰى لِلسَّاعَةِ :

কেয়ামতের বড় আলামতসমূহ : কেয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনাদি প্রকাশিত হওয়ার পর আরো কিছু বড় নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার কথা রাসূল (স) বলেছেন। সাহাবী হোযায়ফা ইবনে উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা কী বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কেয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বললেন–

اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

অর্থাৎ, দশটি আয়াত বা নিদর্শন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। যথা– ১. প্রাচ্যে কোথাও ভূমিধস হওয়া, ২. পাশ্চাত্যের কোথাও ভূমিধস হওয়া, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হওয়া, ৪. ধোঁয়া, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজূজ মাজূজ, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ।

এসব নিদর্শনের মধ্য হতে ইয়াজূজ ও মাজূজ আগমনের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔

অর্থাৎ, অতঃপর যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে বন্ধনমুক্ত করা হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯৬)

মাটির নিচ থেকে জীব বের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔

অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা-গর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (সূরা নামল : আয়াত ৮২)

ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔

অর্থাৎ, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৫৭-১৫৯)

এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর পুনরাগমনের পর তাঁর মৃত্যুর আগে তৎকালীন সকল আহলে কিতাবই তাঁর বিষয়ে সঠিক জ্ঞানলাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে।

বড় নিদর্শনাদির মধ্যে সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া। যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔

অর্থাৎ, যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য কোনো উপকারে আসবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি। (সূরা আনয়াম : আয়াত ১৫৮)

উপসংহার : কেয়ামত সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেক মুসলমানের এ ব্যাপারে বিশ্বাস রয়েছে। কেয়ামতকে অবিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

■ السُّؤَالُ (٥٦) : مَا الْأَشْرَاطُ الصُّغْرَى لِلسَّاعَةِ؟ بَيِّنْ بِإِيجَازٍ۔

■ প্রশ্ন : ৫৬ ॥ কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[ফা. প. ২০১৭]

او، الاشراط الصغرى للساعة ما هي؟ بين بالايجاز۔

অথবা, কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [ফা. প. '০৮,'১৩,'১৫]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে এর ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। তবে কবে সেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, তা রাব্বুল আলামীন ব্যতীত কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে–

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ـ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ۔

কেয়ামতের সময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জানাননি; কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছু আলামত তথা পূর্বাভাস জানিয়েছেন। ওলামায়ে কেরাম কেয়ামতের এ নিদর্শনগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ১. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট নিদর্শন, ২. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো আলামতে সুগরা। নিম্নে প্রশ্নালোকে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

الْأَشْرَاطُ الصُّغْرٰى لِلسَّاعَةِ :

কেয়ামতের ছোট আলামতসমূহ : রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে কেয়ামতের ছোট নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলো নিম্নরূপ–

১. ইলমে দীন উঠিয়ে নেয়া হবে।
২. মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে।
৪. মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে।
৫. পুরুষ মানুষের সংখ্যা কমে যাবে।
৬. মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে, এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার বিপরীতে একজন পুরুষ হবে।
৭. আলেম তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে।
৮. দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে।
৯. নীচু শ্রেণির লোকেরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক হবে।
১০. অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সকল স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।
১১. ইসলাম শুধু কথায় থাকবে, বাস্তবে আমল হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।
১২. আমানতের খেয়ানতসহ নেফাকের সকল আলামত প্রকাশ পাবে।
১৩. শিরক ও বিদয়াতে দুনিয়া ভরপুর হবে।
১৪. কুরআনের শুধু রসম থাকবে।
১৫. মসজিদসমূহ সুশোভিত হবে, তবে তা থাকবে হেদায়াতশূন্য।
১৬. আল্লাহর যমীনের ওপর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকেরা হবে আলেমগণ, এদের নিকট থেকে ফেতনা বের হবে এবং এদের মাঝেই তা ঘুরাফেরা করবে।
১৭. হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরে যুদ্ধ হতে থাকবে।
১৮. নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে ইত্যাদি।

দলীল : যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

١- إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ-

٢- إِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ-

উপসংহার : কেয়ামতের নির্ধারিত সময় কেবল মহান আল্লাহই জানেন; তবে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হাদীসে বর্ণিত ছোট আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। সুতরাং আমাদেরকে আল কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ অনুসরণ করতে হবে, যাতে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٧) : اَيْنَ يَسْكُنُ الرُّوْحُ بَعْدَ الْمَمَاتِ؟ بَيِّنْ آرَاءَ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ۔

■ প্রশ্ন : ৫৭ ॥ মৃত্যুর পর রূহ কোথায় থাকে? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রূহ সম্পর্কে কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশ্ন উদ্ধৃত করে তার জবাব দিয়ে ইরশাদ করেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

এখন প্রশ্ন হলো, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কোথায় থাকে? নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করা হলো।

حَيْثُ يَسْكُنُ الرُّوْحُ بَعْدَ الْمَمَاتِ :

মৃত্যুর পর রূহ যেথায় থাকে : মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত রূহ কোথায় থাকবে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জান্নাতে থাকবে এবং কাফেরদের রূহ জাহান্নামে থাকবে। কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জান্নাতের প্রাঙ্গণে থাকবে। সেখানেই তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুখ পেতে থাকবে।

ইমাম মালেক (র) বলেছেন, আমার কাছে এমর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, রূহ যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়।

কেউ বলেন, মুমিনদের রূহ জাবিয়া নামক একটি স্থানে আর কাফেরদের রূহ সৌদি আরবের হাযরামাউতের বরহুত নামক একটি কূপে থাকবে।

ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, শহীদগণের রূহ জান্নাতে থাকবে, আর সাধারণ মুসলিমদের রূহ জান্নাতের প্রাঙ্গণে থাকবে।

ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, শহীদদের রূহ একটি সবুজ পাখির মতো হয়ে আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। সেখান থেকেই তারা জান্নাতের বাগানে ঘুরে বেড়াবে।

উপসংহার : রূহের গন্তব্য বা পরিণতি নির্ভর করে ব্যক্তির আমলের ওপর। সে নেককার হলে তার স্থান হবে ইল্লীনে, যেখানে সুখে শান্তিতে বিচরণ করবে। আর বদকার কাফের হলে সিজ্জীনে চির অশান্তি ও আযাবের স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٨) : مَا مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ؟ اِشْرَحْ عَقِيْدَةَ الصِّرَاطِ وَالْحَوْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ۔

■ প্রশ্ন : ৫৮ ॥ আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? সিরাত, হাউয, জান্নাত ও জাহান্নাম, কেয়ামতের পূর্বাভাস বিষয়ক আকিদা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই জীবনই হলো আখেরাত বা পরকাল। সেখানে পাপ পুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণ্যের হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাওযে কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, পরকাল, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, হাউয, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ :

আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ :

ক. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন– কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

খ. مِنْهَاجُ الْمُسْلِم গ্রন্থকার বলেন–

اَلْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ بَعْثًا وَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا لِيُحَاسِبَهُمْ فَيَجْزِى الْاَبْرَارَ بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فِى الْجَنَّةِ وَيَجْزِى الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فِى النَّارِ۔

অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনরায় প্রেরণ করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন।

গ. اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ-এর গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْحِسَابِ وَالْمُجَازَاتِ۔

অর্থাৎ, اَلْاِيْمَانُ بِالْاٰخِرَةِ-এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পর বিচার ও প্রতিদান প্রদানকল্পে পুনরায় জীবন লাভের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৩ بَيَانُ عَقِيْدَةِ الْاَشْيَاءِ الْمَسْئُوْلَةِ :

প্রশ্নোক্ত বিষয়গুলোর আকিদা বিষয়ক বর্ণনা : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে সিরাত, হাউয, জান্নাত, জাহান্নাম ও কেয়ামতের আলামতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এ সকল বিষয়ের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

ক. **সিরাত :** صراط শব্দের অর্থ– পথ। সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত রাস্তা তথা সেতুকে বুঝানো হয়। আখেরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা তথা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে, এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা মুমিনগণের জন্য আবশ্যক। নবী, সিদ্দীক, মুমিন, কাফের, হিসাবকৃত, হিসাবমুক্ত সকলকেই এ সেতু অতিক্রম করতে হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে কৃত আমল অনুযায়ী পথ অতিক্রম করবে।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন–

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا۔

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় গমন করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন।

সিরাত সম্পর্কে মুতাযিলাদের অভিমত : অধিকাংশ মুতাযিলা সিরাত অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে আবু আলী আল জুবায়ী থেকে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তার এক মতে সিরাত সত্য, অন্য মতে সত্য নয়।

মুতাযিলাদের মধ্য হতে আবুল হুযাইল ও বিশর ইবনে মুতামার বলেন, সিরাত হওয়া বৈধ। তবে তা বাস্তবে হবে না।

অস্বীকারকারীদের দলীল : সিরাত অস্বীকারকারীরা আকলী দলীল তথা যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক বলে, সিরাতের গুণ বর্ণনায় হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, তা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়েও ধারালো হবে; অথচ যদি সিরাত এমন হয়, তাহলে তা অতিক্রম করা অসম্ভব। আর অতিক্রম করা সম্ভব হলেও মুমিনদের জন্য তা হবে শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাতের অস্তিত্ব বিবেচ্য নয়।

সত্যপন্থিদের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : সত্যপন্থিরা জবাব প্রদানকল্পে বলেন, আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মহা ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু তিনি পুলসিরাত অতিক্রম করার সামর্থ্য দিতে পারেন। আর তিনি মুমিনদের জন্য তা খুব সহজ করে দেবেন। এমনকি মুমিনদের কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করবে।

খ. হাউয : اَلْحَوْضُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র 'হাউয' দান করেছেন। আর এ হাউয থেকে তাঁর উম্মতরা কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে। ত্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকীদা আত তাহাবিয়া' গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত।

গ. জান্নাত ও জাহান্নাম : জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। নচেৎ কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার বিধান অস্বীকার করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا -

٢- وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ -

ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ الْيَوْمَ لاَ تَفْنِيَانِ اَبَدًا وَلاَ تَمُوْتُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ اَبَدًا وَلاَ يَفْنِىْ عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَثَوَابُهٗ سَرْمَدًا -

অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ দুটি কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হুরগণ কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।

ঘ. কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ : কেয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। যেমন–

১. **এর সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত :** কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ۔

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না, কখন পুনরুত্থিত হবে।

২. **কেয়ামতের পূর্বাভাস :** কেয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানাননি; কিন্তু কেয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলেমগণ কেয়ামতের নিদর্শনগুলোকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। যথা– ক. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট নিদর্শন, খ. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় নিদর্শন। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো–

ক. اَلْعَلَامَاتُ الصُّغْرٰى তথা ছোট নিদর্শন : ছোট পূর্বাভাসের অন্যতম হচ্ছে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন। যেমন সাহাবী হযরত সাহল (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করে বলেন– بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهٖ مِنْ هٰذِهٖ অর্থাৎ, আমি প্রেরিত হয়েছি কেয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি।

এছাড়া হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কেয়ামতের পূর্বে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে অনেক কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি হবে; কিন্তু মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। এসব নিদর্শন প্রকাশের একপর্যায়ে বিশেষ নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে।

খ. اَلْعَلَامَاتُ الْكُبْرٰى তথা বড় নিদর্শন : কেয়ামতের বড় নিদর্শন সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন– اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشَرُ اٰيَاتٍ ... وَنُزُوْلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

অর্থাৎ, দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হলো– ১. পূর্ব দিকে ভূমিধস (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া) ২. পশ্চিম দিকে ভূমিধস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, ৪. ধূম্র, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজূজ মাজূজ, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ। (মুসলিম)

• **উপসংহার :** কেয়ামত, হাউযে কাউসার, সিরাত ও জান্নাত জাহান্নাম এসবই সত্য। এ ব্যাপারে অবিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং অস্বীকারকারীকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٥٩) : بَيِّنْ اَهَمِّيَّةَ الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ ـ ثُمَّ اذْكُرْ اٰثَارَهُ فِى الْمُجْتَمَعِ الْاِنْسَانِىِّ ـ

■ প্রশ্ন : ৫৯ ॥ পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে এর প্রভাব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬]

اَوْ تَكَلَّمْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اذْكُرْ اٰثَارَهُ فِى الْمُجْتَمَعِ الْاِنْسَانِىِّ ـ

অথবা, আখেরাতের ওপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মানবসমাজে এর প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মানুষের পৃথিবীর জীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। মানুষসহ সকল প্রাণীকে মৃত্যুর মাধ্যমে আখেরাত তথা পরকাল নামক আরেকটি জগতে প্রবেশ করতে হবে। পরকালীন এ জগৎ অনন্ত ও অবিনশ্বর। পরকালে মানুষের আমলের ওপর ভিত্তি করে জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যবস্থা হবে। আমল ভালো হলে জান্নাত পাবে আর আমল মন্দ হলে জাহান্নামে যেতে হবে। পরকালকে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং ফরয। আখেরাত তথা পরকালের বিশ্বাস মানবসমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

⊃ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ :

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ : ১. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন– কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামতের আলামত, কেয়ামত, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাউয, সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রোকন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

২. مِنْهَاجُ الْمُسْلِمِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقَ بَعْثًا وَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا لِيُحَاسِبَهُمْ فَيَجْزِى الْاَبْرَارَ بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فِى الْجَنَّةِ وَيَجْزِى الْفُجَّارَ بِالْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, পরকাল হচ্ছে দ্বিতীয় জীবন, যেখানে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করবেন এবং সকলকে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর সৎকর্মশীলদের চিরস্থায়ী জান্নাতে সুখে রাখবেন এবং পাপিষ্ঠদের ঘৃণ্য শাস্তি দ্বারা জাহান্নামে রাখবেন।

৩. اَلْاِسْتِقَامَةُ عَلَى الْاِيْمَانِ গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْحِسَابِ وَالْمُجَازَاتِ ـ

⊃ اٰثَارُ الْاِيْمَانِ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْمُجْتَمَعِ الْاِنْسَانِىِّ :

মানবসমাজে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব : আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানবসমাজকে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রভাবিত করে। নিম্নে কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ সম্পর্কীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো–

১. **ঈমান বিশুদ্ধ হয় :** আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের আকিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমান সঠিক হয় না এবং এটি মুমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ, তারা পরকালের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

২. **কল্যাণকর সমাজ ও মানুষ তৈরি হয় :** পরকালীন বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণকামী করে তুলে। আর যে সমাজের মানুষ কল্যাণকামী হয় সে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ۔

অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো কল্যাণ নেই; কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে কেউ আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে।

৩. **ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ পায় :** ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা হতে পরিত্রাণের অন্যতম মাধ্যম হলো আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আর যে সমাজে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী মানুষ বসবাস করে, সে সমাজ ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা হতে মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا۔

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করবে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

৪. **অহংকারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় :** পরকালে পুরস্কার কিংবা শাস্তি, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা ইহকালের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল। আর এ কথার বিশ্বাসই মানুষকে পার্থিব জীবনে সৎপথের অনুসারী বানায় এবং নেক আমলের পথ ও কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানবমনে সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অসত্য ও অহংকার পরিহার করার মনোভাব সৃষ্টি করে। আর এরূপ মানুষের মাধ্যমে অহংকারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۔

অর্থাৎ, তোমাদের ইলাহ, তিনিই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।

৫. **পার্থিব প্রীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় :** পরকালীন বিশ্বাস মানবমনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে সকল প্রকার পার্থিব লালসা হতে মুক্ত করে তুলে। আর এ ধরনের মানুষের কারণে মানবসমাজ শান্তির নীড়ে পরিণত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী। আর আখেরাতে বিশ্বাসীরা পরকালকে পার্থিব জগৎ হতে উত্তম মনে করে বিধায় তারা অপছন্দ ও অকল্যাণকর বিষয় থেকে মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন- وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰى অর্থাৎ, আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম।

সুতরাং আখেরাত তথা পরকালীন বিশ্বাস মানবসমাজকে কলুষমুক্ত করে নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়ে পরিণত করে।

উপসংহার : আখেরাত তথা পরকাল সত্য। মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালীন জীবনের সূচনা হয়। পরকালীন বিশ্বাস মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সৃষ্টি করে। আর পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী মানুষ হয় অসৎ, অহংকারী ও পথভ্রষ্ট। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকৃত মুমিন হওয়ার মাধ্যমে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٠) : اَثْبِتْ سُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ بِالْاَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ.

■ প্রশ্ন : ৬০ ॥ মুনকার ও নাকীরের সওয়াল জওয়াব অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পার্থিব ও নশ্বর এ জীবন মানবজাতির জন্য চিরন্তন নয়। এ ক্ষণস্থায়ী মায়াময় পৃথিবীর জীবন শেষে মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন কালের সেই ঘোষিত আখেরাত। মৃত্যুর পর পরই কবরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত مُنْكَر ও نَكِيْر নামক দু'জন ফেরেশতা মানুষকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয়।

أَسْئِلَةُ الْمُنْكَرِ وَالنَّكِيْرِ وَالْجَوَابُ عَنْهَا :

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নোত্তর : মুনকার ও নাকীর হচ্ছেন দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা। কবরে রাখার পর মৃতব্যক্তিকে তাঁরা তিনটি মৌলিক প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলো হলো- ১. مَنْ رَبُّكَ তথা তোমার রব কে? ২. وَمَا دِيْنُكَ তথা তোমার দীন কী? ৩. وَمَنْ نَبِيُّكَ তথা তোমার নবী কে?

তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদ্বয় কবরবাসীর সামনে মহানবী (স)-এর আকৃতি উপস্থাপন করে জিজ্ঞেস করবেন- مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ هَلْ تَعْرِفُهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কে? তুমি কি তাকে চিন?

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তরসমূহ : যারা পার্থিব জগতে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, তারা অনায়াসেই সে উত্তর দিতে পারবে। যেমন প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলবে- رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমার রব। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- دِيْنِى الْإِسْلَامُ অর্থাৎ, আমার দীন ইসলাম। তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বলবে- نَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স), অথবা هٰذَا الرَّجُلُ مُحَمَّدٌ (صـ) অর্থাৎ, এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (স)।

পক্ষান্তরে যারা মৃত্যুর পূর্বে পাপাসক্ত ছিল, তারা সে কঠিন প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলবে, هَا هَا لَا أَدْرِىْ অর্থাৎ, হায় হায় আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না।

ٱلْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ لِإِثْبَاتِ الْاِسْتِجْوَابِ :

জিজ্ঞাসাবাদ সাব্যস্তকরণে প্রামাণ্য দলীল : মৃতব্যক্তিকে কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে নকলী দলীল হলো–

১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন–

إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ .... إِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

অর্থাৎ, মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর তার নিকট কৃষ্ণ ও নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটবে। একজনের নাম মুনকার এবং অন্যজনের নাম নাকীর।

আকলী দলীল : যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা মনিব তাঁর কর্মচারী থেকে হিসাব নিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আমাদের মনিব বা প্রভু। তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগ যুগ ধরে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মৃত্যুর পর হিসাব নেবেন না কেন?

মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে, مُنْكَر ও نَكِيْر-এর প্রশ্ন সত্য ও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত; তবে কিছুসংখ্যক مُعْتَزِلَة কবরে مُنْكَر ও نَكِيْر-এর প্রশ্ন অস্বীকার করে।

রাফেযীদের অভিমত : রাফেযী সম্প্রদায়ের মতে, مُنْكَر ও نَكِيْر-এর জিজ্ঞাসাবাদ স্বীকৃত নয়। তাদের মতে, কবরে প্রশ্ন করা হবে না; বরং হাশরে বিচার করা হবে।

উভয়ের দলীল : মুতাযিলা ও রাফেযী উভয় সম্প্রদায়ের দলীল হচ্ছে, মৃতব্যক্তি হলো جَهَاد তথা জড়বস্তুর ন্যায়। এদের জীবন, প্রাণ ও অনুভূতি কিছুই নেই। কাজেই মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া ও প্রশ্ন করা একটি অসম্ভব কাজ।

মুতাযিলা ও রাফেযীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলা ও রাফেযীদের উক্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে আহলে হকগণ বলেন–

১. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ অনুভূতিহীন জড়পদার্থে পরিণত হয় ঠিকই, তবে আত্মা মরে না। আত্মার অমরত্বে সবাই বিশ্বাসী। সুতরাং আত্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২. বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে জড়পদার্থকে আবার জীবন দান করে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৩. আহলে হকদের অভিমত নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মুতাযিলা ও রাফেযীদের যুক্তিনির্ভর দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উপসংহার : অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, মৃত্যুর পর বান্দার পক্ষ থেকে মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সুতরাং আমাদের উচিত সর্বদা তাঁর নির্দেশিত পথেই চলা।

■ اَلسُّؤَالُ (٦١) : اَثْبِتْ بِالْبَرَاهِيْنِ الْبَاهِرَةِ اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَجِبْ عَنِ الْمُنْكِرِيْنَ اِيْجَابًا تَامًّا ـ

■ প্রশ্ন : ৬১ ॥ সুউজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত কর যে, পুনরুত্থান সত্য এবং এর অস্বীকারকারীদের তুমি পূর্ণ জবাব প্রদান কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনই মানবের শেষ জীবন নয়। এ জীবনের পর রয়েছে এক অনন্তকালের মহাজীবন। পার্থিব জীবনের সকল হিসাবনিকাশ দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব ও জিন জাতিকে পুনরুত্থান দিবসে সমবেত করবেন। সকল মৃতকে আবার জীবন দান করবেন। পুনরায় সেই জীবন লাভের নামই بَعْث তথা পুনরুত্থান। এ বিষয়টি আকাইদশাস্ত্রের একটি বিতর্কিত ও দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো।

اَلْبَعْثُ عَلٰى ضَوْءِ الدَّلِيْلِ ⊃ :

দলীলের আলোকে পুনরুত্থান : যুক্তির মানদণ্ডে بَعْث সম্ভব কিনা, এটা عِلْمُ الْعَقَائِدِ-এর একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** هَلْ هُوَ مُحَالٌ عَقْلاً এ মাসয়ালায় اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর মত বর্ণনা করে اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ গ্রন্থকার আল্লামা ওমর নাসাফী (র) বলেন– اَلْبَعْثُ حَقٌّ অর্থাৎ, بَعْث তথা পুনরুত্থান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ও সত্য। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলে অভিহিত করা হবে।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাঁদের মতের পক্ষে আকলী ও নকলী দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

ক. নকলী দলীল : নকলী দলীল হিসেবে তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেন–

١ـ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ـ

٢ـ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ـ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ

٣ـ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

উপরিউক্ত প্রতিটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় بَعْث তথা পুনরুত্থান অবশ্যই হবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

খ. আকলী দলীল : তাঁদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো–

১. মনিব যেমন তাঁর কর্মচারী থেকে কর্মের শেষে হিসাব নিয়ে থাকেন, তেমনি আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মনিব বা প্রভু। তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর বান্দাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব নেবেন। আর হিসাবনিকাশের জন্য অবশ্যই পুনর্জন্ম হতে হবে।

২. আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর নিকট অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কেননা তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। যেমন– كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ, (তিনি বলেন) হয়ে যাও, সাথে সাথেই হয়ে যায়। তাই بَعْث তথা পুনর্জন্ম দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব।

৩. সকল ধর্ম ও মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই পার্থিব কর্মের হিসাবনিকাশে বিশ্বাসী। আর হিসাবনিকাশের জন্য পুনর্জন্ম হতে হবে।

৪. যেহেতু প্রথমবার আল্লাহ কোনো মিসাল তথা মডেল ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, অতএব পুনরায় হুবহু সৃষ্টি করা তো আরো সহজ।

২. **দার্শনিকদের অভিমত :** দার্শনিকগণ بَعْث তথা পুনরুত্থান স্বীকার করে না; বরং তারা বলেন, بَعْث তথা পুনরুত্থান কখনই সম্ভব নয়। কেননা اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ بِعَيْنِهٖ مُمْتَنِعٌ অর্থাৎ, ধ্বংসপূর্ণ বস্তুকে হুবহু পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মৃতের শরীর যেহেতু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাই তাকে আবার জীবিত করা অসম্ভব ব্যাপার।

দার্শনিকদের অভিযোগ : দার্শনিকগণ পরকালীন জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনটি অভিযোগ আরোপ করে থাকে। যথা–

১. اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ অর্থাৎ, অস্তিত্ববিহীন বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

২. কোনো ব্যক্তিকে যদি পশু খেয়ে ফেলে, তবে তাকে কিভাবে পুনর্জীবিত করা হবে?

৩. পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের মতবাদ। সুতরাং ইসলামী আকিদায় পুনর্জন্মের অনুরূপ بَعْث তথা পুনরুত্থান বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অভিযোগের জবাব : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে দার্শনিকদের অভিযোগের জবাব নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হয়–

১. তাঁদের প্রথম অভিযোগের জবাবে বলা হয়– اِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃসৃষ্টি আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। কেননা বলা হয়েছে–
كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ۔

২. দ্বিতীয় অভিযোগের জবাবে বলা হয়– اَجْزَاءِ اَصْلِيَّة দ্বারা بَعْث হবে। আর اَجْزَاءِ مَاْكُوْلَة অতিরিক্ত অংশ।

৩. হিন্দুদের পুনর্জন্ম বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আবার এই জড়জগতেই মানুষ কিংবা জীবজন্তুর বেশে আগমন করে। আমাদের মতে, পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব শরীরে পুনরায় জীবন লাভ করবে। সুতরাং তাদের সাথে আমাদের মতের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. **কতিপয় مُتَكَلِّم-এর অভিমত :** কিছুসংখ্যক مُتَكَلِّم তথা বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য হলো পুনরুত্থান সত্য, তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে তা ঘটবে না; বরং নতুন শরীরে পূর্বের رُوْح প্রদান করা হবে।

দলীল : হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতীদের দেহ পশমহীন হবে এবং জাহান্নামীদের দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে। অতএব বুঝা গেল, পার্থিব জগতের দেহ ও পরকালীন দেহ এক নয়।

প্রত্যুত্তর : হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে হকগণ বলেন, ব্যক্তির শরীরের গুণগত রূপ পরিবর্তন হবে; কিন্তু মূল অঙ্গপ্রতঙ্গ ঠিকই থাকবে।

উপসংহার : মৃত্যুর পর সকলেরই পুনরুত্থান হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এ পুনরুত্থান মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরেই ঘটবে, নতুন করে সৃজিত শরীরে নয়।

■ السُّؤَالُ (٦٢) : هَلِ الْمَعَادُ الْجِسْمَانِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِ اعَادَةِ الْمَعْدُومِ؟ بَيِّنْ بِالْاَدِلَّةِ مَعَ تَرْدِيْدِ الْمُخَالِفِيْنَ ـ

■ প্রশ্ন : ৬২ ॥ শারীরিক পুনরুত্থান কি বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল? বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতঃ দলীল সহকারে বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : এ পার্থিব জীবনের অবসানের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এ বিশ্বাস ঈমানের প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাঁর সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবত করবেন? বিলুপ্ত অস্তিত্বকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে, নাকি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

⊃ هَلِ الْمَعَادُ الْجِسْمَانِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِ اِعَادَةِ الْمَعْدُوْمِ :

শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল কিনা : শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল কিনা, এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. **জমহুর মুতাকাল্লিমীনের অভিমত :** আশায়েরা ও মুতাযিলাদের অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল।

   দলীল : জমহুর কালামশাস্ত্রবিদগণ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ উপস্থাপন করেন–

   ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী– كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

   ২. আল্লাহ তায়ালার অপর বাণী– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

   উপরিউক্ত আয়াত দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

   ৩. আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন– هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ

   ৪. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ

   উপরিউক্ত আয়াত দুটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, عدم তথা বিলুপ্ত অস্তিত্ব থেকে ابداء তথা সৃষ্টির সূচনা হয়েছে। অনুরূপভাবে اعادة তথা পুনরুত্থানও عدم থেকে হবে।

২. **কতিপয়ের অভিমত :** কতেক দার্শনিক, কাররামিয়া, আবুল হোসাইন আল বসরী এবং মুতাযিলাদের থেকে মাহমুদ আল খাওয়ারেযমী বলেন, শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁদের মতে, فَنَاء অর্থ সমূলে বিনষ্ট হওয়া নয়; বরং কোনো কিছুর উলটপালটের মাধ্যমে ধ্বংস হওয়ার পর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকবে।

   দলীল : প্রতিপক্ষ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলীল উপস্থাপন করেন–

   ১. পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে–

   قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ـ

   অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) চারটি পাখি জবাই করে টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে ফেলে পুনরায় ডাক দিলে আল্লাহর কুদরতে

পাখিগুলো জীবিত হয়ে তাঁর নিকট ফিরে আসে। এতে প্রতীয়মান হয়, বস্তু নিঃশেষ হয় না; বরং অংশ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

২. পবিত্র কুরআনে হযরত ওযায়ের (আ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে–

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْىِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ.

অর্থাৎ, এখানে হযরত ওযায়ের (আ) ও তাঁর গাধা একশত বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর তাদের জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। যেখানে হযরত ওযায়ের (আ) ও তাঁর গাধা নিঃশেষ হয়নি। ফলে আয়াতে مَعْدُوْم থেকে জীবিত করা বোঝায় না।

৩. পবিত্র কুরআনে শুষ্ক যমীনকে মৃত বলার দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়।
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

৪. اِعَادَةٌ হলো বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রীকরণ। অতএব তা مَعْدُوْم-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের খণ্ডন : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও জমহুর কালামশাস্ত্রবিদগণ প্রতিপক্ষের পেশকৃত আয়াতদ্বয়ের উত্তরে বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ওযায়ের (আ) সম্পর্কিত ঘটনা দুটি পার্থিব ব্যাপার। অর্থাৎ তা কেবল পার্থিব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা হযরত ইবরাহীম (আ) ও ওযায়ের (আ)-এর অন্তরাত্মার প্রশান্তিসহ মানবমণ্ডলীর সামনে হেদায়াত লাভের নিদর্শন মাত্র। এর ওপর ভিত্তি করে কুরআন মাজীদের অন্যান্য অসংখ্য আয়াত অস্বীকার করা যাবে না, যেগুলোতে সরাসরি مَعْدُوْم থেকে اِعَادَةٌ হবে বলে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় দলীল তথা শুষ্ক যমীনকে মৃত হিসেবে আখ্যায়িত করার উত্তরে বলা হয়, এ উক্তির ভিত্তি اِسْتِعَارَةٌ ও مَجَاز-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালার মোয়ামালাত এবং পারলৌকিক ব্যাপারে এর কোনো বিধান ধর্তব্য নয়।

চতুর্থ দলীলের উত্তরে বলা হয়, اِعَادَةٌ হলো عدم তথা বিলুপ্ত অস্তিত্ব থেকে وُجُوْد তথা অস্তিত্বে আনয়ন করা, বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রীকরণ নয়।

৩. **দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদীদের অভিমত :** জমহুর দার্শনিক এবং জন্মান্তরবাদীগণের মতে– مَعَاد جِسْمَانِى তথা শারীরিক পুনরুত্থান বৈধ নয়।

দলীল : দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদীগণ নিজেদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত আকলী দলীল উপস্থাপন করেন–

১. اِعَادَةٌ হচ্ছে অস্তিত্বে আসা; مَعْدُوْم হওয়ার পর পুনরায় তা অস্তিত্বে আসে। এভাবে হওয়ার কারণেই দ্বিতীয় অস্তিত্বটি প্রথম অস্তিত্বের হুবহু না হয়ে অন্তর্বর্তী عَدَم-এর কারণে এক বিশেষ রূপ লাভ করে।

২. مَعْدُوْم হওয়ার পর وُجُوْد তথা অস্তিত্বে আসতে সময়ের প্রয়োজন। তাই সময়ের কারণেই প্রথম সৃষ্টি হওয়ার পর দ্বিতীয় সৃষ্টিটি اَخَصّ হয়ে যায়। সময়ক্ষেপণের কারণ হওয়ায় এটার হুবহু অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না বলে তা اِعَادَةُ الْمَعْدُوْم হয় না।

দলীলের জবাব : দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদীদের পেশকৃত ভ্রান্ত দলীলের উত্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন,

১. وُجُود এমন একটি জিনিস, যা প্রাথমিক পর্যায়ের এক আকৃতিকে পরবর্তী পর্যায়ে অন্য বিশেষ আকৃতিতে পরিবর্তন ছাড়া বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ وُجُود সর্বাবস্থায় একই থাকে।

২. দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি স্বাভাবিক সৃষ্টির পরিপন্থি, প্রতিপক্ষের একথা মেনে নিলে মৌলিক জিনিসে পরিবর্তন না হওয়ার কারণে উলটপালট মেনে নিতে হয়। ফলে وُجُوْدُ الْمَعْدُوْم তথা অস্তিত্ব বিলুপ্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, যা বিবেকের স্বীকারোক্তি পাওয়ার যোগ্য নয়।

আমাদের নিকট অগ্রগণ্য অভিমত : আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট প্রবল ও সহীহ অভিমত হচ্ছে, শারীরিক পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় মতের পক্ষে দলীল ও বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত দলীল খণ্ডনের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, পুনরুত্থান বিলুপ্ত অস্তিত্বের পুনরুত্থানের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং প্রথমবার মহান আল্লাহ যেভাবে مَعْدُوْم হতে সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় সেভাবেই সৃষ্টি করবেন।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٣) : هَلِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ؟ اُكْتُبْ اِخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ۔

■ **প্রশ্ন : ৬৩ ॥ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত ব্যক্ত কর।** [ফা. প. ২০১২, '১৫]

اَوْ۔ هَلِ الْجَنَّةُ وَجَهَنَّمُ مَوْجُوْدَتَانِ فِى الْحَالِ؟ اُكْتُبْ اِخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ۔

অথবা, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কী? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য লেখ। [ফা. প. ২০১০]

اَوْ هَلِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ؟ اُذْكُرِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ اِيْجَازًا۔

অথবা, বেহেশত ও দোযখ এখন বিদ্যমান আছে কি? আলেমগণের মতপার্থক্য উল্লেখসহ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অন্যদিকে কাফের, মুশরিক ও পাপাচারিদের জন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ جَنَّة ও جَهَنَّم বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ هَلِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُوْدَتَانِ :

জান্নাত ও জাহান্নাম বিদ্যমান আছে কিনা : আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বর্ণনা করে اَلْعَقَائِدُ النَّسَفِيَّةُ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ওমর নাসাফী (র) বলেন–

اَلْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانِ۔

অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এতদুভয় আল্লাহর সৃষ্টি এবং উভয়েই বিদ্যমান আছে। তাদের মতে, جَنَّة ও جَهَنَّم আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই সৃষ্টি করেছেন।

দলীল : ক. নকলী দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিজেদের মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন–

১. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করার পর আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ, (হে আদম!) তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।

২. মুত্তাকীগণের সৎকর্মের প্রতিদানে জান্নাতের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔

৪. মহানবী (স) মিরাজের ভ্রমণে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন–

اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ۔

অর্থাৎ, (মিরাজ রজনীতে) আমি জান্নাত প্রত্যক্ষ করলাম, তখন সেখানে অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দরিদ্রগণকে দেখলাম এবং আমি জাহান্নাম অবলোকন করলাম, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরূপে মহিলাগণকে দেখলাম।

৫. হাদীসের ভাষ্য–

حَدِيْثُ اَنَسٍ فِىْ قِصَّةِ لَيْلَةِ الْاِسْرَاءِ - وَفِىْ اٰخِرِهٖ قَالَ النَّبِىُّ (صـ) ثُمَّ انْطَلَقَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتٰى سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهُمَا الْذَانِ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ قَالَ (صـ) ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا هِىَ .... الخ۔

খ. আকলী দলীল : যুক্তির নিরিখেও আমরা সুস্পষ্টরূপে বলতে পারি, جنة ও جهنم এখন বিদ্যমান আছে। কেননা–

১. মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জান্নাতে রেখেছেন। কাজেই এখন জান্নাত বিদ্যমান আছে। আর নবী করীম (স) মিরাজ রজনীতে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। কাজেই জাহান্নাম এখন বিদ্যমান আছে।

২. সৎকর্মপরায়ণ কবরবাসীর শান্তির জন্য কবরের সাথে জান্নাতের সংযোগ সৃষ্টি করা হয়, তা জান্নাতের একটি উদ্যানে পরিণত হয়। তদ্রূপ পাপীদের কবরে জাহান্নামের সংযোগ সৃষ্টি করায় তা অশান্তির গহ্বরে পরিণত হয়; যাতে সাপ-বিচ্ছু থাকে (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ)। যেমন হাদীসে এসেছে–

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ۔

সুতরাং প্রমাণিত হলো– جَنَّة ও جَهَنَّم এখন বিদ্যমান আছে।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তবে বর্তমানে তা বিদ্যমান নেই; বরং বিচার দিবসে সৃষ্টি করা হবে।

দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলগুলো পেশ করে থাকে–

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ; অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, جَنَّة-এর প্রশস্ততা হবে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়। অতএব পৃথিবীতে বর্তমানে جَنَّة ও جَهَنَّم-এর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। তাই পৃথিবী ধ্বংসের পরই কেবল جَنَّة ও جَهَنَّم সৃষ্টি করা সম্ভব।

২. মহান আল্লাহর বাণী–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ

এ আয়াতে نَجْعَل-এর মধ্যে فِعْل مُضَارِع ব্যবহার করায় বোঝা যাচ্ছে– جَنَّة পরকালে সাজানো হবে। বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

৩. মুতাযিলা সম্প্রদায় আরো বলেন, আল্লাহর বাণী– اُكُلُهَا دَائِمٌ দ্বারা বোঝা যায়, جَنَّة-এর ফলফলাদি সর্বদা বিদ্যমান থাকবে; অথচ আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছুই কেয়ামতের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ; সুতরাং এতে বোঝা গেল, জান্নাতের সৃষ্টি কেয়ামতের পরে হবে।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. اَهْلُ الْحَقّ তথা সত্যপন্থিগণ মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তরে বলেন, আকাশ ও যমীনের পাশাপাশি এর সমতুল্য আরেকটি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করা মহান আল্লাহর জন্য কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। যেমন তিনি বলেন– وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ; তিনি হলেন– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ; সুতরাং মুতাযিলাদের এ মন্তব্য অবান্তর।

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, فِعْل مُضَارِع-এর সীগাহ দ্বারা অনেক সময় حَال বা اِسْتِمْرَارِى-এর অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন– يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

৩. তাঁদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে اَهْلُ الْحَقّ তথা সত্যপন্থিগণ বলেন, اُكُلُهَا دَائِمٌ-এর অর্থ যদি এটা নেয়া হয় যে, সর্বদা বিদ্যমান তথা অক্ষত থাকবে, তাহলে اَهْلُ الْجَنَّاتِ খাবে কী? সুতরাং এর অর্থ হবে– اَهْلُ الْجَنَّاتِ তথা জান্নাতের অধিবাসীগণ খেতে খেতে ফলফলাদি নিঃশেষ করে ফেলবে, তা আবার পূর্ণ করে দেয়া হবে।

৩. **দার্শনিকদের অভিমত :** ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী কিছুসংখ্যক দার্শনিকের মতে, জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ভবিষ্যতেও হবে না।

দার্শনিকের বক্তব্যের জবাব : দার্শনিকদের এ বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা جَنَّة ও جَهَنَّم-কে অস্বীকার করা মানে আল্লাহকেই অস্বীকার করা।

উপসংহার : জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্য। এতদুভয় এখন বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

■ السؤال (٦٤) : اثبت حقيقة الوزن والكتاب والصراط والحوض بالأدلة الواضحة ـ
■ প্রশ্ন : ৬৪ ॥ সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওজন, কিতাব, সিরাত এবং হাউযে কাউসার সত্য। [ফা. প. ২০১৪]
او هل الحوض والكوثر سواء؟ بين الحوض الكوثر بالتفصيل ـ
অথবা, হাউয ও কাউসার একই বস্তু কিনা? হাউযে কাউসার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। যে জীবনের শুরু আছে, পরিসমাপ্তি নেই; সে জীবনই হলো পরকাল। সেখানে পাপপুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা হাউযে কাউসারের পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। নিম্নে প্রশ্নালোকে আমলের পরিমাপ, আমলনামা, পুলসিরাত ও হাউযে কাউসার সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

১ الوزن حق :

আমলের ওজন সত্য : মৃত্যুর পর পরকাল তথা কেয়ামত দিবসে মানুষের কৃতকর্মের পরিমাপ করা সম্ভব বা সত্য কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়ালা জামায়াতের মতে, الوزن حق অর্থাৎ, কৃতকর্মের পরিমাপ করা সত্য। মহান আল্লাহ মীযানের মাধ্যমে মানুষের আমলের পরিমাপ করবেন। আর মীযান বলা হয় عما يعرف به مقادير الاعمال অর্থাৎ, এমন যন্ত্র যার দ্বারা আমলের পরিমাণ জানা যায়। অবশ্য এর ধরন তথা প্রকৃতি মানবজ্ঞান বহির্ভূত।

দলীল : আল্লাহ তায়ালা আমলের ওজনের সত্যতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

١ـ الوزن يومئذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ـ

٢ـ فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ـ

এছাড়াও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, পরিমাপের জন্য দুটি পাল্লা ও একটি দাঁড়ি থাকবে, এক পাল্লায় পুণ্য ও অপর পাল্লায় পাপ রাখা হবে। ব্যক্তির নেকের পাল্লা ভারী হলে বেহেশতে এবং পাপের পাল্লা ভারী হলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো পরকালে আমলের ওজন করা হবে এটা সত্য নয়; বরং এটা অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার।

দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে থাকে–

১. আমলসমূহ হচ্ছে কায়াবিহীন বস্তু। যার শরীর নেই, অস্তিত্ব নেই, তাকে কিভাবে ওজন করা হবে?
২. আল্লাহ তায়ালা সকল আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। আল্লাহর জ্ঞানে থাকা বস্তুকে আবার পরিমাপ করা অর্থহীন।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মুতাযিলাদের দলীলের উত্তরে বলেন–

১. ان كتاب الاعمال هى التى توزن অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমলসমূহের কিতাব ওজন করা হবে। হাদীসের এ উক্তির আলোকে বলতে হবে, আমলনামা ওজন করা হবে এতে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

২. আমলের পরিমাপ করার মধ্যে মহান আল্লাহর হেকমত নিহিত রয়েছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা- فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة সুতরাং আমাদের বোধগম্য না হলেও সে বিষয়কে অবাস্তব মনে করা উচিত নয়।

৩ الكتاب حق :

কিতাব সত্য : পরকালীন জীবনে মানুষের আমলনামা তথা কিতাব সত্য হওয়া সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হলো- الكتاب حق তথা কিতাব সত্য। যাতে মানুষের সৎকর্ম ও অসৎ কর্মসমূহের খতিয়ান লিপিবদ্ধ থাকবে। আর এ আমলনামা মুমিনদের ডান হাতে এবং কাফেরদের বাম হাতে ও পশ্চাৎ দিক থেকে দেয়া হবে।

দলীল : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

١. ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا.

٢. فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.

٣. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

২. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো- ان الكتاب عبث তথা কিতাব হলো নিরর্থক; পরকালীন জীবনে কিতাব বলতে কিছুই প্রদান করা হবে না।

দলীল : মুতাযিলাদের যুক্তি হলো, মানুষের আমলের যেহেতু কোনো দেহ নেই, সেহেতু তাকে সংরক্ষণ করে কিতাব আকারে প্রদান করাও অনর্থক ব্যাপার। সুতরাং কিতাব তথা আমলনামা বৃথা।

মুতাযিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে মুতাযিলাদের দলীলের উত্তরে বলা হয়, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যভিত্তিক হয় না। আর যদি এটা মেনে নেয়া হয়, তার কার্যাবলি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, কিতাব তথা আমলনামা প্রদানের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহাকৌশল বিদ্যমান, যা আমাদের চিন্তার বাইরে। সুতরাং কিতাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয়।

৩ الصراط حق :

সিরাত সত্য : জাহান্নামের ওপরে অবস্থিত দীর্ঘ সেতু তথা সিরাত সত্য হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো- الصراط حق অর্থাৎ, সিরাত সত্য। এটি এমন পুল, যা জাহান্নামের ওপর নির্মিত। যার দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান। যা চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তা পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। এটা বাস্তব সত্য। এতে কোনো সংশয় নেই।

দলীল : তাঁরা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন- وان منكم الا واردها অর্থাৎ, "তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে।" আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ সুদীর্ঘ পথ পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে। পুণ্যবানরা সহসাই পার হয়ে যাবে আর পাপীরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

২. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য নয়। তারা উল্লিখিত صِرَاط-কে صِرَاط مُسْتَقِيْم দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো–

১. لَا يُمْكِنُ الْعُبُوْرُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

২. وَاِنْ اَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয় তবুও এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্বীকারকারী মুতাযিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সব কিছুর ওপর শক্তিমান। সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত মুমিনদের জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার।

এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো মুমিন বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ কেউ আবার প্রবল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উক্ত সিরাত পার হয়ে যাবে।

اَلْحَوْضُ وَالْكَوْثَرُ حَقٌّ ৩ :

হাউয ও কাউসার সত্য :

১. **হাউয :** اَلْحَوْضُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– চৌবাচ্চা, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একটি পবিত্র হাউয দান করেছেন। আর এ হাউয থেকে তাঁর উম্মত কেয়ামত দিবসে পানি পান করবে।

اَلْحَوْضُ يُطْلَقُ عَلَى الْكَوْثَرِ هُوَ حَوْضٌ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ يَسْقِى الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْهُ۔

অর্থাৎ, اَلْحَوْضُ হচ্ছে اَلْكَوْثَرُ আর সেটা জান্নাতের সম্মুখে একটি কূপ, যা হতে মুমিনগণ পানি পান করবেন।

ত্রিশেরও অধিকসংখ্যক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবুল ইযয হানাফী 'শারহুল আকিদা আত তাহাবিয়া' গ্রন্থে বলেন, হাউয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলো বর্ণিত। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক তাঁর বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি দলীল পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন–

اِنَّ قَدْرَ حَوْضِىْ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ۔

অর্থাৎ, আইলা থেকে ইয়েমেনের সানয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব, আমার হাউযের পরিমাণ তদ্রূপ। তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়।

খ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) অন্যত্র বলেন–

بَيْنَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اِذَا اَغْفٰى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ .....)

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝে ছিলেন। তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। এরপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠান। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার ওপর একটি সূরা নাযিল করা হলো। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহসহ সূরা কাউসার পাঠ করেন।

গ. অন্য হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبْ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথ এবং এর সকল কোণ সমান। আর এর পানি দুধের চেয়েও শুভ্র ও মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায়। যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

২. **কাউসার :** كَوْثَر শব্দটি فَوْعَل-এর ওযনে مُبَالَغَة-এর শব্দ, যা كَثُرَ বা كَثْرَة শব্দ হতে নিষ্পন্ন। كَوْثَر শব্দের আভিধানিক অর্থ– বিপুল হওয়া, অধিক হওয়া, সীমাহীন মঙ্গল, অধিক কল্যাণ ইত্যাদি।

كَوْثَر দ্বারা উদ্দেশ্য : كَوْثَر দ্বারা কী উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জালালাইনের ভাষ্য হলো–

اَلْكَوْثَرُ اَلْخَيْرُ الْكَثِيْرُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْقُرْاٰنِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحْوِهَا ـ

অর্থাৎ, কাউসার হলো সীমাহীন কল্যাণ, (যা মহানবী স.-কে দান করা হয়েছে)। যেমন– নবুয়ত, আল কুরআন, শাফায়াত ইত্যাদি।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, পরকালে পবিত্র কুরআনের শারীরিক রূপই হবে হাউযে কাউসার।

৩. ইবনুল মুনযির ও দাহহাক (র)-এর মতে, কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর।

৪. ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, কাউসার হলো আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ।

৫. হাউযে কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর, যা রাসূল (স)-কে দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মহল্লী (র) সত্তরটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৬. কেউ কেউ বলেন, কাউসার শব্দটির অর্থ হাউযে কাউসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও নেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা যায়।

اَلْحَوْضُ وَالْكَوْثَرُ سَوَاءٌ اَمْ لَا :

হাউয ও কাউসার এক বস্তু কিনা : গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হাউয ও কাউসার উভয়টি একই বস্তু; কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, উভয়টি এক বস্তু নয়; বরং পৃথক বস্তু। কেননা হাউয হাশরের মাঠে আর কাউসার জান্নাতে বেহেশতবাসীরা লাভ করে থাকবে।

উপসংহার : একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আখেরাতের জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে মীযান, সিরাত এবং হাউযে কাউসারের সম্মুখীন হতে হবে। এ বিশ্বাসকে সামনে রেখেই একজন মুমিন ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনে সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে হবে। নতুবা কাফের শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٥) : هَلِ الصِّرَاطُ حَقٌّ اَمْ لاَ؟ أَوْضِحْ اِخْتِلاَفَ الْعُلَمَاءِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ـ

■ **প্রশ্ন : ৬৫ 'সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৭]

اَوْ هَلِ الصِّرَاطُ حَقٌّ اَمْ لاَ؟ حرر الْخِلاَف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ـ

অথবা, সিরাত বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১১]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে মানুষ আরেকটি অনন্ত মহাজগতে প্রবেশ করবে। সেখানে প্রত্যেকটি মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হবে। তন্মধ্যে একটি হলো পুলসিরাত। প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

الصِّرَاطُ حَقٌّ اَمْ لاَ :

পুলসিরাত বাস্তব কিনা : জাহান্নামের উপর অবস্থিত দীর্ঘ সেতু তথা সিরাত বাস্তব কিনা, এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো– اَلصِّرَاطُ حَقٌّ অর্থাৎ, পুলসিরাত সত্য। এটি এমন পুল যা জাহান্নামের ওপর নির্মিত। যার দৈর্ঘ্য ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তার সমান। যা চুলের চেয়ে চিকন ও তলোয়ারের চেয়েও ধারালো, তা পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। এটা বাস্তব সত্য। এতে কোনো সংশয় নেই।

দলীল : তাঁরা স্বীয় মতের পক্ষে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন– وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا অর্থাৎ, তোমাদের সকলকেই তা অতিক্রম করতে হবে। আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা হলো পুণ্যবান হোক আর পাপী হোক সকলকেই এ সুদীর্ঘ পথ পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে। পুণ্যবানরা সহসাই পার হয়ে যাবে আর পাপীরা নিমজ্জিত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

২. **মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো সিরাত সত্য নয়। তারা উল্লিখিত صراط-কে صراط مُسْتَقِيْم দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

দলীল : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো–

১. لاَ يُمْكِنُ الْعُبُوْرُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, এ পুল পার হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

২. وَاِنْ اَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদিও পার হওয়া সম্ভব হয়, তবুও এটা মুমিনদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং সিরাত পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : আহলে হকদের পক্ষ থেকে সিরাত অস্বীকারকারী মুতাযিলাদের বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সবকিছুর ওপর শক্তিমান। সুতরাং তিনি মুমিনদেরকে এটা পার হওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত মুমিনদের জন্য এটা হবে একটা অতি সহজ ব্যাপার।

এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো মুমিন বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ কেউ আবার প্রবল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় উক্ত সিরাত পার হয়ে যাবে।

উপসংহার : আখেরাতের জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে, সিরাত তথা জাহান্নামের ওপর নির্মিত তীক্ষ্ণ ও ধারালো পথ অতিক্রম করতে হবে। এ বিশ্বাসকে সামনে রেখেই একজন মুমিন ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনের সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে হবে। অন্যথায় কাফের হিসেবে পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٦) : اُكْتُبْ مَعْنَى الشَّفَاعَةِ وَاَقْسَامَهَا مُفَصَّلًا۔

■ **প্রশ্ন : ৬৬ ॥ শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ।** [ফা. প. ২০১৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : শাফায়াতের বিষয়টি সত্য। কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। শাফায়াত ইসলামী আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এর পরিচয় ও প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো।

⊃ شَفَاعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً :

شَفَاعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّفَاعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার, যা اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। এর অর্থ জোড় বা জোড়া বানানো। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

আর اَلشَّفَاعَةُ শব্দের আভিধনিক অর্থ হচ্ছে-

১. সুপারিশ করা। যথা- مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

২. اَلضَّمُّ তথা মিলিত করা। যথা- كَانَ وِتْرًا فَشَفَعَهٗ بِاٰخَرَ

৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ গ্রন্থকার বলেন- اَلشَّفَاعَةُ كَلَامُ الشَّفِيْعِ অর্থাৎ, সুপারিশকারীর বক্তব্য হলো শাফায়াত।

৪. কেউ কেউ বলেন- اَلشَّفَاعَةُ التَّوَسُّلُ

৫. ইংরেজীতে বলা হয়- Intercession, Mediation, Advocacy ইত্যাদি।

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ شَرْعًا :

شَفَاعَة-এর শরয়ী অর্থ : শাফায়াতের শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. আল্লামা ইবনুল আমীর বলেন-

وَالشَّفَاعَةُ يَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَهِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ وَالْجَرَائِمِ۔

অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক তথা আখেরাতের বিষয়ে। এর অর্থ হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা।

২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন-

هِىَ تَوَسُّلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ اِلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْمُذْنِبِيْنَ لِاِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِىْ يَوْمِ الْحِسَابِ۔

অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করা।

৩. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন-

اَلشَّفَاعَةُ الْاِنْضِمَامُ اِلٰى اٰخَرَ نَاصِرًا لَهٗ وَسَائِلًا عَنْهُ۔

অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত।

৪. اَلْمُفْرَدَاتُ فِىْ غَرِيْبِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থকার বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ اَنْ يَشْرَعَ الْاِنْسَانُ لِلْاٰخَرِ طَرِيْقَ خَيْرٍ اَوْ طَرِيْقَ شَرٍّ فَيَقْتَدِىْ بِهٖ ـ

৫. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন–

هِىَ السُّؤَالُ فِى التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِىْ وَقَعَ الْجِنَايَةُ فِىْ حَقِّهٖ ـ

অর্থাৎ, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য উচ্চপদস্থ লোকের নিকট অনুরোধ করাকে شَفَاعَة বলে।

৬. কতিপয় মনীষী বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ فِى الْاِصْطِلَاحِ دَفْعُ الْعُقُوْبَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوُزِ عَنِ الذَّنْبِ ـ

অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া।

اَقْسَامُ الشَّفَاعَةِ :

শাফায়াতের প্রকারভেদ : আল্লামা ইমাম নবুবী (র) বলেছেন– شَفَاعَة মোট পাঁচ প্রকার। যথা–

১. اَلشَّفَاعَةُ الْكُبْرٰى لِلْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : হাশরের ময়দানে ভীতিজনক অবস্থা দেখে হিসাবনিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য এ ধরনের সুপারিশ করা হবে। এটা শুধু আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর জন্য বিশেষত্ব। তিনি ছাড়া এ জাতীয় সুপারিশ আর কেউ করতে পারবে না।

২. اَلشَّفَاعَةُ لِاِدْخَالِ قَوْمٍ فِى الْجَنَّةِ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ। এটা কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য খাস।

৩. اَلشَّفَاعَةُ لِقَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য সুপারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে পড়েছে। এটা নবী (স)-এর জন্য নির্ধারিত।

৪. اَلشَّفَاعَةُ لِزِيَادَةِ الدَّرَجَةِ فِى الْجَنَّةِ : জান্নাতে বেহেশতবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা।

৫. اَلشَّفَاعَةُ بِاِخْرَاجِ الْمُدْخَلِيْنَ مِنَ النَّارِ : ঐ সকল অপরাধী মুমিনের জন্য সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। এ ধরনের সুপারিশ নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকগণ করতে পারবেন।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের সাথে আরো তিন প্রকার শাফায়াত হচ্ছে–

৬. রাসূল (স) কর্তৃক তাঁর উম্মতের মাঝে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করা।

৭. অবধারিত শাস্তিকে কিছুটা হালকা করার জন্য সুপারিশ করা। যেমন– রাসূল (স)-এর চাচা আবু তালিবের জন্য তাঁর সুপারিশ করা।

৮. রাসূল (স) কর্তৃক তাঁর সকল মুমিনের জন্য সুপারিশ করা।

উপসংহার : বিচার দিবসে আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে নবী, রাসূল ও পুণ্যবান বান্দাদের শাফায়াতে কতিপয় গুনাহগার বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

■ السُّؤَالُ (٦٧) : تَحَدَّثْ عَنْ شَفَاعَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ ـ هَلْ هِيَ ضَرُوْرِيَّةٌ لِلنَّجَاةِ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ ـ

■ প্রশ্ন : ৬৭ ॥ উম্মতের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা কর। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

اَوْ حَدِّثْ عَنِ الشَّفَاعَةِ ـ هَلْ شَفَاعَةُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرُوْرِيَّةٌ لِلنَّجَاةِ اَمْ لَا؟ أَثْبِتْ بِالدَّلَائِلِ ـ

অথবা, শাফায়াতের সংজ্ঞা দাও। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১১, '১৫]

اَوْ مَا مَعْنَى الشَّفَاعَةِ؟ هَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكَبَائِرِ؟

অথবা, শাফায়াত অর্থ কী? কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূল এবং সৎকর্মশীলগণের সুপারিশ সাব্যস্ত হবে কি? [ফা. প. ২০০৭,'০৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা শাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণিত। কেয়ামতের দিন নবী রাসূল ও অন্যান্য কতিপয় লোককে মহান আল্লাহ কতিপয় পাপী বান্দার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন; তবে নবী রাসূলগণ এবং সৎকর্মশীলদের সুপারিশ اَهْلُ الْكَبَائِرِ-দের জন্য কার্যকর হবে কিনা, নিম্নে এ বিষয়টি প্রশ্নালোকে উপস্থাপন করা হলো।

১ شَفَاعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ لُغَةً :

شَفَاعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّفَاعَةُ শব্দটি اِسْمِ مَصْدَر; এটি বাবে فَتَحَ-এর অন্তর্গত এবং اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন– ১. সাহায্য করা, ২. সুপারিশ করা, ৩. সহানুভূতি করা। শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Intercession, Mediation ইত্যাদি।

مَعْنَى الشَّفَاعَةِ اِصْطِلَاحًا :

شَفَاعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শাফায়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন–

وَالشَّفَاعَةُ تَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوْبِ وَالْجَرَائِمِ ـ

অর্থাৎ, শাফায়াত শব্দটি এসেছে জাগতিক তথা আখেরাতের বিষয়ে। এর অর্থ হলো পাপ তথা অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা।

২. আল্লামা মুকাতিল (র) বলেন–

هِيَ تَوَسُّلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ اِلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمُذْنِبِيْنَ لِاِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ يَوْمِ الْحِسَابِ ـ

অর্থাৎ, শাফায়াত হলো বিচারের দিন পাপী তথা অপরাধী লোকদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি দেয়ার জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণ কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করা।

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ اَلْاِنْضِمَامُ اِلَى اٰخَرَ نَاصِرًا لَهُ وَسَائِلًا عَنْهُ ـ

অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যার্থে ও তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হওয়ার নামই শাফায়াত।

৪. কতিপয় মনীষী বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ فِى الْاِصْطِلَاحِ دَفْعُ الْعُقُوْبَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوُزِ عَنِ الذَّنْبِ۔

অর্থাৎ, পরিভাষায় শাফায়াত বলা হয় শাস্তি রহিত করা ও গুনাহ হতে পরিত্রাণ চাওয়া।

শাফায়াতের নামকরণের কারণ : শাফায়াতকে শাফায়াত নামকরণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে– سُمِّيَتِ الشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً لِاَنَّ الْحَاجَةَ كَانَ وِتْرًا فِىْ ضَمِيْرِ مُشْفَعًا بِالشَّفِيْعِ অর্থাৎ, শাফায়াতকে শাফায়াত নামকরণের কারণ হলো, প্রয়োজন প্রথমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল তারপর شَفِيْعِ-এর দ্বারা مُشَفَّعِ তথা যুগলকেন্দ্রিক হয়েছে।

هَلِ الشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ :

কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ সাব্যস্ত কিনা : কুরআন ও হাদীসের আলোচনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও খারেজী ও মুতাযিলা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্প্রদায় কবীরা গুনাহে লিপ্তদের জন্য নবীর বা অন্যদের শাফায়াত অস্বীকার করে। আলোচ্য মাসয়ালায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং অন্যান্যের মতামত উল্লেখ করা হলো।

ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন–

১. জমহুর আলেম বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ اَوِ الصَّالِحِيْنَ فِىْ حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ۔

অর্থাৎ, কবীরা গুনাহে লিপ্তদের পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য নবী রাসূল ও নেক বান্দাগণের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অবকাশ রয়েছে।

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ الْعِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ۔

অর্থাৎ, পাপী মুমিনগণ ও কবীরা গুনাহকারীদের জন্য পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন আমাদের নবী (স)-এর শাফায়াতও সত্য।

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন–

اَلشَّفَاعَةُ الَّتِىْ اِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ لِمَا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ۔

অর্থাৎ, শাফায়াত সত্য যা আপন উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

দলীল : কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফায়াত গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নিম্নোক্ত দলীল প্রদান করেছেন–

১. **কুরআনভিত্তিক দলীল :** আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

١۔ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

٢۔ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ۔

২. **হাদীসভিত্তিক দলীল :** রাসূল (স) বলেন–

شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النُّبُوَّةُ وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ۔ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا الْخَيْرَ قَطُّ۔

পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় কবীরা গুনাহকারীদের জন্য شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য এবং নবী রাসূল ও সৎকর্মশীলগণের শাফায়াত মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

৩. **ইজমাভিত্তিক দলীল :** شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদগণের ইজমা রয়েছে।

৪. **কেয়াসভিত্তিক দলীল :** যেহেতু شِرْك ব্যতীত কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত (يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ), সেহেতু সুপারিশের মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দেয়া যুক্তিযুক্ত।

খ. জমহুর মুতাযিলার অভিমত : জমহুর মুতাযিলার মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ কবীরা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ কেবল পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে।

গ. কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজীদের অভিমত : কতিপয় ভ্রান্ত মুতাযিলা ও খারেজী এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো- لَا شَفَاعَةَ لِتَخْصِيْصِ الْيَوْمِ الْجَزَاءِ

বিচার দিবসে অপরাধীর মুক্তির জন্য شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য নয়। তারা নবী রাসূল ও পুণ্যবান কর্তৃক পাপীর জন্য সুপারিশ অস্বীকার করেছে।

দলীল : তাদের দলীলগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা-

১. **কুরআনভিত্তিক দলীল :** তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন-

١- وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ـ

٢- وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ ـ

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : বস্তুত এ সকল আয়াতে شَفَاعَة অস্বীকার করা হয়নি; বরং শাফায়াত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

২. **হাদীসভিত্তিক দলীল :** তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো-

١- مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ ـ

٢- يَا عَبْدَ مَنَافٍ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর :

ক. لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ দ্বারা شَفَاعَة বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে।

খ. لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا একইভাবে এর দ্বারাও شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য নয়, এটা উদ্দেশ্য নয়।

৩. **মতবাদভিত্তিক যুক্তি :** তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না।

প্রত্যুত্তর : এ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। মহান আল্লাহর বাণী- وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত; তবে কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নবী রাসূল ও পুণ্যবানগণের شَفَاعَة মহান আল্লাহর অনুমতি দ্বারা গৃহীত।

هَلْ شَفَاعَةُ الرَّسُوْلِ (صـ) ضُرُوْرِيَّةٌ لِلنَّجَاةِ :

নাজাতের জন্য রাসূলের শাফায়াত অপরিহার্য কিনা : শাফায়াতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অভিমত হলো– اَلشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ وَ الصَّالِحِيْنَ فِىْ حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ, কবীরা গুনাহগারদের পাপ মোচনের জন্য নবী রাসূল ও নেক বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অবকাশ রয়েছে; তবে পাপী বান্দাগণের নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত বা সুপারিশ অপরিহার্য কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. **আবু হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَلِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ الْعِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ۔

অর্থাৎ, এমন পাপী মুমিন ও কবীরা গুনাহকারী পাপের কারণে যাদের ওপর জাহান্নাম অবধারিত, তাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (স)-এর শাফায়াত সত্য ও প্রমাণিত।

দলীল : কবীরা গুনাহকারীদের জন্য রাসূল (স)-এর অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে দলীল হলো রাসূল (স)-এর বাণী– ١۔ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ۔

٢۔ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবীরা গুনাহকারীদের নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য।

২. **মুতাযিলাদের অভিমত :** জমহুর মুতাযিলার মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ কবীরা গুনাহকারীদের শাস্তি রহিত করার জন্য নয়; বরং তার সুপারিশ কেবল পুণ্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে।

৩. **কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজির অভিমত :** পথহারা ভ্রান্ত মতাবলম্বী মুতাযিলা ও খাওয়ারিজ এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকাদের অভিমত হলো–

لَا شَفَاعَةَ لِتَخْلِيْصِ يَوْمِ الْجَزَاءِ۔

অর্থাৎ, বিচার দিবসে নাজাতের জন্য شَفَاعَة গ্রহণযোগ্য নয়। তারা পাপীর জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ অস্বীকার করে।

দলীল : তাদের দলীলগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. **কুরআনভিত্তিক দলীল :** তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মাধ্যমে দলীল পেশ করেন–

١۔ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔

٢۔ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ۔

٣۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ۔

٤۔ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ۔

জবাব : বস্তুত এ সকল আয়াতে شَفَاعَة অস্বীকার করা হয়নি; বরং শাফায়াত বিষয়ে মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

খ. **হাদীসভিত্তিক দলীল :** তাদের হাদীসভিত্তিক দলীল হলো–

١۔ مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ۔

٢۔ يَا عَبْدَ مَنَافٍ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔

আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব :

ক. لم ينل شفاعتى-এর দ্বারা شفاعة বোঝানো হয়নি; বরং কেয়ামতের ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে।

খ. لا املك لكم من الله شيئا একইভাবে এর দ্বারাও شفاعة গ্রহণযোগ্য নয়, এটা উদ্দেশ্য নয়।

গ. **মুতাযিলাদের আকলী দলিল :** তাদের মতে, পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। কাজেই আল্লাহ নিজের রহমতে বা অন্য কারো শাফায়াতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না।

জবাব : এ বক্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পাপীকে ক্ষমা করে দেয়া প্রমাণিত। মহান আল্লাহর বাণী– ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

আমাদের সিদ্ধান্ত : কুরআন সুন্নাহভিত্তিক ইমাম আবু হানীফার মতামতই গ্রহণযোগ্য এবং এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

উপসংহার : মহান আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে রাসূল (স) মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি থেকে কবীরা গুনাহকারীদের নাজাতের জন্য شفاعة করবেন। মুশরিকরা এ শাফায়াতকে অস্বীকার করে মূলত মহান আল্লার সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

■ **السؤال (٦٨) : متى تقع واقعة الساعة؟ وما اشراط الساعة؟ بين بالايجاز۔**

■ **প্রশ্ন : ৬৮ ॥ কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৪]

او ما القيامة ومتى تنعقدها؟ بين اشراطها بالدلائل۔

অথবা, কেয়ামত কী এবং কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রমাণসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণ্যের হিসাব দিতে হবে। কেয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

➲ **تعريف القيامة :**

কেয়ামতের পরিচয় : কেয়ামত (القيامة)-এর আভিধানিক অর্থ– দাঁড়ানো, উঠা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়– যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ) এ মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের অধিকারীদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, মানুষ কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে এবং বিচার ফয়সালার জন্য বিশালাকায় মাঠে সমবেত হবে। মহাপ্রলয়ে আকাশ ও দুনিয়ার সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ তুলার মতো উড়তে থাকবে। সে মহাপ্রলয় হলো কেয়ামত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ـ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ـ

➲ **وقت وقوع القيامة :**

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর বয়স কত হবে, কখন কেয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআনুল কারীমে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন–

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ـ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً ـ يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ـ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন ঘটবে? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা হবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের ওপর আসবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের (গাইবের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না কখন পুনরুত্থিত হবে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ـ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ـ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ـ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ـ

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে? কেয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট। যে তা ভয় করে, তুমি কেবল তার সতর্ককারী।

ͻ العَلاَمَاتُ الْكُبْرٰى لِلْقِيَامَةِ :

কেয়ামতের বড় আলামতসমূহ : কেয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনাদি প্রকাশিত হওয়ার পর আরো কিছু বড় নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার কথা রাসূল (স) বলেছেন। সাহাবী হোযায়ফা ইবনে উসায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা কী বিষয়ের আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কেয়ামতের আলোচনা করছি। তিনি বললেন–

إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُوْنُ حَتّٰى تَكُوْنَ عَشْرُ اٰيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدْنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

অর্থাৎ, দশটি আয়াত বা নিদর্শন সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। যথা– ১. প্রাচ্যে কোথাও ভূমিধস হওয়া, ২. পাশ্চাত্যের কোথাও ভূমিধস হওয়া, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হওয়া, ৪. ধোঁয়া, ৫. দাজ্জাল, ৬. ভূমির প্রাণী, ৭. ইয়াজূজ মাজূজ, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর অবতরণ।

এসব নিদর্শনের মধ্য হতে ইয়াজূজ ও মাজূজ আগমনের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

حَتّٰى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, অতঃপর যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে বন্ধনমুক্ত করা হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত- ৯৬)

মাটির নিচ থেকে জীব বের হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔

অর্থাৎ, যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী। (সূরা নামল : আয়াত- ৮২)

ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا۔

অর্থাৎ, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা নিসা : আয়াত ১৫৭-১৫৯)

এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর পুনরাগমনের পর তাঁর মৃত্যুর আগে তৎকালীন সকল আহলে কিতাবীই তাঁর বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে।

বড় নিদর্শনাদির মধ্যে সর্বশেষ নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া। যার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا۔

অর্থাৎ, যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হবে সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য কোনো উপকারে আসবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ১৫৮)

العَلَامَاتُ الصُّغْرٰى لِلْقِيَامَةِ :

কেয়ামতের ছোট আলামতসমূহ : রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে কেয়ামতের ছোট নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইলমে দীন উঠিয়ে নেয়া হবে।
২. মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. যেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে।
৪. মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে।
৫. পুরুষ মানুষের সংখ্যা কমে যাবে।
৬. মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে, এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার বিপরীতে একজন পুরুষ হবে।
৭. আলেম তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে।
৮. দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে।
৯. নীচু শ্রেণির লোকেরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক হবে।
১০. অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিরা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সকল স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।
১১. ইসলাম শুধু কথায় থাকবে, বাস্তবে আমলে জিন্দেগি হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।
১২. আমানতের খেয়ানতসহ নেফাকের সকল আলামত প্রকাশ পাবে।
১৩. শিরক ও বিদয়াতে দুনিয়া ভরপুর হবে।
১৪. কুরআনের শুধু রসম থাকবে।
১৫. মসজিদসমূহ সুশোভিত হবে, তবে তা থাকবে হেদায়াতশূন্য।
১৬. আল্লাহর যমীনের ওপর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকেরা হবে আলেমগণ, এদের নিকট থেকে ফেতনা বের হবে এবং এদের মাঝেই তা ঘুরাফেরা করবে।
১৭. হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরে যুদ্ধ হতে থাকবে।
১৮. নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে ইত্যাদি।

দলীল : যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

১. إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ۔

২. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔

উপসংহার : কেয়ামতের নির্ধারিত সময় কেবল মহান আল্লাহই জানেন; তবে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আলামতগুলো প্রকাশিত হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٦٩) : مَا هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ؟ اَثْبِتْ وُجُوْبَ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ بِالْاَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

■ প্রশ্ন : ৬৯ ॥ اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ বলতে কী বোঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৬]

اَوْ اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ مَا هُوَ؟ أَثْبِتْ وُجُوْبَ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ بِالْاَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

অথবা, اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১৩]

اَوْ اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ مَا هُوَ؟ اَثْبِتْ وُجُوْبَ الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ بِالْاَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِيْنِ۔

অথবা, اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ কী? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। আর তাকদীর তথা ভাগ্যলিপিকে অস্বীকার করা মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। শুধু তাই নয়, তাকদীর অস্বীকারকারীকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো।

⊃ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ :

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ : তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো, এ বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভালোমন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে থাকে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।

অন্যত্র তিনি বলেন–

১. اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۔

٢. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ.

وُجُوْبُ الْاِيْمَانِ بِالْقَدَرِ :

কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা : এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা কুরআন, হাদীস ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُبِيْنٍ.

অর্থাৎ, তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের সকল চাবিকাঠি। এগুলো তিনি ব্যতীত অপর কেউ জানেন না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। কোনো পাতা ঝরলে তিনি তা জানেন। মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্যকণা পতিত হলে, (কোথাও) কোনো আর্দ্র ও শুষ্কদ্রব্য পতিত হলে সে সম্পর্কিত তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (সূরা আনয়াম : আয়াত- ৫৯)

সৃষ্টিজগতের যেসব ব্যাপারে কোনো সৃষ্টজীবের কোনোই জ্ঞান নেই, সবই তাদের জন্য অদৃশ্য। কোনো সৃষ্টজীব যখন তার ভাগ্যে কী রয়েছে তা বাস্তবে রূপ না নেয়া পর্যন্ত জানতে পারে না, তখন তাও তাদের জন্য অদৃশ্য। এ জগতের জলে ও স্থলে, অন্ধকারে ও আলোতে মানুষের দৃশ্যে ও অদৃশ্যে যা কিছু ঘটছে, সবকিছুরই তথ্য সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে, এ জগতে আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, সেসবের পরিমাণ, তাদের জীবন ও জীবিকা এবং ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার অবস্থা এবং তাদের সৃষ্টির সময়কাল, এসবকিছুই এ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ লিখন সম্পর্কে আল্লাহ তাঁয়ালা আরো বলেন–

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَهَا.

অর্থাৎ, পৃথিবীতে এবং তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ এসে থাকে, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ : আয়াত- ২২)

মানুষের জীবনে আনন্দ বিষাদ যাই আসুক না কেন, সবই যে সে লিখন অনুসারে হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا.

অর্থাৎ, বলুন, আমাদের মাওলা আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের স্পর্শ করবে না। (সূরা তাওবা : আয়াত- ৫১)

এতে বোঝা যায়, কার জীবনে কী সুখ-দুঃখ বা আনন্দ ও বিষাদ রয়েছে, সবই সকলের ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। এ লিখনীর সময় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

অপর হাদীসে তিনি বলেন–

اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ. فَقَالَ مَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

অর্থাৎ, কলমকে প্রথমে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সেটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি লেখ। জবাবে বলল, কী লিখব? আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বস্তুর ভাগ্য লেখ।

প্রত্যেক সৃষ্টি এবং তার ভাগ্য যে লিপিবদ্ধ থাকবে, তা যুক্তিরও দাবি। আমরা সাধারণ মানুষ হয়ে একটি কাজ করার পূর্বে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি, কোনো বস্তু তৈরি করলে এর উপকারিতা ও গুণগত মান সম্পর্কে বেশ চিন্তাভাবনা করি। আমাদের সৃজনশীল কাজ ও কর্মের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি যে কোনো পরিকল্পনার বাইরে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস শয়তানের জন্য হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়। যার ফলে শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের, কর্মের, দেহের এবং জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন।

■ **اَلسُّؤَالُ (٧٠) : مَا مَعْنَى الْقَدْرِ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ؟ اشْرَحِ الْعَقِيْدَةَ الْاِسْلَامِيَّةَ فِى الْقَدْرِ-**

■ **প্রশ্ন : ৭০ ॥ قَدْر অর্থ কী? قَدْر-এর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কুরআনের আলোকে قَدْر সম্পর্কে ইসলামী আকিদা বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীরে বিশ্বাস হলো ঈমানের ষষ্ঠ রোকন। তাকদীরের ভালোমন্দে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের ঈমানের পূর্ণতা আসে না। আর তাকদীর তথা ভাগ্যলিপিকে অস্বীকার করা মহান আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। শুধু তাই নয়, তাকদীর অস্বীকারকারীকে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। নিম্নে প্রশ্নালোকে তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ, বিষয়াবলি, বিভ্রান্তি এবং মানবজীবনে এ বিশ্বাসের কল্যাণ উপস্থাপন করা হলো।

➲ قَدْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدْرِ لُغَةً :

قَدْر-এর আভিধানিক অর্থ : قَدْر শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَقْدَار; এর আভিধানিক অর্থ হলো– নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি।

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে– مِقْدَارُ الشَّيْءِ তথা কোনো কিছুর পরিমাণ।

যেমন কুরআনে এসেছে– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ

مَعْنَى الْقَدْرِ اِصْطِلَاحًا :

قَدْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুরের মতে তাকদীর বলা হয়–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرَرٍ وَغَيْرِهَا-

অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির পারসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর।

২. কতিপয় আলেমের মতে–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَضَرَرٍ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ-

⊃ اَلْمُرَادُ بِالْاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ :

তাকদীরে বিশ্বাসের উদ্দেশ্য : তাকদীরে বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম ও কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকেই তাকদীর তথা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভালোমন্দ, আনন্দ, কষ্ট যা কিছু ঘটে থাকে, তা সবই মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছুই আল্লাহর নির্ধারিত কদর তথা পরিমাপের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। অন্যত্র তিনি বলেন–

١- اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۔

٢- وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ۔

⊃ اَلْعَقِيْدَةُ السَّلَامِيَّةُ فِى الْقَدْرِ :

তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা : তাকদীরের ব্যাপারে ইসলামী আকিদা হলো নিম্নের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা–

১. **আল্লাহর অনাদি, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস করা :** প্রকৃত মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয়ে কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে, তা সবই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই।

২. **আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস :** আল্লাহর লিখনে বিশ্বাসের অর্থ হলো তিনি অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'কিতাবুম মুবীন' তথা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টিকুলের কদর লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ۔

তবে লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে–

١- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔

٢- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا۔

٣- اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ۔

৩. **আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস :** আল্লাহর ইচ্ছার ওপর বিশ্বাসের অর্থ হলো, মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর জ্ঞানে হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনা ঘটে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۔ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۔

٢- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيْمَ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۔

৪. **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে মুমিন বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট। এমনকি মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে–

١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ-

٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ-

৫. **মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের ওপরই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি। প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিবেক, বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে; তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে, তার ফল সে ভোগ করবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا- اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا-

٢- اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ-

উপসংহার : তাকদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। যার ফলে শয়তান সেখানে হতাশ বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের, কর্মের, দেহের এবং জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

■ **اَلسُّؤَالُ (٧١) : هَاتِ الدَّلِيْلَ بِالْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ عَلٰى اَنَّ الْقَدْرَ مَكْتُوْبٌ-**

■ **প্রশ্ন : ৭১ ॥ "তাকদীর লিপিবদ্ধ"-এর ওপর কুরআন ও হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : তাকদীর তথা ভাগ্যলিপি যা এ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। কোনো কিছুই দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়নি; বরং সবই আল্লাহর মহাপরিকল্পনার ফ্রেমে বাঁধা। নিম্নে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাকদীর লিপিবদ্ধ থাকার দলীল উপস্থাপন করা হলো।

اَلدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الْقَدْرَ مَكْتُوْبٌ :

তাকদীর লিপিবদ্ধ থাকার প্রমাণ : এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি যে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা কুরআন, হাদীস ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا - وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ, তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের সকল চাবিকাঠি। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনিই তা জানেন। কোনো পাতা ঝরলে তিনি তা জানেন। মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্যকণা পতিত হলে, (কোথাও) কোনো আর্দ্র ও শুষ্কদ্রব্য পতিত হলে সে সম্পর্কিত তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (আনয়াম : আয়াত ৫৯)

সৃষ্টিজগতের যেসব ব্যাপারে কোনো সৃষ্টজীবের কোনোই জ্ঞান নেই, সবই তাদের জন্য অদৃশ্য। কোনো সৃষ্টজীব যখন তার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা বাস্তবে রূপ না নেয়া পর্যন্ত জানতে পারে না, তখন তাও তাদের জন্য অদৃশ্য। এ জগতের জলে ও স্থলে, অন্ধকারে ও আলোতে মানুষের দৃশ্যে ও অদৃশ্যে যা কিছু ঘটছে, সবকিছুরই তথ্য সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে, এ জগতে আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, সেসবের পরিমাণ, তাদের জীবন ও জীবিকা এবং ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার অবস্থা এবং তাদের সৃষ্টির সময়কাল, এ সবকিছুই এ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ লিখন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَهَا ـ

অর্থাৎ, পৃথিবীতে এবং তোমাদের ব্যক্তিজীবনে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ এসে থাকে, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা হাদীদ : আয়াত- ২২)

মানুষের জীবনে আনন্দ বিষাদ যাই আসুক না কেন, সবই যে সে লিখন অনুসারে হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا ـ

অর্থাৎ, বলুন, আমাদের মাওলা আমাদের অদৃষ্টে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত অন্য কিছু আমাদের স্পর্শ করবে না। (সূরা তাওবা : আয়াত- ৫১)

এতে বোঝা যায়, কার জীবনে কী সুখ-দুঃখ বা আনন্দ ও বিষাদ রয়েছে, সবই সকলের ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। এ লিখনীর সময় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) "اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ" ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজনের পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

অপর হাদীসে তিনি বলেন–

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. فَقَالَ مَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ

অর্থাৎ, কলমকে প্রথমে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সেটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি লিখ। জবাবে বলল, কী লিখব? আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বস্তুর ভাগ্য লেখ।

প্রত্যেক সৃষ্টি এবং তার ভাগ্য যে লিপিবদ্ধ থাকবে, তা যুক্তিরও দাবি। আমরা সাধারণ মানুষ হয়ে একটি কাজ করার পূর্বে এ নিয়ে পরিকল্পনা করি, কোনো বস্তু তৈরি করলে এর উপকারিতা ও গুণগত মান সম্পর্কে বেশ চিন্তাভাবনা করি। আমাদের সৃজনশীল কাজ ও কর্মের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি যে কোনো পরিকল্পনার বাইরে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

উপসংহার : উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয় অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণিত হলো যে, তাকদীর পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ আছে। আর তাই তো হযরত আবু হোরায়রা (রা) যখন আর্থিক দৈন্যের কারণে রাসূল (স)-এর নিকট পুরুষত্বহীন হওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন জবাবে রাসূল বললেন– جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ

■ اَلسُّؤَالُ (٧٢) : هَلْ لِلْعِبَادِ اَفْعَالٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اَمْ لَا؟ بَيِّنِ الْخِلَافَ بَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৭২ ॥ বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাযিলা ও আশ্যারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৩,'১৬]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবমণ্ডলীকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার মহান গুরুদায়িত্ব দিয়ে। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। সাধ্যাতীত কোনো বিধান তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। আকাইদের পরিভাষায় একে বলা হয় اِخْتِيَار; নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

هَلْ لِلْعِبَادِ اَفْعَالٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ اَمْ لَا ؟ :

কর্মে বান্দার স্বাধীনতা আছে কিনা : বান্দার কৃতকর্মে তার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা আছে কিনা, এটি আকাইদের একটি বিতর্কিত বিষয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, মুতাযিলা, জাবারিয়্যা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে মুতাযিলা ও আশয়ারীদের অভিমত দলীলসহ পেশ করা হলো–

১. মুতাযিলাদের অভিমত : এ মাসয়ালায় মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত হলো- اِنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِاَفْعَالِهٖ وَالْفِعْلُ يَقَعُ بِاخْتِيَارِهٖ ـ অর্থাৎ, বান্দা স্বয়ং তার কর্মের خَالِق এবং এ কর্মে তার পূর্ণ اِخْتِيَار রয়েছে। তাদের মতে, এতে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই এবং এর মধ্যে তাঁর قُدْرَة ও اِرَادَة-এর কোনো দখল নেই। সুতরাং বান্দা তার কর্মের ফলাফল তথা পুণ্য ও শাস্তির উপযোগী হবে।

দলীল :

ক. নকলী দলীল : মুতাযিলাগণ তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নের নকলী দলীলগুলো পেশ করেন–

١ـ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ـ
٢ـ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ
٣ـ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا ـ
٤ـ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ـ
٥ـ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ
٦ـ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ـ

তাদের মতে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বান্দা তার স্বীয় কর্মের خَالِق; তাই কর্মে বান্দার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা রয়েছে। এ اِخْتِيَار-এর ভিত্তিতে কেউ নেক আমল করলে তার জন্য প্রশংসিত পুরস্কার রয়েছে। আর বদ আমল করলে তার জন্য রয়েছে তিরস্কার ও শাস্তি। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ـ

খ. আকলী দলীল : তাদের মতের পক্ষে আকলী দলীল হচ্ছে, যদি বান্দা স্বীয় কর্মের خَالِق না হতো, তাহলে বান্দাকে مُكَلَّف করে ভালো কাজের জন্য ثَوَاب এবং মন্দ কাজের জন্য عِقَاب তথা শাস্তি প্রদান করা সমীচীন হতো না। সুতরাং আকল বলে দেয় যে, আল্লাহ নয়; বরং বান্দা নিজেই তার কর্মের خَالِق তথা স্রষ্টা।

২. **আশয়ারীদের অভিমত :** আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, বান্দার স্বীয় কর্মে তার কোনো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা নেই। বান্দা হচ্ছে একান্ত জড় পদার্থতুল্য। বান্দা তা-ই করে যা আল্লাহ তার দ্বারা করান। এতে তার কোনো قُدْرَة নেই, কোনো قَصْد নেই এবং কোনো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতাও নেই।

দলীল :

ক. নকলী দলীল : আশয়ারী সম্প্রদায় তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নের নকলী দলীল পেশ করেন–

١. اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ اىْ عَمَلَكُمْ.

٢. اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

٣. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

٤. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ.

তাদের মতে, উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা যেমনি বান্দার خَالِق তেমনি তার কর্মেরও خَالِق। সুতরাং এমতাবস্থায় বান্দাকে স্বীয় কর্মে স্বাধীন বলা হলে বান্দা خَالِق ও مُوْجِد হিসেবে একই কর্মে দু'জন خَالِق হওয়া لَازِم হয়ে পড়ে; অথচ নিয়ম হলো–

اَلْمَقْدُوْرُ الْوَاحِدُ لَايَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ.

অতএব এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্মে বান্দার কোনো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা নেই।

খ. আকলী দলীল : তাদের আকলী দলীল হচ্ছে–

১. আল্লাহর عِلْم ও اِرَادَة ব্যাপক। বান্দা যে কোনো কাজই করুক না কেন তা পূর্ব হতেই আল্লাহর عِلْم ও اِرَادَة-এর মধ্যে থাকে। সুতরাং বান্দা পাপ বা পুণ্য যাই করুক না কেন তা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী করে থাকে; তার নিজের ইচ্ছা নয়।

২. কর্মে বান্দার اِخْتِيَار থাকা মেনে নিলে قُدْرَةُ اللّٰهِ-এর সাথে قُدْرَةُ الْعَبْدِ-কে যুক্ত করে شَرِيْك করা হয়। ফলে اِيْمَان থাকে না। সুতরাং বলতে হয়, কর্মে বান্দার কোনো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা নেই।

৩. যদি বান্দার কর্মের خَالِق আল্লাহ আর كَاسِب স্বয়ং বান্দা হয়, তবে সেক্ষেত্রে কোনো পাপ কর্মের كَاسِب পাপী হলে উহার خَالِق-ও পাপী হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বান্দা কোনো পাপ করলে তার خَالِق হিসেবে আল্লাহও পাপী হওয়া لَازِم হয়ে পড়ে। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সুতরাং বলতে হয়, কর্মে বান্দার কোনো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা নেই।

আশয়ারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. আশয়ারীদের নকলী দলীলের প্রত্যুত্তর হলো, একই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একটি কর্ম দুই স্বয়ংসম্পন্ন ক্ষমতার অধীনে থাকতে পারে না– এ বিধান একান্তই সঠিক; কিন্তু এখানে বান্দার কর্ম خَلْق হিসেবে আল্লাহর অধীনে এবং كَسْب হিসেবে বান্দার অধীনে হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে উভয়ের বেলায় একই দৃষ্টিভঙ্গি না হওয়ার কারণে তা উক্ত বিধানের পরিপন্থি হয়নি। সুতরাং কর্মে বান্দার اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।

২. তাদের উপস্থাপিত প্রথম আকলী দলীলের জবাব হলো, বান্দার ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই তার কর্মে আল্লাহর اِرَادَة হয়। তাই যে কাজটি বান্দার اِخْتِيَار-এর ভিত্তিতে হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর اِرَادَة থাকার কারণে তার اِخْتِيَار নস্যাৎ হয় না; বরং এর

ফলে বান্দার اِخْتِيَار আরো সুন্দর ও ফলপ্রসূ হয়। কুরআনেই এর প্রমাণ মিলে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

৩. তাদের দ্বিতীয় আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, شَرِيْك অর্থ– একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো কিছুর ব্যাপারে দুই বা ততোধিক সত্তা অংশীদার হওয়া; কিন্তু বান্দার কর্মটি একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বান্দা ও আল্লাহর অধীনে হয় না; বরং কর্মটি আল্লাহর অধীনে হয় خَلْق-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে আর বান্দার অধীনে হয় كَسْب-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হওয়ায় شَرِيْك হয় না।

৪. তাদের তৃতীয় আকলী দলীলের জবাবে বলা হয়, একথা অনস্বীকার্য যে, খারাপ বা অসৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া কোনো কাজের خَالِق আর كَاسِب হওয়া পৃথক কথা। খারাপ কাজের خَالِق হলেই যে সে كَاسِب-এর সাথে পাপী হবে, এটা যুক্তিসংগত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ভালোমন্দ উভয়টি সৃষ্টি করে সাথে সাথে এতদুভয়ের সুফল ও কুফলও বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এটা করেছেন শুধুমাত্র বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا;

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের বাণী, হাদীসের ভাষ্য ও যুক্তির আলোকে আশয়ারীদের সকল যুক্তি ও দলীল ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কর্মে বান্দার পূর্ণ اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা রয়েছে। আর এটা আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় বান্দার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ।

■ **اَلسُّؤَالُ (٧٣) : مَا حِكْمَةُ اللّٰهِ فِىْ جَعْلِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِى الرِّزْقِ؟**

■ **প্রশ্ন : ৭৩ ॥ বান্দাদের মাঝে রিজিকের তারতম্য রাখার পেছনে আল্লাহর কী রহস্য রয়েছে?**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা ও রিজিকদাতা। তিনি সবাইকে সমান হারে রিজিক প্রদান করেন না; বরং এ রিজিক বণ্টনের ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের তারতম্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে তাঁর মহাহেকমত নিহিত রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে তা আলোচনা করা হলো।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ جَعْلِ الْمُفَاضَلَةِ فِى الرِّزْقِ :

জীবিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য করার রহস্য : আলেমগণ এ ব্যাপারে কতিপয় হেকমত উল্লেখ করেন। যেমন–

১. **আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ :** আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাদশাহ বানান আবার বাদশাহকে ফকির বানান। কাউকে দেন অগণিত, অফুরন্ত রিজিক। আবার কাউকে করেন রিক্ত। এটা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছাধীন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ .... وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

২. **পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরিপূরক বানানোর উদ্দেশ্যে :** মানুষ যতই ধন ও জনের মালিক হোক না কেন, কোনোভাবেই সে তার নিজের জীবনের সকল চাহিদা এককভাবে পূরণ করতে পারে না। তাই পরস্পরের সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে। মানুষের জীবনের এ চাহিদা পূরণের স্বার্থেই যুক্তির দাবি

হচ্ছে তাদের মধ্যে মেধা, মনন ও সম্পদের ক্ষেত্রে তারতম্য হোক। সবাই জমিদার হয়ে গেলে ক্ষেতে কাজ করবে কে? সবাই শিল্পপতি হয়ে গেলে শিল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক হবে কে? এসব সমস্যার সমাধানকল্পেই মহান আল্লাহ মানুষের মেধা, মনন ও সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। তাই সবাই সমান শিক্ষিত হতে পারছে না, সবার দ্বারা সকল কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সবাই যাতে পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, সেদিক বিবেচনা করেই তিনি তাদের জীবিকার মাধ্যম ও জীবিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। এ রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔

অর্থাৎ, আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি, পার্থিব জীবনে একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। (সূরা যুখরুফ : আয়াত- ৩২)

এ আয়াত দ্বারা খোলাখুলিভাবে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা–

ক. প্রচুর জীবিকাপ্রাপ্তির জন্য মানুষের মনের ইচ্ছা ও কর্ম যতই থাকুক না কেন, বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা এককভাবে তাঁর নিজের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। পৃথিবীতে এসে কারা তাঁর নিকট উত্তম জীবিকা চেয়ে কর্ম করবে, আর কারা তাঁর নিকট না চেয়ে শুধু নিজেদের যোগ্যতা ও কর্মের মাধ্যমে উত্তম জীবিকা চাইবে, তিনি তা আগাম জেনে নিজ ইচ্ছায় এ জীবিকা বণ্টন করেছেন।

খ. বণ্টনের ক্ষেত্রে যাতে পরস্পর পরস্পরের জন্য পরিপূরক, সেবক ও মুখাপেক্ষী হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করছেন। সে কারণেই আমাদের কেউ হয় জমিদার, আর কেউ হয় ক্ষেতমজুর। আবার কেউ হয় শিল্পপতি, আর কেউ হয় শিল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক।

৩. **ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা :** যে রহস্যকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ জীবিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে এ তারতম্য করেছেন, সে তারতম্য কারো জন্যই চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করে দেননি; বরং সম্পদ যাতে চিরদিন ধনীদের হাতে আবর্তিত না হয়, সেজন্য সময়ের পরিবর্তনে আজকে যিনি রাজা কাল তাকে প্রজায় পরিণত করেন। আজকে যিনি জমিদার কাল তাকে বা তার অধস্তন বংশধরদেরকে ক্ষেতমজুরে পরিণত করেন। আজকে যিনি শিল্পপতি কাল তাকে দেউলিয়া করেন, আজকে যিনি ক্ষেতমজুর বা শ্রমিক কাল তাকে জমিদার বা শিল্পপতিতে পরিণত করেন। এভাবে যুগের পর যুগ চক্রাকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি যেমন জনজীবনকে সচল করে রাখেন, তেমনিভাবে এর মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেন, কারা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এ পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ۔

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষুধা ও ভয় দিয়ে এবং সম্পদ, জান ও ফলফলাদি নষ্ট করে পরীক্ষা করব, আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

(সূরা আল বাকারা : আয়াত- ১৫৫)

তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান, সহায় সম্পদ হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কারা ধৈর্যধারণ করে আর কারা করে না। কারা ঈমানের ওপর অবিচল থেকে বিপদ দূরীকরণের জন্য তার দ্বারস্থ হয়, আর কারা প্রকৃতি বা অন্য কিছুর দ্বারস্থ হয়। আবার কাউকে সম্পদ দিয়ে দেখতে চান, তারা এ সম্পদকে কি আল্লাহর দান মনে করে, না ফিরাউনের গভর্নর কারুনের মতো এসব নিজের হাতের কামাই বলে মনে করে। কারুন বলেছিল– إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِىْ অর্থাৎ, আমার এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান গরিমা দ্বারা অর্জন করেছি। (সূরা কাসাস : আয়াত- ৭৮)

তিনি আরো দেখতে চান, সম্পদের ওপর গরিব আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী ও গরিবদের অধিকারকে কারা স্বীকার করে, আর কারা করে না।

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা জীবিকা বন্টনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য। কাউকে তিনি প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কাউকে অসচ্ছলতার দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং বান্দার উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٤) : بَيِّنْ عَقِيْدَةَ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ فِى التَّقْدِيْرِ مَعَ الْاِجَابَةِ مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ۔

■ প্রশ্ন : ৭৪ ॥ তাকদীর সম্পর্কে পথভ্রষ্ট দলের আকিদা উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসের আলোকে আহলে হকদের প্রত্যুত্তর বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের রোকনসমূহের অন্যতম। মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ভাগ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলি আগাম অবগতির ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সবকিছুই তাঁর নির্ধারিত পরিমাপ বা قَدْر-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ তথা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। এটা মূলত সৃষ্টির মৌলিক রহস্য, যা কোনো নিকটতম ফেরেশতা তথা নবী রাসূলগণও অবগত নন। আল্লাহ তাকদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টি হতে আড়াল করে রেখেছেন এবং এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

⊃ عَقِيْدَةُ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ فِى التَّقْدِيْرِ :

তাকদীর সম্পর্কে ভ্রষ্টদলের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) বলেন, তাকদীরের মূল বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য। কোনো নিকটতম ফেরেশতা ও নবীগণও তা অনুধাবন করতে পারেন না। এটা নিয়ে অধিক চিন্তা পথভ্রষ্টতার পন্থা, বদনসীব হওয়ার সিঁড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের ধাপ। এ কারণেই যুগে যুগে বহু মুসলিম তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. **মুতাযিলাদের আকিদা :** মুতাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহকে বান্দার কর্মের স্রষ্টা অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ কাফেরদের নিকট ঈমান কামনা করেন; কিন্তু কাফেররা নিজ ইচ্ছার কারণে কুফরী করে। তাদের কুফরী কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ নন; বরং কাফেররাই তাদের স্বীয় কুফরী কর্মের জন্য দায়ী। এ মতের সমর্থনে তারা আল্লাহর বাণী থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ অর্থাৎ, অতঃপর যার ইচ্ছা ঈমান আন, আর যার ইচ্ছা কুফরী কর।

সুতরাং প্রতীয়মান হয়, মুতাযিলাগণ আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে আগাম জ্ঞান ও লিখনীকে অস্বীকার করেছে; যা ভ্রান্ত আকিদা।

২. **কাদারিয়্যাদের আকিদা :** কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্বনির্ধারণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে– تَقْدِيْر তথা নিয়তি বলে কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা। মুতাযিলাদের সাথে তাদের বক্তব্যের মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে বলেন, اَمْر তথা আদেশ হলো একটি নতুন বিষয়। এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন– جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

৩. **জাবারিয়্যাদের আকিদা :** তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মত ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থ তুল্য। বান্দা তা-ই করে যা আল্লাহ করান। তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ভোগ করে না। তারা এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী দলীলরূপে পেশ করেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে।

আহলে হকদের প্রত্যুত্তর : তাকদীর সম্পর্কে আহলে হক বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক কর্মই আল্লাহর ফয়সালা, পূর্বনির্ধারিত ও কিতাবে লিপিবদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ মানুষের সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা। আর মানুষ সে কর্মের كَاسِبْ তথা অর্জনকারী।

তাদের এ অভিমত অনুযায়ী তারা বিরুদ্ধবাদীদের প্রদানকৃত দলীলের প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন–

১. মুতাযিলা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায়; যারা আল্লাহর আগাম জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণকে অস্বীকার করে বান্দাকে পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করেন, তাদের প্রদত্ত দলীলের প্রত্যুত্তরে আহলে হক বলেন– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ আয়াতের মাধ্যমে বান্দাকে স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করা গেলেও আল্লাহকে অক্ষম ভাবা বৈধ নয়। সুতরাং বান্দা পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে থাকে।

২. আর জাবারিয়্যাদের সম্পর্কে আহলে হক বলেন, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা বটে, তবে বান্দাদেরকে তিনি বিবেক ও বিচারশক্তি দান করেছেন এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করে তাদেরকে সঠিক ও ভ্রান্ত উভয় পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই এ সম্প্রদায়ের অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

উপসংহার : ঈমানের ষষ্ঠতম রোকন হিসেবে তাকদীরে বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এর ওপর নির্দ্বিধায় মতভেদ ও বাড়াবাড়ি ব্যতীত ঈমান আনয়ন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। অন্যথা এর মাধ্যমেই যে কেউ অতি সহজেই পদস্খলিত হয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٥) : مَا مَعْنَى الْقَدْرِ؟ اُكْتُبْ اٰرَاءَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ.

■ **প্রশ্ন : ৭৫ ॥ قَدْر অর্থ কী? এই বিষয়ে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যা সম্প্রদায়ের অভিমত লেখ।** [ফা. প. ২০১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : قَدْر তথা তাকদীর বা ভাগ্যলিপির প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানদারের পরিচায়ক এবং এর অস্বীকার করা আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত; যার চরম পরিণতি অনিবার্য। এছাড়াও তাকদীরের প্রতি বাতিল আকিদা প্রত্যাখ্যান করতঃ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদায় পরিপূর্ণ ঈমান আনা মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত। নিম্নে قَدْر-এর পরিচয় উল্লেখপূর্বক কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যাদের অভিমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

◐ قَدْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدْرِ لُغَةً :

قَدْر-এর আভিধানিক অর্থ : قَدْر শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَقْدَار; এর আভিধানিক অর্থ হলো– নিয়তি, ভাগ্য, তাকদীর, পরিমাণ, সক্ষম হওয়া, নির্ধারণ ইত্যাদি।

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে– مِقْدَارُ الشَّيْءِ তথা কোনো কিছুর পরিমাণ।

যেমন কুরআনে এসেছে– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

مَعْنَى الْقَدْرِ اِصْطِلَاحًا :

قَدْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুরের মতে তাকদীর বলা হয়– هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَنَفْعٍ وَضَرٍّ وَغَيْرِهَا **অর্থাৎ, প্রত্যেক মাখলুকের ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির পরিসীমা নির্ধারণ করার নামই তাকদীর।**

২. কতিপয় আলেমের মতে–

هُوَ تَحْدِيْدُ كُلِّ مَخْلُوْقٍ بِحَدِّهِ الَّذِىْ يُوْجَدُ مِنْ حُسْنٍ وَقُبْحٍ وَضَرٍّ وَمَا يَحْوِيْهِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সৃষ্টি যে ভালোমন্দ, লাভ ক্ষতি করবে ও সেজন্য যে স্থান কালের প্রয়োজন হবে এবং তথবিনিময়ে যে সাওয়াব ও শাস্তি লাভ করবে, তা নির্ধারণ করে দেয়াকে تَقْدِيْر বলে।

◐ عَقِيْدَةُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ فِى الْقَدْرِ :

তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়্যা ও জাবারিয়্যাদের আকিদা : আল্লামা তাহাবী (র) বলেন, তাকদীরের মূল বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একটি রহস্য। কোনো নিকটতম ফেরেশতা ও নবীগণও তা অনুধাবন করতে পারেন না। এটা নিয়ে অধিক চিন্তা পথভ্রষ্টতার পন্থা, বদনসীব হওয়ার সিঁড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের ধাপ। এ কারণেই যুগে যুগে বহু মুসলিম তাকদীর নিয়ে মতভেদ ও বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. **কাদারিয়্যাদের আকিদা :** কাদারিয়া সম্প্রদায় তাকদীরের পূর্বনির্ধারণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং এ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে, تَقْدِيْرٌ তথা নিয়তি বলে কিছুই নেই; বরং মানুষই তার কর্ম ও ভাগ্যের নিয়ন্তা। মুতাযিলাদের সাথে তাদের বক্তব্যের মিল থাকলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে বলেন, أمْر তথা আদেশ হলো একটি নতুন বিষয়। এ সম্পর্কে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন– جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

২. **জাবারিয়্যাদের আকিদা :** তাকদীর সম্পর্কে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বলেন, বান্দার স্বীয় কর্মে কোনো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই; বরং বান্দা নিয়তির পুতুল ও জড়পদার্থতুল্য। বান্দা তা-ই করে যা আল্লাহ করান। তাই বান্দা তার কর্মে কোনো শক্তি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ভোগ করে না। তারা এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কুরআনের বাণী দলীলরূপে পেশ করেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দার কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, জাবারিয়্যা সম্প্রদায় বান্দার ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে।

উপসংহার : "একমাত্র মানুষ তাদের ভাগ্যের বা কর্মের নিয়ন্তা এবং মানুষ তার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে ক্ষমতাবান নয়" এ অভিমত দুটি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের এবং ভ্রান্ত। তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মধ্যপন্থা অনুসরণে অভিমত ব্যক্ত করে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করেছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٦) : تَحَدَّثْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৭৬ ॥ কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

[ফা. প. ২০১৭]

اَوْ مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ؟ بَيِّنْ.

অথবা, عَذَابُ الْقَبْرِ وَالْبَعْثُ وَالْحَشْرِ সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর।

[ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন শেষে মৃত্যু অথবা কেয়ামতের মাধ্যমে প্রত্যেককে আরেকটি অনন্ত মহাজীবনে প্রবেশ করতে হবে। সে জীবনই হলো আখেরাত বা পরকাল। সেখানে পাপপুণ্যের পরিমাপ করা হবে। পুণ্যবানরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর পাপীরা পুলসিরাত পার হতে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সেখানে মানুষের সকল পাপপুণ্যের হিসাব দিতে হবে। পরকালে পুণ্যবান বান্দাদেরকে মহানবী (স) হাউযে কাওসারের পানি পান করাবেন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করবেন। কেয়ামত, পরকাল, হাশর, ইত্যাদি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। নিম্নে প্রশ্নালোকে এসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো।

⊃ بَيَانٌ عَلٰى عَذَابِ الْقَبْرِ :

কবরের আযাব সম্পর্কে বর্ণনা : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। তন্মধ্যে কবরের আযাব অন্যতম। এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন–

وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِى الْقَبْرِ وَاِعَادَةُ الرُّوْحِ اِلٰى جَسَدِ الْعَبْدِ فِىْ قَبْرِهٖ حَقٌّ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهٗ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরে করা হবে আর কবরে বান্দার রূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়াও সত্য। কবরের চাপ ও আযাব সত্য। কাফেররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনো কোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসেছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

১. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ـ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

অর্থাৎ, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফিরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও।

২. وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে বারযাখ প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

৩. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ـ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবন ও পরজীবনে এবং যারা জালেম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

পরকালীন জীবনের শুরু তথা কবরে রাখার সাথে সাথেই 'মুনকার নাকীর' নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ ـ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাবে ও ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। সেজন্য আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আযাব ও নেয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বলে গণ্য। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার 'রূহ' তাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফেরেশতাদ্বয় স্বীয় প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। মুমিন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে; তবে মুনাফিক ও কাফের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। অতএব কবরের আযাব সত্য এবং এর ওপর বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রোকন।

বَيَانٌ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ :

পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

১. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

২. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ۔

৩. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔

উপসংহার : পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কেউ মুমিন ও মুসলিম বলে গণ্য হতে পারে না। মূলত আখেরাতের বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত ইবাদতকারী ও মুত্তাকী হতে সাহায্য করে।

■ **اَلسُّؤَالُ (৭৭) : مَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْخَوَارِجِ وَالْاَشَاعِرَةِ فِىْ مَسْأَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا۔**

■ **প্রশ্ন : ৭৭ ॥ مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৬,'১৮]

اَوْ اُكْتُبْ اَقْوَالَ الْخَوَارِجِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ فِىْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ مَعَ الْاَدِلَّةِ۔

অথবা, مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ বিষয়ে খারেজী ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতামত দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : পাপ ও পুণ্য পরস্পর বিপরীত বিষয়। আর সর্বোচ্চ পাপ কবীরা গুনাহ মানুষকে স্বীয় মনুষ্যত্বের সীমা থেকে অজ্ঞতা, হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা ও পাশবিকতার প্রতি ধাবিত করে। তাই এসব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ-দের সম্পর্কে খারেজী ও আশয়ারীদের অভিমত ব্যক্ত করা হলো।

➲ **اَقْوَالٌ فِىْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ :**

مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ-এর মাসায়ালা সম্পর্কে অভিমত : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন থাকবে, না কাফের বলে সম্বোধন করা যাবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। নিম্নে প্রশ্নালোকে খারেজী ও আশয়ারীদের অভিমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

খারেজী সম্প্রদায়ের অভিমত : খারেজীদের মতে, مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ তথা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন থেকে বের হয়ে কুফরীতে প্রবেশ করে। তাই তারা কাফের এবং এদেরকে এ নামে সম্বোধন করা যাবে।

দলীল : তাদের যুক্তি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত করেন–

১. وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ۔

২. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔

এছাড়াও হাদীসে এসেছে– مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কুফরীতে প্রবেশ করে।

খারেজীদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. আয়াতে يَحْكُمْ অর্থ হলো আল্লাহর বিধান অবহেলা, অস্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা। যার ফলে ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হতে বাধ্য।

২. আর হাদীসের জবাবে বলা হয়, এখানে تَرْك বলতে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। আর اِنْكَار করলে অবশ্যই কাফের হবে।

৩ আশয়ারী সম্প্রদায়ের অভিমত : আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত কোনো মুমিন ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায় না এবং তারা কুফরীতেও নিমজ্জিত হয় না; তবে তারা ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।

দলীল :

ক. নকলী দলীল : তাদের যুক্তির সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা উপস্থাপন করেন–

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ۔

٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا۔

٣. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا۔

উপর্যুক্ত আয়াত তিনটির মতো অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কবীরা গুনাহের প্রতি নিসবত করতঃ মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন; যা প্রমাণ করে কবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না।

খ. ইজমাভিত্তিক দলীল : রাসূল (স)-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের ওপর ইজমা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহকারী তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও তার জানাযা দেয়া যাবে; যা কবীরা গুনাহকারী কাফের না হওয়ার পক্ষে যুক্তি বহন করে।

গ. আকলী দলীল : ঈমান হলো تَصْدِيْقُ الْقَلْبِ তথা অন্তরের বিশ্বাস। তাই কেউ যদি কবীরা গুনাহ বৈধ মনে করে, তবে সে কুফুরীতে প্রবেশ করে, অন্যথায় নয়।

উপসংহার : ঈমান যেহেতু اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ তথা বাহ্যিক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত, তাই কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কুফরীতে প্রবেশ করবে না; তবে সে ফাসেকী করবে এবং তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে আশয়ারীদের মতামতের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

■ اَلسُّؤَالُ (٧٨) : اُكْتُبْ اَقْوَالَ الْمُعْتَزِلَةِ فِىْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ۔

■ প্রশ্ন : ৭৮ ॥ مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হবে না। মুসলিমদের উচিত যাবতীয় কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা। কেননা কবীরা গুনাহ বান্দাকে ঈমান থেকে বের করে কুফরির দিকে নিয়ে যায়; তবে সে কাফের হয়ে যায় কিনা, এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ তুলে ধরা হলো।

৩. أَقْوَالُ الْمُعْتَزِلَةِ فِىْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ :

مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ-এর বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ তথা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও হয় না আবার মুমিনও থাকে না। সে ঈমান ও কুফরির মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ তার অবস্থান হলো– مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ তথা সে এমন এক পর্যায়ভুক্ত যার অবস্থান কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি। এরূপ ব্যক্তি তওবা ব্যতীত মারা গেলে مُخَلَّدٌ فِى النَّارِ হবে।

দলীল :

ক. নকলী দলীল : এ সম্পর্কে তারা কুরআন ও হাদীসের দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا.

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا.

٣. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

٤. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حَيْثُ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

٥. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ.

খ. আকলী দলীল : মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন, যেহেতু একথা বর্ণিত আছে যে, উম্মতগণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না এবং তাদের ওপর মুরতাদের হুকুমও বাস্তবায়ন করতেন না। আর তাদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতেন। সেহেতু এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফেরও নয় আবার মুমিনও নয়; বরং সে কাফের ও মুমিন-এর মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থিত।

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর :

১. তাদের উত্থাপিত প্রথম আয়াতে خَالِدًا দ্বারা دَوَام উদ্দেশ্য নয়; বরং مَكْث طَوِيْل উদ্দেশ্য।

২. তাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় আয়াতে فِسْق দ্বারা كُفْر উদ্দেশ্য। কেননা كُفْر-ই হলো বড় فِسْق; সুতরাং এখানে فَاسِق-এর শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী তাফসীর করা হবে না।

৩. তাদের পেশকৃত উল্লেখিত হাদীসগুলোতে এসব চরম সতর্কবাণী ও ধমকি হিসেবে এবং গুনাহ হতে বিমুখ করার মানসে বলা হয়েছে।

৪. হাদীসগুলোতে نَفْس اِيْمَان তথা মূল ঈমানকে نَفْى করা হয়নি; বরং ঈমানের পূর্ণাঙ্গতাকে نَفْى করা হয়েছে।

৫. উক্ত হাদীসগুলো تَشْدِيْد ও تَغْلِيْظ হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার : কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মুতাযিলা সম্প্রদায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা সঠিক নয়; বরং এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হবে না; বরং সে মুমিনে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সে خُلُوْدٌ فِى النَّارِ হবে না। যদি সে তওবা ব্যতীত মারা যায়, তাহলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নাজাত তথা মুক্তি পাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

নাওয়াকিদুল ঈমান

■ اَلسُّؤَالُ (٧٩) : مَا مَعْنٰى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ؟ وَكَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟

■ প্রশ্ন : ৭৯ ॥ নাওয়াকিদুল ঈমান বলতে কী বোঝ? তা কয়টি ও কী কী?

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ বলেন– صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً; আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার বাস্তব রূপরেখা। ঈমান এ দাবি নিয়েই আগত। এর বিপরীত সবগুলোই ঈমান পরিপন্থি। মূলত যে সকল বিশ্বাস বা কর্ম মুমিনের ঈমান নষ্ট করে, সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ বলা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর পরিচিতি :

مَعْنٰى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ لُغَةً :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-এর আভিধানিক অর্থ : نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ একটি যৌগিক শব্দ। একটি نَوَاقِض অপরটি اَلْاِيْمَانُ; দুটি শব্দের সমষ্টিকে আরবিতে تَرْكِيْب اِضَافِى বলে। এ দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন–

نَوَاقِض-এর অর্থ : نَوَاقِض শব্দটি বহুবচন, একবচনে نَاقِضَة; এটা نَقْض মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

ক. نَقَضَ الشَّىْءَ نَقْضًا : اَفْسَدَ بَعْدَ اِحْكَامِه তথা কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করার পর নষ্ট করা।

খ. نَقَضَ الْبِنَاءَ : هَدَمَهُ তথা ভিত্তিকে ধ্বংস করা।

গ. نَقَضَ الْحَبْلَ اَوِ الْغَزْلَ : حَلَّ طَاقَتَهُ তথা শক্তি সহজ করা, ভেঙে ফেলা, টুকরা টুকরা করা। যেমন কুরআনে এসেছে–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا۔

২. কেউ কেউ বলেন–

ক. اَلْاِنْكَارُ তথা অস্বীকার করা, খ. اَلْاِفْسَادُ তথা নষ্ট করা, গ. اَلْاِهْدَامُ তথা ধ্বংস করা, ঘ. اَلْاِبْطَالُ তথা বাতিল করা, ঙ. اَلْاِعْرَاضُ তথা বিমুখ হওয়া।

৩. মুখতারুস সিহাহ প্রণেতা বলেন– مَا تَسَاقَطَ مِنَ الْوَرَقِ وَالثِّمَارِ অর্থাৎ, পাতা এবং ফল থেকে যা পড়ে যায়।

৪. লিসানুল আরব গ্রন্থে রয়েছে– مُفْسِدَاتُ مَا اُبْرِمَ مِنْ عَقْدٍ اَوْ بِنَاءٍ পবিত্র কুরআনে শব্দটির অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

١- اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ-

٢- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ-

الْاِيْمَان-এর অর্থ : اِيْمَان শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এটি خَوْف-এর বিপরীত। এর অর্থ–

১. اَلتَّصْدِيْق তথা বিশ্বাস করা। ২. اَلْاِذْعَان তথা স্বীকৃতি দেয়া।

৩. الانْقِيَاد তথা আনুগত্য করা। ৪. اَلْخُضُوْع তথা অবনত হওয়া।

সুতরাং نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো– ঈমান তথা বিশ্বাস বিনষ্টকারী, مُهْلِكَاتُ الْاِيْمَان তথা ঈমান ধ্বংসকারী, ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বিষয়, ঈমানের বিপরীত করা, আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, স্বীকৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি।

مَعْنَى نَوَاقِضِ الْاِيْمَانِ اِصْطِلَاحًا :

نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কয়েকটি উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. আকাইদ শাস্ত্রবিদদের মতে– نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ الَّتِىْ تَخْرُجُ مَنْ يَفْعَلُهَا عَنْ دَائِرَةِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, نَوَاقِضُ الْاِيْمَان বলা হয় এমন কাজকে যে ব্যক্তি তা করবে, তাকে তা ঈমানের সীমা থেকে বের করে দেবে।

২. কারো মতে–

هِىَ الَّتِىْ اَحْبَطَتْ اِيْمَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَزَالَتْ عَنْهُمُ الْاِسْلَامَ يُقَالُ لَهَا نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ-

অর্থাৎ, যে বিষয় মুমিনদের ঈমান ধ্বংস করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَان বলা হয়।

৩. কতিপয় আলেম বলেন– نَوَاقِضُ الْاِيْمَانِ هِىَ مَا اَبْعَدَ النَّاسَ عَنِ الْاِسْلَامِ وَالْقُرْاٰنِ وَمِنَ الْحَقِّ অর্থাৎ, যা মানুষকে ইসলাম, কুরআন ও সত্য পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়, তাকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَان তথা ঈমান বিনষ্টকারী বলা হয়।

মোটকথা, ইসলাম, কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি বিশ্বাস এবং এমন কার্যাবলি যা মুমিনকে তার ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা ঈমানকে নষ্ট করে ফেলে, সেগুলোকে نَوَاقِضُ الْاِيْمَان তথা ঈমান ধ্বংসকারী বলে।

⊃ نَوَاقِضُ الْاِيْمَان :

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ : আকাইদের যাবতীয় কিতাব পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে, نَوَاقِضُ الْاِيْمَان-এর মূলবিষয় তিনটি। যথা– ১. اَلشِّرْك ২. اَلْكُفْر ৩. اَلنِّفَاق; তবে এসবের শাখাপ্রশাখা মিলে ১০টি কারণ পাওয়া যায়। যথা–

১. اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ তথা আল্লাহর সাথে শরীক করা।

২. جَعْلُ الْوَسَائِطِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ তথা আল্লাহ ও তাঁর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা।

৩. لَا يُقَالُ الْمُشْرِكُ كَافِرًا তথা মুশরিককে কাফের না বলা।

৪. اَلْاِعْتِقَادُ بِعَدَمِ الْاِكْمَالِ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى তথা নবী করীম (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাকে পরিপূর্ণ মনে না করা।

৫. اَلْكَرَاهِيَةُ بِاَحَدٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صـ) তথা মহানবী (স) কর্তৃক প্রদর্শিত কোনো বিধান অপছন্দ করা।

৬. اَلْاِسْتِهْزَاءُ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ তথা আল্লাহর অঙ্গীকার এবং ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্রূপ করা।

৭. الاعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া।

৮. مُسَاعَدَةُ الْمُشْرِكِيْنَ তথা মুশরিকদের সাহায্য করা।

৯. تَفْضِيْلُ اَحَدٍ عَلٰى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ (صـ) তথা মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়তের ওপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া।

১০. السِّحْرُ তথা যাদু টোনা করা।

উল্লিখিত কাজের সবগুলোই কুফরী। কারো দ্বারা এ কাজগুলো সংঘটিত হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার : ঈমান আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত। এ ঈমান গ্রহণকারী কখনো ঈমান বিধ্বংসী কোনো কাজ করতে পারে না। তাহলে সে ঈমানের সীমা থেকে কুফরীর সীমায় পৌঁছে যায়। তাই ঈমান গ্রহণকারী মুমিনকে বর্ণিত বিষয়াবলি থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

■ **اَلسُّؤَالُ (٨٠) : عَرِّفِ الشِّرْكَ مَعَ ذِكْرِ اَقْسَامِهِ مُفَصَّلًا۔**

■ **প্রশ্ন : ৮০ ॥ শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০১৯]

اَوْ۔ الشِّرْكُ مَا هُوَ؟ كَمْ قِسْمًا لَهُ؟ ثُمَّ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالْاِخْتِصَارِ۔

অথবা, শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

اَوْ۔ الشِّرْكُ مَا هُوَ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ بِالتَّمْثِيْلِ۔

অথবা, শিরক কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০]

اَوْ۔ مَا مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ اُذْكُرْ اَنْوَاعَ الشِّرْكِ مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا۔

অথবা, شِرْك শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকারভেদ উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ "নিশ্চয় শিরক একটি মহাজুলুম।" আমল বিধ্বংসী এ কাজ সৎকর্মশীলদের সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মুশরিকের জন্য পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। সকল নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিরক নামক ব্যাধি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে তাওহীদের আলোতে আলোকিত করা। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩ شِرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْكِ لُغَةً :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْك শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা– اَلشَّرْكُ শব্দটির ش-এর ওপর যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে– حَبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচন হচ্ছে اَشْرَاك বা شِرْك;

আবার اَلشِّرْكُ শব্দের ش-এর নিচে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে– اَلنَّصِيْبُ তথা অংশ। বহুবচন হবে اَشْرَاك; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন–

১. বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন বলা হয়– اَشْرَكَ بِاللّٰهِ اَىْ جَعَلَ لَهٗ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِهٖ অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।
২. বাবে مُفَاعَلَة থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمٍ كَذَا أَىْ لَهٗ نَصِيْبٌ مِنْهُ
৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে اِفْعَال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো–

১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا
২. جَعْلُ الشَّىْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।
৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা।
৪. আল্লামা রাগেব বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্যা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

مَعْنَى الشِّرْكِ اِصْطِلَاحًا :

شِرْك-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন–

اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ وَاُلُوْهِيَّتِهٖ.

অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন– اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَهٗ اَوْ يَصْرِفُ لَهٗ شَيْئًا مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।
৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।
৪. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَل গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الْعَامُّ তথা সাধারণ অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رَبُوْبِيَّة ,اُلُوْهِيَّة এবং اَلْاَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

২. اَلشِّرْكُ الْخَاصُّ তথা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰهِ-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

⊃ اَقْسَامُ الشِّرْكِ :

شِرْك-এর প্রকারভেদ : شِرْك প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ তথা বড় শিরক, ২. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ তথা ছোট শিরক।

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ-এর পরিচয় : ক. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন–

اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, শিরকে আকবর তথা বড় শিরক বলা হয়, ইবাদতের কোনো প্রকারকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন– اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ هُوَ اِثْبَاتُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার সাব্যস্ত করা।

২. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ-এর পরিচয় : আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন–

اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ هُوَ مُرَاعَاةُ غَيْرِ اللّٰهِ مَعَهُ فِيْ بَعْضِ الْاُمُوْرِ.

অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাথে غَيْرُ اللّٰهِ-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ তথা ছোট শিরক আবার দু'প্রকার। যথা– ১. اَلشِّرْكُ الظَّاهِرُ তথা প্রকাশ্য শিরক, ২. اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ তথা গোপন শিরক।

اَلشِّرْكُ الظَّاهِرُ আবার দু'প্রকার। যথা–

ক. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَلْفَاظِ তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক।

খ. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَفْعَالِ তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক।

⊃ حُكْمُ الشِّرْكِ :

শিরকের বিধান : মানবজীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ অধঃপতন ও ধ্বংস শিরকের মধ্যে নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের বিধান বা পরিণতি নিম্নরূপ–

১. **শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না :** তওবা তথা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার মাধ্যম। তবে মহান আল্লাহ তওবা ছাড়াও সৎকাজের কারণে শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্যসব পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

২. **শিরক সকল পুণ্য কর্ম ধ্বংস করে :** আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١. وَلَقَدْ أُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٢. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ, কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. **শিরক জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :** মহান আল্লাহ অংশীবাদীদের জন্য চির শান্তির আবাস জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। পরিণামে তাদের জন্য তৈরি রয়েছে চির শাস্তির স্থান জাহান্নাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

৪. **শিরককারীর জানমালের বিধান :** শিরককারীর জানমাল অন্যান্যদের জন্য হালাল করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ। একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ **اَلسُّؤَالُ (٨١) : مَا الشِّرْكُ؟ اُذْكُرْ اَنْوَاعَ الشِّرْكِ الْاَصْغَرِ فِىْ ضَوْءِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ.**

■ **প্রশ্ন : ৮১ ॥ শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরকে আসগারের প্রকারসমূহের বর্ণনা দাও।** [ফা. প. ২০১৪]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, নিশ্চয় শিরক একটি মহা জুলুম। আমল বিধ্বংসী এ কাজ সৎকর্মশীলদের সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মুশরিকের জন্য পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। সকল নবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিরক নামক ব্যাধি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে তাওহীদের আলোতে আলোকিত করা। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩ شِرْك-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّرْك لُغَة :

شِرْك-এর আভিধানিক অর্থ : شِرْك শব্দটি দু'কেরাতে পাঠ করা যায়। যথা- اَلشِّرْك শব্দটির ش-এর ওপর যবর দ্বারা। তখন অর্থ হবে- حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। বহুবচন হচ্ছে اشْرَاك বা شُرُك;

আবার اَلشِّرْك শব্দের ش-এর নিচে যের দ্বারা। তখন অর্থ হবে- اَلنَّصِيْب তথা অংশ। বহুবচন হবে اِشْرَاك; তবে শব্দটি স্বাভাবিকভাবে বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। এটি বিভিন্ন বাব থেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-

১. বাবে افعال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন বলা হয়- اَشْرَك بِاللّٰه اى جَعَل لَهٗ شَرِيْكًا فِىْ مُلْكِه অর্থাৎ, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে, অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।
২. বাবে مُفَاعلة থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে অংশীদার হওয়া। যেমন বলা হয়- فُلَانٌ يُشَارِكُ فِىْ عِلْمِ كَذَا أَىْ لَه نَصِيْبٌ مِّنْه
৩. বাবে اِفْتِعَال থেকে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া। তবে শব্দটি অধিকাংশ সময় বাবে افعال থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ হয় অংশীদার সাব্যস্ত করা।

প্রচলিত অর্থ : شِرْك-এর প্রচলিত অর্থ হলো-

১. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা। যেমন কুরআনে এসেছে- فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا
২. جَعْلُ الشَّىْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।
৩. اَلتَّشْبِيْه তথা সদৃশ করা।
৪. আল্লামা রাগেব বলেন, শিরক হচ্ছে দু'স্বত্বাধিকারের মিশ্রণ। অংশ, হিস্যা, ভাগ, সংমিশ্রণ, মিলানো, সমান হওয়া।

مَعْنَى الشِّرْك اِصْطِلَاحًا :

شِرْك-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন-

اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِه وَاُلُوْهِيَّتِه.

অর্থাৎ, শিরক হলো উলূহিয়াত ও রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন- اَلشِّرْكُ هُوَ اَنْ يَّدْعُوَ مَعَ اللّٰهِ غَيْرَه اَوْ يَصْرِفَ لَهٗ شَيْئًا مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহবান করা অথবা ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছুকে কারো দিকে ফিরানোকে শিরক বলে।
৩. আল্লামা রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী (র) বলেন, শিরক হচ্ছে আল্লাহর এমন কোনো সমকক্ষ স্থির করা, যাকে আল্লাহর মতোই ডাকা হয়, ভয় করা হয় ও তার কাছে আশা করা হয়, আল্লাহর মতোই তাকে ভালোবাসা নিবেদন করা হয়।
৪. ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান তাঁর اَلْمَدْخَلُ গ্রন্থে বলেন, শিরকের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা-

১. اَلشِّرْكُ الْعَامُّ তথা সাধারণ অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা رُبُوْبِيَّة, اُلُوْهِيَّة এবং اَلْاَسْمَاءُ وَالصِّفَات-এর মধ্যে غَيْرُ اللّٰه-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

২. اَلشِّرْكُ الْخَاصُّ তথা নির্দিষ্ট অর্থে শিরক। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে غَيْرُ اللّٰه-কে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

انْوَاعُ الشِّرْكِ الْاَصْغَرِ :

শিরকে আসগারের প্রকারসমূহ : اَلشِّرْكُ الْاَصْغَر তথা ছোট শিরক আবার দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الظَّاهِرُ তথা প্রকাশ্য শিরক,

২. اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ তথা গোপন শিরক।

اَلشِّرْكُ الظَّاهِرُ আবার দু'প্রকার। যথা–

ক. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَلْفَاظِ তথা শব্দের দ্বারা ছোট শিরক।

খ. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ بِالْاَفْعَال তথা কর্মের দ্বারা ছোট শিরক।

ক. শব্দের দ্বারা শিরক : মানুষ তার কথার মাধ্যমেও শিরক করে। যেমন–

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম দ্বারা শপথ করা। এমর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেন– مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ

২. مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ অর্থাৎ, কথা বলতে গিয়ে এরূপ বলা, আল্লাহর ইচ্ছা এবং তোমার ইচ্ছা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী–

لِمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ فَقَالَ اَجَعَلْتَنِىْ لِلّٰهِ نِدًّا قُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ۔

খ. কর্মের দ্বারা শিরক : বিপদ থেকে মুক্তির জন্য গলায় বা অন্য অঙ্গে তাবিজ, সুতা ইত্যাদি বাঁধা।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, শিরক প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক।

২. اَلشِّرْكُ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর ইবাদতে শিরক।

১. اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ-এর পরিচয় : اَلشِّرْكُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ وَاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَاَفْعَالِهِ তথা আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাবলিতে শিরক করা। এক্ষেত্রে ছোট শিরক নেই; বরং সবগুলোই বড় ও জঘন্য। এ ধরনের শিরক দু'প্রকার। যথা–

১. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ তথা সবচেয়ে বড় শিরক।

২. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ তথা সবচেয়ে ছোট শিরক।

তবে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) এ প্রকার শিরককে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

ক. شِرْكُ التَّعْطِيْل তথা আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় ও শূন্য করার শিরক। এ প্রকার শিরক নাস্তিকতার নামান্তর। যেমন ফিরাউন আল্লাহকে অস্তিত্বহীন মনে করে নিজেই রব তথা লালনপালনকারী বলে দাবি করেছিল।

খ. আল্লাহর সাথে অন্যকে স্বতন্ত্র মাবুদ সাব্যস্ত করে নেয়া। যেমন–
১. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা ও মারইয়াম (আ)-কে ইলাহ সাব্যস্ত করেছে।
২. সূর্য ও চন্দ্র পূজারিদের শিরক।
৩. নমরূদের ন্যায় কেউ নিজেকে জীবন ও মৃত্যুদাতা মনে করা।
৪. আলো ও আঁধারকে যথাক্রমে কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক মনে করা।

আল্লামা আবুল বাকা আল হানাফী (র) বলেন, শিরক ছয় প্রকার। যথা–

১. شِرْكُ الْاِسْتِقْلَالِ তথা স্বতন্ত্র মালিকানাসম্পন্ন শরীক সাব্যস্ত করা। যেমন– অগ্নিপূজারিদের শিরক।
২. شِرْكُ التَّبْعِيْضِ তথা একাধিক মাবুদের সমন্বয়ে এক মাবুদ হওয়ার বিশ্বাস করা।
৩. شِرْكُ التَّقْرِيْبِ তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় غَيْرُ اللّٰه-এর ইবাদত করা। যেমন– পীর পূজারি মুসলিম, পুরোহিত পূজারি হিন্দু ইত্যাদি।
৪. شِرْكُ التَّقْلِيْدِ তথা অন্যের অন্ধ অনুসরণে غَيْرُ اللّٰه-এর ইবাদত করা। যেমন– পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণে জাহেলদের শিরক।
৫. شِرْكُ الْاَسْبَابِ তথা প্রকৃতি পূজারি। যেমন– দুর্ঘটনাকে প্রকৃতির ক্রিয়া বলে বিশ্বাস করা।
৬. شِرْكُ الْاَغْرَاضِ তথা সম্পূর্ণ غَيْرُ اللّٰه-এর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা। যেমন– প্রকৃত মুনাফিকদের সালাত।

২. **اَلشِّرْكُ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ-এর পরিচয় :** আল জাওয়াবুল কাফী প্রণেতা বলেন–

شِرْكٌ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَمُعَامَلَتِهِ وَهٰذَا الشِّرْكُ يَنْقَسِمُ اِلٰى مَغْفُوْرٍ وَغَيْرِ مَغْفُوْرٍ وَاَكْبَرٍ وَ اَصْغَرٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সাথে করণীয় আচরণে শিরক। এ শ্রেণির শিরক মার্জনীয়, অমার্জনীয় এবং বড় শিরক ও ছোট শিরকে বিভক্ত।

ড. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল বুরাইকান বলেন– شِرْكٌ فِى الْعِبَادَةِ তিন প্রকার। যথা–

ক. اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ তথা বড় শিরক। এর অর্থ হলো– আল্লাহর কোনো সমকক্ষ স্থির করে আল্লাহর মতোই তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা।
খ. اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ তথা ছোট শিরক। এর অর্থ হলো– আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় غَيْرُ اللّٰهِ-কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা।
গ. اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ তথা গোপন শিরক। এর অর্থ হলো– মনের মধ্যে এমন কথা, গোপন ইচ্ছা ও মুখের এমন অসতর্কতামূলক কথা যাতে আল্লাহ ও غَيْرُ اللّٰهِ সমান হয়ে যায়।

উপসংহার : শিরক একটি জঘন্যতম অপরাধ। একটি শিরকের দ্বারা সারা জীবনের সমস্ত ভালো আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। তবে একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং শিরক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভপূর্বক শিরক থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٢) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ وَ الشِّرْكِ الْاَصْغَرِ؟ بَيِّنْ اَقْسَامَ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ مُفَصَّلًا۔

■ প্রশ্ন : ৮২ ॥ শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যে পার্থক্য কী? শিরকে আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শিরককারীর পরিণতি বিবেচনায় শিরককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. শিরকে আকবর, ২. শিরকে আসগর, ৩. শিরকে খফী। নিম্নে শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের মধ্যকার পার্থক্য এবং শিরকে আকবরের প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ↄ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ وَالْاَصْغَرِ :

শিরকে আকবর ও আসগরের মধ্যে পার্থক্য : শিরকে আকবর ও আসগরের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. অপরাধের দিক থেকে শিরকে আকবর সবচেয়ে বড় অপরাধের অন্তর্গত। আর শিরকে আসগর সাধারণ কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।
২. শিরকে আকবর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে থাকলেও বা ধর্মীয় কাজকর্ম করলেও আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টিতে সে মুসলিম থাকতে পারে না; কিন্তু শিরকে আসগর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না।
৩. শিরকে আকবর মুমিনের অতীতের যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। শিরকে আসগর শুধু সংশ্লিষ্ট আমলকেই ধ্বংস করে; অন্য আমলকে নয়।
৪. শিরকে আকবর থেকে তওবা করতে না পারলে তা ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়। আর শিরকে আসগর থেকে তওবা না করলেও তা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাযোগ্য অপরাধ।

ↄ اَقْسَامُ الشِّرْكِ الْاَكْبَرِ :

শিরকে আকবরের প্রকারভেদ : শিরকে আকবরের প্রকারসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন– আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) এটিকে মোট চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে– ১. জ্ঞানগত শিরক, ২. পরিচালনা বা ব্যবহারগত শিরক, ৩. উপাসনাগত শিরক, ৪. অভ্যাসগত শিরক। আবুল বাকা আল হানাফী আবার শিরককে অন্য আরো ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **শিরকুল ইসতেকলাল** (شِرْكُ الْاِسْتِقْلَالِ) : এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা পোষণ করাকে শিরকুল ইসতেকলাল বলা হয়। যেমন– অগ্নিপূজকদের শিরক; তারা যাবতীয় কল্যাণের বিষয়াদিকে 'ইয়াযদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করত, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজকে 'আহরমন' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে করত।

২. **শিরকুত তাবয়ীদ (شِرْكُ التَّبْعِيْدِ) :** একাধিক উপাস্য থেকে এক উপাস্য গঠন করাকে 'শিরকুত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন– খ্রিস্টানদের শিরক।

৩. **শিরকুত তাকলীদ (شِرْكُ التَّقْلِيْدِ) :** অন্যের অনুসরণে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকলীদ' বলা হয়। যেমন– আরব জনগণের শিরক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তিপূজা করত।

৪. **শিরকুত তাকরীব (شِرْكُ التَّقْرِيْبِ) :** আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনা করাকে 'শিরকুত তাকরীব' বলা হয়। যেমন আরবের মুশরিকরা বলত– مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ, আমরা দেবতাদের উপাসনা কেবল এজন্যই করছি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা যুমার : আয়াত ৩)

৫. **শিরকুল আসবাব (شِرْكُ الْاَسْبَابِ) :** কোনো বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে এমনটি না বলে অপর কোনো বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা বলাকে শিরকুল আসবাব বলা হয়।

৬. **শিরকুল আগরাদ (شِرْكُ الْاَغْرَاضِ) :** গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাকে 'শিরকুল আগরাদ' বলা হয়।

ড. ইবরাহীম বরীকান শিরকে আকবরকে আরো ছয় প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে– ১. আহ্বানগত শিরক, ২. উদ্দেশ্যগত শিরক, ৩. আনুগত্যগত শিরক, ৪. ভালোবাসাগত শিরক, ৫. ভয়ভীতিগত শিরক, ৬. ভরসাগত শিরক।

উপরোল্লিখিত সকল প্রকার শিরকেরই যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (র) কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে আরব সমাজে যেসব শিরকের প্রচলন ছিল, তা এ চার প্রকার শিরকের অন্তর্গত ছিল। সেজন্যই কুরআন ও হাদীসে এ চার প্রকার শিরকের সমালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লামা ইসমাঈল শহীদ কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা সরাসরি সমর্থিত, সেহেতু শিরকে আকবরকে এ চার প্রকারে বিভক্ত করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার : শিরকে আসগর শিরকে আকবরের চেয়ে কম বিপজ্জনক। শিরকে আকবরের ফলে ব্যক্তি মুমিন থেকে খারিজ হয়ে যায়; কিন্তু শিরকে আসগরের কারণে তা হয় না। খাঁটি ও পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে সকল প্রকারের শিরক থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য।

■ **اَلسُّؤَالُ (٨٣) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ؟ اَوْضِحْ اَوْصَافَ الْكَافِرِيْنَ بِالْاِيْجَازِ.**

■ প্রশ্ন : ৮৩ ॥ কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য কী? কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। এটা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা, অভদ্রতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। এটা আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করে, যার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। মুশরিকের জন্য পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ :

কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য : কুফর ও শিরকের মাঝে অর্থগত ও মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. **আভিধানিক পার্থক্য :** اَلْكُفْرُ-এর আভিধানিক অর্থ اَلسَّتْرُ তথা গোপন করা, اَلْجُحُوْدُ তথা অস্বীকার করা, اَلْكِتْمَانُ তথা গোপন করা বা ঢেকে রাখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ-

পক্ষান্তরে اَلشِّرْكُ শব্দের আভিধানিক অর্থ–

১. حِبَالَةُ الصَّيْدِ তথা শিকারের রশি। ২. اَلنِّدُّ তথা সমকক্ষ মনে করা।

৩. اَلتَّشْبِيْهُ তথা সদৃশ করা।

৪. جَعْلُ الشَّيْءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

খ. **পারিভাষিক পার্থক্য :** কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهِ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।

পক্ষান্তরে শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–

اَلشِّرْكُ هُوَ جَعْلُ شَرِيْكٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ رُبُوْبِيَّتِهِ وَاُلُوْهِيَّتِهِ-

অর্থাৎ, শিরক হলো উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা।

গ. **বিধানগত পার্থক্য :** ১. শিরক হলো عَامٌّ আর কুফর হলো خَاصٌّ;

২. মুশরিক আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করে না; বরং তার সাথে অন্যকেও অংশীদার সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে কাফের আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।

৩. শিরকে খফী বা আসগরের ফলে মুমিন কবীরা গুনাহকারী হয়, ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে কুফর কাউকে ঈমান থেকে বের করে দেয়।

اَوْصَافُ الْكَافِرِيْنَ :

কাফেরের বৈশিষ্ট্যাবলি : ১. কাফেররা অত্যাচারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

২. কাফেররা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

৩. তারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ-

৪. তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে গোপন করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى-

৫. তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মুমিনের অভিশাপ। যেমন কুরআনে এসেছে–
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

৬. তাদের অন্তরে ভয়ভীতি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–
سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ.

৭. তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–
اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ.

৮. তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ.

৯. তারা নিজেরা আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত থাকে এবং মানুষকে বিরত রাখে। যেমন–
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلَالًا بَعِيْدًا.

১০. নির্বোধদের ন্যায় আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও কুরআন হাদীসে কাফেরদের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উপসংহার : শিরক হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর কুফর হলো আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। যার অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, সেই প্রকৃত কাফের। তবে কবীরা গুনাহকারী কিবলার অনুসারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয নেই।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٤) : تَحَدَّثْ عَنْ مَظَاهِرِ الشِّرْكِ فِى الْعِبَادَاتِ اَلَّتِىْ ظَهَرَتْ كَثِيْرًا فِى الْمُجْتَمَعِ الْاِسْلَامِىِّ.

■ প্রশ্ন : ৮৪ ॥ ইসলামী সমাজে বহুল প্রচলিত ইবাদতগত শিরকসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : শিরকের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে اَلشِّرْكُ فِى الْعِبَادَاتِ অন্যতম। এক্ষেত্রে বান্দা ইবাদত মনে করেই শিরক করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত ইবাদতগত অনেক শিরক রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় শিরক নিম্নে আলোচনা করা হলো।

➲ اَلشِّرْكُ فِى الْعِبَادَاتِ فِى الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত উপাসনাগত শিরক : আমাদের দেশের অনেক মুসলিম অলীদেরকে কেন্দ্র করে যেসব ধারণা পোষণ করেন এবং তাঁদের কবর বা মাযারকে কেন্দ্র করে যেসব কর্ম করেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের অনেকেই আরবের মুশরিকদের ন্যায় আল্লাহর ইবাদতে অলীগণকে শরীক করে নিয়েছেন। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা আরবের মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন। নিম্নে তাদের কতিপয় শিরকী কর্মের উদাহরণ দেয়া হলো।

১. **অলীদের নিকট কিছু কামনা করা :** মানুষের জীবনে এমন অনেক প্রয়োজন রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অপর কেউ পূরণ করতে পারে না। সেসব প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে– সন্তান দান, রোগমুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্ম করে, তা আল্লাহ তায়ালার কাছেই কামনা করতে হয়; কিন্তু অনেক মাযার যেয়ারতকারীগণ এ জাতীয় বিষয়াদিও অলীগণের নিকট কামনা করে থাকেন, যা সুস্পষ্ট শিরক।

২. **অলীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা :** যে বিপদে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যায় না, সে রকম বিপদে অলীদেরকে ইয়া গাউস, ইয়া খাজা, ইয়া গরীব নেওয়াজ ইত্যাদি বলে নিকট বা দূরদূরান্ত থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা, যার প্রচলন অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে।

৩. **যিকির করার জন্য কবরের পার্শ্বে অবস্থান করা :** আল্লাহর ইবাদতের জন্য কবর কোনো অবস্থানস্থল না হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলিমকে কবরের পার্শ্বে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত আদায় করতে দেখা যায়। কিছু সময় বসে নিরিবিলি আরাধনা করতেও দেখা যায়। কোনো মাযার বা দরবার যেহেতু মসজিদ নয়, সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের জন্য সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করলে তা বিদয়াতি কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। কেউ যদি কোনো মাযারে অবস্থানের দ্বারা কবরস্থ অলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চায়, তাহলে তার এ অবস্থান সময়কার উপাসনা শিরকী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। কেননা যুগে যুগে মুশরিকরা তাদের দেবতাদের পার্শ্বে এ জাতীয় উদ্দেশ্যেই অবস্থান গ্রহণ করত বলে 'সূরা ত্বহা'-এর ৯১ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাছাড়া রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কর্মে আমার সাথে অপরকে শরীক করল, আমি তাকে ও তার কর্মকে ছেড়ে দেই।

৪. **কবরকে সামনে রেখে রুকু ও সেজদা করা :** রুকু ও সেজদা আল্লাহর তাযীম প্রদর্শনের একক মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও অনেক পীর ভক্তকে তাদের পীরকে সেজদার মাধ্যমে সম্মান করতে দেখা যায়। মানুষ কোনো মানুষকে এভাবে সম্মান করলে এটি একটি প্রত্যক্ষ শিরকী কর্ম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৫. **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সেজদা করা :** কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা শিরক। আমরা দেখেছি, কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে বারংবার নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল আলেম একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সেজদা করা শিরক। কারণ ইবাদত ছাড়া বা চূড়ান্ত ভক্তির প্রকাশ ছাড়া কেউ কাউকে সেজদা করে না। জাগতিক ভয়ভীতি, সম্মান ইত্যাদির জন্য একজন আরেকজনের পা জড়িয়ে ধরতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একমাত্র অলৌকিক ও অপার্থিব ভক্তি ও বিনয় ছাড়া কেউ কারো জন্য সেজদা করে না।

আল্লামা ইবনে আবেদীন (র) বলেন–

وَالسُّجُوْدُ اَصْلٌ لِاَنَّهٗ شُرِعَ عِبَادَةً بِلَا قِيَامٍ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالْقِيَامُ لَمْ يُشْرَعْ عِبَادَةً وَحْدَهٗ ـ حَتّٰى لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُكَفَّرُ بِخِلَافِ الْقِيَامِ ـ

অর্থাৎ, সেজদাই হলো মূল। কারণ সেজদা কেবল ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম তথা দণ্ডায়মান হওয়া তদ্রূপ নয়। কেবল দাঁড়ানোও ইবাদত হিসেবে শরীয়তে নির্ধারিত নয়। এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সেজদা করে, তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে, দাঁড়ানোর বিষয়টি তদ্রূপ নয়।

উপসংহার : বর্তমানে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরক ও বিদয়াত মযবুতভাবে গেঁড়ে বসেছে। সমাজকে এ সকল ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় থেকে মুক্ত করতে না পারলে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি সুদূর পরাহত হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٥) : مَا مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ بِالتَّفْصِيْلِ-

■ **প্রশ্ন : ৮৫ ॥ 'কুফর'-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও।** [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কুফর ঈমানের বিপরীত শব্দ। এটা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সীমারেখা থেকে হিংস্রতা, অকৃতজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার মনোভাব সত্যিই ভ্রান্ত ও পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানুষ যেহেতু বিবেকসম্পন্ন প্রাণী, তাই তার মধ্যে এ গুণের সঞ্চার কাম্য নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে কুফর সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ كُفْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْكُفْرِ لُغَةً :

كُفْر-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْكُفْر শব্দটি বাবে نَصَر-এর মাসদার। যা ك - ف - ر মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. جُحُوْدُ النِّعْمَةِ وَالْاِحْسَانِ তথা নেয়ামত ও অনুগ্রহের অস্বীকার করা। যেমন হাদীসে রয়েছে– يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

২. اَلسَّتْرُ তথা আবৃত করা। যেমন কবির উক্তি– فِيْ لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُوْمَ غَمَامُهَا اَيْ سَتَرَهَا

৩. اَلتَّغْطِيَةُ তথা ঢেকে ফেলা। ৪. سَتْرُ الْحَقِّ তথা সত্যকে গোপন করা।

৫. اَلْاِخْتِفَاءُ তথা লুকিয়ে ফেলা। ৬. اَلظُّلْمَةُ তথা অন্ধকার।

৭. نَقِيْضُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের বিপরীত।

৮. نَقِيْضُ الشُّكْرِ তথা কৃতজ্ঞতার বিপরীত।

৯. ইবনে রাওয়ানদী বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ الْجَحْدُ وَالْاِنْكَارُ وَالسَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ

১০. اَلْبُغْضُ তথা হিংসা। যেমন আরবরা বলে– كُفْرٌ عَلٰى كُفْرٍ অর্থাৎ بُغْضٌ عَلٰى بُغْضٍ

১১. আল মুহীতু ফিল লুগাত গ্রন্থে রয়েছে– اَلْكُفْرُ هُوَ الْعِصْيَانُ وَالْاِقْتِنَاعُ অর্থাৎ, অবাধ্যতা ও বিরত থাকা।

مَعْنَى الْكُفْرِ شَرْعًا :

كُفْر-এর শরয়ী অর্থ : ১. তাফসীরে বায়যাবী প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ بِهٖ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আনীত বিধান অস্বীকার করাই কুফর।

২. কিতাবুত তাওহীদ প্রণেতা বলেন– اَلْكُفْرُ عَدَمُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনাই হলো কুফর।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْكُفْرُ اِنْكَارُ مَا عُلِمَ مَجِيْءُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مِمَّا اشْتَهَرَ۔

৪. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন– اَلْكُفْرُ هُوَ اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করাকে কুফর বলে।

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– كَفَرَ الرَّجُلُ كُفْرًا اَىْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْوَحْدَانِيَّةِ اَوِ النُّبُوَّةِ اَوِ الشَّرِيْعَةِ اَوْ بِثَلَاثَتِهَا অর্থাৎ, ব্যক্তি কর্তৃক কুফরী করার মানে হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ অথবা নবুয়ত অথবা শরীয়ত অথবা একই সাথে উপরিউক্ত তিনটির কোনোটির প্রতি ঈমান না আনা।

اَقْسَامُ الْكُفْرِ :

كُفْر-এর প্রকারভেদ : তাফসীরে খাযেন প্রণেতা বলেন, কুফর চার প্রকার। যথা–

১. كُفْرُ الْاِنْكَارِ তথা অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী। এটা বলা হয়– وَهُوَ اَنْ لَا يَعْرِفَ اللّٰهَ اَصْلًا অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে মূলগতভাবে আল্লাহকে চিনে না। যেমন ফিরাউনের কুফরী এবং তার কথা–

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ۔

২. كُفْرُ الْجُحُوْدِ তথা অস্বীকৃতির কুফরী। এটা বলা হয়– وَهُوَ اَنْ يَعْرِفَ اللّٰهَ اَصْلًا بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে মূলগতভাবে আল্লাহকে চিনে কিন্তু মুখে তা স্বীকার করে না। যেমন শয়তানের কুফরী।

৩. كُفْرُ الْعِنَادِ তথা সীমালঙ্ঘনের কুফরী। এটা বলা হয়– هُوَ اَنْ يَعْرِفَ اللّٰهَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يُدَيِّنَ بِهِ অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনে এবং মুখে স্বীকার করে; কিন্তু ঐ আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করে না। যেমন রাসূল (স)-এর চাচা আবু তালেবের কুফরী। এ ব্যাপারে তার কবিতা রয়েছে–

وَلَقَدْ عَلِمْتَ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ * مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا۔

لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا۔

৪. كُفْرُ النِّفَاقِ তথা নেফাকীর কুফরী। এটা বলা হয়–

هُوَ اَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ ذٰلِكَ بِقَلْبِهِ۔

অর্থাৎ, এ প্রকার কুফরী হয় ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে মুখে স্বীকার করে কিন্তু তার সত্যতা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করে না।

উপসংহার : কুফরী খোদাদ্রোহী কাজ। এর দ্বারা মূলত আল্লাহকে অস্বীকার করা হয়। এ কাজ যারা করে তারা চির জাহান্নামী। এদের সাথে বন্ধুত্ব করাও ইসলামের সাথে দুশমনীর শামিল। তাই কুফর থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা আবশ্যক।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٦) : هَلِ الشَّتْمُ وَالْكِذْبُ عَلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ؟ اَوْضِحْ بِالْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ وَالْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ۔

■ প্রশ্ন : ৮৬ ॥ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে গালি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা কি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

او ۔ هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الشَّاتِمِ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ حَدَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ (صـ) وَحَدَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ۔

অথবা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালিদাতার তওবা কী কবুল হবে? অতঃপর যে ব্যক্তি নবী (স)-কে গালি দেয় ও তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করে তার শাস্তি বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা হিসেবে এ পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষক হিসেবে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠিয়েছেন। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া বা মিথ্যারোপ করাকে আমাদের ওপর হারাম করেছেন। আর তাঁদেরকে সম্মান করাকে আবশ্যকীয় করেছেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

⊃ حُكْمُ الشَّتْمِ عَلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ :

আল্লাহ ও রাসূলকে গালি দেয়ার হুকুম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া সকল ফকীহের মতে কবীরা গুনাহ ও কুফরী। এ সম্পর্কে ফকীহদের মতামতসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে–

اِنَّ سَبَّ اللّٰهِ اَوْ سَبَّ رَسُوْلِهِ كُفْرٌ ظَاهِرًا اَوْ بَاطِنًا، سَوَاءٌ كَانَ السَّابُّ يَعْتَقِدُ اَنَّ ذٰلِكَ مُحَرَّمٌ اَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لَهُ اَوْ كَانَ ذَاهِلًا عَنْ اِعْتِقَادِهِ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া প্রকাশ্য কুফর। হোক তা প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে। এক্ষেত্রে গালিদাতা এটাকে তার ওপর হারাম মনে করুক কিংবা হালাল মনে করুক। অথবা এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকুক।

২. **ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে–**

مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ (صـ) قُتِلَ، وَذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا شَتَمَ فَقَدْ اِرْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ، وَلَايَشْتِمُ مُسْلِمٌ النَّبِيَّ (صـ)۔

অর্থাৎ, রাসূল (স)-কে যে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে যখন গালি দেয়, তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর কোনো মুসলিম রাসূল (স)-কে গালি দিতে পারে না।

৩. কাযী আবি ইয়াল (র)-এর মতে– **مَنْ سَبَّ اللّٰهَ اَوْ سَبَّ رَسُوْلَهُ فَاِنَّهُ يَكْفُرُ سَوَاءٌ اِسْتَحَلَّ سَبَّهُ اَوْ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে** গালি দিল সে কাফের হলো। হোক সে গালিটাকে হালাল মনে করুক কিংবা **হারাম মনে করুক।**

৪. ইবনে রাওয়াহিয়া (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দিল কিংবা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করল অথবা কোনো নবীকে হত্যা করল, সে তার দ্বারা কাফের হয়ে গেল। যদিও সে আল্লাহর নাযিলকৃত সবকিছু বিশ্বাস করে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল নিম্নরূপ–

কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

হাদীসের দলীল : হাদীসে এসেছে–

١ـ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّٰى مَاتَتْ. فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا (ابو داود)

٢ـ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ اَغْلَظَ رَجُلٌ لِاَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ. فَقُلْتُ اَقْتُلُهُ ـ فَانْتَهَرَنِىْ وَقَالَ لَيْسَ هٰذَا لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (صحيح النسائى) ـ

⊃ هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الشَّاتِمِ اَمْ لَا :

গালিদাতার তওবা কবুল হবে কিনা : এ ব্যাপারে দুটি মাসয়ালা বিদ্যমান। আর তা হলো–

ক. তার তওবা আখেরাতে কাজে আসবে কিনা : এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো–

اِذَا تَابَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، وَنَدِمَ عَلٰى فِعْلٍ، أَنَّ هٰذِهِ التَّوْبَةَ تَنْفَعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ ـ

অর্থাৎ, যদি সে একনিষ্ঠভাবে তওবা করে এবং তার কাজের ওপর অনুতপ্ত হয়, তবে তার তওবা কেয়ামত দিবসে কাজে আসবে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হলো–

١ـ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ـ

٢ـ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

٣ـ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ

খ. তার তওবা দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. জমহুর আলেমের মতে– تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَيَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنْهُ অর্থাৎ, তার তওবা দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে কতল করা যাবে না।

২. ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে– لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، فَيُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ অর্থাৎ, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে কতল করা হবে, যদিও সে তওবা করে।

حَدُّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ (صـ) :

রাসূল (স)-কে গালিদাতার শাস্তি : এ ব্যাপারে ফকীহদের বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গালিদাতাকে হত্যা করতে হবে। আর এটা সকলের ঐকমত্য।

২. ইবনে মুনযির (র) বলেন–

أَجْمَعَ عَوَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ حَدَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ (صـ) الْقَتْلُ۔

৩. আবু বকর আল ফারেসী (র) বলেন–

اِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَنَّ حَدَّ مَنْ يَّسُبُّ النَّبِيَّ (صـ) الْقَتْلُ۔

৪. আল খাত্তাবী (র) বলেন–

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِخْتَلَفَ فِيْ وُجُوْبِ قَتْلِهِ۔

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন–

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : كُلُّ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ (صـ) أَوْ تَنَقَّصَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ۔ وَأَرٰى أَنْ يُقْتَلَ وَلَا يُسْتَتَابَ۔

৬. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اِنَّ عَهْدَ الذِّمِّيِّ يَنْتَقِضُ بِسَبِّ النَّبِيِّ (صـ) وَاِنَّهُ يُقْتَلُ۔

حُكْمُ الْكِذْبِ عَلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ عَمَدًا :

ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যারোপকারীর হুকুম : ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপকারীর ব্যাপারে সকল আলেমের মত হলো সে কাফের। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

١۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

٢۔ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ۔

ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (স)-এর ওপর কেউ মিথ্যারোপ করলে সে ফাসেক হবে, না কাফের হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **আহলুস সুন্নাতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (স)-এর ওপর কেউ মিথ্যারোপ করলে সে কাফের হবে না; বরং সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের কারণে ব্যক্তি কাফের হয় না; বরং ফাসেক হয়। এ ব্যাপারে তাদের দলীল নিম্নরূপ–

কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

١۔ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ۔

٢۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ۔

٣۔ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ۔

হাদীসের দলীল : হাদীসে এসেছে–

١- اِنَّ كِذْبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكِذْبٍ عَلٰى اَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- (رواه مسلم)

٢- لَا تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ- (رواه البخارى)

٣- مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ-

২. **খারেজীদের অভিমত :** খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, এরূপ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে এবং সে চিরজাহান্নামী হবে। কেননা রাসূল (স) বলেন–
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

৩. **মুতাযিলাদের অভিমত :** মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সে কাফেরও হবে না আবার মুমিনও থাকবে না; বরং তার অবস্থান হলো– مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ অর্থাৎ, ঈমান ও কুফরির মাঝামাঝিতে সে অবস্থান করবে। আর উক্ত ব্যক্তি চিরজাহান্নামী হবে।

➲ حَدُّ مَنْ كَذَبَ عَلَى الرَّسُوْلِ :

রাসূলের ওপর মিথ্যারোপকারীর শাস্তি : ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যারোপ করে, তার শাস্তি কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. **একদল আলেমের অভিমত :** حَدُّ قَذْفٍ-এর ওপর কেয়াস করে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–
وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً-

২. **কতিপয় আলেমের অভিমত :** এরূপ ব্যক্তি কাফের হবে এবং তাকে হত্যা করতে হবে। তবে ইমামুল হারামাইন এ মতটিকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

৩. **অন্যদের অভিমত :** এ ব্যাপারটি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি সর্বোচ্চ ৮০টি বেত্রাঘাত এবং সর্বনিম্ন ৩৯টি বেত্রাঘাত করতে পারবেন।

মোটকথা, এখানে প্রথম অভিমতটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

উপসংহার : অতএব উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-কে গালি দেয়া কিংবা তাঁদের ওপর মিথ্যারোপ করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ ও রাসূলকে গালিদাতার হুকুম হলো, সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা হবে। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃত আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা সরাসরি কুফরী; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা ফাসেকী। তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং তওবা করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (٨٧) : عَرِّفِ النِّفَاقَ ثُمَّ اكْتُبْ اَقْسَامَهٗ وَحُكْمَهٗ بِالْاِخْتِصَارِ۔

■ প্রশ্ন : ৮৭ ॥ نفاق-এর পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারসমূহ ও হুকুম সংক্ষেপে লেখ। [ফা. প. ২০১০,'১৪,'১৫]

اَوْ- عَرِّفِ النِّفَاقَ بِالْاِخْتِصَارِ ثُمَّ اذْكُرْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔

অথবা, নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতসমূহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২]

اَوْ عَرِّفِ النِّفَاقَ مَعَ بَيَانِ اَقْسَامِهٖ وَحُكْمِهٖ۔

অথবা, نِفَاق-এর পরিচয় প্রদানপূর্বক এর প্রকারভেদ ও বিধান বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নেফাক বা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম ক্ষতিকর বিষয়। এটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। কাফের মুশরিকরা সরাসরি ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত; কিন্তু মুনাফিকরা ছদ্মবেশে প্রতারণা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে। এরা হৃদয়ে কুফরী ও শিরক গোপন রেখে কেবল সাময়িক সুবিধা লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে নেফাকের পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ نِفَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى النِّفَاقِ لُغَةً :

نِفَاق-এর আভিধানিক অর্থ : اَلنِّفَاقُ শব্দটি فِعَال ওযনে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। যা ن - ف - ق মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. اَلنَّقْبُ الْخَافِضُ مِنَ الْاَرْضِ তথা ভূমির নিচের গর্ত।

২. اِظْهَارُ خِلَافِ مَا يَبْطُنُ তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা।

৩. اِخْفَاءُ الْاَصْلِ তথা মূলকে গোপন করে রাখা।

৪. اَلْمَرَضُ তথা রোগ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী– فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَىْ نِفَاق

مَعْنَى النِّفَاقِ اِصْطِلَاحًا :

نِفَاق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. اَلتَّعْرِيْفَات প্রণেতা বলেন–

اَلنِّفَاقُ هُوَ اِظْهَارُ الْاِيْمَانِ بِاللِّسَانِ وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ۔

অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক।

২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন– اَلنِّفَاقُ اِسْرَارُ الْكُفْرِ وَاِظْهَارُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকাশ করাকে নেফাক বলা হয়।

৩. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত–

قِيْلَ لَهٗ مَا النِّفَاقُ؟ قَالَ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْاِسْلَامِ وَلَا يَعْمَلَ بِهٖ۔

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন– اَلنِّفَاقُ هُوَ اَنْ يَظْهَرَ الْاِسْلَامَ وَيَبْطُنَ الْكُفْرَ

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– اَلنِّفَاقُ اَلْاِظْهَارُ خِلَافَ مَا يَبْطُنُ

৩ عَلَامَاتُ النِّفَاقِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ :

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নেফাকের আলামতসমূহ : নেফাক তথা কপটতা ও ধোঁকার যাবতীয় আলামত ও বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীসে এদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের আলামত : কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের আলামতগুলো হলো–

১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও উপহাস করা।
সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন–
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ۔

২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ۔ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ (سورة التوبة - ٦٧)

৩. তাদের দানের হাত সংকুচিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا۔

৪. মুমিনদের সম্পর্কে তারা বিরূপ মন্তব্য করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔

৫. মুনাফিক তাগুত তথা কাফেরের নিকট বিচারের ভার অর্পণ করতে চায়। যেমন কুরআনে এসেছে–
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ۔ (سورة النساء - ٦٠)

৬. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

৭. শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা আল্লাহকে ভুলে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন– اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

৮. তারা অলসভাবে নামাযে দাঁড়ায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–
وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى۔

৯. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–
يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا۔

১০. তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ۔
১১. তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যেমন কুরআনের বাণী–
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔
১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔
১৩. তারা কথা বললে মিথ্যা বলে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ۔
১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔
১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ ۔ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۔
১৬. তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–
هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

খ. হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের আলামত : হাদীসে রাসূল (স) মুনাফিকদের আলামত উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন–
اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔
অন্য হাদীসে এসেছে– وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো–

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে।
৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ৪. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে।

উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (স) আরেকটি হাদীসে বলেন–
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا ۔ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى)۔

৫. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে।
৬. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়।

اَقْسَامُ النِّفَاقِ :

نِفَاق-এর প্রকারভেদ : نِفَاق প্রথমত দু'প্রকার। যথা–

১. اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى তথা বিশ্বাসগত নেফাক।
২. اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِى তথা আমলগত নেফাক।

৩ حُكْمُ النِّفَاقِ :

নেফাকের বিধান : উভয় প্রকার নেফাকের বিধান নিম্নে আলোচনা করা হলো–

اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى-এর বিধান : اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى তথা বিশ্বাসগত নেফাকের বিধান নিম্নরূপ–

১. **তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে :** কেয়ামত দিবসে মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

١- اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ الخ-

٢- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ الخ-

٣- بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا-

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুনাফিকরা জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

২. **মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয :** আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ- اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৩. **মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ-

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর আর না কর, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তথাপি কখনো তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

৪. **মুনাফিকদের জানাযা আদায় ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ কপটবিশ্বাসীদের জানাযা আদায় ও কবর যেয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন– وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না।

৫. **মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা :** মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا-

অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে।

اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِى-এর বিধান : اَلنِّفَاقُ الْعَمَلِى-এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলতে হবে না। তাই বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে তাদেরকে مُنَافِقٌ فِى الْعَمَلِ বলা হবে, যা ঈমানের পরিপন্থি নয়।

১. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, نِفَاق দু'প্রকার। যথা– আকিদাগত নেফাক ও আমলগত নেফাক। আমাদের যুগে মুসলিমদের মধ্যে নেফাকের উল্লিখিত নিদর্শনগুলো বিদ্যমান থাকলেও তারা হাদীস অনুযায়ী খাঁটি মুনাফিক নয়। কারণ তাদের নেফাক হচ্ছে আমলগত, যা ঈমানের পরিপন্থি নয়। তাই তারা مُخَلَّدٌ فِى النَّارِ হবে না।

২. **নবুবীর অভিমত :** ইমাম নবুবী (র) বলেন, সে যুগের মুসলিমদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো বেশি ছিল বলে রাসূল (স) এগুলোকে عَلَامَةُ النِّفَاقِ বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানে পাওয়া গেলেই তাকে مُنَافِق خَالِص বলা হবে; বরং এ স্বভাবগুলো বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের, মুনাফিক কোনোটাই বলা যাবে না। তবে ফাসেক মুমিন বলা যাবে।

৩. **কাযী আয়াযের অভিমত :** আল্লামা কাযী আয়ায (র) বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রাসূল (স)-এর যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল, বর্তমানে এ স্বভাবের লোকেরা প্রকৃত মুনাফিক নয়।

৪. **কতিপয়ের অভিমত :** কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো মুসলমানের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে مُشَبَّه بِالْمُنَافِقِ বলা হবে।

উপসংহার : নেফাক মানবচরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাই মুনাফিকী আচরণ পরিহার এবং মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ **اَلسُّؤَالُ (٨٨) : اُذْكُرِ الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةَ وَالْاَحَادِيْثَ النَّبَوِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّفَاقِ وَالْمُنَافِقِيْنَ۔**

■ **প্রশ্ন : ৮৮ ॥ নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী হতে উদ্ধৃত কর।** [ফা. প. ২০১৩]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : নেফাক বা মুনাফিকী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম ক্ষতিকর বিষয়। এটি ঘৃণ্য আচরণ ও জঘন্য অপরাধ। কাফের মুশরিকরা প্রকাশ্যে ইসলামের ক্ষতিসাধন করে; কিন্তু মুনাফিকরা ছদ্মবেশে ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতিসাধন করে থাকে। এরা অন্তরে কুফরী ও শিরক গোপন রেখে কেবল সাময়িক সুবিধা লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য ঈমান ও ইসলাম জাহির করে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে নিফাক ও মুনাফিকদের চরম পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

◙ اَلْاٰيَاتُ الْقُرْاٰنِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّفَاقِ وَالْمُنَافِقِيْنَ :

নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ : নেফাক একটি ঘৃণ্য আচরণ ও জঘন্য অপরাধ। নেফাকীর কারণে পরকালে মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদের যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে–

١۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا۔

٢۔ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

٣- بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۔

٤- يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ بِهِمْ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا۔

٥- يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا۔

٦- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ۔

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ۔

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের কবর যেয়ারত করতেও নিষেধ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ۔

অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে কখনো তার জানাযার সালাত পড়াবেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।

একসময় মুনাফিকদের জঘন্য আচরণের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা ও হত্যা করা বৈধ ছিল। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে।

اَلْاَحَادِيْثُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّفَاقِ وَالْمُنَافِقِيْنَ :

নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে হাদীসমূহ : মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলিমদের চির শত্রু। কাজেই মুসলিম সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। তাদের চিহ্নিত করণের সুবিধার্থে রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসে তাদের কতিপয় নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী–

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। যথা– ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৩. তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَة (رضـ) قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ.

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, এমন দু'টি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। একটি হচ্ছে সুস্বভাব আর অপরটি হচ্ছে দীনের যথার্থ জ্ঞান।

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ الْحِكْمَةَ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ.

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, এ উম্মতের এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয়, যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে যুলুমের সাথে।

উপসংহার : নেফাক মানব চরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ কারণে মুনাফিকদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কাজেই মুনাফেকী আচরণ পরিহার এবং মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ السُّؤَالُ (٨٩) : اَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ مَا هِىَ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَضْرَارَ النِّفَاقِ فِى الْحَيَاةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ.

■ প্রশ্ন : ৮৯ ॥ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।

اَوْ مَا هِىَ اَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ؟ وَمَا حُكْمُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَضْرَارَ النِّفَاقِ فِى الْحَيَاةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ.

অথবা, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি কী কী? প্রকৃত মুনাফিকের বিধান কী? অতঃপর সামাজিক জীবনে নেফাকের কুফলগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : যুগে যুগে কাফের ও মুশরিকরা যত না দীনের ক্ষতি সাধন করেছে; কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুনাফিকরা তার চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছে। এরা পার্থিব স্বার্থ হাসিল ও ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে অন্তরে কুফর ও শিরক লালন করে; কিন্তু বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে। কুরআন ও হাদীসে এদের পরিচয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এদের ভয়াবহ পরিণতি এবং মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। নিম্নে মুনাফিকদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও সমাজে নেফাকীর ক্ষতির প্রভাব আলোচনা করা হলো।

⊃ اَوْصَافُ الْمُنَافِقِيْنَ :

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলি : কপটতা ও ধোঁকার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের মাঝে বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীসে এদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এসেছে।

ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য : কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও উপহাস করা।

সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন–

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.

২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ হতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ . وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ . (سورة التوبة – ٦٧)

৩. তাদের দানের হাত সংকুচিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا .

৪. মুমিনদের সম্পর্কে তারা বিরূপ মন্তব্য করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

৫. মুনাফিক তাগুত তথা কাফেরের নিকট বিচারের ভার অর্পণ করতে চায়। যেমন কুরআনে এসেছে–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ . (سورة النساء – ٦٠)

৬. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৭. শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা আল্লাহকে ভুলে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন– اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

৮. তারা অলসভাবে নামাযে দাঁড়ায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى .

৯. তারা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا .

১০. তারা ঈমান ও কুফরীর মাঝে দোদুল্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ .

১১. তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যেমন কুরআনের বাণী–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .

১২. তারা সুমিষ্ট ভাষায় মানুষের মনে আঘাত করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ .

১৩. তারা কথা বললে মিথ্যা বলে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ـ

১৪. তারা শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১৫. তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ ـ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ـ

১৬. তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে নিষেধ করে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ـ

খ. **হাদীসের আলোকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য :** হাদীসে রাসূল (স) মুনাফিকদের আলামত উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেন– اٰيَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ; অন্য হাদীসে এসেছে– وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো–

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে।
৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ৪. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে।

উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (স) আরেকটি হাদীসে বলেন–

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ (صـ) قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ـ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا ـ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى) ـ

৫. নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করে।
৬. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়।

حُكْمُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ :

প্রকৃত মুনাফিকের হুকুম : খাঁটি মুনাফিক তথা مُنَافِقٌ فِى الْاِعْتِقَادِ কাফের কিনা, এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. **জমহুরের অভিমত :** অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ একমত যে, খাঁটি মুনাফিক নিঃসন্দেহে কাফের ও চিরজাহান্নামী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

١ـ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

٢ـ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ـ

٣ـ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ـ

খ. **আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত :** যেহেতু তাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তাই তাদের সাথে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَة-এর ন্যায় আচরণ করতে হবে। যদি সে বাস্তবে مُنَافِق فِى الْاِعْتِقَاد হয়ে থাকে, তার হুকুম বর্ণনায় عَقِيْدَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة-এর গ্রন্থকার বলেন–

وَحُكْمُهُ اَنَّهُ كُفْرٌ اَكْبَرُ وَمُخْرِجٌ مِّنَ الدِّيْنِ بِالْكُلِّيَّةِ ووجب لِلْخُلُوْدِ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

গ. **আবদুর রহমান সালেহের অভিমত :** তিনি বলেন–

اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِىُّ اَوِ النِّفَاقُ الْاَكْبَرُ اَلْمُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ وَالْمُوْجِبُ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

ঘ. **নবুবীর অভিমত :** ইমাম নবুবী (র)-এর মতে– اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا হাদীসে খাঁটি মুনাফিক দ্বারা مُنَافِقُ الْعَمَل উদ্দেশ্য। এখানে مُبَالَغَة বোঝাতে خَالِصًا শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। খাঁটি মুনাফিক مُنَافِق اِعْتِقَادِى নিঃসন্দেহে কাফের।

৩ : اَضْرَارُ النِّفَاقِ فِى الْحَيَاةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ

সামাজিক জীবনে نِفَاق-এর কুফল : نِفَاق এমন একটি ব্যাধি, যার কুফল গোটা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। সামাজিক জীবনে এর কুফল মারাত্মক এবং মানবতাবিধ্বংসী। নিম্নে কুফলের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো–

১. মুনাফিক হলো জঘন্য কাফের। কেননা সে অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে।
২. কুরআনে নেফাকীকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
৩. মুনাফিক মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু।
৪. সমাজে সে হয় সবচেয়ে ঘৃণিত।
৫. নেফাক সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ।
৬. এটা সমাজের বন্ধনকে ছিন্ন করে।
৭. এটা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ধ্বংস করে।
৮. নেফাকের ব্যাপকতা কখনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।
৯. নেফাক ধর্মের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে বহুদলে বিভক্ত করে দেয়।
১০. এটা সমাজে পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদের বিস্তার ঘটায়।
১১. মুনাফিক সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে সদা তৎপর থাকে।
১২. সে দেশ ও জাতির শত্রু।
১৩. সে দেশ ও জাতির ধ্বংস সাধনে সবধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে সদা তৎপর থাকে।
১৪. বহিঃশত্রু ও কাফেরদের সাথে গোপন আঁতাত গড়ে তোলে।
১৫. মূলত সে দেশ, জাতি ও ধর্মের ক্ষতি সাধনে ইবলিসের যোগ্য প্রতিনিধি।

উপসংহার : নেফাক ইসলামের ছদ্মাবরণে তাগুতী শক্তি। যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা ইসলামের জঘন্য দুশমন। তাই এদের অনিষ্টতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বার বার মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٠) : مَاذَا تَعْرِفُ عَنِ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِيِّ؟ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ ـ

■ **প্রশ্ন : ৯০ ॥ اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى বলতে কী বুঝ? এর বিধান বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নেফাক জঘন্য অপরাধ। এর মধ্যে আকিদাগত নেফাক জঘন্যতম। তারা ছদ্মবেশে নেফাকী গোপন রেখে প্রতারণা ও ছলছাতুরীর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের সীমাহীন ক্ষতি করে থাকে। এদের সম্পর্কে মুসলিমদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত।

⊃ تَعْرِيْفُ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِىِّ :

اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى তথা আকিদাগত নেফাকের পরিচয় : আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত নেফাককে আকিদাগত নেফাক বলা হয়। যেমন– কেউ বাহ্যত শরীয়তের নির্দেশাবলি ও নিষেধসমূহের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রকাশ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতাস্বরূপ অন্তরের অন্তস্তলে সে কুফরকে গোপন রাখে। যার মনের অবস্থা এমনটি হয়ে থাকে, সেই প্রকৃত মুনাফিক। এ জাতীয় লোকদেরকে ইসলামী পরিভাষায় যিন্দীকও বলা হয়ে থাকে। এদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিকদের অবস্থান হচ্ছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে (সূরা নিসা : ১৪৫)। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ জাতীয় নেফাক মদিনার আওস ও খাযরাজ এ দুটি গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল।

⊃ حُكْمُ النِّفَاقِ الْاِعْتِقَادِىِّ :

اَلنِّفَاقُ الْاِعْتِقَادِى-এর বিধান : যারা মুসলিম হয়েও অন্তরে ইসলামবিরোধী চিন্তাচেতনা লালন করে এবং মাঝেমধ্যে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করে, তারা মূলত আকিদাগত মুনাফিক হলেও কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। দেশে ইসলামী সরকার থাকলে এমন মুনাফিকদের ওপর ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। নিম্নে আকিদাগত মুনাফিকদের বিধান বর্ণনা করা হলো–

১. **তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামের নিম্নস্তরে :** কেয়ামত দিবসে মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

١ـ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ

٢ـ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ـ

٣ـ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

٤ـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুনাফিকরা জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে তারা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

২. **মুনাফিকদের আনুগত্য নাজায়েয :** যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ـ

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপটবিশ্বাসীদের অনুসরণ করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ থেকে নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেন। কারণ তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হলে তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরূপ সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো প্রশ্নই ওঠে না।

৩. **মুনাফিকদের কল্যাণ কামনা নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তথাপি কখনো তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ নাফরমান সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

৪. **মুনাফিকদের জানাযা পড়া ও কবর যেয়ারত নিষিদ্ধ :** মহান আল্লাহ কপটবিশ্বাসীদের জানাযা ও কবর যেয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো সালাত পড়বেন না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না।

৫. **মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা :** মুনাফিকদের পাকড়াও করা ও হত্যা করা তখনকার যুগে বৈধ ছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ـ

অর্থাৎ, অভিশপ্ত অবস্থায় মুনাফিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে।

উপসংহার : নেফাক মানবচরিত্রের জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের ফেতনা ফাসাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাই মুনাফিকী আচরণ পরিহার এবং মুনাফিকদের কবল থেকে মুক্ত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ **اَلسُّؤَالُ (٩١) : اِشْرَحْ بِالتَّفْصِيْلِ مَظَاهِرَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ الْمُنْتَشِرِ فِى الْمُجْتَمَعِ ـ**

■ প্রশ্ন : ৯১ ॥ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : শিরক ও কুফর মুমিনের ঈমানবিধ্বংসী একটি মারাত্মক ব্যাধি। প্রত্যেক মুমিনের উচিত শিরক ও কুফরমুক্ত ঈমান লালন করা; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও দীনি সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও সমাজের অনেক মুসলিম বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও কুফরের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। নিম্নে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক ও কুফর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. اَلشِّرْكُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْمُجْتَمَعِ :

সমাজে প্রচলিত শিরক : আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক শিরকী আকিদা ও কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. **গায়রুল্লাহকে সেজদা করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা প্রত্যক্ষ শিরক। এ কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক ভণ্ড পীর-ফকির ও জ্ঞানপাপী তথাকথিত আলেম রয়েছে, যাদের অনুসারীরা তাদের পায়ে পড়ে তাদেরকে প্রকাশ্য সেজদা করে। আর তারা সন্তুষ্টচিত্তে সে সেজদা গ্রহণ করে। অথচ উভয়ই মারাত্মক অপরাধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ.

২. **গায়রুল্লাহর নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা :** নিজের দুরবস্থার অবসান ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। মুসলিম সমাজে অজ্ঞতার কারণে এরূপ অবস্থা বিরাজমান। যেমন কোনো পীর ফকিরের নিকট ব্যবসায়ের উন্নতি চাওয়া, সন্তান কামনা করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুতি পেশ করা। রাসূল (স) বলেছেন– وَمَنِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

৩. **গায়রুল্লাহর জন্য মানত নযর পেশ করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত নযর পেশ করা শিরক। যেমন কোনো মৃতব্যক্তির জন্য নযর মানত পেশ করা। আউলিয়ায়ে কেরামের নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মাযার কবরের জন্য টাকা-পয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য প্রদান করা ও গ্রহণ করা। বর্তমানে বিভিন্ন মাযার এলাকায় গেলে এ অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য অহরহ পরিলক্ষিত হয়।

৪. **গায়রুল্লাহর গায়েবী ইলমে বিশ্বাস করা :** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো عِلْمُ الْغَيْبِ তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। এ সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَعْلَمُوْا الْمَغِيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ اَحْيَانًا.

উল্লিখিত শিরক ছাড়াও আমাদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু শিরক–

৫. রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত করা। কেননা রাসূল (স) বলেন–

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْاَصْغَرَ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ.

৬. যাদু করা। যেমন রাসূল (স) বলেছেন– مَنْ سَحَرَ فَقَدْ اَشْرَكَ

৭. তাবিজ-কবচ গলায় ঝুলানো। কেননা রাসূল (স) বলেন– مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ

৮. শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

৯. মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

১০. শহীদ মিনারে ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাভরে নগ্নপদে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।

১১. বিপদাপদ দূর করার জন্য আংটি, রিং ও সুতা ব্যবহার করা। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। রাসূল (স) তাৎক্ষণিকভাবে তা খুলে ফেলে দিলেন।

ٱلْكُفْرُ الْمُنْتَشِرُ فِى الْمُجْتَمَعِ ↄ :

সমাজে প্রচলিত কুফর : আমাদের সমাজে অনেক কুফরী আকিদা ও কার্যক্র প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. **ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা :** গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিচক্রবিদ হস্তরেখাবিদ বা যে কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফর।

২. **পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা :** কোনো কর্ম যদি কুরআন হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা পাপ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তবে সে পাপকে হালাল ব বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় সম্পর্কে উপহাস করা বা হাসি তামাশা করাও কুফর।

৩. **আল্লাহর বিশেষণ বা নির্দেশের সমালোচনা :** মহান আল্লাহর মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তাঁর ওপর আরোপ করা অথবা তাঁর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা কুফর।
সমাজে প্রচলিত এসব কুফরের মধ্যে রয়েছে সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, ইসলামী আইন, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ও তালাক এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে উপহাস করা, তামাশা করা, অনুপযোগী বলে মনে করা ও এগুলোর প্রতি বিরক্তি অনুভব করা।

৪. **আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার বৈধতায় বিশ্বাস :** কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের ব্যতিক্রম করা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে বৈধ বলে মনে করে তাহলে কুফর বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করা কুফরী। যেমন সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

৫. কবরবাসীর নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা।

৭. অলী-আউলিয়াদের নামে মানত করা এবং তাদের নিকট অলৌকিক সাহায্য কামনা করা।

৮. মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর একত্ববাদকে এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ -

৯. সত্য জানা সত্ত্বেও অহংকারবশত তা অস্বীকার করা। যেমন কুরআনে এসেছে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ - اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

১০. ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান অস্বীকার করা। যেমন– যাকাত, ইসলামী দণ্ডবিধি ও ইসলামী রাজনীতিকে অস্বীকার করা।

উপসংহার : সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক ও কুফর। এগুলো মুমিনের ঈমানবিধ্বংসী উপাদান। কাজেই এসব ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিহার করে ঈমানকে খাঁটি ও মযবুত করে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়াই মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٢) : مَا مَعْنَى التَّكْفِيْرِ؟ بَيِّنْ مَدَى خُطُوْرَةِ تَكْفِيْرِ الْمُؤْمِنِ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ

■ প্রশ্ন : ৯২ ॥ تَكْفِيْر অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করাকে تَكْفِيْر বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে না জেনে না শুনে কাউকে কাফের বলা মারাত্মক অপরাধ। এ বিষয়ে রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। কাজেই কোনো মুসলমানের পক্ষে অন্য কাউকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা আদৌ উচিত নয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ تَكْفِيْر-এর পরিচিতি :

مَعْنَى التَّكْفِيْرِ لُغَةً :

تَكْفِيْر-এর আভিধানিক অর্থ : تَكْفِيْر শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। মাদ্দাহ ك ـ ف ـ ر জিনসে صَحِيْح; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. কাউকে কাফের বলা। ২. কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা।

৩. অপরকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা ইত্যাদি।

مَعْنَى التَّكْفِيْرِ اِصْطِلَاحًا :

تَكْفِيْر-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় تَكْفِيْر-এর সংজ্ঞা হলো– هُوَ مَا اَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করাকে تَكْفِيْر বলা হয়।

২. হাদীসের ভাষায় تَكْفِيْر বলা হয়– هُوَ اَنْ يَكْفُرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে কাফের আখ্যায়িত করাকে تَكْفِيْر বলা হয়।

৩. আবার কেউ বলেছেন– هُوَ اَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করা।

৪. কতিপয় আলেম বলেন, تَكْفِيْر বলা হয় ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা করাকে।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর প্রথম বিভ্রান্ত ফেরকা 'খারেজীরা' পাপের কারণে মুসলিমকে কাফের বলা তথা تَكْفِيْر-এর মতবাদ চালু করে। এরপর মুতাযিলা ও অন্যান্য অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাদের কমবেশি অনুসরণ করে। অথচ পাপের কারণে একজন মুসলিম কাফের হয়ে যাবে বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে কুফরী বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ঈমানদারগণ জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে মুক্তি পাবেন।

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূল (স)-এর সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন যে, কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা–

১. কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

২. আবার কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফিকী আচরণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

خُطُوْرَةُ تَكْفِيْرِ الْمُؤْمِنِ ⊃ :

মুসলিমকে কাফের বলার ভয়াবহতা : ঈমানের দাবিদার কোনো মুমিনকে এবং ইসলাম গ্রহণকারী কোনো মুসলিমকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে অভিযুক্ত করা মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। রাসূল (স) বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন–

١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكْفَرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَاِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে কাফের বলে, তবে এ কথা দু'জনের একজনের ওপর প্রযোজ্য হবে। যদি সে তা হয়ে থাকে তাহলে তো হলো, অন্যথায় যে তাকে কাফের বলল তার (বক্তার) ওপরই তা প্রযোজ্য হবে।

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا-

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যে কেউ তার ভাইকে বলল, হে কাফের! তবে তাদের দু'জনের একজনের ওপর এ কুফরীর দায়ভার বর্তাবে।

٣- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ, হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কাউকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে, হে আল্লাহর শত্রু! আর সে তা না হয়, তবে তা বক্তার ওপর বর্তাবে।

٤- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

অর্থাৎ, হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীর সাথে অভিযুক্ত করে, তবে তা তাকে হত্যা করার মতোই অপরাধ হবে।

٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا اِلَّا بَاءَ اَحَدُهُمَا بِهَا اِنْ كَانَ كَافِرًا وَاِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيْرِهِ-

অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কোনো লোক যদি অপর কাউকে কাফের বলে গণ্য করে, তবে দু'জনের একজনের ওপর তা বর্তাবে, যদি সে কাফের হয়। নতুবা তাকে কাফের সম্বোধন করার কারণে সম্বোধনকারীই কাফের হয়ে যাবে।

উপসংহার : পাপের কারণে কেউ কাউকে কাফের বলা কিংবা কাফের বলে সাব্যস্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। কাজেই এরূপ করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। আর এটিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা।

■ **اَلسُّؤَالُ (٩٣) : عَرِّفِ الْبِدْعَةَ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاٰثَارِ الصَّحَابَةِ.**

■ **প্রশ্ন : ৯৩ ॥ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের আলোকে বিদয়াতের পরিচয় দাও।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম। দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ضَلَالَة তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে বিদয়াতের পরিচয় আলোচনা করা হলো।

⊃ بِدْعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً :

بِدْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : بِدْعَة শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এটা اَلْبِدْع মূল শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِنْشَاءُ عَلٰى غَيْرِ مِثْلٍ سَابِقٍ তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে بَدِيْع বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.
   কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।
২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।
৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।
৪. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।
৫. اَلْمَوْرِد গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো– شَيْءٌ جَدِيْدٌ
৬. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন– اَلْبِدْعَةُ مَاخُوْذَةٌ مِّنَ الْبِدْعِ وَهُوَ الْاِخْتِرَاعُ
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– اَلْاَمْرُ الَّذِىْ يُفْعَلُ اَوَّلًا অর্থাৎ, যে কাজ প্রথমত করা হয়।

مَعْنَى الْبِدْعَةِ اِصْطِلَاحًا :

بِدْعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় بِدْعَة হলো দীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাহ কর্তৃক সমর্থিত নয়।

২. ইমাম নববী (র)-এর ভাষায়- اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই এমন কিছু সৃষ্টি করাকে بِدْعَة বলা হয়।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন-

اَلْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ).

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন-

اَلْبِدْعَةُ هِيَ الَّتِيْ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ.

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে-

هِيَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ.

৬. ইমাম শাতেবী বলেন- اَلْبِدْعَةُ اِبْتِدَاءُ طَرِيْقَةٍ مَا لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهَا سَابِقٌ অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত।

ⓒ اَلْبِدْعَةُ عَلَى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ :

কুরআনের আলোকে বিদয়াত : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিদয়াত শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-

١. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

٢. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ.

٣. وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ.

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বিদয়াত শব্দটি অভিনবত্ব বা নবসৃষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বিশেষ করে শেষ আয়াতে যে বিদয়াত বলা হয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থা করে দেননি; বরং লোকেরা নিজেদের থেকে তা রচনা করেছে এবং এখানে ব্যবহৃত বিদয়াত শব্দটি সুন্নাতের বিপরীত শব্দ হিসেবে এসেছে।

সুতরাং আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ বান্দাদের জন্য যে সম্পর্কে সরাসরি বিধিবিধান দেননি, বান্দারা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা যা রচনা করে ইবাদত হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা করে, তাই বিদয়াত।

ⓒ اَلْبِدْعَةُ عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيْثِ :

হাদীসের আলোকে বিদয়াত : হাদীসের আলোকে বিদয়াত শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। কারণ হাদীসে যেমন সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, তেমনি বার বার বিদয়াত থেকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে-

١. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

٢. فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

আলোচ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত বিদয়াত শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আল্লামা আহমাদুল বান্না বলেন-

وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوْفًا فِيْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا اِجْمَاعٍ وَهِيَ الْبِدْعَةُ.

অর্থাৎ, কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা কোনো দিক দিয়েই শরীয়তের বিধিবদ্ধ নয় এমন বিষয়ই বিদয়াত।

সুতরাং বোঝা যায়, হাদীসের ভাষায় বিদয়াত কুরআন ও শরীয়তের পরিপন্থি। যার আগমনই হয়েছে সুন্নাত উৎখাত করার জন্য। এজন্যই রাসূল (স) শক্তভাবে বলেছেন– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ, সমস্ত নব আবিষ্কৃত ইবাদত ভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত।

البدعة على ضوء اثار الصحابة ❍ :

আসারুস সাহাবার আলোকে বিদয়াত : সাহাবীদের জীবনী, কর্মনীতি ও ইবাদত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, তাঁরাও বিদয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন। যেমন সাহাবীদের আসার–

١. قالتْ عائشة (رضـ) مَنْ عمل عملا ليْس عليْه امْرنا فهُو ردٌّ.

٢. قال عبْدُ الله بْن مسْعُوْدٍ (رضـ) انكُمْ ستُحْدثُوْن ويُحْدثُ لكُمْ فكُلُّ مُحْدثةٍ ضلالةٌ وكُلُّ ضلالةٍ فى النَّار.

রাসূল (স)-এর তিরোধানের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন খোলাফায়ে রাশেদীনগণ। তাঁরা তা-ই প্রবর্তন করেছেন, যা রাসূল (স) করতে বলেছেন বা পথ বলে দিয়েছেন। তাঁরা রাসূল (স)-এর আদর্শের বিরোধিতা করেননি এবং দীন ইসলামেও তাঁরা কোনো নতুন জিনিসের উদ্ভাবন করেননি।

উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি। এটা দ্বারা সাওয়াবের প্রত্যাশা করেও কোনো লাভ নেই; বরং সুন্নাত পরিপন্থি হিসেবে গুনাহগার হতে হয়। তাই বিদয়াত থেকে বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

■ اَلسُّؤَال (٩٤) : بيِّنْ نشْأة الْبدْعة وتطوُّرها فى الْاسْلام.

■ প্রশ্ন : ৯৪ ॥ ইসলামে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম। দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয়, যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ضلالة তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। বিদয়াতি বিদয়াত রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে থাকে এবং এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে বিদয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো।

نشأة البدعة ❍ :

বিদয়াতের উৎপত্তি : কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয় যে, বিদয়াতের উৎপত্তি চার কারণে হয়। যথা–

১. বিদয়াতি বিদয়াত নিজের থেকে উদ্ভাবন করে তা সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে স্বাভাবিকভাবে সমাজে তা প্রচলিত হয়ে যায়।
২. কোনো আলেম জানা সত্ত্বেও প্রথমত শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে কিন্তু তা দেখে মূর্খ লোকেরা মনে করতে থাকে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে পারে না। এভাবে গোটা সমাজেই বিদয়াতের প্রচলন ঘটে।

৩. মূর্খ লোকেরা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে শুরু করে আর সমাজের আলেমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকে, তা থেকে নিষেধও করে না এবং তার প্রতিবাদও করে না। তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে, এ কাজ অবশ্যই বিদয়াত হবে না। কারণ বিদয়াত হলে আলেমগণ এর প্রতিবাদ করতেন। যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে কাজটি হয়েছে এবং তারা এর প্রতিবাদ করেনি তাই এটা ইবাদত; বিদয়াত নয়।

৪. কোনো কাজ মূলতই শরীয়তসম্মত এবং ভালো কাজ হওয়া সত্ত্বেও বহুকাল যাবৎ তা মানুষের নিকট প্রচার করা না হলে তখন সাধারণ মানুষেরা মনে করে নিশ্চয় এটা ভালো কাজ নয়। কারণ ভালো কাজ হলে অবশ্যই আলেমগণ তার প্রচার করতেন। এভাবে শরীয়তসম্মত কোনো কাজকে শরীয়তবিরোধী মনে করাও একটা বড় বিদয়াত।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ : মানুষ স্বভাবতই শান্তি ও সুখের সন্ধানে থাকে, কিভাবে জান্নাত পাবে সে সন্ধানে ব্যাকুল থাকে, আর এ কারণে বেশি বেশি নেক কাজ করার বা ভালো আমল করার চেষ্টা করে। তবে দীনের হুকুম আহকাম আদায় করা কঠিন বিধায় সে সহজ আমলের প্রতি বেশি লালায়িত হয়। আর এ ফাঁকে শয়তান এসে তাকে ধোঁকা দেয় আর তার সামনে কতকগুলো সহজ কাজ উপস্থাপন করে এবং এসব কাজ করলে অনেক বেশি সাওয়াব হবে বলে নিজে নিজে ভাবতে থাকে। আমলগুলো শরীয়তসম্মত কিনা, সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে না। এমনকি সে পরিমাণ জ্ঞানও তার থাকে না। আর সময়ের পরিবর্তনে সাধারণ মানুষের নিকট তা বিদয়াত হিসেবে পরিগণিত হয়, যা সত্যিকার অর্থেই বিদয়াত। আর এভাবেই সমাজে বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে।

تَطَوُّرُ الْبِدْعَة :

বিদয়াতের ক্রমবিকাশ : শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, সর্বপ্রথম বিদয়াতের ক্রমবিকাশ হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ দিকে। যে ব্যাপারে রাসূল (স) সংবাদ দিয়েছেন–

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের ওপর কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা।

এ উম্মতের মাঝে সর্বপ্রথম যাদের বিদয়াত চালু হয়, তাদের আলোচনা নিম্নরূপ–

১. بِدْعَةُ الْقَدْر তথা কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
২. بِدْعَةُ الْاِرْجَاء তথা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
৩. بِدْعَةُ التَّشَيُّع তথা শিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।
৪. بِدْعَةُ الْخَوَارِج তথা খারেজীদের বিদয়াত।
৫. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর শুরু হয় হারুরীদের বিদয়াত।
৬. সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে শুরু হয় জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিদয়াত।

উপরিউক্ত বিদয়াতের সূচনা হয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে।
অতঃপর প্রচলিত হয় بِدْعَةُ الْاعْتِزَال তথা মুতাযিলাদের বিদয়াত।

৭. بِدْعَةُ الْاَهْوَاء তথা প্রবৃত্তি অনুসরণের বিদয়াত।

৮. بِدْعَةُ التَّصَوُّف তথা তাসাউফের বিদয়াত।

৯. بِدْعَةُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُوْر তথা কবরের উপর ভবন নির্মাণের বিদয়াত।

পরবর্তীতে সময়ের অতিক্রান্তে মুসলিম সমাজে বিদয়াত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এসব বিদয়াত কুফা, বসরা, খোরাসান ইত্যাদি দেশেই সবচেয়ে বেশি প্রচলন হয়। পরবর্তীতে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রবৃত্তির আনুগত্য, মতামত প্রকাশে গোঁড়ামি, কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিদয়াত সমগ্র মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে গজীব ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত– مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ অর্থাৎ, জনগণ যে বিদয়াত চালু করে তারই মতো একটা সুন্নাত সেখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব বিদয়াত চালু না করে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরাই উত্তম।

মুসনাদে দারেমীতে এসেছে–

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِّثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

উপসংহার : বিদয়াত সুন্নাতের পরিপন্থি। এটা দ্বারা সাওয়াবের প্রত্যাশা করেও কোনো লাভ নেই; বরং সুন্নাত পরিপন্থি হিসেবে গুনাহগার হতে হয়। তাই বিদয়াত থেকে বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٥) : مَا مَعْنَى الْبِدْعَةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ اَقْسَامَهَا بِالْاَمْثِلَةِ.

■ প্রশ্ন : ৯৫ ॥ 'বিদয়াত' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বিদয়াত-এর প্রকারসমূহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]

او. بَيِّنْ مَعْنَى الْبِدْعَةِ وَأَقْسَامَهَا بِالْاَمْثِلَةِ.

অথবা, اَلْبِدْعَة-এর অর্থ ও প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. '১১,'১৬]

او. كَمْ قِسْمًا لِلْبِدْعَةِ وَمَا هِىَ؟ اُذْكُرِ الْبِدْعَاتَ الْمُرَوَّجَةَ فِىْ بَلَدِنَا.

অথবা, বিদয়াত কত প্রকার ও কী কী? আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতগুলোর বিবরণ দাও।

اَوْ. كَمْ قِسْمًا لِلْبِدْعَةِ وَمَا هِىَ؟ اُكْتُبْ بِالْاَمْثِلَةِ.

অথবা, بِدْعَة কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৭]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের মাঝে বিদয়াত অন্যতম। দীনের মধ্যে যদি এমন নতুন কিছু সংযোজন করা হয় যা রাসূল (স)-এর উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া যায় না, এমনকি এর কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, তবে তা বিদয়াত হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের বিদয়াতকে মহানবী (স) ضَلَالَة তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। এ বিদয়াত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। নিম্নে বিদয়াতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদয়াতগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

بِدْعَة ⊃-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْبِدْعَة لُغَةً :

بِدْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : بِدْعَة শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এটা اَلْبِدْعُ মূল শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِنْشَاءُ عَلٰى غَيْرِ مِثْلِ سَابِقٍ তথা পূর্বনমুনা ছাড়া কোনো জিনিস সৃষ্টি করা। এ দৃষ্টান্ত থেকে আল্লাহকে بَدِيْع বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী–

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

কেননা আল্লাহ তায়ালা পূর্বনমুনা ছাড়া আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন।

২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।

৩. ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

৪. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।

৫. اَلْمَوْرِد গ্রন্থ মতে এর অর্থ হলো– شَيْءٌ جَدِيْد

৬. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান বলেন– اَلْبِدْعَةُ مَاخُوْذَةٌ مِنَ الْبِدْعِ وَهُوَ الْاِخْتِرَاعُ

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন– اَلْاَمْرُ الَّذِىْ يُفْعَلُ اَوَّلًا অর্থাৎ, যে কাজ প্রথমত করা হয়।

مَعْنَى الْبِدْعَة اِصْطِلَاحًا :

بِدْعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় بِدْعَة হলো দীনের মধ্যে এমন সব নব আবিষ্কার, যা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাহ কর্তৃক সমর্থিত নয়।

২. ইমাম নববী (র)-এর ভাষায়– اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে যার দৃষ্টান্ত নেই, এমন কিছু সৃষ্টি করাকে بِدْعَة বলা হয়।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ فِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ)۔

৪. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ هِىَ الَّتِىْ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْاَثَرَ وَالْاِجْمَاعَ۔

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থে আছে–

هِىَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِىْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ۔

৬. ইমাম শাতেবী বলেন– اَلْبِدْعَةُ اِبْتِدَاءُ طَرِيْقَةٍ مَا لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهَا سَابِقٌ

অর্থাৎ, ইতঃপূর্বে কারো দ্বারাই সংঘটিত হয়নি এমন পথের সূচনা করাই বিদয়াত।

اَقْسَامُ الْبِدْعَة ⊃ :

بِدْعَة-এর প্রকারভেদ : ১. নেহায়া গ্রন্থকার ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– ক. বিদয়াতে হাসানা, খ. বিদয়াতে সায়্যিয়া।

ক. **বিদয়াতে হাসানা :** بِدْعَةٌ لِلدِّيْنِ তথা দীনের জন্য নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীসবিরোধী না হয়; বরং এর দ্বারা ইসলামী উম্মাহ তথা গোটা মানবজাতির উপকার সাধিত হয়, তবে তাকে বিদয়াতে হাসানা বলে অভিহিত করা হয়।

এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ـ

খ. **বিদয়াতে সায়্যিয়া :** بِدْعَةٌ فِى الدِّيْنِ তথা দীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি কুরআন ও হাদীসবিরোধী হয়, তবে তাকে বিদয়াতে সায়্যিয়া বলে অভিহিত করা হয়। এ প্রকার বিদয়াতের ব্যাপারে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

١ـ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ـ

٢ـ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

٣ـ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اى كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ ـ

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন–

اَلْبِدْعَةُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسِنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ـ

অর্থাৎ, বিদয়াত দু'প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা বিদয়াতে হাসানা বা ভালো বিদয়াত। আর যদি তা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা বিদয়াতে মুস্তাকবিহা বা ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত।

৩. আবু নুয়াইম আল ইস্পাহানী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) সর্বপ্রথম বিদয়াতকে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন–

"বিদয়াত দু'প্রকার। প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদয়াত তথা নব উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তথা সুন্নাতের অনুসরণে হবে তা প্রশংসনীয়, আর যে বিদয়াত তথা নবোদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে, তা নিন্দনীয়।"

৪. قَوَاعِد গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা عِزُّ الدِّيْن বলেন, বিদয়াত সর্বমোট পাঁচ প্রকার। যথা–

১. ওয়াজিব বিদয়াত। যেমন– কুরআন, হাদীস ও দীন শিক্ষার জন্য নাহুশাস্ত্র শিক্ষা করা।
২. হারাম বিদয়াত। যেমন– কাদারিয়্যা ও জাবরিয়্যাদের ধর্মদর্শন।
৩. মানদুব বিদয়াত। যেমন– মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।
৪. মাকরূহ বিদয়াত। যেমন– শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।
৫. মুবাহ বিদয়াত। যেমন– পানাহারে প্রাচুর্য আনা।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পাঁচটি বিদয়াতের মধ্যে হারাম বিদয়াত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। আর এ ব্যাপারেই রাসূল (স) বলেন– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রাসূল (স) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শে পাওয়া দূরে থাক, এমনকি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না, এমন আবিষ্কৃত প্রত্যেক বিষয়কে রাসূল (স) ضَلَالَةٌ তথা ভ্রষ্টতা বলেছেন। সুতরাং বিদয়াতের মধ্যে حَسَنَةٌ ও سَيِّئَةٌ বলে

বিদয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করার কোনো অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে নিয়ত যতই ভালো হোক, কাজ যতই সুন্দর হোক, ব্যক্তি যতই উপযুক্ত হোক, ইসলামে বিদয়াত রচনাকারী পথভ্রষ্ট। তাই তাকে অবশ্যই বিদয়াতি বলা হবে। কারণ সে বিদয়াত রচনার মাধ্যমে মানুষের স্বচ্ছ ঈমান হরণ করে থাকে। আর এতে জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

⊃ اَلْبِدْعَةُ الْمَرُوَّجَةُ فِىْ بَلَدِنَا :

আমাদের দেশে প্রচলিত বিদয়াতসমূহ : আমাদের সমাজে প্রচলিত বহুবিধ বিদয়াতকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা– ক. আকিদাগত বিদয়াত খ. আমলগত বিদয়াত। নিম্নে এ দু'প্রকারের বিদয়াত আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হলো–

ক. আকিদাগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া বিরোধী প্রচারণা।
২. সাহাবীদের সমালোচনা করা।
৩. উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে গমন করা।
৪. কবরে গিয়ে মৃত অলীদের কাছে প্রার্থনা করা।
৫. পীর আউলিয়াদের কবরে মানত করে বিপদাপদ দূর হওয়ার আকিদা পোষণ করা।
৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা।
৭. কবুতর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা।
৮. মিলাদ মাহফিলে রাসূল (স)-এর সশরীরে উপস্থিতির ধারণা করা।
৯. তারকারাজির অবস্থান বা গতিবিধিকে বৃষ্টিবর্ষণের নিয়ামক হিসেবে ধারণা পোষণ করা।
১০. কুলক্ষণে বিশ্বাস করা।
১১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা।

খ. আমলগত বিদয়াত : বর্তমান সমাজে প্রচলিত আকিদাগত বিদয়াতের ন্যায় আমলগত বিদয়াতের সংখ্যাও ব্যাপক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে–

১. কবরকে ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা।
২. মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওরস করা।
৩. খাতনার পর এ উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৪. জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী পালন করা।
৫. নির্দিষ্ট তারিখে মৃত্যুদিবস পালন করা।
৬. আযানের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে দরূদ পাঠ করা।
৭. কবরে বাতি জ্বালানো।
৮. কবরে আতর গোলাপ ছিটানো।
৯. মৃতব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা।
১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গানবাজনা করা।
১১. আনুষ্ঠানিকভাবে দু'হাত তুলে আযানের পর মুনাজাত দেয়া ইত্যাদি।

উপসংহার : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিপরীত সকল কথা ও কাজ বিদয়াতরূপে গণ্য এবং সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। আর দীনের মধ্যে বিদয়াত তথা নব আবিষ্কার থেকে বিরত থাকার মাঝেই মুমিন জীবনের সফলতা নিহিত। কাজেই আমাদের উচিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদয়াতকে পরিহার করা।

চতুর্থ অধ্যায়
ইফতিরাক

■ اَلسُّؤَالُ (٩٦) : مَا هِىَ خَلْفِيَّةُ اِفْتِرَاقٍ فِى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟ كَمْ فِرْقَةً فِى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ.

■ প্রশ্ন : ৯৬ ॥ মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট কী? মুসলিম জাতির মধ্যে কতগুলো ফেরকা তথা সম্প্রদায় রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইসলামপন্থিদের মধ্যে চিন্তাভাবনার পার্থক্য দেখা দেয়, ফলে বিভিন্ন দল উপদলের সৃষ্টি হয়। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসের। নিচে প্রশ্নালোকে আকিদা বিভক্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো।

خَلْفِيَّةُ اِفْتِرَاقٍ فِى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ :

মুসলিমজাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট : মুসলিম উম্মাহর তথা মুসলিম জাতির রাজনৈতিক মতভেদই ইফতিরাকের মূল প্রেক্ষাপট রচনা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্বে আরবদেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিলো না। আরবের লোকেরা বংশতান্ত্রিক (কবীলা) প্রথার অধীনে বসবাস করত। রাসূল (স)-ই প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে বিষয়ের নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচন, ওমর (রা)-এর নির্বাচন, ওসমান (রা)-এর নির্বাচন, আলী (রা)-এর নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর ঐকমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে মতানৈক্যগুলো হয়েছিল, তা ছিল ইখতিলাফ পর্যায়ের; কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ, হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মাঝে দ্বন্দ্ব, আলী (রা)-এর শাহাদাত, মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণ, হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযিদের মাঝে দ্বন্দ্ববিগ্রহ ও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি মুসলিম মিল্লাতের বিভক্তির পিছনে মূল ভূমিকা পালন করে।

আর পরবর্তী প্রজন্মের অজ্ঞতা, অপপ্রচার, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এসব রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক তথা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফেরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল (খারেজী ও শিয়া) এরূপ বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে। সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারিয়্যা, জাহমিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়্যা, মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

গ) عَدَدُ فِرْقَةٍ فِى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ :

মুসলিমজাতির মধ্যে বিদ্যমান ফেরকার সংখ্যা : হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ফেরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩টি হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় শতক থেকেই অনেক আলেম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফেরকার নাম চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবে তাবেয়ী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন–

اَلْاَصْلُ اَرْبَعُ فِرَقٍ هُمُ الشِّيْعَةُ. وَالْحَرُوْرِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ فَافْتَرَقَتِ الشِّيْعَةُ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ فِرْقَةً. وَافْتَرَقَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ عَلٰى اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فِرْقَةً. وَافْتَرَقَتِ الْقَدْرِيَّةُ عَلٰى سِتَّ عَشْرَةَ فِرْقَةً. وَافْتَرَقَتِ الْمُرْجِئَةُ عَلٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِرْقَةً-

অর্থাৎ, মুসলিম উম্মাহর ফেরকাগুলোর মূল ৪টি ফেরকা, তারা হলো শিয়া, হারূরিয়া (খারেজী), কাদারিয়্যা ও মুরজিয়া। শিয়াগণ ২২ ফেরকায় বিভক্ত হয়, খারেজীগণ ২১ ফেরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়্যা ১৬ ফেরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়া ১৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়।

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস রাযী (র) বলেন–

اَخْبَرْتُ عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ : اَوَّلُ مَا افْتَرَقَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الزَّنَادِقَةُ. وَالْقَدْرِيَّةُ. وَالْمُرْجِئَةُ وَالرَّافِضَةُ. وَالْحَرُوْرِيَّةُ. فَهٰذَا جِمَاعُ الْفِرَقِ وَاُصُوْلُهَا- ثُمَّ تَشَعَّبَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ هٰذِهِ الْفِرَقِ عَلٰى فِرَقٍ. وَكَانَ جِمَاعُهَا الْاَصْلُ. وَاخْتَلَفُوْا فِى الْفُرُوْعِ. فَكَفَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَجَهَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ....

অর্থাৎ, আলেমগণ বলেছেন, এ উম্মতের ইফতিরাক তথা বিভক্তি শুরু হয়েছে যিনদীক, কাদারিয়্যা, মুরজিয়া, রাফেযী (শিয়া) ও হারূরিয়া (খারেজী) এ দলগুলোর মাধ্যমে। এরাই হলো সকল ফেরকার মূল। এরপর প্রত্যেক ফেরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আর মৌলিক বিষয়ে তারা একমত ছিল এবং শাখা প্রশাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। অতঃপর তারা একে অপরকে কাফের ও জাহেল বলেছে।

যিনদীকগণ ১১ ফেরকা, খারেজীগণ ১৮ ফেরকা, রাফেযীগণ (শিয়াগণ) ১৩ ফেরকা, কাদারিয়্যাগণ ১৬ ফেরকা, মুরজিয়াগণ ১৪ ফেরকায় বিভক্ত। মোট ৭২ ফেরকা।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র) তাঁর 'গুনিয়াতুত তালেবীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ৭৩ ফেরকা মূলত ১০ ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। এ দশ দল হলো আহলুস সুন্নাত, খারেজী, শিয়া, মুতাযিলা, মুরজিয়া, মুশাব্বিয়া, জাহমিয়া, জাবরিয়্যা নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফেরকা এ দশ ফেরকার মধ্যে শামিল। তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ– ক. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, খ. খারেজী ১৫ ফেরকা, গ. মুতাযিলা ৬ ফেরকা, ঘ. মুরজিয়া, ঙ. শিয়া ৩২ ফেরকা, চ. জাহমিয়া, ছ. নাজারিয়া, জ. জাবরিয়্যা ১২ ফেরকা, ঝ. কাদারিয়্যা ৩ ফেরকা, ঞ. মুশাব্বিহা। সর্বমোট ৭৩ ফেরকা।

অনেক আলেম মনে করেন, ৭৩ ফেরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উম্মতের বিষয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কাজেই কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফেরকার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন এবং এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করেন না বলে দাবি করেন, ইসলামের সর্বজন পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন না; অথচ তাদের নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকিদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যা কুরআন হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফেরকা বলে গণ্য করতে হবে।

আর যারা তাদের আকিদায় রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন, তাঁরা যা বলেছেন তা বলেন এবং তাঁরা যা বলেননি তা আকিদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকিদা বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' বলে গণ্য করতে হবে।

উপসংহার : বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন কারণেই মুসলিম জাতির মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দল, মত ও আকিদাপন্থি মানুষের। এমন পরিস্থিতিতে সত্য ও সঠিক মত ও আকিদা খুঁজে পেতে এ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٧) : مَا مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِخْتِلَافِ؟

■ প্রশ্ন : ৯৭ ॥ اِفْتِرَاق অর্থ কী? اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? ■

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা বা বিভাজিত হওয়া। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন ইসলামী আকিদাশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ফেরকা বা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

➲ اَلْاِفْتِرَاق-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْاِفْتِرَاقِ لُغَةً :

اِفْتِرَاق-এর আভিধানিক অর্থ : اِفْتِرَاق শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। এটি فَرَق শব্দ থেকে গৃহীত। মাদ্দাহ ف ـ ر ـ ق; জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. اَلْمُفَارَقَة তথা বিচ্ছেদ, ২. اَلْاِنْقِطَاع তথা বিচ্ছিন্নতা, ৩. اَلتَّفَرُّق তথা বিভক্ত হওয়া, ৪. اَلْفَاصِلَة তথা পৃথক করা, ৫. اَلْاِنْفِصَال তথা স্পষ্টহীনতা, ৬. اَلشُّذُوْذ তথা ব্যতিক্রম, ৭. اَلْمُبَايَنَة তথা বিপরীত হওয়া, ৮. اَلْاِنْقِسَام তথা বিভাজন, ৯. اَلضَّيَاع তথা বিনাশ, ১০. اَلضَّلَال তথা ভ্রষ্টতা, ১১. اَلْمُقَاطَعَة তথা বয়কট করা, ১২. اَلتَّشَعُّب তথা শাখা হওয়া, ১৩. اَلتَّغْيِيْر তথা পরিবর্তন, ১৪. اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَادَةِ وَعَنِ الْاَصْلِ وَعَنِ الْاَكْثَرِ وَعَنِ الْجَمَاعَة তথা পন্থা, মূল, আধিক্য ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া।

اِفْتِرَاق শব্দটি اِجْتِمَاع-এর বিপরীতার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

এখানে আল্লাহ তায়ালা جَمَاعَة বা اِجْتِمَاع-এর বিপরীতে اِفْتِرَاق বা تَفَرَّق শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর اِفْتِرَاق-এর বিপরীত শব্দ হলো– اِجْتِمَاع; এর অর্থ হচ্ছে– ঐক্যবদ্ধ হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْاِفْتِرَاق اِصْطِلَاحًا :

اِفْتِرَاق-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন।

১. مَفْهُوْمُ الْاِفْتِرَاق গ্রন্থকারের ভাষায়–

هُوَ الْخُرُوْجُ عَنِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ اَىِّ اَصْلٍ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ الْقَطْعِيَّةِ اَوْ اَكْثَرَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْاُصُوْلُ الْاِعْتِقَادِيَّةُ، اَوِ الْاُصُوْلُ الْعَمَلِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَطْعِيَّاتِ، اَوِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَصَالِحِ الْاُمَّةِ الْعُظْمٰى اَوْ بِهِمَا مَعًا۔

অর্থাৎ, اِفْتِرَاق হলো দীনের এক বা একাধিক অকাট্য মূলনীতির ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও দল থেকে বের হয়ে যাওয়া। হোক সে মূলনীতি আকিদা বিষয়ক অথবা জ্ঞান বিষয়ক; যা অকাট্য বিষয়ের সাথে কিংবা উম্মতের বড় কোনো কল্যাণের সাথে অথবা এতদুভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. مُوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَامِ গ্রন্থে اِفْتِرَاق-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– هُوَ التَّفَرُّقُ فِى الدِّيْنِ وَالْاِخْتِلَافُ فِيْهِ

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করাকে اِفْتِرَاق বলা হয়।

৩. مَوْسُوْعَةُ الْفِرَقِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْاِسْلَامِ গ্রন্থকার আরো বলেন–

هُوَ الْاِفْتِرَاقُ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ عُمُوْمُ اُمَّةِ الْاِسْلَامِ فِىْ عَهْدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَهُمْ اَصْلُ السُّنَّةِ وَمَنْ كَانَ عَلٰى هَدْيِهِمْ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْاِفْتِرَاقِ۔

অর্থাৎ, মুসলিম জামায়াত তথা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হলো افتراق; আর মুসলিম জামায়াত হলো রাসূল (স) ও সাহাবাগণের যুগের সাধারণ মুসলিম জাতি। আর তাঁরা হলেন আহলুস সুন্নাহ এবং উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির পরেও যারা আহলুস সুন্নাহর পথের অনুসারী ছিলেন।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاِفْتِرَاقِ وَالْاِخْتِلَافِ :

اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার পার্থক্য : اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। اِفْتِرَاق অর্থ– বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া। আর اِخْتِلَاف অর্থ– মতভেদ বা মতবিরোধ করা। সুতরাং এখানে اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ বা মতবিরোধ সাধারণভাবে

বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি নয়। তবে মতভেদ বা মতবিরোধকারীগণ যখন নিজেদের মতকেই একমাত্র হক ও অন্য মতকে বাতিল গণ্য করে ভিন্ন দল মনে করেন, তখন তাকে বলা হয় اِفْتِرَاق; নিম্নে اِفْتِرَاق ও اِخْتِلَاف-এর মধ্যকার আরো কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

১. ইফতিরাক হলো ইখতেলাফ তথা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।
২. প্রত্যেক ইফতিরাকই ইখতেলাফের অন্তর্ভুক্ত, তবে সব ইখতেলাফ ইফতিরাক নয়। অর্থাৎ ইখতেলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই। তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতেলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতেলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।
৩. ইখতেলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও আলেমগণের মধ্যে 'মতভেদ' বা ইখতেলাফ ছিল; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না।
৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতেলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়; বরং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সর্বক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।
৫. ইখতেলাফকারী নিন্দিত নয়; বরং তিনি ইখলাস ও ইজতেহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। ইফতিরাককারী বিভক্তি সৃষ্টি করায় নিন্দিত এবং তিরস্কৃত।
৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইখতেলাফের ভিত্তি ইলম বা জ্ঞান ও দলীল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ ও স্বার্থকামিতা; এতে স্বার্থহীনতা ও ইখলাসের প্রতিফলন ঘটে না। ইখতেলাফের ক্ষেত্রে আলেমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তকর ও এর প্রবক্তাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন না; বরং তার দলীলকে দুর্বল গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলেম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্ত গণ্য করেন।
৭. ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতেলাফ থাকতে পারে; কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। কেবল এগুলোর অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।
৮. ইখতেলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত; পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংস।
৯. ইখতেলাফকারী মুজতাহিদ, ভুল সিদ্ধান্তে একটি এবং সঠিক সিদ্ধান্তে দুটি সাওয়াবের ভাগী হবেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাককারী সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে।

উপসংহার : ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন সৃষ্টি মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার শামিল; যা মারাত্মক অপরাধও বটে। কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন পরিহার করা এবং বিভাজনকারীদের প্রতিহত করে মুসলিম ঐক্য অটুট রাখা।

■ اَلسُّؤَالُ (٩٨) : بَيِّنْ اَسْبَابَ الْاِفْتِرَاقِ فِىْ ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔

■ প্রশ্ন : ৯৮ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকিদা বিভাজনের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা বা বিভাজিত হওয়া। মুসলিম উম্মার মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের বিশ্বাসগত বিভাজন ইসলামী আকিদাশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ফেরকা বা বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তাই নির্ভুল জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ↄ اَسْبَابُ الْاِفْتِرَاقِ :

اِفْتِرَاق-এর কারণসমূহ : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পূর্ববর্তী উম্মত এবং এ উম্মতের মধ্যে اِفْتِرَاق তথা বিভক্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. **অহী ভুলে যাওয়া :** কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তারা তাদেরকে প্রদত্ত অহী ভুলে গিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ۔

তাদের অহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন–

ক. অহী তথা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যা করার অধিকার কারো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে বিরত রাখা। বিশেষ করে এটা শিয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকিদাগুলোর অন্যতম।

খ. অহীর ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ইমামের বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবি করে তার ব্যাখ্যা বা মতামতকে অহীর অংশ বানিয়ে দেয়া। এটিও শিয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম।

গ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর অন্য কোনো মানুষকে নিষ্পাপ বা নির্ভুল বিশ্বাস করে তার মতামতকে অহীর সমতুল্য বা অহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা। এতে মূল অহীর আর কোনো মূল্য থাকে না। কেবল অহীর ব্যাখ্যার নামে কথিত ইমামের মতামতই আকিদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায়। এটিও শিয়াদের বিভ্রান্তির মৌলিক দিক।

ঘ. অহীর পাশাপাশি দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে অহীর মতোই আকিদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য।

ঙ. অহীর ব্যাখ্যার নামে নিজেদের মতামতকে অহীর সাথে আকিদার অংশ বানিয়ে দেয়া। সকল বিভ্রান্ত ফেরকারই এটি বৈশিষ্ট্য।

চ. তাবীল তথা ব্যাখ্যার নামে অহীর কিছু তাবীল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকিদার মধ্যে গণ্য করা। এতে অহীর মূল ভাষা ও বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে। এটি সকল বিভ্রান্ত ফেরকারই বৈশিষ্ট্য।

ছ. বানোয়াট কথা অহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা কিংবা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার ওপর আকিদার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শিয়া ও অন্যান্য অনেক ফেরকার বৈশিষ্ট্য।

২. **প্রবৃত্তির অনুসরণ করা :** ব্যক্তিমনের পছন্দ অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মার বিভক্তিকে اَهْوَاء বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوْا فِىْ دِيْنِهِمْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً يَعْنِىْ الْاَهْوَاءَ كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً وَهِىَ الْجَمَاعَةُ ـ

৩. **হিংসা বিদ্বেষ :** কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা اِفْتِرَاق তথা বিভক্তির অন্যতম কারণ। বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের মধ্যে অন্যান্য সব বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে। তবে দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায়। বিষয় দুটি হলো– ক. অহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং খ. পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আর হিংসা বিদ্বেষ এ বিষয় দুটি দূরীভূত করে।

৪. **সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি :** রাসূল (স)-এর সুন্নাত এবং সাহাবীগণের সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হওয়া মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ। কেননা বিভিন্ন হাদীসে সুন্নাতের অনুসরণ করাকে নাজাত, সফলতা, ঐক্য ও হেদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে সব বিভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খারেজী ফেরকার বিভক্তির ইতিহাসে ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয়।

৫. **অনির্দেশিত বিষয়ের অনুসরণ :** হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূল (স) বলেছেন, যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি, তা তারা করবে, অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে যেসব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি, অহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে সেসব কাজকে দীনের অংশ বানিয়ে তা সম্পাদন করা। যেমন অহীর মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করতে, অন্যায় শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়নি; কিন্তু খারেজীরা অহীর অনুসরণের নামে তা করেছে।

৬. **অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া :** মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফেরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি, অন্যান্য জাতি কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া ছিল সকল বিভক্তির অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন ও সমাজের পণ্ডিতদের বক্তব্য ইত্যাদি কারণেই বিভিন্ন ফেরকার অনুসারী হয়ে পড়ে।

৭. **মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ :** কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়াতে মুহকামের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে আয়াতে মুতাশাবিহ তথা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতের বক্তব্য গ্রহণ করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ـ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ـ

৮. **অহী নিয়ে অনর্থক বিতর্ক :** অহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথপ্রদর্শন করা। আর মুমিনের দায়িত্ব অহীর নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালনা করা। কাজেই অহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়; অহী নিয়ে বিতর্ক নয়; কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে কর্মহীন বিতর্ক ভালোবাসে। আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস। অথচ হাদীস শরীফে অহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপসংহার : ইফতিরাক তথা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিভাজন সৃষ্টি মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার শামিল; যা মারাত্মক অপরাধও বটে। কাজেই আমাদের উচিত বিভাজন পরিহার করা এবং বিভাজনকারীদের প্রতিহত করে মুসলিম ঐক্য অটুট রাখা।

■ **اَلسُّؤَالُ (৯৯) : كَيْفَ ظَهَرَ الْاِفْتِرَاقُ فِى الْاُمَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ؟ بَيِّنْ ـ**

■ **প্রশ্ন : ৯৯ ॥ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০০৭,'০৯,'১৫,'১৮]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ হচ্ছে ফেরকা বা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ইফতিরাকী বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো।

⊃ **كَيْفِيَّةُ ظُهُوْرِ الْاِفْتِرَاقِ بَيْنَ الْاُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ :**

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের উৎপত্তি : হাদীসের আলোকে বুঝা যাচ্ছে, বিবিধ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজনের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ–

১. **পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ :** পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় ও বিভাজন থেকে বাঁচার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) ইরশাদ করেন–

فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের ওপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সব নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত এবং সব বিদয়াতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।

২. **শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনা :** মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনা একত্রিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়।

৩. **প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণ :** প্রাকৃতিক ও জাগতিক কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক সৃষ্টি হয়। তবে ইফতিরাকের কারণে ইফতিরাকীদের দল-উপদল অনেক হলেও তাদের অনুসারীদের সংখ্যা খুবই কম।

৪. **অহীর সাথে সংযোজন :** আকিদার উৎস হিসেবে অহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অহীর সাথে মানবীয় যুক্তি-বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করার কারণেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরূপ ইফতিরাক তথা বিভাজন হওয়া স্বাভাবিক। কারণ হাদীস শরীফে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরূপ বিভাজনের ফলে কারা সঠিক পথের অনুসারী আর কারা বাতিলের অনুসারী তারও দিকনির্দেশনা হাদীসে রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

إِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ (اَلْيَوْمَ) وَاَصْحَابِى-

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে একটিমাত্র দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বললেন, তারা হলো, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে নীতির ওপর আছি তার অনুসরণ করবে।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁরা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠٠) : بَيِّنِ الْمَسَائِلَ الْاَسَاسِيَّةَ الَّتِىْ كَانَتْ مَدَارُ الْاِفْتِرَاقِ-

■ প্রশ্ন : ১০০ ॥ যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে আকিদার বিভাজন ঘটে সেগুলোর বিবরণ দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইফতিরাক অর্থ ফেরকা বা বিভাজন সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেরকা সৃষ্টি ও তাদের আকিদাগত বিভাজন ইসলামী আকিদার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কাজেই ফেরকা ও বিভাজনসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের সঠিক আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এখানে মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাকী বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো।

الْمَسَائِلُ الْأَسَاسِيَّةُ مَدَارُ الْإِفْتِرَاقِ ↄ :

যেসব মূলবিষয়কে কেন্দ্র করে ইফতিরাক ঘটে : মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভাজন ঘটে তা নিম্নরূপ–

১. **রাসূলের বংশধরদের ভালোবাসা ও মর্যাদা :** মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্য দিক ছিল 'আহলুল বাইত' তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের বিষয়ে উম্মতের দায়িত্ব ও বিশ্বাসের পরিধি নিয়ে। ইসলাম সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্ম। এখানে কোনো বংশ, রক্ত, বর্ণ বা দেশের কোনো 'পবিত্রতা', 'অলৌকিকত্ব' বা বিশেষ অধিকার ঘোষণা করা হয়নি। হাদীসের শিক্ষাও অনুরূপ। কুরআন মাজীদে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে; বংশ বা বর্ণের কারণে নয়।

দীন পালন ও বোঝার ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের মানুষেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মীয়তার ভালোবাসা রক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى-

অর্থাৎ, বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না।

হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক একজন ইহুদি ইসলাম গ্রহণের দাবি করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাঁকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলতে থাকে। এসব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকার-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে।

২. **ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান :** কুরআন মাজীদে পাপ, জুলুম, কুফর ইত্যাদি শব্দ কঠিন নিন্দা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে কাফের বলা হয়েছে। পাপীদের অনন্ত জাহান্নামবাসের কথা বলা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় পাপ, ফিসক, জুলুম ও কুফরের একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নামবাস।

পক্ষান্তরে, কুরআন মাজীদে বার বার বলা হয়েছে যে, শিরক ব্যতীত সর্বপ্রকারের পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। কঠিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কুরআনে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব আয়াত ও হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায়, আমল তথা কর্মের সাথে ঈমান বা বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নয়। বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক থাকলে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে; কিন্তু কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। খারেজীরা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফের বা ঈমানহারা হয়ে যায়।

এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারা দাবি করে যে, ঈমান ও ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ঈমান তথা বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে, তাহলে কোনো গুনাহের কারণেই কোনো অসুবিধা হবে না। ইসলামের অনুশাসন মানুক অথবা না-ই মানুক, সকল মুমিনই জান্নাতি হবে।

৩. **রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইমামত :** খারেজীদের মতে, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় 'ইমামত' বা নেতৃত্ব একইসূত্রে গাঁথা। রাষ্ট্রপ্রধানই নামাযের ইমামত করেন, ইমাম নির্ধারণ করেন এবং জেহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। যেহেতু পাপী ব্যক্তি মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারে না। এ কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাকে অপসারণ এবং সেজন্য যুদ্ধ ও অস্ত্রধারণ করাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে গণ্য করে। এ দায়িত্বে অবহেলা করা বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী বলে গণ্য করে।

শিয়ারাও খারেজীদের অনুরূপ মত পোষণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়াসম্পন্ন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের ইমামদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকিদার অংশ মনে করে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ সৃষ্টি হয়।

৪. **তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা :** কুরআন মাজীদে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মহান ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না।

আবার কুরআনুল কারীম থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার কথা জানতে পারি। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিই "মানুষ তার নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী।" মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো ওপর জুলুম করবেন না; বরং প্রত্যেককে তার কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

কিছু লোক এ বিষয়ে বিপরীত কল্পনা করতে শুরু করে। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে তারা বলতে শুরু করে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই। তাদের মতে, তাকদীরের বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। ক্রমান্বয়ে এ মতটি একটি 'দল' বা ফেরকায় পরিণত হয়। এদের 'কাদারিয়্যা' বলা হয়। পরবর্তীকালে মুতাযিলারাও অনুরূপ মত পোষণ করে।

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কলের পুতুলের মতোই সে কর্ম করে। এদের 'জাবরিয়্যা' বলা হয়।

৫. **আল্লাহর বিশেষণে বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা :** ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণ। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে ইফতিরাক তথা বিভক্তির ভূমিকায় সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

প্রাচীনকাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তাঁর একত্ববাদ বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত। প্রায় সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি-অনন্ত সত্তা হিসেবে আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক; কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, তাঁর কর্ম, তাঁর বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই 'কাদারিয়্যা' ফেরকার লোকেরা তাকদীর অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিত্ব হওয়াকে স্বীকার করে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহম ইবনে সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি ভারতীয়, গ্রিক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে সর্বপ্রকার সিফাত বা বিশেষণ থেকে মুক্ত বা 'নির্গুণ' বলে দাবি করে। পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাকের সৃষ্টি হয়। তবে এদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সাধারণ মুসলিমগণ সাহাবী ও সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁরা এসব বিভাজন সৃষ্টিকারীদেরকে বিদয়াতপন্থি বলে অভিহিত করতেন এবং তাদেরকে ঘৃণা করতেন।

■ **اَلسُّؤَالُ (١٠١) : عَرِّفْ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - ثُمَّ بَيِّنْ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -**

■ **প্রশ্ন : ১০১ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় দাও। অতঃপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর ইসলামের ওপর এক অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্ম দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সত্যপন্থি এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُغَةً :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আভিধানিক অর্থ :

اَهْلٌ-এর অর্থ : اَهْلٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَهْلُوْنَ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاَقَارِبُ তথা নিকটাত্মীয়।
২. اَلْعَشِيْرَةُ তথা পরিবার পরিজন।
৩. اَلْاَصْحَابُ তথা সাথি।
৪. اَلسُّكَّانُ তথা অধিবাসী।
৫. اَلْمُسْتَحِقُّ তথা অধিকারী।
৬. اَلتَّابِعُ তথা অনুসারী।
৭. اَخَصُّ النَّاسِ তথা বিশেষ ব্যক্তি।
৮. عُضْوٌ তথা সদস্য।

سَنَة-এর অর্থ : اَلسُّنَّةُ শব্দটি سَنَّ يَسُنُّ থেকে গৃহীত। এটা একবচন, বহুবচনে سُنَن ; যেমন মহান আল্লাহর বাণী- قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো-

১. اَلطَّرِيْقَة তথা পদ্ধতি। ২. اَلسِّيْرَة তথা আদর্শ।

৩. اَلْقَانُوْن তথা নীতিমালা। ৪. اَلشَّرِيْعَة তথা বিধান।

৫. اَلْمَوْرِد প্রণেতা বলেন- اَلْخَصْلَة তথা স্বভাব, اَلطَّبِيْعَة তথা প্রকৃতি।

৬. اَلنَّهْج তথা পদ্ধতি।

جَمَاعَة-এর অর্থ : اَلْجَمَاعَة শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْجَمَاعَات এটা মূলধাতু ج-م-ع থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ-

১. اَلْجَيْش তথা সৈন্যদল। ২. اَلْفِئَة তথা ছোট দল।

৩. اَلْحِزْب তথা দল। ৪. اَلْقَوْم তথা সম্প্রদায়।

সুতরাং اَهْلُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة-এর একত্রে অর্থ- সুন্নাতের অনুসারী দল।

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اِصْطِلَاحًا :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন- هِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِيْ قَامَتْ عَلٰى طَرِيْقٍ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِهٖ অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন- اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ اَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ অর্থাৎ, চার মাযহাব এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاء প্রণেতা বলেন-

هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا فِى الْعَقِيْدَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ اٰرَاءِ الْفَلَاسِفَةِ.

অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন-

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَلْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَسُنَّةَ الرَّسُوْلِ وَسُنَّةَ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন।

মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যাঁরা সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ঔ عَقَائِدُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

২. কোনো অন্যায়ের কারণে ইমামকে বরখাস্ত করা যাবে না; বরং তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সংশোধন না হলে তবে বরখাস্ত করা যাবে।

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ খলিফা হতে পারেন। খেলাফতে নবী পরিবারের কোনো বিশেষত্ব নেই।

৪. ইমাম মাহদী কেয়ামতের পূর্বে আগমন করবেন, তিনি হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা)-এর বংশধর হবেন বলে হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে।

৫. আনসার মুহাজির সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। যেমন হাদীসে এসেছে– اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ

৬. চার খলিফাই ন্যায়সঙ্গত খলিফা।

৭. সাহাবীগণ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে।

৮. নবী রাসূলগণ মাসুম। তাঁরা সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহে কলুষিত নন, তবে তাঁদের থেকে উত্তমতার খেলাফ কিছু প্রকাশ পেতে পারে।

৯. কবীরা গুনাহের কারণে কোনো মুসলিমকে ফাসেক বলা যাবে; কিন্তু কাফের নয়।

১০. রাসূল (স) সশরীরে মিরাজ গমন করেছেন।

১১. আল্লাহ কারো ওপর সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপান না। যেমন আল্লাহর বাণী– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

১২. কবীরা গুনাহকারী মুমিন তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলেও চিরকাল দোযখে থাকবে না। কেননা হাদীসে এসেছে– مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

১৩. মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদে ভুল-শুদ্ধ উভয় প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেন।

১৪. বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা করা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয়।

১৫. রাসূল (স) ও পুণ্যবান লোক কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করতে পারবেন।

১৬. সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো অহী।

১৭. আল্লাহর গুণাবলি তাঁর অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন। তাঁর গুণাবলি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করে সে আস্তিক।

১৯. ধর্মীয় ব্যাপারে কারো সাথে মতপার্থক্য থাকার দরুন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সুন্নীদের মতের পরিপন্থি।

২০. কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালোমন্দ কাজের বিনিময় দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেন– فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

২১. মৃতব্যক্তির শান্তির জন্য দোয়া করা শরীয়তসম্মত। এতে শাস্তি লাঘব হয় এবং আত্মা শান্তি পায়। যেমন হাদীসের ভাষ্য– اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ

২২. কুরআন আল্লাহর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তবে লিখন, পঠন ও উচ্চারণ সৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة

২৩. পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন-
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا۔

২৪. বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে সুন্নীগণ পরমাণুবাদের সমর্থক। আর তাই তাঁরা মনে করেন, জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল।

২৫. আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের স্রষ্টা। সৃষ্টির ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে অর্জন করার ক্ষমতা আছে। যেমন আল্লাহ বলেন- فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

২৬. বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সব সাহাবীই বেহেশতী।

২৭. আশারায়ে মুবাশশারার প্রতি অশোভন আচরণ করা তাঁরা হারাম মনে করেন।

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। আর ৭৩ দলের মধ্যে এ দলটিই সঠিক পথের ওপর রয়েছে। সুতরাং এ দলের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ও ঈমানী দায়িত্ব।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠٢) : اِشْرَحْ جُهُوْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِىْ شَرْحِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔

■ প্রশ্ন : ১০২ ॥ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান ব্যাখ্যা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : অতীতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইফতিরাক তথা বিভাজন সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলেম ও ইমামগণ তৎকালীন সময়ে বিকৃতি বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করতে এবং সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করতে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার ইমাম বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

⊃ جُهُوْدُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِىْ شَرْحِ الْعَقِيْدَةِ :

আকিদা ব্যাখ্যায় চার ইমামের অবদান : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় চারজন ইমাম বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হচ্ছেন-

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র), ৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র),
২. ইমাম আবু ইউসুফ (র), ৪. ইমাম মুহাম্মাদ (র)।

উল্লিখিত ইমামগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে নিজেরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন-

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার মূলনীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। এতে তাঁদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে যে আকিদা লিখেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর আকিদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) যা লিখেছেন, তা-ই চার ইমামের আকিদা। আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ন্যায় সামান্য দু'একটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ব্যতীত তাদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সব বিদয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খড়গহস্ত। বিশেষত

আকিদাগত বিদয়াতের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বিভিন্নভাবে আকিদার বিষয় আলোচনা করেছেন।

৩. চার ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) আকিদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিকহের বিষয়ে নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তাঁর ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পারি; কিন্তু তিনি আকিদার বিষয়ে অনেকগুলো পুস্তিকা রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকিদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াত' পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ও পঠিত বই।

৫. আকিদার বিষয়ে চার মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ হলো আকিদার উৎস ও ভিত্তির বিষয়ে তাঁরা একমত। আমরা দেখেছি যে, আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকিদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি। উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না। যারা আকিদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা বা জামায়াতকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন, তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শাব্দিক বা ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ব্যতীত কোনো মৌলিক মতভেদ নেই। কারণ মূল উৎস এক এবং তা বহুমুখী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এজন্য চার ইমাম একমত পোষণ করেছেন যে, আকিদার উৎস মূলত তিনটি। যথা– ১. কুরআনুল কারীম, ২. সহীহ হাদীস এবং ৩. সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ইজমা বা জামায়াত। তাঁরা একমত যে, কুরআন হাদীসে যা যেভাবে আছে, তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকিদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। আর সে বিষয়ে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সব বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ব্যতীত গ্রহণ করার জন্য সমন্বয়মূলক কিছু কথা বলা যেতে পারে। এরূপ কথা আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয়। এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ মেনে নেয়া হয়েছে।

ধর্মীয় ব্যাপারে এবং বিশেষত গায়েবী বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং অহীর কথাকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতি বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন– وَلَا نَخُوْضُ فِى اللّٰهِ ـ وَلَا نُمَارِى فِى دِيْنِ اللّٰهِ ـ وَلَا نُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না। আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হই না।

উপসংহার : কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অকপটে, সর্বান্তকরণে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, তার অতিরিক্ত কিছু না বলা এবং সর্বপ্রকার বিতর্ক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরিত্যাগের বিষয়ে চার মাযহাবের চার ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং খাঁটি আকিদার বিশ্লেষণে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আল্লাহ তাঁদের জান্নাতবাসী করুন।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠٣) : عَرِّفْ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَعَ ذِكْرِ مَزَايَاهُمْ ـ

■ **প্রশ্ন : ১০৩ ॥ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহসহ তাদের পরিচয় দাও।** [ফা. প. ২০১৪]

اَوْ مَنْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ اُذْكُرْ خِصَالَهُمْ ـ

অথবা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের স্বভাব আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর ইসলামের ওপর নানাবিধ অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে উদ্ভব ঘটে ভ্রান্ত মতবাদ খারেজী, শিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের। বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর ধর্ম-দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সত্যপন্থি ও আল্লাহপ্রদত্ত, রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে প্রশ্নালোকে اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর পরিচিতি :

مَعْنٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لُغَةً :

اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর আভিধানিক অর্থ :

اَهْل-এর অর্থ : اَهْل শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَهْلُوْن; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاَقَارِب তথা নিকটাত্মীয়।
২. اَلْعَشِيْرَة তথা পরিবার পরিজন।
৩. اَلْاَصْحَاب তথা সাথি।
৪. اَلسُّكَّان তথা অধিবাসী।
৫. اَلْمُسْتَحِقّ তথা অধিকারী।
৬. اَلتَّابِع তথা অনুসারী।
৭. اَخَصُّ النَّاس তথা বিশেষ ব্যক্তি।
৮. عَضْو তথা সদস্য।

سُنَّة-এর অর্থ : اَلسُّنَّة শব্দটি سَنَّ يَسُنُّ থেকে গৃহীত। এটা একবচন, বহুবচনে سُنَن ; যেমন মহান আল্লাহর বাণী– قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ; এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلطَّرِيْقَة তথা পদ্ধতি।
২. اَلسِّيْرَة তথা আদর্শ।
৩. اَلْقَانُوْن তথা নীতিমালা।
৪. اَلشَّرِيْعَة তথা বিধান।
৫. اَلْمَوْرِد প্রণেতা বলেন– اَلْخَصْلَة তথা স্বভাব, اَلطَّبِيْعَة তথা প্রকৃতি।
৬. اَلنَّهْج তথা পদ্ধতি।

جماعة-এর অর্থ : اَلْجَمَاعَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْجَمَاعَاتُ এটা মূলধাতু ج - م - ع থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلْجَيْشُ তথা সৈন্যদল। ২. اَلْفِئَةُ তথা ছোট দল ।

৩. اَلْحِزْبُ তথা দল। ৪. اَلْقَوْمُ তথা সম্প্রদায়।

সুতরাং اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-এর একত্রে অর্থ– সুন্নাতের অনুসারী দল।

مَعْنَى اهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اصْطِلاحًا :

اهْلُ السُّنَّةِ وَالْجماعة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجماعة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ফকীহগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন– هِىَ الْجَمَاعَةُ الَّتِىْ قَامَتْ عَلَى طَرِيْقٍ ثَبَتَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابِه অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি দলকে বলে, যারা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীগণের নির্ধারিত পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. শরহে ফিকহুল আকবার গ্রন্থকার বলেন–
اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمْ اَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ۔
অর্থাৎ, চার মাযহাব এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. مُعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ প্রণেতা বলেন– هُمُ الَّذِيْنَ الْتَزَمُوْا فِى الْعَقِيْدَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ اٰرَاءِ الْفَلَاسِفَةِ অর্থাৎ, দার্শনিকদের রায় ব্যতিরেকে যারা কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বাসকে আবশ্যক মনে করে তারাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন–
اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَلْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَسُنَّةَ الرَّسُوْلِ وَسُنَّةَ صَحَابَتِه اَجْمَعِيْنَ۔
অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন একটি সত্যপন্থি দল, যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত সাহাবীগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন।
মোটকথা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এমন এক সম্প্রদায়, যাঁরা সর্বদাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

خِصَالُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যাবলি : আকিদাতুত তাহাবী প্রণেতা বলেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের خِصَال তথা বৈশিষ্ট্য ১০টি। যথা–

১. **দু'শায়খকে সম্মান করা :** হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মর্যাদা প্রদান। কারণ এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

١- عَنْ اِبْنِ عُمَر قال : كُنَّا نُخَيِّر بَيْنَ النَّاس فِىْ زمانِ رسُوْل الله عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ فنُخَيِّرُ ابا بكْرٍ ثُمَّ عُمر ثُمَّ عُثْمان-

٢- عنْ ابْن عُمر قال : كُنَّا وفيْنا رسُوْلُ الله عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ نُفضِّلُ ابا بكْرٍ وعُمر وعُثْمان وعليًا-

٣- عنْ ابىْ هُريْرة قال : كُنَّا معاشر اصْحاب رسُوْل الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم ونحْنُ مُتوافرُوْن نقُوْلُ : أفْضلُ هٰذه الْاُمَّة بعْد نبيِّها ابُوْ بكْرٍ ثُمَّ عُمر ثُمَّ عُثْمانُ ثُمَّ نسْكُتُ-

২. **দু'জামাতাকে সম্মান করা :** দু'জামাতা তথা হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা)-কে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁরা উভয়ে রাসূল (স)-এর জামাতা। আর এজন্যই উভয়ের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ধারণা বা সন্দেহ পোষণ না করা।

৩. **দু'কেবলাকে সম্মান করা :** কাবা ও বায়তুল মাকদাসকে সম্মান করা। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী– ومنْ يُّعظِّمْ شعائر الله فانَّها منْ تقْوى الْقُلُوْب উভয় কিবলার কোনোটির প্রতি কোনো প্রকার অসম্মান প্রদর্শন না করাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

৪. **ফাসেক ও মুত্তাকীর জানাযা আদায় :** মুত্তাকী এবং ফাসেক সকলের মৃত্যুর পর তাদের জানাযা আদায় করতে হবে। একজন লোক ফাসেক বলে তার মৃত্যুর পর তার জানাযা আদায় না করাটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং মুত্তাকী ও ফাসেক সকলের মৃত্যুর পরই তাদের জানাযা আদায় করতে হবে।

৫. **ফাসেক ও মুত্তাকীর পিছনে সালাত আদায় :** ফাসেক ও সৎ উভয় প্রকার ব্যক্তির ইমামতিতে সালাত আদায় করা যাবে। ফাসেকের পিছনে সালাত আদায় করলে হবে না এরকম বলা যাবে না; বরং উভয়ের পিছনে সালাত আদায় করলে সালাত হয়ে যাবে।

৬. **ন্যায়পরায়ণ ও অত্যাচারী শাসকের সম্মান রক্ষা :** অত্যাচারী এবং ন্যায়বিচারক উভয় প্রকার নেতার বিরুদ্ধে বের হওয়া ত্যাগ করতে হবে। সকলকে যার যার স্থানে মর্যাদা দিতে হবে।

৭. **দু'মোজার উপর মাসেহ :** দু'মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানতে হবে। কোনোভাবেই এ নীতিকে অস্বীকার করা যাবে না। এ বিধানের পরিপন্থি হওয়া আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধী কাজ।

৮. **তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস :** ভালো ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাকদীরের এ বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ফয়সালার বাইরে কোনো কাজ হয় না। এটা যথাযথভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

৯. **সত্যায়ন করা হতে বিরত থাকা :** নবীগণ এবং আশারায়ে মোবাশশারা ব্যতীত কারো ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। কারণ জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালার ব্যাপারে মন্তব্য করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি।

১০. **দু'ফরয আদায় করা :** দু'ফরয তথা সালাত ও যাকাত যথার্থভাবে আদায় করা। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অবহেলার অবকাশ নেই; বরং দুটি বিধানই যথাযথভাবে আদায় করা আবশ্যক।

উপসংহার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা ও ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দলীলভিত্তিক, যাতে কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও তারা মযবুত ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। অতএব এ দলের পথ ও মত আঁকড়ে ধরা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

■ **اَلسُّؤَالُ (١٠٤) : مَنْ هُمُ الْخَوَارِجُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهَا وَتَطَوُّرَهَا ـ**

■ **প্রশ্ন : ১০৪ ॥ খারেজী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উল্লেখ কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিমদের মাঝে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম। এ সম্প্রদায় শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদেরকে ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– The Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion and democratic in politics.

➲ خَوَارِجُ-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْخَوَارِجِ لُغَةً :

خَوَارِجُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْخَوَارِجُ শব্দটি خَارِجٌ-এর বহুবচন, যা اَلْخُرُوْجُ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْمُنْفَصِلُ তথা পৃথক, ২. اَلْخُلُوْصُ فِيْهِ তথা মুক্ত হওয়া,
৩. اَلْمُنْقَطِعُ তথা বিচ্ছিন্ন, ৪. اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ তথা দলত্যাগ করা,
৫. বের হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْخَوَارِجِ اِصْطِلَاحًا :

خَوَارِجُ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

فِرْقَةٌ مِنَ الْفِرَقِ الْاِسْلَامِيَّةِ خَرَجُوْا عَلَى الْاِمَامِ عَلِيٍّ وَخَالَفُوْا رَأْيَهُ ـ

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন।

২. اَلْاَدْيَانُ وَالْفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْخَوَارِجُ طَائِفَةٌ مَخْصُوْصَةٌ كَانَ اَوَّلُ خُرُوْجِهِمْ عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْخَلِيْفَةِ الرَّابِعِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رض) ـ

৩. المِلَل وَالنِّحَل প্রণেতা বলেন-

اَلْخَوارِجُ كُلُّ ما خرج على الامام الحقّ الّذى اتفقت الجماعة عليه ـ

নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন-

১. তারা মুসলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

২. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে বের হয়ে কুফার হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়।

৩. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন- ان الحكم الا لله অর্থাৎ, সকল হুকুমের মালিক আল্লাহ তায়ালা। এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়।

⊃ نَشْأَةُ الْخَوارِج :

খারেজীদের উৎপত্তি : ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। এরা শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদেরকে ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- The acceptance of the principle of orbitration proved disastrous to Ali in more than one way, it alienated the sympathy of a large body of his own followers. These kharijites as they were called, the earliest sect of Islam.

খারেজীরা হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের উৎপত্তি হয়েছিল মূলত হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। হযরত ওসমান (রা)-এর সরলতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী উমাইয়ারা সাম্রাজ্যের প্রায় সব উচ্চপদ দখল করে এবং প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করে। হযরত আবু যর গিফারী (রা) উমাইয়াদের এরূপ কাজের নিন্দা করেন। তিনি ইসলামকে বিলাসিতা ও জাঁকজমক থেকে মুক্ত রাখতে জোর প্রচেষ্টা চালান এবং বিশেষ করে তাঁর অনুসারীদের উমাইয়াদের থেকে পৃথক থাকতে বলেন। একপর্যায়ে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসনে গমন করেন। নির্বাসিত অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়। আবু যর গিফারী (রা)-এর অনুসারীগণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু করেন। মূলত উমাইয়াদের বিলাসিতা ও পার্থিব লালসার বিরোধিতা করতে গিয়েই খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তারা নিজেদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে হিজরতকারী বলে ঘোষণা করলেও সাধারণ মুসলিমরা তাদের খারেজী নামেই অভিহিত করতে থাকে।

⊃ تَطَوُّرُ الْخَوارِج :

খারেজীদের ক্রমবিকাশ :

১. **আবু যর গিফারীর নির্বাসন :** হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে ক্ষুদ্র মতানৈক্যের কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর স্বেচ্ছানির্বাসন ও নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর ইন্তেকালকে কেন্দ্র করে মুনাফিকগোষ্ঠী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত ওসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার

আন্দোলন জোরদার করে। পরবর্তীতে এদের অনুসারীদের হাতে হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন। মুনাফিকদের এ সম্প্রদায়টিই পরবর্তীতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করে। মূলত ব্যাপারটি ছিল আবু যর গিফারী (রা)-কে ঘিরে মুনাফিকদের একটা ষড়যন্ত্র।

২. **হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ :** সিফফীনের যুদ্ধের সালিসীর সিদ্ধান্তে মনোক্ষুণ্ন হয়ে খারেজীরা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ করে হারুরা নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। পরে কৌশলগত সুবিধা বিবেচনা করে সেখান থেকে সরে গিয়ে নাহরাওয়ানে ঘাঁটি স্থাপন করে।

৩. **হযরত আলী কর্তৃক নাহরাওয়ান অভিযান :** হযরত আলী (রা) খারেজীদের বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য নাহরাওয়ান অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধে খারেজীদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব বহু অনুচরসহ নিহত হয়।

৪. **হযরত আলীর শাহাদাতবরণ :** নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হয়েও খারেজীরা সামাজিকভাবে খুজিস্তান, ফারস, কিরমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। এ সময় খারেজীদের হাতে হযরত আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

৫. **খারেজীদের পতন :** খারেজী সম্প্রদায় ছিল সর্ববিষয়ে চরমপন্থি। আব্বাসী খেলাফতকালে তারা চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। আব্বাসী খলিফাগণ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা কার্যত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আফ্রিকায় গমন করে। মিসরের ফাতেমীয়দের শাসনামলে তারা একেবারে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তারা এ দলত্যাগ করাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করত এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সঠিক পথে আছে বলে মনে করত। নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে তারা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিত–

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ـ

উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি। তাই এ মতাদর্শ বর্জন করা ঈমানের দাবি।

■ **السُّؤَال (١٠٥) : الْخَوَارِجُ مَنْ هُمْ؟ اُذْكُرْ أَهَمَّ عَقَائِدِهِمْ مُخْتَصَرًا ـ**

■ **প্রশ্ন : ১০৫ ॥ খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন কর।** [ফা. প. ২০১১,'১৫]

اَوْ ـ مَا هُوَ اَفْكَارُ الْخَوَارِجِ؟ بَيِّنْ ـ

অথবা, খারেজীদের মতবাদ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : নবী করীম (স)-এর ওফাতের পর মুসলিমদের মাঝে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় প্রাচীনতম। এ সম্প্রদায় শিয়াদের মতো প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে নিজেদেরকে ধর্মীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– The Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion and democratic in politics.

৩ خَوَارِج-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْخَوَارِج لُغَةً :

خَوَارِج-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْخَوَارِج শব্দটি خَارِج-এর বহুবচন, যা اَلْخُرُوْج থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْمُنْفَصِلُ তথা পৃথক, ২. اَلْخُلُوْصُ فِيْهِ তথা মুক্ত হওয়া,

৩. اَلْمُنْقَطِعُ তথা বিচ্ছিন্ন, ৪. اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ তথা দলত্যাগ করা,

৫. বের হওয়া ইত্যাদি।

مَعْنَى الْخَوَارِج اِصْطِلَاحًا :

خَوَارِج-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

فِرْقَةٌ مِّنَ الْفِرَقِ الْاِسْلَامِيَّةِ خَرَجُوْا عَلَى الْاِمَامِ عَلِيٍّ وَخَالَفُوْا رَأْيَه.

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন।

২. اَلْاَدْيَانُ وَالْفِرَقُ وَالْمَذَاهِبُ الْمُعَاصِرَةُ গ্রন্থকার বলেন–

اَلْخَوَارِجُ طَائِفَةٌ مَخْصُوْصَةٌ كَانَ اَوَّلُ خُرُوْجِهِمْ عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْخَلِيْفَةِ الرَّابِعِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ).

৩. اَلْمِلَلُ وَالنِّحَلُ প্রণেতা বলেন–

اَلْخَوَارِجُ كُلُّ مَا خَرَجَ عَلَى الْاِمَامِ الْحَقِّ الَّذِيْ اتَّفَقَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَيْهِ.

৩ عَقَائِدُ الْخَوَارِجِ وَافْكَارُهُمْ :

খারেজীদের আকিদা ও মতবাদ : খারেজীরা বহু দল উপদলে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রত্যেক দল উপদলের নিজস্ব মতবাদ আছে। তাদের মতবাদগুলো নিম্নরূপ–

ক. ধর্মীয় মতবাদ :

১. **নিয়মিত ইসলামী অনুশাসন পালন ঈমানের শর্ত :** খারেজীদের মতে, যে মুসলিম নিয়মিত সালাত, রোযা ও অন্যান্য বুনিয়াদি কর্তব্য পালন করে না সে কাফের এবং তার পরিবারবর্গসহ তাকে হত্যা করা কর্তব্য।

২. **কবীরা গুনাহকারী জাহান্নামী :** কোনো মুসলিম পাপ করার পর তওবা না করে মারা গেলে তাকে অবশ্যই চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের দলীল হলো– لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

৩. **তওবা কবুলের আশা :** মৃত্যুর পূর্বে কেউ তওবা করলে তা কবুলের আশা করা যায়। পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ভোগের পর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মুক্তি দিতে পারেন।

৪. **ইসলাম থেকে খারিজ :** একটি অন্যায় পদক্ষেপই কোনো মুসলিমকে ইসলামচ্যুত করার জন্য যথেষ্ট। সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগের ওপরই প্রকৃত ঈমান তথা বিশ্বাস নির্ভর করে।

৫. **গুনাহ** : খারেজীদের মতে, ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার জন্য একটি গুনাহই যথেষ্ট।

৬. **সাম্প্রদায়িক মনোভাব** : যেসব মুসলিম খারেজীদের মত সমর্থন করে না, তারা নাস্তিক এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য।

৭. **বিবেকের পবিত্রতা** : ঈমান ও কর্মের ন্যায় খারেজীরা বিবেকের পবিত্রতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাদের মতে, বিবেকের পবিত্রতা মানুষকে মহৎ কার্যে প্রেরণা দেয়।

৮. **কুরআনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ** : খারেজীদের আরজাকিয়া উপদল কুরআনের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ এবং ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে।

৯. **অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ** : খারেজীরা অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করে। তাদের মতে, যদি কোনো অমুসলিম হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে, তবে তাকে মুসলিমদের সমান অধিকার দেয়া যাবে।

১০. **অনারব মুসলিমদের প্রতি উদারনীতি** : খারেজীরা মাওয়ালী বা অনারব মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। তাদের অন্যান্য মুসলিমদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১১. **যিম্মীদের প্রতি সহানুভূতি** : খারেজীরা যিম্মীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। তাদের মুসলিমদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করত।

১২. **ধর্মের অনুশাসন** : তারা যদিও বিশটি দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল তথাপি তারা ধর্মকে কোনো প্রকার বিতর্কমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত না করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

১৩. **ইসলাম ও ঈমান** : খারেজীদের মতে, ইসলাম ও ঈমান এক এবং অবিভাজ্য। আর খাঁটি ব্যক্তিই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. **পার্থিব বিলাসিতা** : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, মুসলিমদের জন্য পার্থিব বিলাসিতা হারাম।

১৫. **মৃত শিশুদের পরকাল** : মৃত শিশুদের ব্যাপারে খারেজীদের আকিদা হচ্ছে, বিধর্মীদের মৃত শিশুরা দোযখে আর মুসলিমদের শিশুরা বেহেশতে যাবে।

• **সূরা ইউসুফ পরিত্যাগ** : সূরা ইউসুফে প্রেমকাহিনী স্থান লাভ করায় তারা এ সূরা পরিত্যাগ করে। তাদের দাবি হচ্ছে, সূরা ইউসুফ কুরআনের অন্তর্গত হলে এ ধরনের প্রেমকাহিনী তাতে অন্তর্ভুক্ত হতো না।

১৭. **কুরআন হাদীসের প্রতি আনুগত্য** : খারেজীরা কুরআন হাদীসের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করত। তারা একমাত্র কুরআন হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এ থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতিও তারা মেনে নেয়ার পক্ষপাতী ছিল না। এজন্য খারেজী সম্প্রদায় ইসলামে বিশুদ্ধবাদী বলে পরিচিত।

১৮. বিত্তবৈভব বর্জন : খারেজী সম্প্রদায় বিত্তবৈভব অর্জনে নিরুৎসাহিত করে।

১৯. আকিদা : খারেজীদের মতে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম ও ঈমান অবিভাজ্য।

খ. রাজনৈতিক মতবাদ :

১. গণতন্ত্রপন্থি : খলিফা নির্বাচনে খারেজীরা চরম গণতন্ত্রপন্থি। তাদের মতে, খলিফাকে সমগ্র মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

২. খলিফার যোগ্যতা : তাদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য কোনো গোত্র বা পরিবার নির্ধারিত নেই। মুসলিম সমাজের যে কোনো যোগ্য ব্যক্তিই খলিফা হতে পারেন। এমনকি নির্বাচিত খলিফা নারী অথবা ক্রীতদাস হলেও তাতে কিছু যায় আসে না।

৩. জনসমর্থিত ও আস্থাভাজন : খলিফা যতক্ষণ জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, ততক্ষণই তিনি খলিফা পদে বহাল থাকবেন। তিনি যদি জনগণের কোনো অকল্যাণ করেন অথবা ইসলামের মূলনীতির বিরোধিতা করেন, তাহলে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে, এমনকি হত্যাও করা যেতে পারে।

৪. খলিফা নিষ্প্রয়োজন : একদল চরমপন্থি খারেজীর মতে, মুসলিমদের কোনো খলিফা বা ইমাম নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাতই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট।

৫. প্রথম দু'খলিফার স্বীকৃতি : চার খলিফার মধ্যে খারেজীরা মাত্র হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে খলিফা বলে স্বীকার করে। তাদের মতে, হযরত ওসমান ও আলী (রা)-এর খেলাফত স্বীকার করা যায় না। কারণ তাঁরা সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থাভাজন ছিলেন না।

৬. জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী : খারেজীরা উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, ইসলামের গণতান্ত্রিক আদল ধ্বংসকারী বলে মনে করত। তাদের মতে, অনৈসলামিক এ শাসকবর্গকে বিতাড়িত করা কর্তব্য।

৭. অনারবদের আরবজাতির ওপর প্রাধান্য দান : তারা আরব আভিজাত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে অনারবদের আরবদের ওপর স্থান দিত। কেননা তারা আরবজাতিকে হিংসার চোখে দেখত।

৮. অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ : কোনো খলিফা যদি পুরোপুরিভাবে জনগণের উন্নতি সাধন করতে না পারেন, তবে অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ করে যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা পদে নির্বাচিত করতে হবে।

৯. আইনের বিধান : لَا حُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম নেই। এটা খারেজীদের অন্যতম রাজনৈতিক মতবাদ।

১০. অপসারণ নীতি : খলিফা যতদিন জনগণের আস্থাভাজন থাকবেন, ততদিনই তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। জনস্বার্থ বিরোধী বা ইসলাম পরিপন্থি কোনো কাজ করলে তাঁকে অপসারিত করে যোগ্যতর ব্যক্তিকে খলিফা পদে বসাতে হবে।

১১. **রাজতন্ত্রবিরোধী** : খারেজী সম্প্রদায় চরম রাজতন্ত্রবিরোধী। তাই তারা উমাইয়া শাসকদের কর্তৃক বার বার নির্যাতিত হয় এবং আব্বাসীয়দের সাথে মিলে উমাইয়াদের পতন ঘটায়।

উপসংহার : খারেজীরা যদিও নিজেদেরকে ইসলামী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনে করে; কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, তাদের কর্মনীতির মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ বেশি। তাই এ মতাদর্শ বর্জন করা ঈমানের দাবি।

■ **اَلسُّؤَالُ (١٠٦) : عَرِّفِ الْفِرْقَةَ الشِّيْعَةَ مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ.**

■ **প্রশ্ন : ১০৬ ॥** শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনাসহ তাদের পরিচয় দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয়। শিয়া সম্প্রদায় এ দলগুলোর অন্যতম। এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় ও উৎপত্তির ইতিহাস উপস্থাপন করা হলো।

⊃ شِيْعَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الشِّيْعَةِ لُغَةً :

اَلشِّيْعَة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشِّيْعَة শব্দটি اَلشَّيْعُ থেকে গৃহীত। শব্দটি একবচন, বহুবচনে شِيَع ,اَشْيَاع; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন– اَلْاِتْبَاع তথা অনুসারী, اَلْاَنْصَار তথা সাহায্যকারী।

২. লুগাতুল ফোকাহা প্রণেতা বলেন– اَلْمُطَاوَعَة তথা অনুগত, اَلْمُتَابِعَة তথা অনুগামী, اَلْفِرْقَة তথা দল, اَلْاَحْزَاب তথা গোষ্ঠি।

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– اَلْفِرْقَة তথা দল, اَلْجَمَاعَة তথা সমষ্টি, اَلْاِتْبَاع তথা অনুগত, اَلْاَنْصَار তথা সাহায্যকারী, اَلْاَمْثَال তথা অনুরূপ, اَلْاَشْيَاء তথা সদৃশ।

مَعْنَى الشِّيْعَةِ اِصْطِلَاحًا :

شِيْعَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীরা 'শিয়া' নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নীতি বহুলাংশেই সাংঘর্ষিক। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে আলেমগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْن شَايَعُوْا عَلِيًّا وقالُوْا اِنَّه هُوَ الْاِمَامُ بَعْد رَسُوْل اللّٰه (ص) واعْتقَدُوْا اَنَّ الْاِمامَة لا تَخْرُجُ مِنْهُ وَمِنْ اَوْلَادِه۔

অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং তারা বলে রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং তারা বিশ্বাস করে ইমামতি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থেকে বের হবে না।

২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন– اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْن شَايَعُوْا عَلِيًّا وَيُقَدِّمُوْنَهُ عَلٰى سَائِر اَصْحاب الرَّسُوْلِ অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়।

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

هِىَ فِرْقَةٌ كَبِيْرَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اجْتَمَعُوا عَلٰى حُبِّ عَلِيٍّ وَآلِه واحَقِّيَّتِهِمْ بِالْاِمَامَةِ۔

অর্থাৎ, শিয়া হচ্ছে মুসলিমদের একটি বড় দল যারা হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরদের ভালোবাসে এবং ইমামতির দায়িত্বে তাদের অধিকার সম্পর্কে একমত হয়েছে।

➲ تَارِيْخُ نَشْأَةِ الشِّيْعَة :

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস : হঠাৎ করেই শিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেনি। তাদের উদ্ভবের পিছনে কয়েকটি ঘটনা বিদ্যমান। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **খলিফা নির্বাচনে অসন্তোষ :** হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আবু বকর (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হিসেবে মনোনীত হন। কতিপয় লোক এ মনোনয়ন মানতে পারেননি। এ মনোনয়নই শিয়া সম্প্রদায়ের উন্মেষের বীজ হিসেবে কাজ করে।

২. **আলী (রা)-কে খলিফা করার দাবি :** রাসূল (স)-এর ওফাতের পর কিছুসংখ্যক লোক মনে করেছিল, তাঁর জামাতা হযরত আলী (রা)-ই ইসলামী সাম্রাজ্যের খলিফা হবেন; কিন্তু যখন তারা দেখল, পর পর তিন বার তাদের দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে, তখন তারা নিরাশ হয়ে গোপনে সংগঠিত হতে থাকে; কিন্তু হযরত আলী (রা) কখনোই ক্ষমতালোভী ছিলেন না। তিনি পূর্ববর্তী সকল খলিফার আনুগত্য করেছেন।

৩. **ওসমানের শাহাদাতবরণ :** হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে আগের তুলনায় তারা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মান্তরিত ইহুদি ইবনে সাবা তাদের সাথে যোগ দিয়ে ওসমানবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে। এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

৪. **আলী ও মুয়াবিয়ার বিরোধ :** ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত হলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। অতঃপর সিফফিনের যুদ্ধ বিরতির পর দুমাতুল জান্দালের সালিসী বৈঠকে হযরত আলী (রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় এবং পরবর্তীতে খারেজীদের হাতে তাঁর হত্যাকাণ্ড শিয়া আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে।

৫. **গণতন্ত্র বিলোপ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :** শিয়াদের উৎপত্তির পিছনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করার বিষয়টাও প্রবলভাবে দায়ী। মুয়াবিয়া (রা) ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করায় শিয়ারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

৬. **কারবালার হত্যাকাণ্ড :** হযরত আলী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ইমাম হাসান (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খেলাফতের দাবি পরিত্যাগ করেন। তবে শর্ত থাকে, মুয়াবিয়া (রা)-এর পর তিনিই মুসলিম জাহানের খলিফা হবেন; কিন্তু হযরত হাসান (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর আগেই ইন্তেকাল করেন। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযিদের নাম খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করেন। ফলে ইয়াযিদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। আর খেলাফতের দাবি ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-এর ছোট ভাই হযরত হোসাইন (রা)-এর সাথে ইয়াযিদের চরম বিরোধ বাধে। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াযিদ বাহিনী কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কারবালার এ হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড শিয়াদের প্রতিহিংসার আগুন আরো প্রজ্বলিত করে তোলে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির ভাষায়– The blood of Al-Husain, even more than that of his father, proved to be the seed of the shiison it 'Church'; Shii'sm was born on the tenth of Muharram.

৭. **শিয়াদের সহিংস আন্দোলন :** কারবালার বিষাদময় হত্যাযজ্ঞের পর শিয়ারা প্রকাশ্যভাবে হযরত আলীর পরিবারের পক্ষে সহিংস আন্দোলন সূচনা করে। এ সময় 'মুখতার' নামক জনৈক শিয়া নেতা ইমাম হোসাইনের হত্যাকারী কুফার প্রাদেশিক গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হত্যা করে কারবালার হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

৮. **শিয়াদের ব্যাপক প্রসার লাভ :** প্রথম দিকে কেবল আরবরাই ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পরবর্তীতে আরবের বাইরেও এ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।

৯. **শিয়াদের বিভেদ :** ইমামত প্রশ্নে শিয়াদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। তাদের কেউ কেউ ইমাম হোসাইনের পুত্র যয়নুল আবেদীনকে, আবার কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে শিয়ারা ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১০. **শিয়াদের উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন :** কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে শিয়ারা তীব্র আন্দোলনে নামে। আব্বাসীয়রা তাদের সাথে যোগ দিয়ে উমাইয়াদের পতন ঘটায়।

১১. **আব্বাসীয়দের দমন নিপীড়ন :** শিয়াদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসলেও খলিফা মামুন ব্যতীত অন্য সব আব্বাসী খলিফা তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও দমন নিপীড়ন চালায়। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

১২. **শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :** আব্বাসীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুসংখ্যক শিয়া উত্তর আফ্রিকায় চলে যায়। তথায় তারা হাসানের বংশীয় ইদ্রিসের নেতৃত্বে 'তানজিয়া' নামক স্থানে একটি শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৩. **বর্তমানে শিয়াদের অবস্থান :** বর্তমানে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অনুসারী রয়েছে। তবে ইরানে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে শিয়া সম্প্রদায় উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। তারা প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে তা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করে। তবে এরা সবাই হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠٧) : اُصُوْلُ عقائد الشِّيْعة ما هى؟ بَيِّنْ.

■ প্রশ্ন : ১০৭ ॥ শিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে নানা মতবাদ ও বিভিন্ন দল উপদলের উৎপত্তি হয়। শিয়া সম্প্রদায় এ দলগুলোর অন্যতম। এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপরীত আকিদা পোষণ করতে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতি উপস্থাপন করা হলো।

اُصُوْلُ عقائد الشِّيْعة :

শিয়াদের আকিদার মূলনীতি : শিয়াদের বিভিন্ন প্রকার আকিদা রয়েছে, যা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপ–

ক. عَقِيْدَةٌ فى الامامة তথা ইমাম নির্বাচনের (নেতৃত্বের) ব্যাপারে আকিদা।

খ. عَقِيْدَةٌ فِىْ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ (صـ) তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের ব্যাপারে আকিদা।

গ. عَقِيْدَةٌ فِىْ تَحْرِيْفِ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনের ব্যাপারে আকিদা। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

ক. عَقِيْدَةُ الْاِمَامَةِ তথা ইমাম নির্বাচনের ব্যাপারে আকিদা :

১. ইমাম নির্বাচনে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, ইমামগণ নবীদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাদের বিশ্বাসে ইমামগণের সংখ্যা ১২ জন। যথা–

ক. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা), খ. হযরত হাসান (রা), গ. হযরত হোসাইন (রা), ঘ. হযরত আলী ইবনে হোসাইন, যিনি যাইনুল আবেদীন নামে পরিচিত, ঙ. তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি ইমাম বাকের নামে পরিচিত, চ. তদীয় পুত্র হযরত জাফর সাদেক, ছ. তদীয় পুত্র হযরত মুসা আল কাজেম, জ. হযরত আলী রেজা, ঝ. তদীয় পুত্র হযরত মুহাম্মাদ তাকী, ঞ. তদীয় পুত্র হযরত আলী তাকী, ট. তদীয় পুত্র হোসাইন আসকারী, ঠ. তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী।

২. ইমামগণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে না; বরং তারা যমীন থেকে বের হয়।

৩. ইমামগণ عِلْمُ الْغَيْبِ জানেন। যেমন ইমামদের কথা–

نَحْنُ نَعْلَمُ مَا كَانَ وَلَمْ يَكُنْ وَانَّه لَا يَخْفِى عَلَيْنَا شَيْءٌ.

৪. ইমামদের কথা কুরআনে রয়েছে। যেমন– انَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ এখানে امانة দ্বারা দীন ও শরীয়ত বোঝানো হয়েছে, যা শিয়াদের রয়েছে।

৫. ইমামদের মর্যাদা মুহাম্মাদ (স)-এর মর্যাদার ন্যায়, যা অতীতের নবীদের উর্ধ্বে।

৬. ইমামদের নিকট অহী আসে, যেভাবে নবীদের নিকট অহী এসেছে।

৭. ইমামগণ বৃহস্পতি এবং জুমাবার রাতে মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আসতে পারেন।

৮. ইমামগণ নবীদের ন্যায় গুনাহমুক্ত বা মাসুম।

৯. ইমামদের আনুগত্য করা ফরয এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য শর্ত।

১০. ইমামগণ জাহান্নামবাসীদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার রাখেন।

১১. ইমামগণ বান্দাদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামে পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন।

১২. ইমামত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য যে কোনো ব্যক্তি ইমামতের অযোগ্য।

১৩. প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর খলিফা নির্বাচন অবৈধ ছিল।

১৪. ইমাম মাহদী আগমন করে পৃথিবীতে বিদ্যমান জুলুম, ব্যভিচার, অত্যাচার নির্মূল করে ইসলাম ও ইনসাফ কায়েম করবেন।

১৫. কুরআনুল কারীম নিরন্তর গ্রন্থ নয়।

১৬. কুরআনুল কারীম ছাড়া হাদীস, ইজমা, কেয়াস শরীয়তের দলীল নয়।

১৭. জুমার সালাত একাকী আদায় করা যায়।

১৮. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের স্থানে তিন ওয়াক্ত পড়লেই চলবে।

১৯. ধর্ম প্রচার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তারা গোপনীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী।

২০. ইমাম হোসাইনের স্মৃতি রক্ষার্থে ১০ মহররম পর্ব পালন।

২১. নিকাহে মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ।

২২. কেয়ামত দিবসে সকলে পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং ভালো কাজের জন্য জান্নাত এবং খারাপ কাজের জন্য জাহান্নাম লাভ করবে।

খ. عَقِيْدَةٌ فِىْ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ (صـ) **তথা সাহাবীগণের ব্যাপারে আকিদা :** রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা হচ্ছে, হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা) কাফের।

দলীল : তাদের দলীল কুরআনের বাণী–

١۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا ۔

আলোচ্য আয়াতে তিনবার كُفْر শব্দ দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। অপর দলীল–

٢۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۔

আলোচ্য আয়াতে زَيَّنَهٗ-এর ه সর্বনাম দ্বারা হযরত আলী (রা)-কে বুঝানো হয়েছে, আর كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ আয়াতাংশে اَلْكُفْر দ্বারা হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-সহ সকল সাহাবীকে বুঝানো হয়েছে।

গ. عَقِيْدَةٌ فِىْ تَحْرِيْفِ الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ **তথা কুরআন মাজীদ পরিবর্তনের ব্যাপারে আকিদা :** মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা নিম্নরূপ–

১. হযরত মুসা (আ)-এর জাতি তাওরাত পরিবর্তন করেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর জাতি ইঞ্জিল পরিবর্তন করেছে, অনুরূপ নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ কুরআন মাজীদ পরিবর্তন করেছে।

২. কুরআনুল কারীমে سُوْرَةُ الْوِلَايَةِ নামক একটি সূরাতে ইমামতের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল; কিন্তু এটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩. سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ এটা অনেক বড় সূরা ছিল, যার মধ্যে কুরাইশদের ৭০ জন ব্যক্তির বংশধারা উল্লেখ ছিল; কিন্তু তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

উপসংহার : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা পরিপন্থি। ইমাম নির্বাচন, সাহাবীগণ ও কুরআন পরিবর্তন প্রসঙ্গে তাদের আকিদা সুন্নাত পরিপন্থি। অতএব আহলুস সুন্নাতের মতানুযায়ী এরা বাতিল ফেরকা।

■ **اَلسُّوَالُ (١٠٨) : مَا هِىَ عَقِيْدَةُ الْيَهُوْدِىِّ اِبْنِ صَبَا حَوْلَ عَلِىٍّ (رضـ) وَخِلَافَتِهٖ؟**

■ প্রশ্ন : ১০৮ ॥ হযরত আলী (রা) ও তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে ইহুদি ইবনে সাবার কী বিশ্বাস রয়েছে?

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালে যে সকল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ইসলামী খেলাফতের বিশাল প্রাসাদে কুঠারাঘাত হেনেছিল, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র অন্যতম। মুসলিম নামধারী এ ইহুদি লোকটির ষড়যন্ত্রের ফলে কতিপয় লোক হযরত আলী (রা)-এর প্রতি এ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা)-ই ছিলেন খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরি। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে খেলাফত থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর সাহাবীগণ হযরত আলী (রা)-এর নিকট বাইয়াত না করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। নিম্নে হযরত আলী (রা) ও তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে ইবনে সাবার আকিদা তুলে ধরা হলো।

عَقِيْدَةُ ابْنِ صبا ❷ :

ইবনে সাবা কর্তৃক প্রচারিত আকিদা : ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, ৩০-৩৫ হিজরীর দিকে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার অনুসারীগণ নবী-বংশের ভালোবাসা ভক্তির নামে বিভিন্ন বিদয়াতি আকিদা বা নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাস প্রচলন করে, যা কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। তার সেসব বিদয়াতি আকিদাই পরবর্তীতে শিয়াদের আকিদায় পরিণত হয়। তাদের এ সকল বিদয়াতি আকিদার মধ্যে রয়েছে–

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর আলী (রা)-এর রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ।
২. আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ মাসুম বা নিষ্পাপ।
৩. আলী (রা) তাঁর ইন্তেকালের পরে আবার আসবেন।
৪. রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে বিশেষ কিছু গোপন ইলম দান করেছেন এবং আলী (রা)-এর নিকট গুপ্ত ইলমের ভাণ্ডার রয়েছে।
৫. আলী (রা)-এর মধ্যে উলুহিয়্যাত তথা আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, সম্পর্ক বা বিশেষত্ব রয়েছে কিংবা তিনি অবতার।
৬. আলী (রা), হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) থেকে শ্রেষ্ঠ।
৭. সাহাবীগণের প্রতি কুধারণা ও তাঁদের সকলকে বা কাউকে গালি দেয়া।

প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সকল বিদয়াতের উৎপত্তি ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। আলী (রা) স্বয়ং এদের বিভ্রান্তি দূর করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যারা তাঁর উলুহিয়্যাত বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক দাবি করত বা তাঁকে সেজদা করত, তিনি তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সর্বশেষ যারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে, তাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

উপসংহার : শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পেছনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রই প্রধান। তার আকিদা বিশ্বাসগুলো এ সম্প্রদায়ের আকিদা বিশ্বাসে পরিণত হয়।

■ اَلسُّؤَالُ (١٠٩) : مَنْ هُمُ الْجَبْرِيَّةُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهُمْ وَتَطَوُّرَهُمْ۔

■ প্রশ্ন : ১০৯ ॥ জাবরিয়্যা কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : Islam is the name of a total way of life. জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, এমন উদার নৈতিক ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম। দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। কুরআনের পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াতের বিতর্কমূলক আলোচনা পর্যালোচনাই এ সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য।

জَبْرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْجَبْرِيَّة لُغَة :

জَبْرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : جَبْرِيَة শব্দটির جِيْم ও بَاء বর্ণদ্বয়ে যের হলে এর অর্থ হবে– اَلتَّكَبُّر তথা অহংকার।

جَبْرِيَّة শব্দটি اَلْجَبْر-এর দিকে নিসবত হয়েছে। এর অর্থ– اَلْاِلْزَام তথা আবশ্যক করা, বাধ্যবাধকতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ।

مَعْنَى الْجَبْرِيَة اِصْطِلَاحًا :

জَبْرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

اَلْجَبْرِيَّةُ مَذْهَبُ مَنْ يَرٰى اَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ لِلْاِنْسَانِ قَدْ قُدِّرَ عَلَيْهِ اَزَلًا ـ

অর্থাৎ, জাবরিয়্যা ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা ঘটে এসবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল।

২. আল মিলাল ওয়ান নাহাল প্রণেতা বলেন–

اَلْجَبْرِيَّةُ هُوَ نَفْىُ الْعَقْلِ حَقِيْقَةً عَنِ الْعَبْدِ وَاِضَافَتُهُ اِلَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ

অর্থাৎ, জাবরিয়্যা বলা হয় তাদেরকে, যারা বান্দার আমলকে অস্বীকার করে এবং সকল কিছু প্রতিপালকের দিকে সম্পর্কিত করে।

৩. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন–

اَلْجَبْرِيَّةُ اِسْنَادُ فِعْلِ الْعَبْدِ اِلَى اللّٰهِ الْقَاهِرِ يَخْلُقُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ ـ

৪. আল্লামা আবুল হাশেম (র) বলেন–

اَلْجَبْرِيَّةُ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اَجْبَرَ اللّٰهُ الْعِبَادَ عَلَى الذُّنُوْبِ وَمَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يُكْرِهَ اَحَدًا عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ ـ

মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের মতে মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবরিয়্যা সম্প্রদায় বলা হয়।

نَشْأَةُ الْجَبْرِيَة :

জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : প্রাকইসলাম যুগে আরবদের অনেকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানুষকে তিনি যা করতে বাধ্য করেন, তা-ই মানুষ করে। তারা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথে এক গোঁড়া সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম। তার কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই, কাজেই মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের মতে, প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। সে সম্পূর্ণ আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার আর যাকে ইচ্ছা-শাস্তি প্রদান করেন।

تَطَوُّرُ الْجَبْرِيَة :

জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : এ মতবাদ হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় স্তিমিত থাকলেও হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উমাইয়া খেলাফত আমলে

এ সম্প্রদায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ সময় জাবরিয়্যারা অদৃষ্টবাদের ব্যাপারে একই মতাবলম্বী থাকলেও ছোটখাট ব্যাপারে তারা জাহমিয়া, নাজারিয়া ও জাবরিয়্যা এ তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইবনে সাফওয়ান বলেন– Man does not really out, it is only meet phonically that he is said out in the same way the seles hinem in raid to sheinem and that will wheel to turn.

উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন এবং তার উপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা। তাই জাবরিয়্যারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

■ **اَلسُّؤَالُ (١١٠) : اُكْتُبْ اُصُوْلَ عَقِيْدَةِ الْجَبْرِيَّةِ وطَبَقَاتِ اَفْكَارِهِمْ - وَاٰرَاءَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنْهُمْ -**

■ **প্রশ্ন : ১১০ ॥ জাবরিয়্যাদের আকিদার মূলনীতি ও তাদের মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস এবং তাদের সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামায়াতের অভিমত লিপিবদ্ধ কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : Islam is the name of a total way of life. জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান এখানে অবারিত, এমন উদার নৈতিক ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম। দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। কুরআনের পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াতের বিতর্কমূলক আলোচনা পর্যালোচনাই এ সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য।

⊃ اُصُوْلُ عَقِيْدَةِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবরিয়্যাদের মৌলিক আকিদা :

১. তাদের মতে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কাজেই মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি কিংবা ইচ্ছা বা স্বাধীনতা নেই।
২. মানুষ সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন, মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন।
৩. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পুরস্কার দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

দলীল : জাবরিয়্যারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করে।

١- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

٢- قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলুন, হে প্রভু! তুমিই রাজশক্তির মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর আর যাকে ইচ্ছা রাজ্যচ্যুত কর; তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, তোমার হাতেই সব কল্যাণ; নিঃসন্দেহে তুমি সকল বিষয়ের উপর পরম শক্তিমান।

٣- وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا۔

অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং এদের তাকদীর বা পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৪. يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন।

উপরিউক্ত আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াতকে পুঁজি করে জাবরিয়্যা মতবাদ গড়ে ওঠে।

⊃ طَبَقَاتُ اَفْكَارِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবরিয়্যা মতবাদের শ্রেণিবিন্যাস : শাহরাস্তানী জাবরিয়্যা সম্প্রদায়কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. **গোঁড়া জাবরিয়্যা :** এ দলের মতবাদ হলো, কোনো অর্থেই মানুষ কাজ করে না অথবা মানুষের কাজের শক্তি আছে বলা যায় না।

২. **মধ্যপন্থি জাবরিয়্যা :** এ দলের মতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি মানুষের কার্যের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

জাবরিয়্যাদের উপদল : শাহরাস্তানী জাবরিয়্যাদের তিনটি প্রধান উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. জাহমিয়া, ২. নাযারিয়া, ৩. জাবরিয়্যা। এ উপদলগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে তাদের কোনো মতানৈক্য ছিলো না। তারা সবাই অদৃষ্টে বিশ্বাসী ছিল।

⊃ اٰرَاءُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ الْجَبْرِيَّةِ :

জাবরিয়্যা মতবাদ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ও অন্যান্য বাতিল ফেরকার মতো ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অধিকারী। কেননা তারা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মশক্তির স্বীকৃতি সংক্রান্ত আয়াতের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করে না। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী– اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) অশেষ দয়াময়, তিনি (মানুষদের) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি তাকে বয়ান তথা ইসলামের যাবতীয় বিধি নিষেধ জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যত্র বলেছেন– وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ, আদম (আ)-কে তিনি (আল্লাহ) সর্ববস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

এ পরম সত্য উপেক্ষা করে জাবরিয়্যা সম্প্রদায় নিজেদের সম্পূর্ণ অক্ষম গণ্য করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে উচ্চমার্গে তুলে ধরে।

উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা। তাই জাবরিয়্যারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

■ السُّؤَال (١١١) : مَنْ هُمُ الْقَدَرِيَّةُ؟ اُذْكُرْ نَشْأَتَهُمْ وَتَطَوُّرَهُمْ.

■ **প্রশ্ন : ১১১ ॥ কাদারিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা 'পূর্ব নির্ধারণ' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মীয় কারণে আবির্ভূত এ সম্প্রদায়ের মতবাদকে সুচতুর উমাইয়া খলিফারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন। উমাইয়া খলিফারা ছিলেন ক্ষমতালোভী। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা নিজেদের কর্মফল, অর্থাৎ পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন না। তারা সুচতুরভাবে প্রচার করতেন বা জাবরিয়্যাদেরকে এ মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করতেন যে, মানুষের কর্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু ঘটছে এবং মানুষ যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে মাত্র।

⊃ قَدَرِيَّة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْقَدَرِيَّة لُغَةً :

قَدَرِيَّة-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْقَدَرِيَّةُ শব্দটিকে اَلْقَدَر-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। اَلْقَدَرُ অর্থ– ১. اَلسُّلْطَان তথা ক্ষমতা, ২. اَلْقَضَاء তথা ফয়সালা, ৩. اَلْمُقَدَّر তথা নির্ধারিত, ৪. اَلْحُكْمُ তথা নির্দেশ, ৫. اَلْخَلْق তথা সৃষ্টি, ৬. اَلنِّظَام তথা ব্যবস্থা।

مَعْنَى الْقَدَرِيَّة اِصْطِلَاحًا :

قَدَرِيَّة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাদের ধারণা, আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

اَلْقَدَرِيَّةُ قَوْمٌ يُنْكِرُوْنَ الْقَدَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّ كُلَّ اِنْسَانٍ خَالِقٌ لِفِعْلِهٖ.

অর্থাৎ, কাদারিয়্যা এমন সম্প্রদায়, যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে এবং বলে, প্রত্যেক মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা।

মোটকথা, কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হলো তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী।

⊃ نَشْأَةُ الْقَدَرِيَّة وَتَطَوُّرُهُمْ :

কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বিখ্যাত ইমাম হাসান আল বসরী মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই কাদারিয়্যা আন্দোলনের বীজ বপন করেন। আর তার শিষ্য মাবাদ আল জুহানী এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া শাসকদেরকে অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত ও পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। ফলে খলিফা আবদুল মালেক তার প্রতি রুষ্ট হন

এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফার অনুগতরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কাদারিয়্যা মতবাদের প্রধান উদ্যোক্তা মাবাদ আল জুহানীকে নির্যাতন করেও তার অনুসারী কাদারিয়্যাদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করা উমাইয়া শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাবাদ আল জুহানীকে হত্যা করার পর বিশিষ্ট কাদারিয়্যা চিন্তাবিদ ইউনুস আসওয়ারী ও খিলান দামেশকী কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তারাও অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। একপর্যায়ে খিলান দামেশকীকেও হত্যা করা হয়; কিন্তু অস্ত্রের জোরে পৃথিবীর কোথাও কখনোই মানুষের চিন্তার বিপ্লব দমন করা সম্ভব হয়নি। তাই কাদারিয়্যাদের ওপর উপর্যুপরি অত্যাচার ও তাদের হত্যাকাণ্ড যেন আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো কার্যকর উপাদান হিসেবে সংযোজিত হয়, যা উমাইয়া শাসকদের জন্য অশুভ ইঙ্গিতই বহন করেছিল।

উপসংহার : জাবরিয়্যাদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। জাবরিয়্যা মতবাদানুসারে মানুষকে পরাধীন পশুর ন্যায় প্রভু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়; কিন্তু কাদারিয়্যারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٢) : عَقَائِدُ الْقَدَرِيَّةِ مَا هِيَ؟ بَيِّنْ-

■ প্রশ্ন : ১১২ ॥ কাদারিয়্যাদের আকিদাসমূহ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা 'পূর্ব নির্ধারণ' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মীয় কারণে আবির্ভূত এ সম্প্রদায়ের মতবাদকে সুচতুর উমাইয়া খলিফারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন। উমাইয়া খলিফারা ছিলেন ক্ষমতালোভী। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা নিজেদের কর্মফল, অর্থাৎ পরকালের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন না। তারা সুচতুরভাবে প্রচার করতেন বা জাবরিয়্যাদেরকে এ মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করতেন যে, মানুষের কর্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু ঘটছে এবং মানুষ যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে মাত্র। নিম্নে তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা করা হলো।

عَقَائِدُ الْقَدَرِيَّةِ : ১

কাদারিয়্যাদের আকিদাসমূহ : কাদারিয়্যা সম্প্রদায় বেশ কিছু মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতবাদসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ক. **মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী :** কাদারিয়্যা চিন্তাবিদদের মতে, মানুষ এক ঐচ্ছিক সত্তা, তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারো দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়; বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ন্তা এবং তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কোনো মানুষের কর্ম তৈরি করে দেন না, তবে তিনি মানুষকে কার্যক্ষমতা প্রদান করেন।

খ. **কাদারিয়্যাদের আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কিত বক্তব্য :** "আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ পাপকার্য থেকে পবিত্র"– এ বক্তব্য ঘোষণা করে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় মানুষের

নৈতিকতাবোধের প্রতি অত্যন্ত বেশি গুরুত্বারোপ করে। কাদারিয়্যাদের মতে, মানুষ স্বয়ং তার কর্মের কর্তা। সুতরাং সে যদি ভালো কাজ করে তবে পুরস্কার পাবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে। মানুষ তার নিজ কর্মের নিয়ন্তা, তার ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। যে কোনো মানুষ তার ইচ্ছামতো ভালো কাজ করতে পারে আবার মন্দ কাজও করতে পারে। তবে মানুষের মধ্যে ভালোমন্দ, অন্যায় ও উচিত অনুচিতের পার্থক্য জ্ঞান রয়েছে।

গ. **ভিন্ন কাদারিয়্যাদের অভিমত :** কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের কতিপয় ভিন্নপন্থি চিন্তাবিদ মাঝে মাঝে মানুষের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দু'একটি ঐশী শক্তিও প্রদান করেছেন; কিন্তু মানুষ যে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, এ কথা তারা ভুলে গেছেন।

দলীল : কাদারিয়্যা সম্প্রদায় তাদের মতের পক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তুলে ধরেছে–

১. وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ, যে মুসিবত তোমাদের ওপর আপতিত হয়, তা তোমাদের অর্জিত কাজেরই ফল। (সূরা শূরা : আয়াত- ৩০)

২. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى অর্থাৎ, মানুষ চেষ্টার অতিরিক্ত ফল পাবে না। (সূরা আন নজম : আয়াত- ৩৯)

৩. যে যেমন কাজ করবে, সে তেমন ফল পাবে।

৪. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ - অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে অণু পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে, সে-ও তা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা যিলযাল : আয়াত- ৭–৮)

৫. নিশ্চয় জেনে রেখ, যতদিন পর্যন্ত কোনো জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন করেন না। (সূরা বাকারা : আয়াত- ১১)

৬. যে পাপানুষ্ঠান করে, সে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই তা করে। (সূরা নিসা : আয়াত- ১১১)

৭. وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا - قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ, আর যখন পাপীরা লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ তায়ালাও আমাদের এরূপ আদেশই করেছেন। আপনি বলুন (হে রাসূল), আল্লাহ লজ্জাকর কাজের আদেশ করেন না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ২৮)

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত আয়াতার্থ দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, কাদারিয়্যা চিন্তাবিদরা চরমপন্থি। কারণ জাবরিয়্যা সম্প্রদায় তাদের বিশ্বাস মতে, যেখানে মানুষের নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ ও আত্মসচেতনতাকে পদদলিত করে আল্লাহকে সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে কাদারিয়্যারা মানুষকে শক্তি স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম শক্তিকে খর্ব করে। যদিও উভয় দলই নিজেদের দাবির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছে। তবুও তাদের এদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, বিশেষ ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইসলাম যেমন মহান আল্লাহর অপারসীম শক্তি স্বীকার করে, তেমনি মানুষের সীমিত ইচ্ছা এবং কর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকলেও তা বিশেষ অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের সার্বভৌম কোনো শক্তি নেই। সে কারণেই মানুষ যা

চায় তা পায় না। তাই মানুষ একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিজের চরিত্র ও ভাগ্যের সংগঠক।

উপসংহার : জাবরিয়্যাদের মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে কাদারিয়্যা সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। তারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٣) : اُكْتُبْ اَقْوَالَ الْجَبْرِيَةِ وَالْقَدْرِيَّةِ فِىْ بَابِ الْقَدْرِ وَافْعَالُ الْعِبَادِ.

■ প্রশ্ন : ১১৩ ॥ বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যাদের অভিমতগুলো লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার স্থান ইসলামে অবারিত, এমন উদার নৈতিক ভাবধারার কারণে কালক্রমে এতে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক দল। সেগুলোর মাঝে জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যা সম্প্রদায় অন্যতম। দার্শনিক যুক্তি ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। আর সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামে একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে, যারা অদৃষ্টবাদ বা 'পূর্ব নির্ধারণ' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এরা কাদারিয়্যা সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

⊃ اَقْوَالَ الْجَبْرِيَّةِ حَوْلَ الْقَدْرِ وَاَفْعَالَ الْعِبَادِ :

বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে জাবরিয়্যাদের অভিমত : জাবরিয়্যাদের মতে, বান্দা জড়পদার্থের মতো, আল্লাহ তার সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা। উপার্জনে বান্দার কোনো ক্ষমতা, ইচ্ছা ও এখতিয়ার নেই। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই করতে পারে না। বান্দার নড়াচড়া, হাঁটাচলা সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।

দলীল : ক. নকলী দলীল–

١. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى.

٢. اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ.

٣. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ.

٤. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

খ. আকলী দলীল–

১. কর্মে বান্দার ইচ্ছা থাকা মেনে নিলে قُدْرَةُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর শক্তির সাথে قُدْرَةُ الْعَبْدِ তথা বান্দার শক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়।

২. কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আর كَاسِبْ যদি বান্দা হয়, তাহলে كَاسِبْ পাপী হলে خَالِقْ-ও পাপী হওয়া আবশ্যক হয়।

⊃ اَقْوَالُ الْقَدْرِيَةِ حَوْلَ الْقَدْرِ وَافْعَالُ الْعِبَادِ :

বান্দার কর্ম ও ভাগ্য সম্পর্কে কাদারিয়্যাদের অভিমত : কাদারিয়্যাদের মতে, বান্দা তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। ভালোমন্দ, সুখ, দুঃখ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সবকিছু বান্দার হাতের কাজ। এখানে তাকদীরে বা আল্লাহ পূর্ব থেকে ভাগ্যে লিখেছেন এমন কোনো বিষয় নেই। বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু হয়; এখানে আল্লাহর শক্তিতে কিছু হয় না।

দলীল :

ক. নকলী দলীল–

١. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا.

٢. جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

٣. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

٤. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

٥. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

٦. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ.

খ. আকলী দলীল–

১. কর্মে বান্দার اخْتِيَار তথা স্বাধীনতা না থাকলে তাকে ইবাদতের আদেশ দেয়া বৈধ হতো না।

২. একজন সুস্থ লোকের হস্ত সঞ্চালন তার ইচ্ছায় হয়ে থাকে; কিন্তু মৃগী রুগীর নড়াচড়া তার ইচ্ছায় হয় না। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কর্মসম্পাদনে বান্দার اخْتِيَار তথা স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. বান্দার اخْتِيَار তথা স্বাধীনতা না থাকলে বান্দাকে কোনো কর্মের কর্তা হিসেবে উল্লেখ করা যেতো না। যেমন– اخْتِيَار না থাকলে বান্দাকে مُصَلِّى، صَائِم ইত্যাদি বলা যেতো না।

উপসংহার : জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের সাবলীল জীবনধারায় এক চরমপন্থি চিন্তাচেতনার সঞ্চার করে। মানুষকে আল্লাহ যে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন এবং তার ওপর যে কতগুলো কার্য অত্যাবশ্যক করণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা সেটা অস্বীকার করে ইচ্ছাধীন জীবনযাপনের প্রবক্তা। তাই তারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়। আর কাদারিয়্যারা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং প্রতিটি মানুষকে তার স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী করে এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে। সুতরাং জাবরিয়্যা ও কাদারিয়্যা উভয় মতবাদই চরমপন্থি।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٤) : مَنْ هُمُ الْمُرْجِئَةُ؟ اُذْكُرْ عَنْ نَشْأَتِهَا وَتَطَوُّرِهَا.

■ প্রশ্ন : ১১৪ ॥ মুরজিয়া কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ শিয়া এবং চরমপন্থি খারেজী সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। উদার ও সহনশীল চিন্তাচেতনার ধারক বলে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা করলেও কালক্রমে তা ধর্মতাত্ত্বিক দলে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন– In general Murjite influence was on the side of tolerance.

⊃ مُرْجِئَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُرْجِئَةِ لُغَةً :

مُرْجِئَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُرْجِئَة শব্দটি إِرْجَاء শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ– স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা। সুতরাং مُرْجِئَة শব্দের অর্থ হলো– বিলম্বকারী, মুলতবিকারী।

مَعْنَى الْمُرْجِئَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُرْجِئَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বোঝায়, যারা হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার মতামত দেয়।

⊃ نَشْأَةُ الْمُرْجِئَةِ :

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের সহিংস প্রতিবাদ এবং চরম বাড়াবাড়ির মোকাবেলায় সহনশীল উদার চিন্তাধারার স্লোগান ধারণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উমাইয়া শাসকদের কেউ কেউ ইসলামী জীবনাচারের প্রতি উদাসীন থাকার কারণে তাদের কাফের, মুশরিক, বিদয়াতি আখ্যা দিয়ে খারেজী ও শিয়ারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুরজিয়াদের অভিমত হলো, উমাইয়াদের মুশরিক ও কাফের বলে নিন্দা করা অনুচিত। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, উপরন্তু প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকে। এ কারণে শেষ বিচারের দিন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

⊃ تَطَوُّرُ الْمُرْجِئَةِ :

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশ : উমাইয়া শাসনামলে বহুলোক মুরজিয়া মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উমাইয়াদের সমর্থক হিসেবে তারা রাজকীয় অনুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভ করে। মুরজিয়ারা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সীমালঙ্ঘনকারী নেতিবাচক উদার নৈতিকতার ধ্বজাধারী সম্প্রদায়। ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়– In general Murjite influence was on the side of tolerance.

অবশ্য মুরজিয়ারা একটি ভ্রষ্ট উপদল হলেও তাদের কোনো কোনো মতবাদ সত্যপন্থি ইসলাম অনুসারীদের চিন্তাচেতনা ও মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মুরজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মন্তব্য :

১. আলফ্রেড ভনক্রেমারের মতে, কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের ন্যায় মুরজিয়ারাও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে দামেশকে তাদের উত্থান ঘটে।

২. আব্রাহাম হালকীন মন্তব্য করেন, যেহেতু তারা উমাইয়া শাসকচক্রের পক্ষে সমর্থন যোগায়, সেহেতু তারা রাজনৈতিক দল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

৩. ট্রিউন হালকীনও মনে করেন, এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে।

৪. অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের মতে, মুরজিয়াদের উত্থানের পেছনে অন্য একটি কারণ ছিল। পূর্ববর্তী মুসলিমরা এক ধরনের নির্জলা অদৃষ্টবাদের শিকার এবং পাপ সম্পর্কিত এক ভয়ানক চেতনাবোধে বিকারগ্রস্ত ছিল। পার্থিব জীবন ও জগৎকে তারা একটা অশুভ ব্যাপার মনে করত, যা মানুষকে স্বর্গীয় চিন্তা চেতনা থেকে দূরে রাখে। পাপ সম্পর্কিত এরূপ নেতিবাচক চিন্তাচেতনা তাদের মনে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে এক অস্বাভাবিক ভীতি ও নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, সমকালে পরকাল সম্পর্কে বিরাজিত সেই নৈরাজ্যবাদী ভাবধারা বদলে দেয়ার জন্যই মুরজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

উপসংহার : অযৌক্তিক গোঁড়া মতবাদের কট্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা সাংঘর্ষিক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলও বটে।

■ **اَلسُّؤَالُ (١١٥) : مَا هِيَ أُصُوْلُ عَقَائِدِ الْمُرْجِئَةِ؟ ثُمَّ بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخَارِجِيِّ وَالْمُرْجِئَةِ.**

■ **প্রশ্ন : ১১৫ ॥ মুরজিয়াদের আকিদার মূলনীতিগুলো কী? অতঃপর খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মান্ধ শিয়া এবং চরমপন্থি খারেজী সম্প্রদায়ের উগ্র উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উমাইয়া শাসনের অনুকূলে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। উদার ও সহনশীল চিন্তাচেতনার ধারক বলে খ্যাত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সম্প্রদায়টি প্রতিষ্ঠা করলেও কালক্রমে তা ধর্মতাত্ত্বিক দলে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন–
In general Murjite influence was on the side of tolerance.

أُصُوْلُ عَقَائِدِ الْمُرْجِئَةِ : ☾

মুরজিয়াদের আকিদার মূলনীতি : মুরজিয়া সম্প্রদায় কতিপয় নিজস্ব মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মতবাদগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না :** মুরজিয়া মতবাদের প্রধান দর্শন হলো, একজন মুসলিম যতই পাপ কাজ করুক না কেন, তাকে কাফের বলা যাবে না।

২. **সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত :** মুরজিয়াদের মতে, কী সম্প্রদায়, আর কী মাযহাব, সকল মুসলিম একই সমাজভুক্ত। কোনো মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে লড়াই করবে না।

৩. **চার খলিফার সমস্বীকৃতি :** মুরজিয়ারাই প্রথম চার খলিফাকে সমভাবে স্বীকারকারী সম্প্রদায়। খারেজীদের মতো তারা হযরত ওসমান ও আলী (রা)-এর নিন্দা করে না।

৪. **উমাইয়া শাসনের স্বীকৃতি :** মুরজিয়াদের মতে, উমাইয়া শাসন স্বীকার করা মুসলিমদের কর্তব্য। উমাইয়া শাসক আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করলেও তাদের কাফের বলা উচিত নয়। তাদের মতে, যে কোনো মুসলমানের গুনাহের শাস্তি কেয়ামত পর্যন্ত মুলতবি থাকবে।

৫. **ঈমান অন্তরের ব্যাপার :** মুরজিয়া সম্প্রদায় ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাদের চরম মতাদর্শ অনুসারে ঈমান অন্তরের ব্যাপার, মৌখিক স্বীকৃতি বা বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠান আবশ্যক নয়।

৬. **কবীরা ও সগীরা গুনাহের পার্থক্য নিরূপণ :** মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ কবীরা ও সগীরা গুনাহের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, তা ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাদের মতে, কবীরা গুনাহ শিরকের পর্যায়ভুক্ত না হলে কোনো মুসলিম চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। সগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও কোনো মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

৭. **আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বেশি :** মুরজিয়াদের মতে, আল্লাহভীতির চেয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা আল্লাহভীতি বান্দাকে তাঁর থেকে দূরে নিয়ে যায়, আর ভালোবাসা বান্দাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করে। নিজেদের মতের সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উপস্থাপন করে–

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

৮. **ঈমান থাকাবস্থায় পাপ কাজ কোনো ক্ষতি করে না :** ঈমান থাকলে পাপ কাজ কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু ঈমান না থাকলে সৎকাজও কোনো উপকারে আসে না।

৯. **ঈমানের পরিচয় :** মুরজিয়াদের একশ্রেণির মতে, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তা কর্মে বাস্তবায়নকে ঈমান বলে।

ج : اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْخَارِجِيِّ وَالْمُرْجِئَةِ

খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের পার্থক্য : খারেজী ও মুরজিয়াদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. খারেজী ও মুরজিয়া উভয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হলেও মুরজিয়া সম্প্রদায় পরে নিছক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায় তা হয়নি।

২. সকল দীনি বিষয়ে খারেজীরা ছিল অযৌক্তিক, গোঁড়া ও কট্টরপন্থি। অপরদিকে মুরজিয়ারা ছিল যৌক্তিক, উদারতা ও সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী।

৩. খারেজীরা ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আর মুরজিয়ারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

৪. খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম ধর্মীয় কর্তব্যাদি নিয়মিত পালন না করলে কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস থাকলে সে কাফের হবে না।

৫. খারেজীরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী, আর মুরজিয়ারা উমাইয়া শাসনের সমর্থক।

৬. খারেজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফাকে স্বীকার করে না। অপরদিকে মুরজিয়ারা চার খলিফাকেই নির্দ্বিধায় সমভাবে স্বীকার করে।

৭. খারেজীদের মতে, অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরদিকে মুরজিয়াদের অভিমত হলো, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

৮. খারেজীদের নীতি হলো, যারা তাদের মতবাদ গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শুধু বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য। অপরদিকে মুরজিয়ারা আত্মরক্ষা ছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ অনুচিত বলে মনে করে।

উপসংহার : অযৌক্তিক ও গোঁড়া মতবাদের কট্টরপন্থি অনুসারী খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যপন্থিদের সাথে মুরজিয়াদের চিন্তাধারা সাংঘর্ষিক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীলও বটে।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٦) : مَا مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَمَنْ مُؤَسِّسُهَا؟ وَلِمَ سُمِّيَتْ بِهَا؟ وَضِّحْ۔

■ **প্রশ্ন : ১১৬ ॥ مُعْتَزِلَة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাদেরকে مُعْتَزِلَة নামে নামকরণ করা হয়েছে কেন? আলোচনা কর।** [ফা. প. ২০০৮]

اَوْ۔ مَنْ هُمُ الْفِرَقَةُ الْمُعْتَزِلَةُ؟ وَمَنْ هُوَ مُؤَسِّسُهَا؟ بَيِّنْ وَجْهَ تَسْمِيَةِ هٰذِهِ الْفِرْقَةِ بِالْمُعْتَزِلَةِ۔

অথবা, মুতাযিলা কারা? এদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ সম্প্রদায়কে মুতাযিলা নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলাম উদারতার ধর্ম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। তেমনি কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপনা করা হলো।

⊃ مُعْتَزِلَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ لُغَةً :

مُعْتَزِلَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُعْتَزِلَة শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর اِسْم فَاعِل থেকে وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ, যা عَزل মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. اَلْفَصْل তথা পৃথক হওয়া, ২. اَلْبُعْد তথা দূরে সরে যাওয়া,
৩. اَلطَّرْد তথা উৎখাত করা, ৪. اَلْخُرُوْج তথা বের হওয়া,
৫. اَلْمُنْفَرِد তথা একাকী, ৬. اَلْمُنْقَطِع তথা বিচ্ছিন্ন।

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْتَزِلَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ اَلَّذِيْنَ اِعْتَزَلُوْا عَنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ۔

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতা-এর অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ يُخَالِفُوْنَ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ بَعْضِ الْمُعْتَقَدَاتِ عَلٰى رَأْسِهِمْ وَاصِلُ بْنِ عَطَاءٍ اَلَّذِىْ اِعْتَزَلَ بِأَصْحَابِهِ حَلْقَةَ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ-

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তার্কিকদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন ওয়াসেল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন।

৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ فَاِنَّهُمْ فِىْ اَكْثَرِ الْمَسَائِلِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ مُتَّفِقُوْنَ مَعَ الْقَدَرِيَّةِ وَمُخَالِفُوْنَ مَعَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ-

৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِئَةٌ مِّنَ الْقَدَرِيَّةِ قَالُوْا اِنَّهُمْ اِعْتَزَلُوْا عَنْ فِئَتَىِ الضَّلَالَةِ فِىْ زَعْمِهِمْ اَىْ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْخَوَارِجِ-

ↄ مُؤَسِّسُ الْفِرْقَةِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা : ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ওয়াসেল ইবনে আতা। তিনি ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত হাসান বসরী (র)-এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন।

ↄ وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলা নামকরণের কারণ : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

প্রথমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি হলো, একদিন হাসান বসরী তাঁর শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা সমেত মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল, যদি কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করে তবে সে মুসলিম থাকবে, নাকি কাফের হয়ে যাবে? উত্তরে হাসান বসরী (র) বললেন, সে ফাসেক হিসেবে পরিগণিত হবে; কিন্তু তাঁর প্রতিভাবান সুযোগ্য শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, অনুরূপ ব্যক্তি মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং তার স্থান এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি।

হাসান বসরী (র) শিষ্যের এ মত গ্রহণ করলেন না। ফলে ওয়াসেল ইবনে আতা তার গুরু ইমাম হাসান বসরীর দল ত্যাগ করে মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তখন হাসান বসরী (র) মন্তব্য করেন–

اِعْتَزَلَ عَنَّا অর্থাৎ, সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপর থেকে ওয়াসেল ইবনে আতা এবং তার সমর্থকরা ইতিহাসে মুতাযিলা তথা দলত্যাগী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে ওয়াসেল ইবনে আতার অনুসারীরা যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দল নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত : অধ্যাপক নাল্লিনো মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, খারেজীদের মতে, কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। আবার মুরজিয়াদের মতে উক্ত মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। মুতাযিলাগণ এ দু'চরম মতবাদ পরিত্যাগ করে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করেছে বলে তারা মুতাযিলা (পরিত্যাগকারী) নামে পরিচিত।

মুতাযিলাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিচার করলে অধ্যাপক নাল্লিনোর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা মুতাযিলারাই সর্বপ্রথম ইসলামে অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা চর্চার সূচনা করে। তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী করার পক্ষপাতী। তাদের মতে, যুক্তি হলো জ্ঞানের প্রধান উৎস। সুতরাং অহীও যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। তারা পবিত্র কুরআন দ্বারা নিজেদের মতবাদ প্রমাণ করতে চেয়েছে। যেমন আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের কল্পনাপ্রসূত অনিয়ন্ত্রিত যুক্তিবাদভিত্তিক নির্ধারিত মর্মার্থের ওপর নির্ভর করেই এ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় চিন্তা গবেষণার প্রতি যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, মুতাযিলা সম্প্রদায় সেগুলোকে তাদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। যেমন–

١- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

٢- اِنَّ .... لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

٣- اِنَّ فِىْ ...... لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ-

ঐতিহাসিক গীবন বলেন, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়কালে এ গোষ্ঠীর চিন্তাবিদরা বুদ্ধিবাদীর চেয়ে বরং কঠোর নীতিবাদী ছিল এবং কুরআনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতগণ ফাতেমীদের অধীনেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, মধ্যপন্থি মুতাযিলাদের মতবাদ খলিফা আলী (রা) ও তাঁর অদূরবর্তী বংশধরদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা উদারপন্থিদের এবং সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মতবাদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।" কাজেই দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো মুতাযিলা চিন্তাবিদরাও ইসলামের শিক্ষা থেকেই প্রেরণা লাভ করেছে। মুক্তবুদ্ধির আহ্বানই তাদেরকে চিন্তার বিশাল জগতে নির্ভীক হতে উৎসাহী করেছে।

উপসংহার : ওয়াসেল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাযিলা মতবাদ ছিল নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে চরম গোঁড়ামির পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٧) : مَنِ الْفِرْقَةُ الْمُعْتَزِلَةُ؟ بَيِّنْ عَقَائِدَهُمْ بِالتَّفْصِيْلِ۔

■ **প্রশ্ন : ১১৭ ॥ 'মুতাযিলা' সম্প্রদায় কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর।** [ফা. প. ২০১৭]

اَوْ مَا هِىَ اُصُوْلُ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ؟ بَيِّنْ۔

অথবা, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতিসমূহ কী? বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলাম উদারতার ধর্ম। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। এরই আলোকে সময়ের পরিক্রমায় সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। তেমনি কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলিম দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মত প্রকাশে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে এদের সূচনা হয়। নিম্নে প্রশ্নালোকে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

مُعْتَزِلَة-এর পরিচিতি :

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ لُغَةً :

مُعْتَزِلَة-এর আভিধানিক অর্থ : مُعْتَزِلَة শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর اِسْم فَاعِل থেকে وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ, যা عَزْل মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন–

১. اَلْفَصْل তথা পৃথক হওয়া,
২. اَلْبُعْد তথা দূরে সরে যাওয়া,
৩. اَلطَّرْد তথা উৎখাত করা,
৪. اَلْخُرُوْج তথা বের হওয়া,
৫. اَلْمُنْفَرِد তথা একাকী,
৬. اَلْمُنْقَطِع তথা বিচ্ছিন্ন।

مَعْنَى الْمُعْتَزِلَةِ اِصْطِلَاحًا :

مُعْتَزِلَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ الَّذِيْنَ اعْتَزَلُوْا عَنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِىْ مَسْئَلَةِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْرَةِ۔

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে ওয়াসেল ইবনে আতা-এর অনুসারী, যারা কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা নিয়ে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বৈঠক থেকে বের হয়ে গেছে।

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِرْقَةٌ مِّنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ يُخَالِفُوْنَ اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِىْ بَعْضِ الْمُعْتَقَدَاتِ عَلٰى رَأْسِهِمْ وَاصِلُ بْنِ عَطَاءِ الَّذِىْ اعْتَزَلَ بِاَصْحَابِهٖ حَلْقَةَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ۔

অর্থাৎ, মুতাযিলা হচ্ছে তার্কিকদের এমন একটি দল, যারা কতিপয় আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরোধিতা করে। তাদের নেতা হলেন ওয়াসেল ইবনে আতা, যিনি হাসান বসরীর বৈঠক থেকে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেছেন।

৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে–

اَلْمُعْتَزِلَةُ هُمْ اَصْحَابُ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ فَاِنَّهُمْ فِىْ اَكْثَرِ الْمَسَائِلِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ مُتَّفِقُوْنَ مَعَ الْقَدْرِيَّةِ وَمُخَالِفُوْنَ مَعَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔

৪. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন–

اَلْمُعْتَزِلَةُ فِئَةٌ مِّنَ الْقَدَرِيَّةِ قَالُوْا اَنَّهُمْ اعْتَزَلُوْا عَنْ فِئَتَى الضَّلَالَةِ فِىْ زَعْمِهِمْ اَىْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْخَوَارِجِ ـ

أُصُوْلُ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার মূলনীতিসমূহ : মুতাযিলা সম্প্রদায় বেশ কিছু নবতর মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। যে সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মুতাযিলা মতবাদ গড়ে উঠেছিল, তা নিম্নরূপ–

১. **আল্লাহর একত্ববাদ :** আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ বলতে বুঝায়, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই; কিন্তু মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর একত্ববাদ বলতে বুঝায়, আল্লাহর সত্তার বাইরে কোনো সিফাত বা গুণ নেই। তারা নিজেদের আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে বিশ্বাসী বলে ভাবত, তাই নিজেদের তারা اَهْلُ التَّوْحِيْدِ তথা একত্ববাদী বলে প্রচার করত।

২. **আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলাগণ আল্লাহর সব গুণকে এক করে দেখে। তাদের মতে, আল্লাহর জাত তথা সত্তা ছাড়া আর যেসব গুণ ধরে নেয়া হয়, তা সঠিক নয়। কেননা তাঁর সত্তা বহির্ভূত কোনো গুণ নেই। সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালার গুণসমূহ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক করে দেখতে নারাজ।

৩. **আল্লাহর দর্শন :** পরকালে আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ; কিন্তু মুতাযিলারা আল্লাহ তায়ালার দৈহিক আকৃতি নেই– এ মতবাদের আলোকে নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ অস্বীকার করে–

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ ـ

৪. **নবীর সুপারিশ :** মুতাযিলারা وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আয়াত সামনে রেখে বলে, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ। তাই কেউ ভালো করলে ভালো এবং মন্দ করলে মন্দ পরিণাম ভোগ করবে। এক্ষেত্রে নবীর তথা সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই।

৫. **কুরআনের চিরন্তনতা :** মুতাযিলাগণ কুরআনকে চিরন্তন মনে করে না। তাদের মতে, কুরআনকে চিরন্তন মনে করলে আল্লাহ এবং কুরআন এ দুটি চিরন্তন সত্তা একত্র হয়, যা আল্লাহর একত্ববাদের মূলে আঘাত হানে।

৬. **বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য :** বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মুতাযিলারা আল কুরআনের সাথে এরিস্টটলের মতের সমন্বয় সাধনের অপপ্রয়াসে ব্রতী হয়। আল কুরআনে বিশ্বকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এরিস্টটলের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। মুতাযিলাদের মতে, বিশ্ব সৃষ্ট ও চিরন্তন দুই-ই। বিশ্ব অনন্তকাল থেকে স্তব্ধ ছিল, মহান আল্লাহ এতে গতি সঞ্চার করেন।

৭. **মানুষের কর্মের স্বাধীনতা :** মুতাযিলারা মনে করে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ামক শক্তি। তারা মনে করে, মানুষকে এতটুকু স্বাধীনতা দেয়া না হলে কিভাবে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে? নিজেদের মতের পক্ষে তারা কুরআনের এ আয়াত প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

৮. **শুভ ও অশুভ :** মুতাযিলারা মনে করে, আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দা অশুভ বা খারাপ কাজের সৃষ্টিকর্তা। অতএব শুভ বা কল্যাণ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর অকল্যাণ হয় ব্যক্তির কারণে। নিজেদের পোষিত এ মতবাদের পক্ষেও তারা প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ما اصابك مِنْ حسنة فمن الله وما اصابك مِنْ سَيِّئَةٍ فمن نَّفْسك.

৯. **পুরস্কার ও শাস্তি :** আল্লাহ তায়ালা পরকালে সৎব্যক্তিদের জান্নাত এবং অসৎ ব্যক্তিদের জাহান্নাম দিতে বাধ্য। এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের খেয়ালখুশির পরিচয় দিলে তাঁর ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে পড়বে। যেমন কুরআনে এসেছে–

وما ربُّك بظلّامٍ للعبيد.

১০. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষের মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া কালাম পড়ার কোনো দরকার নেই। কেননা পরজগতে মানুষের ভালো কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং মন্দ কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেবেন। আল্লাহ স্বীয় ন্যায়বিচার গুণ প্রতিষ্ঠার খাতিরে এরূপ করতে বাধ্য। সুতরাং মৃতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিরর্থক।

১১. **দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা :** কবীরা গুনাহকারীদের খারেজীরা কাফের এবং মুরজিয়ারা মুমিন বলে থাকে; কিন্তু মুতাযিলারা এ দু'মতবাদ অস্বীকার করে এর মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাদের মতে, সে ব্যক্তি কাফেরও নয়, মুমিনও নয়।

১২. **সৎকাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ :** মুতাযিলাদের মতে, শুধু সরল বিশ্বাস স্থাপন ও তদনুযায়ী আমল করলেই চলবে না; বরং বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি অর্জন করতে হবে। কারণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

১৩. **বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ :** মুতাযিলাদের মতে, অস্তিত্ব বস্তুর অপরিহার্য গুণ নয়; বরং একটি স্বাভাবিক গুণ মাত্র। তবে যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে তা সত্তা পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে অস্তিত্বহীন বস্তু সত্তা পদবাচ্য নয়।

১৪. **মিরাজের ঘটনা :** মুতাযিলাগণ রাসূল (স)-এর সশরীরে মিরাজ অস্বীকার করে। তাদের মতে, মিরাজ সশরীরে নয়; বরং তা আত্মিক ও স্বপ্নযোগে হয়েছে। তারা তাদের মতের পক্ষে মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– وَكَانَ رُؤْيَا صَالِحَةً

১৫. **সৎ ও অসৎ কর্ম :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষ বিবেকবান, যদি মানুষ কোনো অন্যায় ও অসৎ কাজ করে, সেজন্য সেই দায়ী; আল্লাহ নয়।

১৬. **আল্লাহর কার্যকলাপ :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর কার্যকলাপ যুক্তিসঙ্গত, তাঁর কোনো কার্যকলাপই অযৌক্তিক হতে পারে না।

এছাড়া তাদের আরো কতিপয় বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হলো–

১৭. তারা কবরে মুনকার নাকীরের জেরা অস্বীকার করে।

১৮. বিচার দিবসের আভাস এবং দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করে।

১৯. কিরামান কাতেবীনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

২০. তারা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব ও বর্তমানে বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

২১. তারা অলীর অলৌকিকতা বা কারামত অস্বীকার করে।

২২. **রাজনৈতিক মতবাদ :** রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুতাযিলারা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে খেলাফতের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার বলে স্বীকার করে; কিন্তু খলিফাদের যোগ্যতা বিচারে তাদের মত হলো, ক্রমান্বয়ে প্রথম খলিফা দ্বিতীয় খলিফা থেকে, দ্বিতীয় খলিফা তৃতীয় খলিফা থেকে, তৃতীয় খলিফা চতুর্থ খলিফা থেকে অধিকতর যোগ্য; কিন্তু মুতাযিলাদের অন্য দলের মতে, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) চার খলিফার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

উপসংহার : ওয়াসেল ইবনে আতা কর্তৃক প্রবর্তিত মুতাযিলা মতবাদ ছিল নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। এ মতবাদে অহীর চেয়ে মানবীয় জ্ঞান প্রজ্ঞার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে চরম গোঁড়ামির পরিচয় দেয়ার ফলে এ সম্প্রদায়টি সার্বিকভাবে মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٨) : بَيِّنْ اَسْبَابَ زَوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ بِالْاِيْجَازِ.

■ প্রশ্ন : ১১৮ ॥ সংক্ষেপে মুতাযিলাদের পতনের কারণগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দর্শনে মুতাযিলা সম্প্রদায় সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী হিসেবে পরিচিত। গ্রিক দর্শনের প্রভাবে মুসলিম দর্শনে যে সকল যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, তাদের মধ্যে মুতাযিলা সম্প্রদায় অন্যতম। খারেজীদের উগ্র ধর্মীয় মতবাদ এবং মুরজিয়াদের নৈতিক শিথিলতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জন্ম হয়; কিন্তু তাদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি; বরং অল্প কিছুদিনের ভিতরেই তাদের পতন ঘটে।

اَسْبَابُ زَوَالِ الْمُعْتَزِلَةِ :

মুতাযিলাদের পতনের কারণসমূহ : আব্বাসীয় শাসনামলে মুতাযিলা মতবাদ অনুসারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সমকালীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এ মতবাদ রাজসিংহাসন থেকে গরিবের ভাঙা কুটির পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত এ মতবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল; কিন্তু তাদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। খলিফা মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে মুতাযিলীরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুক্তিবাদী ঐতিহ্যশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারেনি। নিম্নে তাদের পতনের মৌলিক কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

১. **ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিমদের বিরোধিতা :** প্রথম থেকেই নিরঙ্কুশ ইসলাম ও অহীর শিক্ষানুসারী ধর্মতত্ত্ববিদগণ মুতাযিলা মতবাদ মেনে নিতে পারেননি বিধায় তাদের বিরুদ্ধাচরণে রাজপথে নেমে পড়েন। বক্তৃতা, বিবৃতি ও ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে সর্বসাধারণ মুসলিমদের তাঁরা নিজেদের মতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এটা ছিল মুতাযিলা মতবাদের দুর্গে এক চরম আঘাত।

২. **মুতাযিলাবাদ বিরোধীদের ওপর অত্যাচার :** খলিফা মামুন এবং তার উত্তরাধিকারীরা মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিধায় তারা এর বিরোধীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে তাদের এ নির্যাতনই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৩. **রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব :** খলিফা মুতাওয়াক্কিল খেলাফতে আরোহণ করে মুতাযিলাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে খর্ব করেন এবং রাষ্ট্রীয়

পৃষ্ঠপোষকতা দান থেকে হাত গুটিয়ে নেন। ফলে মুতাযিলাগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সময় মুতাযিলা মতবাদ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুতাযিলা আত্মিক নিহত হয়।

৪. **ইমাম আহমাদের কারাবরণ :** মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন না করায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) কারারুদ্ধ হন। এ কারণে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে তাদের পতনের দিন দ্রুত এগিয়ে আসে।

৫. **ইখওয়ানুস সাফার আবির্ভাব :** মুতাযিলা মতবাদের অবধারিত ফলস্বরূপ সৃষ্ট বিশৃঙ্খল মুহূর্তে একদল যুবক মিলিত হয়ে 'ইখওয়ানুস সাফা' নামে একটি জনকল্যাণকামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন দল ও মাযহাবের মধ্যে বিভেদ দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ সংগঠনের সদস্যদের সৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ মুসলিমদের দৃষ্টি মুতাযিলা মতবাদ থেকে ফিরিয়ে আনে।

৬. **শিয়াদের বিরোধিতা :** শিয়ারা কস্মিনকালেও মুতাযিলাদের মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া আব্বাসীয় খলিফাদের সহযোগিতায় মুতাযিলারা শিয়াদের বাঁকা চোখে দেখত। তাই পরবর্তীতে শিয়ারা মুতাযিলাদের শত্রু মনে করে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

৭. **অনৈসলামিক মতবাদে বিশ্বাসের বিরূপ প্রভাব :** মুতাযিলাগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস ও কুরআনের নশ্বরতার মতো কয়েকটি অনৈসলামিক মতবাদ সৃষ্টি করে জনমন থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

৮. **মুতাযিলাদের অনৈক্য :** যুগপরিক্রমায় মুতাযিলাবাদ অনুসারীদের ঐক্যে ফাটল ধরে এবং বাগদাদে বিশর আল মুতাসিমের নেতৃত্বে বিকল্প মুতাযিলা দল গঠিত হয়। এ দু'গ্রুপের অনৈক্যই তাদের পতনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

৯. **আবুল হাসান আল আশয়ারীর অভ্যুদয় :** মুতাযিলী দলের অন্যতম নেতা আবুল হাসান আল আশয়ারী দল ত্যাগ করে এ মতের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মুতাযিলা মতবাদের সুফল ও কুফলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তাছাড়া মুতাযিলা মতবাদের বিরোধিতায় তাঁর প্রবর্তিত আশয়ারী মতবাদ ছিল রক্ষণশীল মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই অনেক মুসলিম তাঁর মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে মুতাযিলা মতবাদ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০. **হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরীর ধ্বংসসাধন :** পরিশেষে ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরী ধ্বংসের সাথে সাথেই খেলাফত ও মুতাযিলা মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার : ওয়াসিল ইবনে আতা প্রবর্তিত মুতাযিলী মতবাদ দীর্ঘ তিনশ বছর অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ও খলিফা কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে এ মতবাদ দুর্বল হতে থাকে। সর্বশেষ আবুল হাসান আল আশয়ারীর দলত্যাগ ও আশয়ারী মতবাদের সম্প্রসারণ তার পূর্ণ যবনিকাপাত ঘটায়।

■ اَلسُّؤَالُ (١١٩) : مَنْ هُمُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ؟ اُذْكُرْ تَارِيْخَ نَشْأَتِهِمْ وَتَطَوُّرِهِمْ وَنَظْرِيَّاتِهِمْ -

■ প্রশ্ন : ১১৯ আশয়ারী কারা? তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মতবাদগুলো আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দল। কট্টর যুক্তিবাদী ও গোঁড়া মতবাদের ধারক মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিমগণ যখন ইসলামের মৌলিকত্ব ও স্বভাবজাত সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর পথ দেখিয়েছিল, তারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায়। নিম্নে তাদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও মতবাদগুলো আলোচনা করা হলো।

⊃ تَعْرِيْفُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ :

আশয়ারী মতবাদের পরিচয় : ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারীর নেতৃত্বে যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাদের পোষিত মতবাদকেই আশয়ারী মতবাদ বলা হয়। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে মুতাযিলাপন্থি ছিলেন। তিনি মুতাযিলাদের নীতিগুলো ত্রুটিপূর্ণ দেখে এবং কতিপয় প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে নিজের শিক্ষকের দল ও মতবাদ ত্যাগ করে বসরার মসজিদে নিজস্ব মতবাদ প্রচার শুরু করেন এবং নিজের পূর্বপুরুষ আবু মুসা আশয়ারীর নামে নিজের উদ্ভাবিত মতবাদের উদ্ভাবন করেন।

⊃ نَشْأَةُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ :

আশয়ারী মতবাদের উৎপত্তি : আশয়ারী মতবাদের উদ্ভাবক ছিলেন আবুল হাসান আল আশয়ারী। প্রথম জীবনে তিনি মুতাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ছিলেন প্রখ্যাত মুতাযিলা পণ্ডিত আল জুবাঈ। আশয়ারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুতাযিলাপন্থি ছিলেন বটে; কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মুতাযিলা মতবাদ থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। পরিশেষে আল্লাহর 'পূর্ব নির্ধারণ' সমস্যার ওপর মুতাযিলাদের সিদ্ধান্ত তাঁর নিকট সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বহু তর্কের পরও তিনি উস্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মুতাযিলা মতবাদ ত্যাগ করেন এবং বসরার মসজিদে নিজস্ব মতবাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুতাযিলা মতবাদ খণ্ডনের জন্য তিনি 'ইলমুল কালাম' নামক এক নতুন বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। আবুল হাসান আশয়ারীর নামানুসারে তাঁর উদ্ভাবিত মতবাদের নামকরণ করা হয় আশয়ারী মতবাদ।

⊃ تَطَوُّرُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ :

আশয়ারী মতবাদের ক্রমবিকাশ : নিম্নোক্তভাবে আশয়ারী মতবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে–

১. **আশয়ারী মতবাদ প্রচারে বাধা বিপত্তি :** প্রথমদিকে আশয়ারী মতবাদ প্রচার প্রসারে যথেষ্ট বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়; কিছু ঐতিহ্যপ্রিয় মুসলিম এবং মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী মিলে এ মতের ঘোর বিরোধিতা করছিলেন। সেলজুক শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘরিল খান এ মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি এ মতবাদের প্রচার প্রসার ও অনুসরণ বেআইনী ঘোষণা করেন এবং কঠোর হস্তে এ মতবাদ অনুসারীদের দমন করেন।

২. **ইখওয়ানুস সাফার সমর্থন :** এদিকে 'ইখওয়ানুস সাফা' নামে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সদস্যরা আশয়ারী মতবাদকে সমর্থন দেয়। তাদের সমর্থন মুতাযিলাদের পতন ও আশয়ারীদের উত্থান ত্বরান্বিত করে।

৩. **আশয়ারী মতবাদের দ্রুত বিস্তার :** প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এ মতবাদ সর্বস্তরের জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ মতবাদ দ্রুত বিস্তার লাভের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে–

ক. এ মতবাদ অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল।

খ. কুরআন সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

গ. এ মতবাদের অনুসারীদের ওপর আব্বাসীয়দের অমানুষিক নির্যাতন।

ঘ. ধর্মীয় ইমাম; যেমন– ইমাম গাযালী, আবু বকর বাকিল্লানী প্রমুখের সমর্থন।

৪. **রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি :** সেলজুক সুলতান আলফা আরসালান ও তাঁর মন্ত্রী নিযামুল মুলক আশয়ারী মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেন। এ মতবাদ প্রসারের লক্ষ্যে বাগদাদে নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

⊃ نَظَرِيَّاتُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ :

আশয়ারীদের মতবাদ : মুতাযিলা মতবাদের মোকাবেলা করতে গিয়ে আশয়ারীরা যেসব মৌল সমস্যার পর্যালোচনা করেন, তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. **আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি :** আশয়ারীগণ মত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ বহু গুণের অধিকারী এবং তা চিরন্তন। এ গুণাবলি তাঁর সত্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁর সত্তা একক কিন্তু গুণাবলি বহুমুখী। তাঁর গুণাবলি সৃষ্টজীবের জন্য প্রযোজ্য নয়। আশয়ারীগণ মহান আল্লাহর গুণ ও সৃষ্ট গুণের মাঝে পার্থক্যে বিশ্বাস করত।

২. **আল্লাহর দর্শন :** আশয়ারীদের মতে, কেয়ামত দিবসে তাকওয়াসম্পন্ন পুণ্যবান ব্যক্তিরা আল্লাহকে দেখবেন। তবে তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখা সম্ভব নয়; বরং দেখতে হবে অনুভূতি ও দিব্য চক্ষু দ্বারা। মূলত তাকওয়াসম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

৩. **কুরআনের চিরন্তনতা :** আশয়ারীদের মতে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং কুরআন চিরন্তন শব্দ ও ধ্বনিতে বিকাশমান; কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে কুরআন অবিনশ্বর, অনন্তকাল থেকে কুরআন আল্লাহর পরম সত্তায় নিত্য বিরাজিত ছিল। পরে ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর খণ্ডাকারে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া তাঁরা কালামুল্লাহকে কালামে নাফসী বলে মনে করেন। এতে বুঝা যায়, আশয়ারীরা মধ্যপন্থার অনুসারী।

৪. **ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা :** আশয়ারীদের মতে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক; মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো স্বাধীনতা নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষ কিছুই করতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, মানুষের কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা না থাকলেও কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে।

৫. **ইষ্ট অনিষ্টের মধ্যে বিসংবাদ :** আশয়ারীরা বলেন, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে অনুযায়ী মানুষ ইষ্ট অনিষ্টের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকে।

৬. **ঐশীবাণী ও বিবেকের সংঘাত :** আশয়ারীদের মতবাদ হলো, চূড়ান্ত সত্য ও বাস্তবতা নির্ধারণে ঐশীবাণীর স্থান সর্বোচ্চ। যুক্তির কাজ হবে ঐশীবাণী কর্তৃক প্রদত্ত বিধিনিষেধের সহায়তা দান।

৭. **পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি :** আশয়ারীদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাধিকারী আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী পুণ্যবানকে শাস্তি এবং পাপীকে পুরস্কার দিতে পারেন। এটা একান্তই তাঁর ইচ্ছাধীন বিষয়; কিন্তু এরূপ করতে তিনি বাধ্য নন। যেমন- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

৮. **সৎ ও অসৎ :** আশয়ারীগণ কঠোর ন্যায়বাদী। তারা আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। তাদের মতে, আল্লাহ সৎব্যক্তিকে পুরস্কার এবং অসৎ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করবেন। স্বীয় ইচ্ছানুসারে আল্লাহ এ কাজ করবেন। আবার ইচ্ছা করলে এর বিপরীতও করতে পারেন।

৯. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা মরে না। তাই আশয়ারীরা মনে করেন, মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা আবশ্যক। কেননা জীবিতদের দোয়া ও দান সদকার কারণে মৃতদের শাস্তি অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। যেমন হাদীসে এসেছে- اَوْ ولد صالح يَدْعُوْ لَه

১০. **শারীরিক অস্তিত্ব :** আশয়ারীগণ শারীরিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান। তিনি মানবাত্মা সৃষ্টি করে দেহ দান করতে পারেন। আবার রোজ কেয়ামতে অদৃশ্য আত্মাকে অনুরূপ নবদেহে সংযোজন করতে পারেন।

১১. **মিরাজের ঘটনা :** আশয়ারীগণ মনে করেন, হযরত মুহাম্মাদ (স) মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে সশরীরেই মিরাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি বোরাক এর ওপর আরোহণ করে একে একে সাত আসমান পার হয়ে জিবরাঈল (আ)-এর সহায়তায় আরশে মোয়াল্লায় গমন করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

১২. **নবীর সুপারিশ :** আশয়ারীরা বিশ্বাস করেন, কেয়ামত দিবসে রাসূল (স) গুনাহগার উম্মতের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন হাদীসে এসেছে- يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

১৩. **বিশ্বসৃষ্টির রহস্য :** বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তারা পরমাণুবাদের সমর্থক। এ মতবাদ অনুসারে বিশ্বের সকল কিছুই পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট বস্তু পরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তনশীল অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি হলো জগৎ। কাজেই জগৎ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল।

১৪. **পরমাণুবাদ :** আশয়ারীগণ পরমাণুবাদের উদ্ভাবক। তাদের মতে, বিশ্বজাহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রকাশ এবং অগণিত পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। কাজেই তা চিরন্তন নয়; বরং অসংখ্য পরিবর্তনশীল পরমাণুর সমষ্টিই জগৎ। কাজেই জগৎ পরিবর্তনশীল। আর যা পরিবর্তনশীল, তা কখনো চিরন্তন হতে পারে না; বরং তা ধ্বংসশীল।

১৫. **মৃত অবস্থায় দেহ সংযোজন :** আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞানী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মানবাত্মা সৃষ্টি করে যেমন তাকে দেহ দান করতে পারেন, তেমনি কেয়ামত দিবসে মৃতদেহে আত্মার সঞ্চার করবেন, এটাই তাদের বিশ্বাস।

১৬. **যুক্তি ও অহী :** মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে অহী।

উপসংহার : মুতাযিলারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা সবকিছু অহীর আলোকে বিবেচনা করেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদী মুতাযিলাদের চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও বলা যেতে পারে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢٠) : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ؟ اُكْتُبْ بِالْوَضَاحَةِ۔

■ **প্রশ্ন : ১২০ ॥ মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায়ের আকিদার মাঝে পার্থক্য কী? সুস্পষ্ট করে বিস্তারিত লেখ।** [ফা. প. ২০১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : মুতাযিলা ও আশয়ারী সম্প্রদায় ইসলামী দর্শনের কতিপয় বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি দল। কট্টর যুক্তিবাদী ও গোঁড়া মতবাদের ধারক মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিমগণ যখন ইসলামের মৌলিকত্ব ও স্বভাবজাত সৌন্দর্য হারিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন যে দলটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকিদা বিশ্বাস জাতির সামনে উপস্থাপন করে মুসলিমদের সঠিক আলোর পথ দেখিয়েছিল, তারা হলো আশয়ারী সম্প্রদায়। নিম্নে মুতাযিলা ও আশয়ারীদের আকিদার পার্থক্য আলোচনা করা হলো।

⊃ اَلْفَرْقُ بَيْنَ عَقَائِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْاَشْعَرِيَّةِ :

মুতাযিলা ও আশয়ারী মতবাদের মধ্যকার পার্থক্য : মুতাযিলা ও আশয়ারী মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে মতবাদ দুটির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো–

১. **আল্লাহর একত্ব :** মুতাযিলাদের মতে, এক অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন হলেও যুক্তিবাদের নিরিখে জটিল, নীরস ও আকর্ষণহীন। অপরদিকে আশয়ারীদের মতে, আল্লাহর অস্তিত্ব চিরন্তন ও আকর্ষণীয়।

২. **আল্লাহর গুণাবলি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর সত্তা চিরন্তন, অনাদি ও অনন্ত; কিন্তু তাঁর গুণাবলি অনিত্য ও চির পরিবর্তনশীল। আর আশয়ারীদের মতে, মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি উভয়ই চিরন্তন।

৩. **মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা :** মুতাযিলাদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা আছে। সে তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারে; পক্ষান্তরে আশয়ারীদের মতে, মানুষের ইচ্ছা ও কাজের স্বাধীনতা নেই। তবে মানুষের কাজের গতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে।

৪. **কুরআনের চিরন্তনতা :** মুতাযিলাদের মতে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত। অতএব এটা চিরন্তন নয়। আশয়ারী সম্প্রদায়ের মতে, কুরআনের অস্তিত্ব অনন্তকাল ধরেই ছিল। কাজেই কুরআন চিরন্তন এবং আল্লাহর চিরন্তনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৫. **ভালোমন্দ ও সৎ অসৎ :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক, তাই তিনি সৎলোকদের পুরস্কার ও অপরাধীদের শাস্তি দেবেন এবং এরূপ করতে তিনি বাধ্য। অপরদিকে আশয়ারী সম্প্রদায় আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হলেও তারা মনে করেন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে বিপরীতও করতে পারেন।

৬. **আল্লাহর দর্শন লাভ :** মুতাযিলাদের মতে, কেয়ামত দিবসে ঈমানদারদের আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব নয়; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কেয়ামতে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব।

৭. **বিশ্বসৃষ্টির রহস্য :** মুতাযিলারা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন এবং এরিস্টটল উভয়ের মতবাদই স্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস, বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পূর্ণ নিস্তব্ধতায় বিরাজ করছিল। পরে আল্লাহ তায়ালা এতে গতির সঞ্চার করেন; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, বিশ্বজগৎ পরমাণুর তৈরি, তাই এটা নিয়ত পরিবর্তনশীল। কেননা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ۔

৮. **যুক্তি ও অহী :** মুতাযিলাদের মতে, সত্য নিরূপণের মাপকাঠি হলো যুক্তি; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, সত্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হলো অহী।

৯. **মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া :** মুতাযিলারা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা নিরর্থক মনে করে; কিন্তু আশয়ারীরা মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, জীবিতদের দোয়ার ফলে মৃতদের শাস্তি লাঘব হয়।

১০. **মিরাজের ঘটনা :** মুতাযিলাদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেননি, এটা একটা আধ্যাত্মিক ঘটনা মাত্র; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী (স) সশরীরে মিরাজে গমন করেছিলেন।

১১. **মহানবীর সুপারিশ :** বাস্তববাদী মুতাযিলাদের মতে, বান্দা ভালো কাজ করলে বেহেশতে আর মন্দ কাজ করলে দোযখে যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে মহানবী (স)-এর সুপারিশের কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, মহানবী (স)-এর সুপারিশ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

১২. **কবীরা গুনাহকারী মুমিন :** মুতাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনও নয় কাফেরও নয়; বরং তার অবস্থান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, কিন্তু আশয়ারীদের মতে, কবীরা গুনাহকারী মুমিনই থাকবে, তবে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।

১৩. **পুরস্কার ও শাস্তি :** মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রাপ্য অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দিতে বাধ্য; কিন্তু আশয়ারীদের মতে, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

উপসংহার : মুতাযিলারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। পক্ষান্তরে আশয়ারীরা সবকিছু অহীর আলোকে বিবেচনা করেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আশয়ারীদেরকে রক্ষণশীল ও যুক্তিবাদী মুতাযিলাদের চিন্তাধারার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানকারী দার্শনিক সম্প্রদায়ও বলা যেতে পারে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢١) : عَرِّفِ الْجَهْمِيَّةَ مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ۔

■ প্রশ্ন : ১২১ ॥ জাহমিয়াদের পরিচয় তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদার বিবরণসহ প্রদান কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : গোষ্ঠী চেতনাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তারপরও ইসলাম বিভেদমুক্ত থাকেনি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধের কারণে পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিমগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় ও তাদের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলো।

تَعْرِيفُ الْجَهْمِيَّةِ :

জাহমিয়াদের পরিচয় : জাহমিয়া অর্থ– জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনে সাফওয়ান পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রিক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে 'জাবরিয়্যা' মতের প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল। সে প্রচার করত, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মতো চলমান। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল। সে বলত, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারেফতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফর। সে আরো প্রচার করত, জান্নাত ও জাহান্নাম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

نَشْأَةُ الْجَهْمِيَّةِ :

জাহমিয়াদের উৎপত্তি : ইমাম আবু যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এ ফেরকাটির جَبْر (মানুষ মাজবুর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়।

জাহম ইবনে সাফওয়ান প্রসিদ্ধ যিন্দীক জাদ ইবনে দিরহাম (جَعْدُ بْنِ دِرْهَم)-এর শিষ্য ছিল। এ জাদ ইবনে দিরহামই প্রথম خَلْق قُرْآن (কুরআন নশ্বর সৃষ্টি) সংক্রান্ত দর্শন-এর প্রবর্তন ঘটায়। সেই প্রথম আল্লাহর গুণাবলিকে অস্বীকার করে। এভাবে যিন্দীক হয়ে যাওয়ার ফলে ১২৪ হিজরীতে তাকে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জাহম ইবনে সাফওয়ান তার গুরু জাদ দিরহাম থেকেই জাহমিয়াহ দর্শন গ্রহণ করে। এ কারণেই জাদ ইবনে দিরহামকে জাহমিয়া মতাদর্শের প্রথম দায়ী বলা হয়ে থাকে।

عَقَائِدُ الْجَهْمِيَّةِ :

জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয়, যে গুণ কোনো মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে।
২. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি مَخْلُوْق মনে করে।
৩. তারা মনে করে, মানুষ নিতান্তই মাজবুর তথা অপারগ ও অসহায়। অর্থাৎ কোনো শক্তি, কোনো ইচ্ছা ও কোনো ক্ষমতা তার নেই।
৪. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে।
৫. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়।
৬. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (رُؤْيَة بَارِى) হবে না।
৭. তারা মালাকুল মওতকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, রূহ সরাসরি আল্লাহ কবজ করেন।

উপসংহার : আল্লাহ ও রাসূল (স) কর্তৃক যে মধ্যপন্থা ও সঠিক পথের দিশা দেয়া হয়েছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই তার পূর্ণ অনুসরণ করে বলে এ দলকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর বাদবাকি বিভ্রান্ত দলগুলো ও তাদের আকিদা বিশ্বাস অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢٢) : عَرِّف الْكَرَّامِيَّة مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ - ثُمَّ بَيِّنْ أُصُوْلَ عَقَائِدِهِمْ -

■ প্রশ্ন : ১২২ ॥ উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাররামিয়াদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ধর্মতত্ত্বভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের মাঝে কাররামিয়া সম্প্রদায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় দশম শতকে এ মতবাদের আবির্ভাব ঘটে। নিম্নে তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও আকিদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

⊃ تَعْرِيْفُ الْكَرَّامِيَّةِ :

কাররামিয়াদের পরিচয় : কাররামিয়া দলটির প্রতিষ্ঠাতা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম সিজিস্তানীর দিকে সম্পৃক্ত করে এ দলটিকে কাররামিয়া বলা হয়। কথিত আছে, তিনি ১৯০ হিজরী মোতাবেক ৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সীস্তান/সিজিস্তান-এর অন্তর্গত যারানজ (زرنج)-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তার পদবী হয় সিজিস্তানী। যারা তার মতবাদের অনুসরণ করত, তারা কাররামিয়া নামে পরিচিত।

⊃ نَشْأَةُ الْكَرَّامِيَّةِ :

কাররামিয়াদের উৎপত্তি : দলটির মতবাদে আল্লাহর প্রতি মানবত্ব আরোপ (اَلتَّجَسُّم) ও আল্লাহকে মানবগুণসম্পন্ন বলা তথা নরত্বারোপবাদী (اَلتَّشْبِيْه)-এর চিন্তাভাবনা থাকায় এ দলটিকে মুজাসসিমা (مُجَسِّمَة), মুশাববিহা (مُشَبِّهَة) ও সাদৃশ্যবাদী দলভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

শুরুতে ইবনে কাররাম সিজিস্তানে তার স্বরচিত গ্রন্থ عَذَابُ الْقَبْرِ-এর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। যার মধ্যে মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীনকে অভিন্ন বলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়ায় স্থানীয় গভর্নর তাকে সিজিস্তান থেকে বহিষ্কার করেন। পরে তিনি গুরজিস্তান ও খোরাসানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ প্রচারকালে তিনি সুন্নী ও শিয়া উভয় দলকে আক্রমণ করতে থাকেন। এখান থেকে তিনি তাঁতী ও নিম্নশ্রেণির অনুসারীদেরকে নিয়ে নিসাপুরে উপস্থিত হলে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের আশঙ্কায় সেখানকার গভর্নর তাকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সুদীর্ঘ ৮ বছর কারাভোগের পর ২৫১ হিজরী মোতাবেক ৮৬৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। তারপর নিসাপুর ত্যাগপূর্বক জেরুযালেমে গমন করেন। এখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ২৫৫ হিজরীর সফর মাস মোতাবেক ৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কাররামিয়াদের শেষ শক্তিশালী আশ্রয় ছিল মধ্য আফগানিস্তানের পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল ঘুর। ঘুরী সুলতান গিয়াসউদ্দীন মুহাম্মাদ এবং তার ভাই মুইজউদ্দীন মুহাম্মাদ-এর কাররামিয়া মতবাদের সাথে একাত্মতার সুবাদে এমনটি হয়েছিল। পরবর্তীতে এতদঞ্চলে মুঘল আক্রমণের পর কাররামিয়াদের তৎপরতার আর কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না।

أُصُوْلُ عَقَائِد الْكَرَّامِيَّة ঃ

কাররামিয়াদের আকিদার মূলনীতি : কাররামিয়াদের অভিনব আকিদার সংখ্যা অগণিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. ইবনে কাররামের স্বরচিত গ্রন্থ 'আযাবুল কবরে' মুনকার নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীনকে অভিন্ন বলে দেখানো হয়েছে।

২. তারা আল্লাহর প্রতি মানবত্ব আরোপ (التَّجَسُّم) ও আল্লাহকে মানুষের সাথে সাদৃশ্য বিধান করে। ইবনে কাররাম মনে করতেন, আল্লাহ এমন এক শরীরী সত্তা, যার সীমা ও প্রান্ত রয়েছে দুই দিক থেকে, নিচের দিক থেকে এবং তাঁর যে অংশ আরশের সাথে সংযুক্ত সেই দিক থেকে। ইবনে কাররাম তার 'আযাবুল কবর' গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহকে জওহার (جَوْهَر) তথা মূলসত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল কাহের বাগদাদীর মতে, এভাবে তিনি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হন। কারণ খ্রিস্টানরা আল্লাহকে جَوْهَر তথা মূলসত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. তারা আল্লাহ তায়ালার ভার (ওজন) আছে বলে মনে করত। আল্লাহর বাণী إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-এর ভিত্তিতে তারা বলত, আসমান ফেটে যাবে আল্লাহ তায়ালার ভারে।

৪. ইবনে কাররাম الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-এর ব্যাখ্যায় বলত, আরশের সাথে আল্লাহ তায়ালার শারীরিক দোয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, আরশ হলো আল্লাহর অবস্থানের স্থান।

৫. তারা মনে করত, আল্লাহর সত্তা অনিত্য গুণাবলির আধার। ইচ্ছা, অনুভূতি, দর্শন, বাকশক্তি এগুলো হলো অনিত্য বিষয় (حَادِث), আর আল্লাহ তায়ালা হলেন এসব অনিত্য বিষয়ের আধার (مَحَلُّ حَوَادِث)।

৬. তাদের ধারণা, আল্লাহ তায়ালার সর্বপ্রথম সৃষ্টি এমন প্রাণবিশিষ্ট কোনো শরীরী সত্তা হওয়া উচিত, যা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত কোনো জড়বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করা হেকমত পরিপন্থি।
এ বক্তব্যের ভিত্তিতে যে হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে লাওহে মাহফুযে কেয়ামত পর্যন্ত সবকিছু লিখে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

৭. কাররামিয়াগণ মনে করত, যে শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহর জানা আছে যে, বড় (বালেগ) হলে তারা ঈমান আনত, তাদের মৃত্যু ঘটানো আল্লাহর হেকমত অনুসারে সম্ভব নয়।

৮. কাররামিয়াগণ বলত, যেসব গুনাহের কারণে সততা রহিত হয়ে যায় বা হদ্দ জারি হয়, এমন পাপ থেকে নবীগণ মাসুম তথা নিষ্পাপ ছিলেন। এর চেয়ে নীচু পর্যায়ের পাপ থেকে তারা মাসুম ছিলেন না।

৯. তারা বলত, ঈমান হলো শুধু মুখে স্বীকৃতি প্রদানের নাম। অন্তরের বিশ্বাস না থাকলেও চলে, আমল না থাকলেও চলে। এ কারণে তাদের ধারণা ছিল, একবার কেউ মুখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করলে তার ঈমান চিরস্থায়ী হয়ে যায়, এমনকি মনেপ্রাণে রিসালাতকে অস্বীকার করলেও তার ঈমান বিনষ্ট হয় না। কেবল মুরতাদ হলেই তার ঈমান বিনষ্ট হয়। এমন হলে মুনাফিকদের সম্পর্কে জাহান্নামের তলদেশে থাকার হুঁশিয়ারি প্রদানের কোনো হেতু ছিলো না। কারণ তারা মুখে ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত করত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

১০. খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে তাদের মত ছিল, একমাত্র জাতির সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতেই তা হতে হবে।
এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত হলো, পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনয়নের পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। যেমন হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।

উপসংহার : কাররামিয়ারা তাদের মতবাদ প্রচারে মুসলিমদের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শাহরাস্তানীর মতে, কাররামিয়াদের ১২টি উপদল ছিল; কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাদের কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। কারো মতে, প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাদের সকল কর্মতৎপরতা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সত্যপন্থিদের মতে, তারা ছিল বাতিল ফেরকা।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢٣) : عَرِّفِ الْقَادِيَانِيَّةَ مَعَ بَيَانِ تَارِيْخِ نَشْأَتِهِمْ.

■ প্রশ্ন : ১২৩ ॥ উৎপত্তির ইতিহাসসহ কাদিয়ানীদের পরিচয় দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ইসরাঈল রাষ্ট্র যেমন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য ক্যান্সার তেমনি কাদিয়ানী মতবাদও ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। কাদিয়ানীদের আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা। কাদিয়ানী মতবাদ বলতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বুঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামায়াত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। তাদের পরিচয় ও উৎপত্তির ইতিহাস নিম্নে আলোচনা করা হলো।

تَعْرِيْفُ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়।

تَارِيْخُ نَشْأَةِ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানীদের উৎপত্তির ইতিহাস : উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতাগ্রহণ কোনোটাই হিন্দু মুসলিমের কাম্য ছিলো না। তাই ইংরেজরা উপমহাদেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন সময় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। বিশেষ করে দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ-এর আমলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় সিপাহী জনতার পরাজয় হয়। ইংরেজবিরোধী সিপাহী বিপ্লবে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতি অংশগ্রহণ করলেও মূল নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলিমরা। কারণ ইংরেজরা মুসলিমদের হাত থেকেই এ উপমহাদেশের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারা এ ধারণার ওপর স্থির ছিল যে, মুসলিমদের মেরুদণ্ড সমূলে ভেঙে দিতে না পারলে সুযোগ পেলেই পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তাই তারা শুরু করে মুসলিমদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন। হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে; কিন্তু জেহাদের স্পৃহাতাড়িত মুসলিমদের অন্তর থেকে কিছুতেই জেহাদের স্পৃহা দূরীভূত করা সম্ভব হলো না। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সশস্ত্র বিপ্লব ইংরেজ জাতিকে বিচলিত করে তুলেছিল। তারা ভাবল, এত কিছুর পরেও মুসলিমরা কেন বিদ্রোহ করছে। তাই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হলো। এ কমিশন প্রায় এক বছর ভারতবর্ষে বিচরণ করে পর্যবেক্ষণপূর্বক একটি প্রতিবেদন রিপোর্ট তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করে। এ রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মুসলিমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় নেতারা এ দেশকে دَارُ الْحَرْبِ (শত্রুর দেশ) ঘোষণা করে যুদ্ধ ফরয বলে ফতোয়া জারি করেছে। মুসলিমরা যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্মাদের মতো আত্মাহুতি দিতে পারে।

উক্ত রিপোর্টে যে কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল, তন্মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. দারিদ্র্যপীড়িত সর্বহারা মুসলিমদের একটি শ্রেণিকে উপঢৌকন ও উপাধি প্রদানের মাধ্যমে ব্রিটিশের অনুগত করে তুলতে হবে। যাতে তারা এ দেশকে 'দারুল আমান' বলে ঘোষণা দেবে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপ্রয়োজন বলে বর্ণনা করবে।
২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের অধিকাংশ লোক পীর মাশায়েখ ভক্ত। বর্তমানে মুসলিমদের মধ্য থেকে ইংরেজদের আস্থাভাজন এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে পীররূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশপরম্পরায় ইংরেজদের আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত হয়। অতঃপর সে পীর নিজেকে নবী বলে দাবি করে এই বলে ঘোষণা দেবে, আমার নিকট এ মর্মে অহী এসেছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আল্লাহর রহমতস্বরূপ এবং অহীর দ্বারা আল্লাহ যুদ্ধ হারাম করে দিয়েছেন।
৩. তথাকথিত সে নবী নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করবে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে সহযোগিতা করবে। এক সময় সে নিজেকে নবী বলে দাবি করবে।

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার মুসলিমদের মধ্য হতে মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য মনোনীত করে।

তাই মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রথমে নিজেকে মুবাল্লিগ বলে পরিচয় দেয়। তারপর ১৮৮৮ সালে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা দেয়। তারপর মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবি করে। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে এ সকল দাবি থেকে একটু সরে এসে নিজেকে যিল্লি বা ছায়া নবী বলে ঘোষণা দেয়; কিন্তু কুরআনে এমন কোনো ছায়া নবীর প্রমাণ নেই বলে প্রশ্ন উঠলে ১৯০১ সালে সে নিজেকে পূর্ণ নবী বলে ঘোষণা দেয় এবং কুরআনের 'সূরা আস সফ'-এর ৬ নং আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তার দাবি প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। আয়াতটি হলো– وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ; অর্থাৎ, (হযরত ঈসা আ. বলেন) আর আমি সুসংবাদদাতা এমন এক রাসূলের, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম আহমাদ।

যেহেতু ঐ সময়টা ছিল ইংরেজ শাসনামল, তার নবুয়তের দাবি করাটাও ছিল তাদের নির্দেশে, তাই তার এ মতবাদ ভালোভাবে প্রচার ও প্রসার হতে থাকে। তার ধোঁকায় পড়ে বহু সরলপ্রাণ মুসলিম কাদিয়ানী মতকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মতো একটি মতাদর্শ মনে করে তাদের মতবাদ গ্রহণ করে।

উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু ঐ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের ছিল তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু। ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও বাতিল মতবাদ।

■ اَلسُّؤَالُ (١٢٤) : اُذْكُرْ اُصُوْلَ عَقَائِدِ الْقَادِيَانِيَّةِ مَعَ بَيَانِ عَقِيْدَتِهِمْ ـ

■ **প্রশ্ন : ১২৪ ॥ কাদিয়ানীদের আকিদার বিবরণসহ তাদের আকিদার মূলনীতিগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসরাঈল রাষ্ট্র যেমন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য ক্যান্সার তেমনি কাদিয়ানী মতবাদও ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। কাদিয়ানীদের আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা। কাদিয়ানী মতবাদ বলতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বুঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামাত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। তাদের আকিদার মূলনীতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

➲ اُصُوْلُ عَقَائِدِ الْقَادِيَانِيَّةِ :

কাদিয়ানীদের আকিদার মূলনীতিসমূহ : কাদিয়ানী আকিদার মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ–

১. কাদিয়ানীরা মনে করে, নবুয়তের ধারাবাহিকতা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ নবীও নন; বরং নবুয়তের ধারাবাহিকতা তাঁরপরও চলতে থাকবে। অতএব মির্জা গোলাম আহমাদও পূর্ববর্তী নবীগণের মতো একজন নবী। যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করবে না, সে মুসলিম নয়; কাফের।

২. মির্জা গোলাম আহমাদের ওপর বারিধারার মতো সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে। তা কখনো আরবি ভাষায়, কখনো উর্দু ভাষায়, কখনো হিন্দি ভাষায়, কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায়, যা বুঝে আসে না।

৩. পরকালীন সফলতা ও মুক্তি একমাত্র মির্জা গোলাম আহমাদের তালীম ও তার ওপর অবতীর্ণ অহীর প্রতি ঈমান রাখার ওপর নির্ভরশীল।

৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত পয়গাম্বর। খতমে নবুয়তের আকিদা অভিশপ্ত ও মারদূদ।

৫. যুদ্ধ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা হারাম।

৬. হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। কেয়ামতের পূর্বে আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না।

৭. দাজ্জাল খ্রিস্টান পাদ্রিদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ মাজুজ হলো রাশিয়ার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। আর আমি (মির্জা গোলাম আহমাদ) হলাম মাসীহে মাওউদ।

৮. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার, আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মুজিযার সংখ্যা দশ লক্ষ।

৯. বুরূজী, যিল্লী বা ছায়ানবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো–
আমি ধ্যানধারণা ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যে, আমার আত্মা ও দেহ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দেহ ও আত্মার মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, আমি মুহাম্মদ (স)-এর দেহ ও আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে এক অভিন্ন দেহ ও আত্মার অধিকারী হয়েছি। তাই আমাকে যিল্লী বা বুরূজী নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১০. স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার উক্তি হলো, আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনি আমাকে মাসীহে মাওউদ নামে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

১১. মির্জা গোলাম আহমাদের দাবির সংখ্যা ছিল ৫০টি। এসব দাবির অনেকটা পরস্পরবিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন– মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি, ইমাম হওয়ার দাবি, খলিফা হওয়ার দাবি, ইমাম মাহদী হওয়ার দাবি, নবী হওয়ার দাবি, রাসূল হওয়ার দাবি, তার নিকট অহী আসার দাবি, পড়ার মতো কুরআন নাযিল হওয়ার দাবি, সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবি। এছাড়া সকল নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, আহমাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ হওয়ার দাবি, মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি, তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না বলে দাবি, শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবি, শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার দাবি, আল্লাহর যেমন ৯৯টি নাম আছে, তারও তেমন ৯৯টি নাম আছে বলে দাবি।

عقائد القاديانية :

কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী।

২. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)।

৩. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে। দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার ঔরসে চেরাগ বিবির গর্ভে।

৪. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।

৫. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের।

৬. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী (পুরুষগণ) জঙ্গলের শূকর (স্ত্রীগণ) কুকুরী।

৭. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও শয়তানী ধর্ম।

৮. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে বর্ণিত তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা।

৯. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

১০. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী আসমান হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে।

১১. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য।

১২. মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযা তিন হাজার, আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নিশানা দশ লক্ষ।

১৩. ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন। যাদের রক্তের অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল (নাউযুবিল্লাহ)।

১৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও রাসূল। অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছে এবং আল্লাহ থেকে ঐশীবাণীপ্রাপ্তও হয়েছে।

উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু ঐ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের ছিল, তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু। ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও বাতিল মতবাদ।

■ **اَلسُّؤَالُ (١٢٥) : اُذْكُرْ اَقْوَالاً لِغُلَامْ اَحْمَدَ الْقَادِيَانِىِّ فِىْ كَوْنِهٖ ظِلاًّ لِلنَّبِىِّ وَنَبِيًّا مُطْلَقًا۔**

■ **প্রশ্ন : ১২৫ ॥ ছায়া নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উক্তিসমূহ উল্লেখ কর।**

উত্তর॥ উপস্থাপনা : কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করে। ব্রিটিশদের লালিতপালিত ও তাদের দীক্ষায় দীক্ষিত এ লোকটি ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে আল্লাহ, নবী, রাসূল, কুরআন, হাদীস ইত্যাদি সম্পর্কে জঘন্যতম মিথ্যাচার শুরু করে। কখনো নিজেকে ঈসা মসীহ, কখনো ছায়া নবী, কখনো বা স্বতন্ত্র নবী, মাহদী, শেষ নবী, আহমাদ, মুহাম্মাদ প্রভৃতি দাবি করতে থাকে। নিম্নে প্রশ্নালোকে নিজেকে ছায়া নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ব্যাপারে তার উক্তিসমূহ উল্লেখ করা হলো।

اَقْوَالُ غُلَامٍ فِىْ كَوْنِهٖ ظِلاًّ لِلنَّبِىِّ ﷺ :

বুরূজী বা ছায়া নবী হওয়া সম্পর্কে গোলামের উক্তি : মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছায়া নবী হওয়ার দাবির পক্ষে যেসব বক্তব্য দিয়েছে, তার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হলো। তবে সে যিল্লী নবীর সাথে নিজেকে উম্মতী নবী বলেও দাবি করেছে।

১. ছায়াস্বরূপ যার নাম দেয়া হয় মুহাম্মাদ ও আহমাদ তার (মাসীহে মাওউদ) নবুয়তের দাবি সত্ত্বেও হযরত (স) খাতামুন্নাবিয়্যীন থাকবেন। কেননা এ দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ওই মুহাম্মাদ (স)-এরই রূপ এবং তারই নাম।

২. আমি রাসূল ও নবী, অর্থাৎ আমি পূর্ণাঙ্গ ছায়া হিসেবে এসেছি। আমি এমন আয়না, যার মধ্যে মুহাম্মাদী আকৃতি ও মুহাম্মাদী নবুয়তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব পড়েছে।

৩. আল্লাহ তায়ালা নবীজি (স)-কে নবুয়তের সীলমোহর করে দিয়েছেন, অন্য কথায় কামালিয়াতের ফয়েজ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, যা আর কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। সেজন্য তাঁর নাম হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য নবুয়তের কামালিয়ত দান করে। তাঁর রূহানী তাওয়াজ্জুহ (দৃষ্টি) নবী সৃষ্টি করে। এ পবিত্র ও ঐশ্বরিক শক্তি আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি।

৪. যেসব জায়গায় আমি নবুয়ত বা রিসালাত সম্পর্কে অস্বীকার করেছি, তা শুধু এ অর্থে যে, আমি স্বতন্ত্র কোনো শরীয়ত নিয়ে আসিনি এবং পৃথক কোনো নবীও নই। তবে এ অর্থে আমি রাসূল এবং নবী যে, আমি স্বীয় পথপ্রদর্শক রাসূল (স) থেকে অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও শক্তি লাভ করে এবং নিজের জন্য সে নাম গ্রহণ করে তাঁরই মধ্যস্থতায় আল্লাহর পক্ষ হতে ইলমে গায়েব পেয়েছি; কিন্তু নতুন শরীয়ত ছাড়া আমাকে নবী বলতে আমি কখনো প্রতিবাদ করিনি; বরং এসব অর্থে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবী ও রাসূল বলে আহ্বান করেছেন। সুতরাং এখনো আমি এ অর্থে নবী রাসূল হওয়ার কথা অস্বীকার করি না।

যিল্লী বা ছায়া নবী হওয়ার দাবিটি একটি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দাবি। এটা অনেকটা হিন্দুদের অযৌক্তিক পুনর্জন্মের আকিদার নামান্তর। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সেসব কথার মারপ্যাঁচে নিজেকে যিল্লী বা ছায়া নবী বলেছে, হিন্দুরা অনুরূপভাবে বলতে পারে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুসলিমদের এ আকিদার সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমাদের সব খোদা হলো যিল্লী খোদা, ছায়া খোদা।

اَقْوَالُ غُلَام اَحْمَد فِىْ كَوْنِهٖ نَبِيًّا مُطْلَقًا :

স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে গোলাম আহমাদের কয়েকটি উক্তি : ১. আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন।

২. আমি যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রেরিত, তা প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য (বারাহীনে আহমদিয়ার বর্ণনা মতে ১০ লক্ষাধিক) নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, সেগুলো হাজার নবীর ওপর বণ্টন করা হলেও এর দ্বারা তাদের সকলের নবুয়ত প্রমাণিত হতে পারে; কিন্তু এরপরও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান তারা মানে না।

৩. "আমি সে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনিই মাসীহে মাওউদ নামে আমাকে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিরাট নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌছেছে।" উল্লেখ্য, তিনি যেসব প্রমাণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে তার মানি অর্ডারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায়ে টাকা-পয়সা বা হাদিয়া-তোহফা আগমনের সংবাদ। (অথচ এটা কৃত্রিম কৌশলের মাধ্যমেও বলা যেতে পারে) যেমন তিনি বলেছেন, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো, প্রায়শই নগদ টাকা-পয়সা, যা আসে বা যা হাদিয়া তোহফা আসে, তা পূর্বাহ্নেই ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে আমাকে অবগত করানো হয়। এ ধরনের নিদর্শন হবে পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে।

৪. এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, এসব ইলহামের মধ্যে আমার সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত, আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত, খোদার বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। যা কিছু সে বলে, তার প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন কর। তার শত্রুগণ জাহান্নামী।

৫. হযরত মাসীহে মাওউদ (মির্জা সাহেব) নিজেকে স্পষ্টভাবে আল্লাহর নবী ও রাসূল হিসেবে পেশ করেছেন এবং নিজেকে নবী রাসূলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার : মূলত গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উত্থান ছিল ইসলামী আকিদা, বিশ্বাস, তাহযীব, তামাদ্দুন, চেতনা, পুনর্জাগরণ ঠেকানোর জন্য পরিচালিত ব্রিটিশদের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের অংশবিশেষ।

■ **اَلسُّؤَالُ (١٢٦) : مَا الْقَادِيَانِيَّةُ؟ بَيِّنْ عَقِيْدَتَهُمْ.**

■ **প্রশ্ন : ১২৬ ॥ কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও।** [ফা. প. ২০১৭]

اَوْ مَا هِىَ الْقَادِيَانِيَّةُ؟ بَيِّنْ عَقِيْدَتَهُمْ.

অথবা, কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১২]

اَوْ مَنْ هُوَ غُلَام اَحْمَد الْقَادِيَانِيّ؟ اُذْكُرْ بَعْض دَعْوَاهُ وَعَقَائِدِهِ الْفَاسِدَةِ.

অথবা, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কে? তার কতিপয় ভ্রান্ত দাবি ও আকিদা উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৮,'১০]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ইসরাঈল রাষ্ট্র যেমন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য ক্যান্সার তেমনি কাদিয়ানী মতবাদও ইসলাম ধর্মের জন্য একটি মারাত্মক ব্যাধি। কাদিয়ানীদের আত্মপ্রকাশে মুসলিম সমাজ খানিকটা হলেও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এ ফেতনা মূলত মুসলিমদের ঈমান ও আকিদা বিনষ্টকারী একটি ফেতনা। কাদিয়ানী মতবাদ বলতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়। আর কাদিয়ানী ফেরকা বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলতে তার অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এ সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় না বলে আহমাদিয়া মুসলিম জামাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা আহমাদী জামাত ও মির্জায়ী নামে পরিচিত। তাদের পরিচয় ও আকিদাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

تَعْرِيْفُ الْقَادِيَانِيَّةِ : ↻

কাদিয়ানীদের পরিচয় : কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়।

عَقَائِدُ الْقَادِيَانِيَّةِ ؟ :

কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

১. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী।

২. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)।

৩. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে। দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার ঔরসে চেরাগ বিবির গর্ভে।

৪. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।

৫. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের।

৬. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী পুরুষগণ জঙ্গলের শূকর, স্ত্রীগণ কুকুরী।

৭. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও শয়তানী ধর্ম।

৮. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে বর্ণিত তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা।

৯. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

১০. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী আসমান হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে।

১১. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য।

১২. মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নিশানা দশ লক্ষ।

১৩. ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন, যাদের রক্তের অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

১৪. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী এবং রাসূল। অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছে এবং আল্লাহ থেকে ঐশীবাণীপ্রাপ্তও হয়েছে।

উপসংহার : কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। যেহেতু তারা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে সেহেতু ঐ মতবাদে যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফের। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী যে একজন বড় মাপের কাফের ছিল, তার প্রমাণ বহন করে তার মৃত্যু। ১৯০৮ সালে মির্জা কাদিয়ানী লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতএব কাদিয়ানী মতবাদ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভ্রান্ত মতবাদ নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও বাতিল মতবাদ।

■ السُّؤَالُ (١٢٧) : تَحَدَّثْ عَنْ بَعْضِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْمُتَوَاجِدَةِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ۔

■ **প্রশ্ন : ১২৭ ॥ বর্তমান সময়ের কতিপয় ভ্রান্ত দল সম্পর্কে আলোচনা কর।**
[ফা. প. ২০১৯]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল থেকেই বিভিন্ন সময় ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ভ্রান্ত দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

بَعْضُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ الْمُتَوَاجِدَةِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ :

বর্তমান সময়ে কতিপয় ভ্রান্ত দল :

১. **শিয়াদের পরিচয় :** ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা)-এর অনুসারী একদল বিভ্রান্ত সম্প্রদায় শিয়া নামে পরিচিত। তারা মহানবী (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের মসনদে আসীন করার পক্ষপাতী ছিল। যেহেতু মহানবী (স) ওফাতের পূর্বে কোনো উত্তরসূরি মনোনীত করে যাননি, ফলে খলিফা নির্বাচনে রাজনৈতিক মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে ইসলামে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ সম্প্রদায়টি হযরত আলী (রা) ও নবী পরিবারের প্রতি অযাচিত অতিরঞ্জিত ভালোবাসা দেখালেও তাদের সাথে হযরত আলী (রা)-এর নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ–

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন–

الشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَقَالُوْا اِنَّهُ هُوَ الْاِمَامُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صـ) وَاعْتَقَدُوْا اَنَّ الْاِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَمِنْ اَوْلَادِهِ۔

অর্থাৎ, শিয়া হলো তারা, যারা হযরত আলী (রা)-এর অনুসরণ করে এবং বলে, রাসূল (স)-এর পর তিনিই ইমাম এবং আরো বিশ্বাস করে যে, ইমামতি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থেকে বের হবে না।

২. ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী (র) বলেন–

اَلشِّيْعَةُ هُمُ الَّذِيْنَ شَايَعُوْا عَلِيًّا وَيُقَدِّمُوْنَهُ عَلٰى سَائِرِ اَصْحَابِ الرَّسُوْلِ۔

অর্থাৎ, শিয়া বলা হয় তাদেরকে, যারা হযরত আলী (রা)-এর আনুগত্য করে এবং তাঁকে সকল সাহাবীর ওপরে মর্যাদা দেয়।

শিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

ক. তাদের একটি অংশ হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশের বারো জনের ইমামতে বিশ্বাসী। অপর একটি অংশ সপ্ত ইমামে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম হবেন।

খ. তারা বিশ্বাস করে, তাদের ইমাম পাপ ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

গ. তারা মনে করে, ইমামগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলমে লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গায়েবী জ্ঞানপ্রাপ্ত।

ঘ. তারা اَلْغَيْبَة তথা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাসী। যেমন তারা মনে করে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

ঙ. তারা اَلرَّجْعَة তথা প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যুগে ইমাম মাহদীরূপে ফিরে আসবেন।

চ. তারা اَلتَّقِيَّة তথা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাসী।

ছ. তাদের বিশ্বাস হলো, প্রচলিত কুরআন বিকৃত। অবিকৃত মূল কুরআন হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন। তার বংশের ইমামগণের নিকট তা গোপন রয়েছে।

জ. বারো ইমামপন্থি শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিন খলিফাসহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ, ধর্মবিচ্যুত ও জালেম ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)

ঝ. তারা اَلْبَرَاءَة বা সম্পর্ক ছিন্নতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ এ সকল সাহাবীকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া তাদের ঈমানের অংশ।

ঞ. তারা সুন্নাত তথা হাদীস অস্বীকার করে। ইমামী শিয়ারা সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করে, তারা সাহাবীগণকে জালিয়াত বলে গণ্য করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

ট. শিয়ারা একমাত্র আলী (রা)-এর খেলাফত ও পরবর্তী যুগের শিয়াদের রাজত্ব ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতি শাসন বলে বিশ্বাস করে।

২. **খারেজীদের পরিচয় :** আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

فِرْقَةٌ مِنَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ خَرَجُوْا عَلَى الْإِمَامِ عَلِيٍّ (رض) وَخَالَفُوْا رَأْيَهُ۔

অর্থাৎ, খারেজী সম্প্রদায় হলো ইসলামী দলসমূহ থেকে এমন একটি দল, যারা হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছেন এবং তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন।

নামকরণের কারণ : খারেজীদের নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

ক. তারা মুসলিমদের দল ত্যাগ করে শরীয়তের কতিপয় মাসয়ালার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেন। তাই তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

খ. হযরত আলী (রা)-এর বৈঠক থেকে ১২,০০০ সৈন্য বের হয়ে কুফার হারুরা নামক স্থানে গিয়ে দল গঠন করায় এদের নাম খারেজী রাখা হয়।

গ. হযরত আলী (রা) বলেছিলেন– اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, সকল হুকুমের মালিক আল্লাহ তায়ালা। এ কথায় একমত না হয়ে বিদ্রোহ করে দল ত্যাগ করায় এদেরকে খারেজী বলা হয়।

খারেজীদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

ক. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের।

খ. ওসমান, আলী, উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মুয়াবিয়া (রা), সিফফীনের যুদ্ধের দুই সালিস : আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশয়ারী (রা) প্রমুখের বিচার ফয়সালাকে সঠিক মনে করলেই কাফের।

গ. জালেম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধ করা ফরয।

৩. **কাদারিয়াদের পরিচয় :** কাদারিয়া সম্প্রদায় তারা, যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের কার্যক্ষমতা রয়েছে এবং তার সম্পাদিত কার্যের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাদের ধারণা, আল্লাহ সরাসরি কোনো মানুষকে কার্যসম্পাদন করতে বাধ্য করেন না; বরং তিনি কার্যক্ষমতা দান করেন এবং এ অর্থেই তিনি সর্বশক্তিমান।

কাদারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : তাদের আকিদার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের কর্মের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যতের নির্মাতা। তারা মানুষকে শক্তি ও স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে আল্লাহর অপরিসীম শক্তি খর্ব করেন। নিজস্ব চরমপন্থি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এ সম্পর্কে ইমাম জাফর আস সাদেক বলেন, কাদারিয়া সম্প্রদায় মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যা মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে। কারণ মানুষকে যদি তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে বাধ্যবাধকতা ও আইনের শাসনের কোনো মূল্য থাকে না।

৪. **জাবারিয়াদের পরিচয় :** মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন–

জাবারিয়া ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা এ মত প্রকাশ করে যে, মানুষের জন্য যা ঘটে এর সবই সূচনাতে লিপিবদ্ধ ছিল।

এ সম্প্রদায়ের মতে, মানুষের ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদি কার্যাবলি আল্লাহর বাধ্যবাধকতার অধীন, তাই তাদের জাবারিয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

জাবারিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : জাবারিয়াগণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। তাদের আকিদা হচ্ছে, প্রত্যেক কার্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ তার কার্যাবলির জন্য দায়ী নয়। মানুষের কোনো কাজ করার শক্তি নেই কিংবা কোনো কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতাও নেই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অধীন। মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা পুরস্কার প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন।

৫. **মুরজিয়াদের পরিচয় :** মুরজিয়া বলতে এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্বে পাপী মুসলিমদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখার উপদেশ দেয়।

মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুরজিয়াদের আকিদার বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ–

ক. তাদের মতে, নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোনো উপকারিতা নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই।

খ. আরশ আল্লাহ তায়ালার থাকার স্থান।

গ. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যার ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে; বিবাহের প্রয়োজন নেই।

ঘ. আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৬. **মুশাব্বিহাদের পরিচয় :** মুশাব্বিহা (اَلْمُشَبِّهَةَ) শব্দটি তাশবীহ (اَلتَّشْبِيْه) মাসদার থেকে উদ্ভূত। তাশবীহ অর্থ– তুলনা করা, উপমা দেয়া, সমান বানানো, To make equal or similar, To compare ইত্যাদি। মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। যারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে 'মুশাব্বিহা' তথা তুলনাকারী ফেরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মুশাব্বিহাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের আকিদার মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

ক. তারা মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে।

খ. তারা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে।

গ. তারা মহান আল্লাহর কিছু কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মতো বলে মনে করে।

৭. **জাহমিয়াদের পরিচয় :** জাহমিয়া অর্থ- জাহমের সাথে সম্পর্কিত। জাহম ইবনে সাফওয়ান পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। ইমাম আবু যুহরা বলেন, উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এ ফেরকাটির جَبْر (মানুষ মাজবূর তথা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়।

জাহমিয়াদের আকিদা : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

ক. আল্লাহ তায়ালাকে এমন কোনো গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয়; যে গুণ কোনো মাখলুকের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে।

খ. তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি مَخْلُوْق মনে করে।

গ. তারা মনে করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর। অর্থাৎ কোনো শক্তি, কোনো ইচ্ছা, কোনো ক্ষমতা তার নেই।

ঘ. ঈমান হলো অন্তরের বিষয়; মুখের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব কারো অন্তরে যদি ঈমান থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মুমিনই থাকবে।

ঙ. ঈমানের মধ্যে কোনো বিভক্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল– এ তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়।

চ. তাদের মতে, পরকালে আল্লাহর দীদার (رُؤْيَة بَارِى) হবে না।

ছ. তারা মালাকুল মওতকে অস্বীকার করে। তাদের মতে, রূহ সরাসরি আল্লাহ কবজ করেন।

৮. **মুতাযিলাদের পরিচয় :** مُعْتَزِلَة শব্দটি اِعْتِزَال হতে উদ্গত। এর শাব্দিক অর্থ– দলত্যাগী। একদা এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীকে প্রশ্ন করেছিলেন, কবীরা গুনাহ করলে কোনো লোক মুসলিম থাকবে কিনা? উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, সে কাফের; কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রতিভাবান শিষ্য ওয়াসেল ইবনে আতা এ মতটি গ্রহণ করলেন না। তিনি ঐ ব্যক্তিকে কাফের ও মুসলমানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছিলেন। অতঃপর সে শিক্ষকের দলত্যাগ করে মসজিদের কোণায় নিজের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। শিষ্যের এ আচরণে হাসান বসরী বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন– هُوَ اعْتَزَلَ عَنَّا অর্থাৎ, সে আমাদের দলত্যাগ করেছে। এ মন্তব্য করার পর হতে ওয়াসেল ইবনে আতার দলকে মুতাযিলী দল বলা হয়।

মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য : মুতাযিলাদের আকিদার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

ক. আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা। মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়।

খ. মহান আল্লাহকে আখেরাতে দেখা যাবে না।

গ. মহান আল্লাহর কালাম তথা কথা তাঁর অনাদি বিশেষণ নয়; বরং তা তাঁর সৃষ্টবস্তু মাত্র।

ঘ. তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই এবং মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন; মানুষই মানুষের কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে।

ঙ. পাপী মুসলিম কাফেরও নয় মুসলিমও নয়। আখেরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী।

চ. অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরি ও ফরযে আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।

৯. **কাদিয়ানীদের পরিচয় :** কাদিয়ানী মতবাদের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমাদ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বলেই তাকে কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম মির্জা গোলাম মুর্তযা। সে ছিল পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তযা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের একজন আস্থাভাজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জমিদার। এ পরিবারটি ছিল ইংরেজ সরকারের বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। মির্জা গোলাম মুর্তযা নিজেকে ইংরেজ সরকারের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময় সে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ইংরেজদেরকে

সাহায্য করেছিল। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দ জন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও ব্রিটিশ সরকারের খেদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে সে দেশপ্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত উর্দু, ফারসি, আরবি ও কিছু ইংরেজি পড়াশোনা করে। কয়েক বার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানির চাকরি নেয়।

কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ : কাদিয়ানীদের আকিদাসমূহ নিম্নরূপ–

ক. মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী নন; বরং মির্জা গোলাম আহমাদ শেষ নবী।

খ. মির্জা গোলাম আহমাদ হুবহু মুহাম্মাদুর রাসূল (স)।

গ. মুহাম্মাদ (স) দু'বার আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমবার ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে। দ্বিতীয়বার ১৮৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্জা গোলাম মুর্তযার ঔরসে চেরাগ বিবির গর্ভে।

ঘ. মির্জা কাদিয়ানীর শিক্ষা ও তার প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।

ঙ. মির্জা কাদিয়ানীকে যারা নবী হিসেবে মানবে না, তারা জাহান্নামী ও কাফের।

চ. মির্জা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধাচরণকারী পুরুষগণ জঙ্গলের শূকর, স্ত্রীগণ কুকুরী।

ছ. মির্জা কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করা ব্যতীত ইসলাম অভিশপ্ত ও শয়তানী ধর্ম।

জ. মির্জা কাদিয়ানীর লিখিত কিতাবসমূহ যারা শ্রদ্ধার সাথে দেখবে না, এতে বর্ণিত তথ্যাদি গ্রহণ করবে না, তারা জারজ সন্তান ও হারামজাদা।

ঝ. মির্জা কাদিয়ানী কুরআনের ভুল সংশোধনের জন্য এসেছে, যা তাফসীরের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

ঞ. কুরআন যমীন হতে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল, মির্জা কাদিয়ানী আসমান হতে আবার যমীনে নামিয়ে এনেছে।

ট. মির্জা কাদিয়ানীর মুখ হতে নির্গত সকল বাক্যই খোদার বাক্য।

ঠ. মুহাম্মাদ (স)-এর মুজিযা তিন হাজার আর মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নিশানা দশ লক্ষ।

ড. ঈসা (আ)-এর দাদি ও নানিদের মধ্যে তিন জন বেশ্যা ছিলেন, যাদের রক্তের অংশ ঈসা (আ)-এর মধ্যে ছিল। (নাউযুবিল্লাহ)

ঢ. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী এবং রাসূল। অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছে এবং আল্লাহ থেকে বাণীপ্রাপ্তও হয়েছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত দলসমূহের অধিকাংশ ফেরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো অনেক নতুন ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। এসব প্রাচীন ফেরকার মধ্যে শিয়া ও খারেজী ফেরকা এখনো বিদ্যমান। এছাড়া অন্যান্য ফেরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকিদা বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়।



বোর্ড প্রশ্নাবলি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٢م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১২

علوم القران والحديث (الورقة الثالثة)

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)]

বিষয় কোড : 103

(العقائد الاسلامية)

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الدرجات الكاملة ـ ١٠٠ الزمن : ٣ ساعات

পূর্ণমান– ১০০ সময়– ৩ ঘণ্টা

الملاحظة : أجب عن إثنين من مجموعة (الف) وعن ستة من مجموعة (ب) ـ

[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

المجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات ـ ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

١ـ ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ أوضح أصول العقيدة الاسلامية وأهميتها ـ

[আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫০ দ্রষ্টব্য।

٢ـ تحدث عن أركان الايمان بالأدلة النقلية والعقلية ـ

[নকলী ও আকলী দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আরকানুল ঈমান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ১১৯ দ্রষ্টব্য।

٣ـ اكتب نواقض الايمان على ضوء القران والسنة ـ

[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান (ঈমান বিনষ্টকারী) সম্পর্কে লিখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

٤ـ من هم أهل السنة والجماعة؟ بين عقيدتهم بالتفصيل ـ

[আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহের বর্ণনা দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য।

المجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات- ١٠ × ٦ = ٦٠

মান- ১০ × ৬ = ৬০

٥- ما معنى الايمان لغة واصطلاحا؟ هل الايمان يزيد وينقص؟
[ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ঈমান কি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়?]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৪৮২ দ্রষ্টব্য।

٦- هل النار والجنة موجودتان الان؟ اكتب اختلاف العلماء فى هذه المسئلة-
[জাহান্নাম ও জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত ব্যক্ত কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৩, পৃষ্ঠা নং ৬০০ দ্রষ্টব্য।

٧- تكلم عن الايمان بالاخرة - ثم اذكر اثاره فى المجتمع الانسانى-
[আখেরাতের উপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মানবসমাজে এর প্রভাবসমূহ উল্লেখ কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য।

٨- الشرك ما هو؟ كم قسما له؟ ثم بين كل قسم بالاختصار-
[শিরক কী? উহার প্রকার কয়টি? অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের হুকুম সংক্ষেপে আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য।

٩- عرف النفاق بالاختصار ثم اذكر علامات النفاق على ضوء القران والسنة-
[নেফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। অতঃপর নেফাকের আলামতগুলো কুরআন সুন্নাহর আলোকে উল্লেখ কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য।

١٠- هل الشتم والكذب على الله والرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر؟ اوضح بالايات القرانية والاحاديث النبوية-
[আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-কে গালি দেয়া ও মিথ্যা আরোপ করা কি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত? কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৬, পৃষ্ঠা নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য।

١١- ما هى القاديانية؟ بين عقيدتهم-
[কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৫ দ্রষ্টব্য।

١٢- عرف الفرقة "الشيعة" - ثم تحدث عن تاريخ نشأتهم وعقائدهم -
[শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও এবং তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও আকিদা সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

١٣- تكلم عن الإيمان بالملائكة - ثم اذكر صفاتهم بالأدلة -
[ঈমান বিল মালাইকা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের গুণাবলি সম্পর্কে দালিলিক প্রমাণ দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৫৭৯ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٣م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৩

علوم القران والحديث (الورقة الثالثة)

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)]

বিষয় কোড : 1 0 3

(العقائد الاسلامية)

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الدرجات الكاملة - ١٠٠ الزمن : ٣ ساعات

পূর্ণমান– ১০০ সময়– ৩ ঘণ্টা

الملاحظة : أجب عن إثنين من مجموعة (الف) وعن ستة من مجموعة (ب) -
[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে দুটি এবং (ب) অংশ থেকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

المجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات - ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

١- عرف العقيدة والإيمان والاسلام - ثم بين الفرق بينها مع ذكر نشأة مصطلح العقيدة وتطورها -
[ايمان ,عقيدة ও اسلام-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য ও عقيدة পরিভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৩ দ্রষ্টব্য।

٢- ما الإيمان بالرسالة؟ تحدث عن مقتضيات الايمان بالرسالة مع إثبات ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم مدللا -
[রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ১৫০ দ্রষ্টব্য।

٣- بين عقائد اهل السنة والجماعة فى رؤية البارى تعالى وعصمة الانبياء عليهم السلام مع الرد على المخالفين-

[আল্লাহ তায়ালার দীদার এবং ইসমাতুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদাসমূহ বর্ণনাপূর্বক বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ১৯৬ দ্রষ্টব্য।

٤- وازن حقيقة الشرك وطبيعته فى الأمم السابقة ولهذه الأمة - ثم بين مفاسد الشرك فى بنغلاديش مع بيان رأيك فى استئصاله-

[অতীত ও বর্তমানে শিরকের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর। বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর এবং শিরকের মূলোৎপাটনে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬০, পৃষ্ঠা নং ৩২৭ দ্রষ্টব্য।

المجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات- ١٠ × ٦ = ٦٠

মান- ১০ × ৬ = ৬০

٥- الإيمان بالقدر ما هو؟ أثبت وجوب الإيمان بالقدر بالأدلة من الكتاب والسنة-

[الإيمان بالقدر বলতে কী বুঝ? কদরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য।

٦- ما هى الأمور التى يجب على المسلم أن يعتقد بها؟ اكتب بأدلة الكتاب والسنة-

[মুসলমানের আবশ্যিক আকিদার বিষয়বস্তুসমূহ কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দলীলসহ উপস্থাপন কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭৫ দ্রষ্টব্য।

٧- هل للعباد الأفعال الاختيارية أم لا؟ بين الخلاف بين المعتزلة والأشعرية فى هذه المسئلة-

[বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয় মুতাযিলা ও আশয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য।

٨- عين مكانة الصحابة واهل البيت رضوان الله عليهم اجمعين على ضوء الاحاديث النبوية-

[হাদীসে নববীর আলোকে সাহাবাগণ (রা) ও আহলে বাইত (রা)-এর মর্যাদা নিরূপণ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৫২০ দ্রষ্টব্য।

৯. الاشراط الصغرى للساعة ما هى؟ بين بالايجاز.
[কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে লেখ।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

১০. اكتب اقوال المعتزلة فى مسئلة مرتكب الكبيرة.
[مرتكب الكبيرة বিষয়ে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ লিপিবদ্ধ কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৬৩৩ দ্রষ্টব্য।

১১. ما معنى الكفر لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل.
['কুফর'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইহা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৫, পৃষ্ঠা নং ৬৪৯ দ্রষ্টব্য।

১২. اذكر الأيات القرانية والاحاديث النبوية بالنسبة للنفاق والمنافقين.
[নেফাক ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী হতে উদ্ধৃত কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৮, পৃষ্ঠা নং ৬৫৯ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٤م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৪

علوم القران والحديث (الورقة الثالثة)

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)]

বিষয় কোড : 1 0 3

(العقائد الاسلامية)

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الزمن : ٣ ساعات   الدرجات الكاملة - ١٠٠

সময়– ৩ ঘণ্টা   পূর্ণমান– ১০০

الملاحظة : أجب عن إثنين من مجموعة (الف) وستة من مجموعة (ب).
[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

المجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات - ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

১. ما معنى الايمان والاسلام لغة واصطلاحا؟ هل هما مترادفان ام لا؟ هل الايمان يزيد و ينقص؟ ثم بين نشأة مصطلح "العقيدة" بالتفصيل.
[ঈমান ও ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ দুটি কি সমার্থক শব্দ না বিপরীতার্থক শব্দ? ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় কিনা? অতঃপর "আল আকিদাহ" পরিভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিশদভাবে আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৮৭ দ্রষ্টব্য।

٢- عرف التوحيد- ثم اذكر اقسامه مدللا ومفصلا-

[আততাওহীদ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর আততাওহীদের প্রকারভেদ দলীলসহকারে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য।

٣- ما الرسالة؟ وما الحكمة فى ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أيد الله عز وجل رسوله بالمعجزات؟ ثم بين اهم معجزاته بالتفصيل-

[আর-রিসালাহ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করার হেকমাত কী? আল্লাহ কেন তার রাসূল (স)-কে মুজিযাহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন? অতঃপর তার প্রধান প্রধান মুজিযাহসমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ২২৯ দ্রষ্টব্য।

٤- عرف البعث لغة واصطلاحا - ثم اثبت بأن البعث حق بالادلة النقلية والعقلية- واجب عن ادلة منكريه موضحا-

[আল বায়াছ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা আল বায়াছ যে সত্য তা প্রমাণ কর এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের উত্তর দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

المجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات- ١٠ × ٦ = ٦٠

মান– ১০ × ৬ = ৬০

٥- اكتب أصول العقيدة الصحيحة بالايجاز-

[ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

٦- عرف الولى لغة واصطلاحا- وماذا تعلم عن حقيقته؟ بين موضحا-

[অলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে স্পষ্টাকারে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

٧- اثبت عذاب القبر وسؤال منكر ونكير بالادلة - ثم أذكر أدلة المخالفين فيه مع جواب أدلتهم-

[কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া এবং মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন ও উত্তর দলীলসহ প্রমাণ কর। অতঃপর এর বিরোধীদের দলীলের উত্তর দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ২৭৯ দ্রষ্টব্য।

٨- اثبت حقيقة الوزن والكتاب والصراط والحوض بالادلة الواضحة-

[সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর যে, ওযন, কিতাব, পুলসিরাত এবং হাওযে কাওসার সত্য।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৬০৩ দ্রষ্টব্য।

৯- متى تقع واقعة الساعة؟ وما اشراط الساعة؟ بين بالايجاز-
[কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কেয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ৬১৪ দ্রষ্টব্য।

١٠- ما الشرك؟ اذكر انواع الشرك الاصغر فى ضوء الاحاديث النبوية -
[শিরক কী? হাদীসের আলোকে শিরক আসগারের বর্ণনা দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮১, পৃষ্ঠা নং ৬৪০ দ্রষ্টব্য।

١١- عرف النفاق - ثم اكتب اقسامه وحكمه بالاختصار-
[নেফাকের পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও হুকুম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য।

١٢- عرف اهل السنة والجماعة مع ذكر مزاياهم-
[আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহসহ তাদের পরিচয় দাও।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৩, পৃষ্ঠা নং ৬৯৫ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٥م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৫

علوم القران والحديث (الورقة الثالثة)

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (তৃতীয় পত্র)]

বিষয় কোড : 1 0 3

(العقائد الاسلامية)

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الزمن : ٣ ساعات　　　　الدرجات الكاملة - ١٠٠

সময়– ৩ ঘণ্টা　　　　পূর্ণমান– ১০০

الملاحظة : أجب عن إثنين من مجموعة (الف) وستة من مجموعة (ب) -
[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات- ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

١- عرف العقيدة والإيمان والإسلام - ثم بين نشأة العقيدة وتطورها مفصلا وممثلا-
[আকিদা, ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আকিদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৩ দ্রষ্টব্য।

٢- ما هى المعجزة؟ اذكر بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التى وقعت فى حياته الطيبة۔

[মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনে সংঘটিত কতিপয় মুজিযা উল্লেখ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

٣- من هم أهل السنة والجماعة؟ بين عقائدهم بالتفصيل۔

[আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কারা? তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য।

٤- اكتب نواقض الإيمان على ضوء القران والسنة۔

[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নাওয়াকিদুল ঈমান বা ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

مجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات۔ ١٠ × ٦ = ٦٠

মান– ১০ × ৬ = ৬০

٥- هل الايمان يزيد وينقص؟ وما رأيك؟ بين اختصارا۔

[ঈমান কি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৪৮১ দ্রষ্টব্য।

٦- هل الجنة والنار موجودتان الأن؟ اكتب اختلاف العلماء فى هذه المسئلة۔

[জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান আছে কি? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত ব্যক্ত কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৩, পৃষ্ঠা নং ৬০০ দ্রষ্টব্য।

٧- عين مكانة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بضوء القران والسنة۔

[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবাগণের মর্যাদা নিরূপণ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৫১৭ দ্রষ্টব্য।

٨- ما معنى عصمة الأنبياء؟ وما هو رأيك؟ بين مؤجزا۔

[ইসমতে আম্বিয়া অর্থ কী? এ বিষয়ে তোমার মতামত কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

٩- حدث عن الشفاعة ۔ هل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورية للنجاة أم لا؟ اثبت بالدلائل۔

[শাফায়াতের সংজ্ঞা দাও। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য।

١٠- الأشراط الصغرى للساعة ما هى؟ بين بالإيجاز۔

[কেয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

١١- عرف النفاق ثم اكتب أقسامه وحكمه بالاختصار-

[নেফাকের পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও হুকুম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৬৫৫ দ্রষ্টব্য।

١٢- الخوارج من هم؟ اذكر اهم عقائدهم مختصرا-

[খারেজী কারা? তাদের প্রধান আকিদাসমূহ উপস্থাপন কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৫, পৃষ্ঠা নং ৭০০ দ্রষ্টব্য।

١٣- كيف ظهر الافتراق فى الأمة الإسلامية؟ بين-

[ইসলামী উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ৬৮৬ দ্রষ্টব্য।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٦م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৬

علوم القران والحديث

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস]

বিষয় কোড : 1 0 3

الورقة الثالثة

[তৃতীয় পত্র]

العقائد الاسلامية

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الوقت : ٣ ساعات الدرجات الكاملة- ١٠٠

সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০

الملاحظة : أجب عن اثنين من مجموعة (الف) وستة من مجموعة (ب)-

[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات- ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান- ২০ × ২ = ৪০

١- عرف التوحيد- ثم اذكر اقسامه مدللا ومفصلا-

[তাওহীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাওহীদের প্রকারসমূহ দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ১২৭ দ্রষ্টব্য।

٢- ما هو الشرك؟ اذكر مفاسد الشرك فى بنغلاديش مع بيان رأيك فى استئصاله-

[শিরক কী? বাংলাদেশে শিরকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আলোচনাপূর্বক এর মূলোৎপাটনে তোমার মতামত বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৩৩২ দ্রষ্টব্য।

٣- ما معنى النبوة والرسالة؟ ما الفرق بين النبى والرسول؟ تحدث عن مقتضيات الايمان بالرسالة مع اثبات ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم بالادلة والبراهين۔

[নবুয়ত ও রিসালাত-এর অর্থ কী? নবী ও রাসূল-এর মাঝে পার্থক্য কী? হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তির বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণপূর্বক রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

٤- "الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" تحدث عن الايمان بالبعث بعد الموت وانكاره فى ضوء هذه العبارة مدللا ومفصلا۔

["الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

مجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات- ١٠ × ٦ = ٦٠

মান- ১০ × ৬ = ৬০

٥- ما هو الخلاف بين الخوارج والاشاعرة فى مسألة مرتكب الكبيرة؟ بين مفصلا۔

[مرتكب الكبيرة বিষয়ে আশয়ারিয়্যা ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩২ দ্রষ্টব্য।

٦- بين اهمية الايمان بالاخرة۔ ثم اذكر اثاره فى المجتمع الانسانى۔

[পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা কর। অতঃপর মানবসমাজে এর প্রভাব আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৫৯২ দ্রষ্টব্য।

٧- بين معنى البدعة واقسامها بالامثلة۔

[البدعة-এর অর্থ ও প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৫, পৃষ্ঠা নং ৬৭৫ দ্রষ্টব্য।

٨- ما هو الايمان بالقدر؟ اثبت وجوب الايمان بالقدر بالادلة من الكتاب والسنة۔

[الايمان بالقدر বলতে কী বুঝ? তাকদীরের ওপর বিশ্বাসের আবশ্যকতা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য।

٩- عرف الولى لغة واصطلاحا۔ وماذا تعلم عن حقيقة الولى؟ بين موضحا۔

[الولى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত সম্পর্কে কী জান? বিশদভাবে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

١٠- هل للعباد افعال اختيارية ام لا؟ بين الخلاف بين المعتزلة والاشعرية فى هذه المسألة-

[বান্দার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ বিষয়ে মুতাযিলা ও আশয়ারীগণের মতভেদ উল্লেখ কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য।

١١- اكتب اصول العقيدة الاسلامية بايجاز-

[ইসলামী আকিদার মূল উৎসসমূহ সংক্ষেপে লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭৫ দ্রষ্টব্য।

١٢- ما هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو شرط لكمال الايمان؟ بين-

[রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা কী? ঈমানের পূর্ণতার জন্য রাসূল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৫৫৪ দ্রষ্টব্য।

١٣- اكتب ترجمة الامام ابى حنيفة رحمه الله بإيجاز-

[সংক্ষেপে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٧م

ফাযিল স্নাতক ১ম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৭

علوم القرآن والحديث

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস]

বিষয় কোড : 103

الورقة الثالثة

[তৃতীয় পত্র]

العقائد الاسلامية

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الوقت : ٣ ساعات — الدرجات الكاملة- ١٠٠

সময়- ৩ ঘণ্টা — পূর্ণমান- ১০০

الملاحظة : أجب عن اثنين من مجموعة (الف) وعن ستة من مجموعة (ب)-

[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات- ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান- ২০ × ২ = ৪০

١- اكتب نبذة من حياة الامام ابى حنيفة رحمه الله- ثم تحدث عن عقيدته فى ضوء كتابه "الفقه الاكبر"-

[ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর তাঁর রচিত 'আল ফিকহুল আকবর' গ্রন্থের আলোকে তাঁর আকিদা আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ১০০ দ্রষ্টব্য।

٢- ما المعجزة؟ اذكر أهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم۔
[মুজিযা কী? রাসূল (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ মুজিযাসমূহ বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

٣- ما الكفر لغة وشرعا؟ وكم قسما له؟ بين كل قسم بالتفصيل۔
['কুফর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুফর কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

٤- من أهل السنة والجماعة؟ بين عقائدهم بالتفصيل۔
['আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' কারা? তাদের আকিদাসমূহ বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৩ দ্রষ্টব্য।

مجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات۔ ١٠ × ٦ = ٦٠

মান– ১০ × ৬ = ৬০

٥- تحدث عن عذاب القبر في ضوء القران والسنة۔
[কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ৬৩০ দ্রষ্টব্য।

٦- اكتب ما تعلم بمكانة الصحابة۔ ثم أثبت بالادلة "ان الصحابة كلهم عدول"۔
[সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান লিখ। অতঃপর প্রমাণ কর যে, 'সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।']
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৫১৭ দ্রষ্টব্য।

٧- تحدث عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لامته۔ هل هى ضرورية للنجاة أم لا؟ بين۔
[উম্মতের জন্য রাসূল (স)-এর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা কর। নাজাতের জন্য রাসূল (স)-এর শাফায়াত অপরিহার্য কিনা? বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য।

٨- هل الصراط حق ام لا؟ اوضح اختلاف العلماء فى هذه المسئلة۔
['সিরাত' বাস্তব কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৭ দ্রষ্টব্য।

٩- من الفرقة المعتزلة؟بين عقائدهم بالتفصيل۔
[মুতাযিলা সম্প্রদায় কারা? তাদের আকিদাসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৭২৫ দ্রষ্টব্য।]

١٠- ما القاديانية؟ بين عقيدتهم۔
[কাদিয়ানী মতবাদ কী? তাদের আকিদার বর্ণনা দাও।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৫ দ্রষ্টব্য।

١١- ما الاشراط الصغرى للساعة؟ بين بإيجاز۔
[কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

١٢- ما المراد ب "عصمة الانبياء" ؟ بين فى ضوء القران والحديث-
['ইসমাতুল আম্বিয়া' বলতে কী বুঝ? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

١٣- اكتب نبذة من حياة الإمام أبى جعفر الطحاوى رحمه الله-
[ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৪৯৮ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٨م

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৮

علوم القران والحديث

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস]

বিষয় কোড : 103

العقائد الاسلامية

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ]

الورقة الثالثة

[তৃতীয় পত্র]

الزمن : ٣ ساعات — الدرجات الكاملة- ١٠٠

সময়– ৩ ঘণ্টা — পূর্ণমান– ১০০

الملاحظة : أجب عن اثنين من مجموعة (الف) وعن ستة من مجموعة (ب)-
[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات- ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

١- ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا؟ تحدث عن موضوع العقيدة وغرضها وغايتها و نشأتها-
[আকিদা-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 'আকিদা' এর বিষয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৫ দ্রষ্টব্য।

٢- "الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين" - تحدث عن الايمان بالبعث بعد الموت وانكاره فى ضوء هذه العبارة مدللا و مفصلا-
[– الايمان بالحشر من ضروريات الدين وانكاره كفر باليقين উক্তিটির আলোকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে ঈমান আনা বা অস্বীকার করা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণসহ আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২৮৪ দ্রষ্টব্য।

٣- تحدث عن نواقض الايمان فى ضوء القران والسنة-
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।]
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

٤- عرف الاسراء والمعراج ـ ثم اثبت بالادلة ان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى اليقظة لا فى المنام ـ

['ইসরা' ও 'মিরাজ' এর সংজ্ঞা দাও। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, রাসূল (স)-এর মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, স্বপ্নে নয়।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ১৮৯ দ্রষ্টব্য।

مجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات ـ ١٠ × ٦ = ٦٠

মান– ১০ × ৬ = ৬০

٥- اكتب نبذة من حياة العلامة سعد الدين التفتازانى رحمه الله صاحب شرح العقائد النسفية ـ

['শরহুল আকিদা আন নাসাফিয়া' গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাদ উদ্দীন তাফতাযানী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২০, পৃষ্ঠা নং ১১৬ দ্রষ্টব্য।

٦- هل الايمان والاسلام متحدان ام مختلفان؟ بين بالادلة ـ

[ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় নাকি ভিন্ন বিষয়? দলীলসহ বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৪৮৬ দ্রষ্টব্য।

٧- تحدث عن عقيدة ختم النبوة مدعما بالادلة من القران والسنة مفصلا ـ

[কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ খতমে নবুয়তের আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ১৭০ দ্রষ্টব্য।

٨- ما معنى عصمة الانبياء؟ وما عقيدة اهل السنة والجماعة فيها؟ بين ـ

['ইসমাতুল আম্বিয়া' বলতে কী বুঝ? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা কী? বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

٩- مامعنى البدعة لغة وشرعا؟ بيين اقسامها بالامثلة ـ

['বিদয়াত' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বিদয়াত-এর প্রকারসমূহ আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৫, পৃষ্ঠা নং ৬৭৫ দ্রষ্টব্য।

١٠- كيف ظهر الافتراق فى الامة الاسلامية؟ بين ـ

[মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ৬৮৬ দ্রষ্টব্য।

١١- ما الخلاف بين الخوارج والاشاعرة فى مسألة مرتكب الكبيرة؟ بين مفصلا ـ

[مرتكب الكبيرة বিষয়ে আশয়ারিয়া ও খাওয়ারেজদের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৬৩২ দ্রষ্টব্য।

١٢- عرف الولى لغة واصطلاحا - ثم اكتب ما تعرف عن حقيقة الاولياء وكراماتهم موضحا -

[الولى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অলীর হাকীকত ও কারামত সম্পর্কে যা জান বিশদভাবে লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

١٣- عرف الشيعة مع بيان تاريخ نشأتهم واصول عقائدهم -

[শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় দাও। তাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহ আলোকপাত কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৩, পৃষ্ঠা নং ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

اختبار السنة الأولى للفاضل البكالوريوس، لعام ٢٠١٩م

[ফাযিল স্নাতক (পাস) প্রথম বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৯]

علوم القران والحديث

[উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস]

العقائد الاسلامية

[আল-আকাইদুল ইসলামিয়্যাহ] বিষয় কোড : 103

الورقة الثالثة

[তৃতীয় পত্র]

الوقت : ٣ ساعات الدرجات الكاملة - ١٠٠

সময়– ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান– ১০০

الملاحظة : أجب عن اثنين من مجموعة (الف) وعن ستة من مجموعة (ب)-

[দ্রষ্টব্য : (الف) অংশ থেকে **দুটি** এবং (ب) অংশ থেকে **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

الدرجات- ٢٠ × ٢ = ٤٠

মান– ২০ × ২ = ৪০

١- عرف العقيدة والإيمان والاسلام - ثم بين اصول العقيدة الاسلامية مفصلا-

[আকিদা, ঈমান ও ইসলামের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী আকিদার মূলনীতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫৪ দ্রষ্টব্য।

٢- ما المعجزة والكرامة؟ تحدث عن عشر معجزات للنبى محمد صلى الله عليه وسلم-

[মুজিযা ও কারামত বলতে কী বোঝায়? নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দশটি মুজিযা আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ১৮৩ দ্রষ্টব্য।

٣۔ عرف الخوارج مع بيان نشأتهم و تطورهم وعقائدهم بشيء من التفصيل۔

[খারেজিদের পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা সবিস্তারে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮২, পৃষ্ঠা নং ৪২১ দ্রষ্টব্য।

٤۔ ما معنى الكفر؟ وكم قسما له؟ بين مفصلا مدللا۔

[কুফর অর্থ কী? তা কত প্রকার? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

مجموعة (ب)

(ب) অংশ

الدرجات۔ ١٠ × ٦ = ٦٠

মান– ১০ × ৬ = ৬০

٥۔ اكتب نبذة عن حياة الامام ابى حنيفة رحمه الله۔

[ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৪৯৫ দ্রষ্টব্য।

٦۔ ما معنى التوحيد؟ وكم قسما له؟ بين۔

[তাওহীদের অর্থ ও প্রকারভেদ বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২০, পৃষ্ঠা নং ৫০৪ দ্রষ্টব্য।

٧۔ تحدث عن ختم النبوة بأدلة من القران والسنة۔

[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খতমুন নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ৫২২ দ্রষ্টব্য।

٨۔ اكتب معنى الشفاعة واقسامها مفصلا۔

[শাফায়াতের অর্থ ও প্রকারভেদ সবিস্তারে লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৮ দ্রষ্টব্য।

٩۔ ما المراد بعصمة الانبياء؟ بين فى ضوء القران والسنة۔

[ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে কী বোঝায়? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

١٠۔ اكتب اشراط الساعة الكبرى بالايضاح۔

[কেয়ামতের বড় আলামতগুলো বিশদভাবে লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৫৮৫ দ্রষ্টব্য।

١١۔ عرف الشرك مع ذكر اقسامه مفصلا۔

[শিরকের পরিচয় ও প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৬৩৭ দ্রষ্টব্য।

١٢۔ اكتب عشرة كتب تتعلق بالعقيدة الاسلامية مع ذكر مؤلفيها۔

[লেখকের নামসহ ইসলামী আকিদা বিষয়ে রচিত দশটি বইয়ের নাম লেখ।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯ দ্রষ্টব্য।

١٣۔ تحدث عن بعض الفرق الضالة المتواجدة فى هذا العصر۔

[বর্তমান সময়ের কতিপয় ভ্রান্ত দল সম্পর্কে আলোচনা কর।]

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৭, পৃষ্ঠা নং ৭৪৭ দ্রষ্টব্য।
